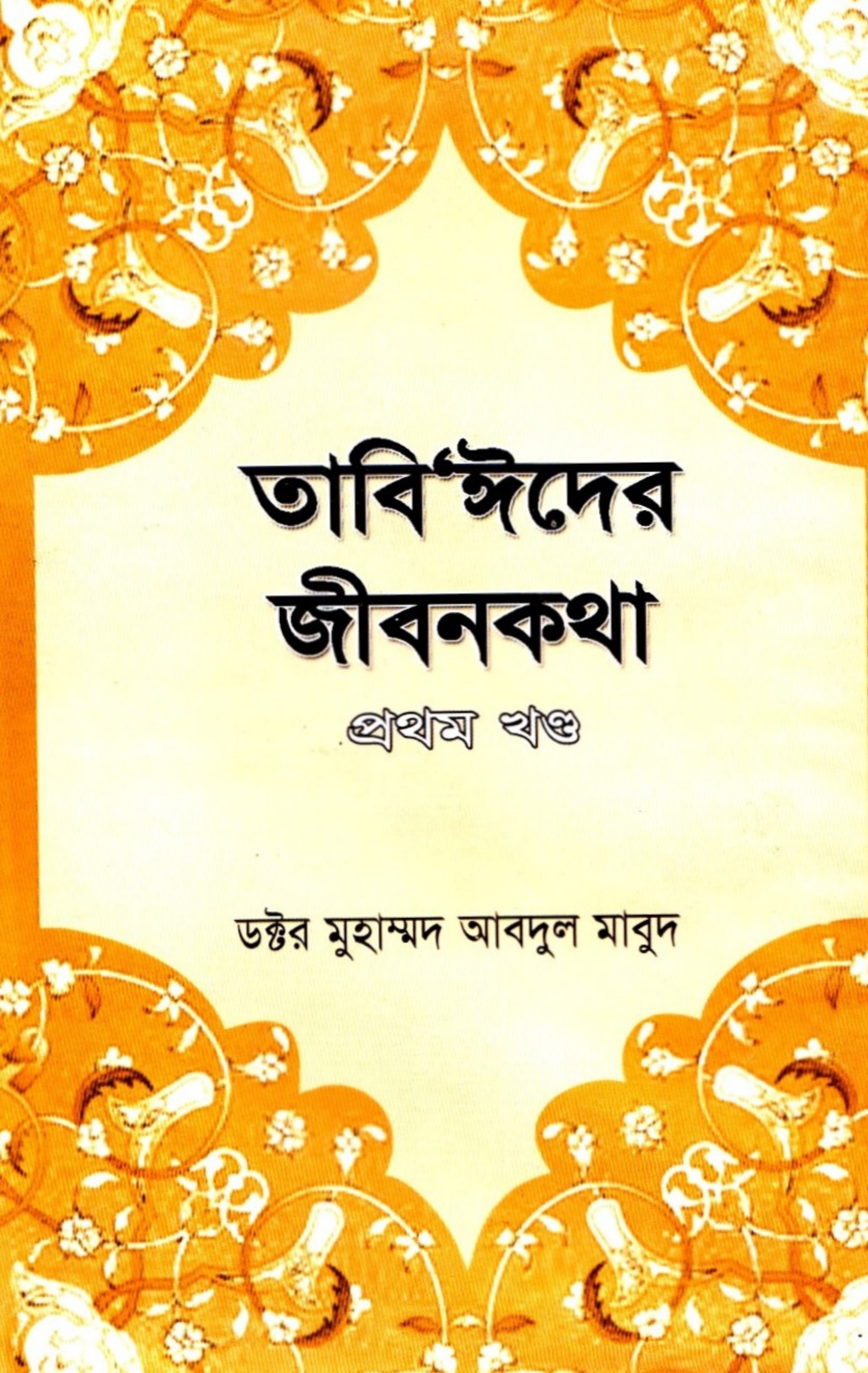

তাবি'ঈদের জীবনকথা

প্রথম খণ্ড

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

তাবি'ঈদের জীবনকথা

[প্রথম খণ্ড]

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ISBN 984-842-015-0 Set

প্রথম প্রকাশ
রমজান ১৪২৩
কার্তিক ১৪০৯
নভেম্বর ২০০২

প্রচ্ছদ
হরফ ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

নির্ধারিত মূল্য : একশত দশ টাকা মাত্র

Tabieeder Jibankatha (Vol. I)
Written by Dr. Muhammad Abdul Mabud and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Masjid Campus Dhaka 1000 First Edition November 2002 Price Tk. 110.00 only.

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা ॥ ৫
১. ‘উরওয়া ইবন আয-যুবায়র (রা) ॥ ১১
২. হাসান আল-বসরী (রহ) ॥ ২৫
৩. ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ আত-তায়মী (রহ) ॥ ৬৬
৪. ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ আন-নাখা‘ঈ (রহ) ॥ ৭০
৫. সা‘ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) ॥ ৭৯
৬. সা‘ঈদ ইবন জুবায়র আল-ওয়ালিবী (রহ) ॥ ১০২
৭. সালিম ইবন ‘আবদিল্লাহ (রা) ॥ ১১৮
৮. তাঊস ইবন কায়সান (রহ) ॥ ১২৫
৯. ‘আতা ইবন আবী রাবাহ (রহ) ॥ ১৩৯
১০. মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন শিহাব আয্‌-যুহ্‌রী (রহ) ॥ ১৪৯
১১. ‘আমির ইবন শুরাহীল আশ-শা‘বী (রহ) ॥ ১৬১
১২. কাজী শুরায়হ (রহ) ॥ ১৮১
১৩. ‘আমির ইবন ‘আবদিল্লাহ (রহ) ॥ ১৯৬
১৪. ‘আলকামা ইবন কায়স (রহ) ॥ ২১৫
১৫. মাসরূক ইবন আল-আজদা‘ (রহ) ॥ ২২১
১৬. মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (রহ) ॥ ২২৯
১৭. আল-আহ্‌নাফ ইবন কায়স (রহ) ॥ ২৪৬
১৮. উওয়াইস ইবন ‘আমির আল-কারানী (রহ) ॥ ২৭১
১৯. সালামা ইবন দীনার (রহ) ॥ ২৮৪
২০. রাবী‘ ইবন খুছায়ম (রহ) ॥ ২৯৫
গ্রন্থপঞ্জি ॥ ২০৭

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

ঈমানী শক্তি, দীনী আবেগ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং জ্ঞান ও কর্মগত সেবার দিক দয়ে ইসলামের রয়েছে তিনটি ধারাবাহিক 'খাইরুল কুরূন' তথা সর্বোত্তম যুগ। আর তা হলো সাহাবা, তাবি'ঈন ও তাবি'-তাবি'ঈনের যুগ। এ তিনটি যুগ বা সময়কালে মুসলিম জাতি দীন চর্চা, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, পার্থিব সৌভাগ্য ও সফলতার চূড়ায় পৌছে যায়। এর পরে যে উন্নতি ও উৎকর্ষ মুসলমানরা অর্জন করে তা ছিল কেবল সভ্যতারূপী প্রাসাদের বাহ্যিক শোভা ও অলঙ্কার।

এই তিনটি যুগ তথা পর্যায়ের দ্বিতীয়টি হলো তাবি'ঈন-এর যুগ। 'তাবি'ঈন' আরবী শব্দ। এটি বহুবচন, একবচনে 'তাবি'ঈ'। মূল ধাতু ت - ب - ع, অর্থ : অনুসরণ করা, পরে আসা ইত্যাদি। আর 'তাবি'ঈ' শব্দটি কর্তৃবাচক বিশেষ্য, যার অর্থ অনুসরণকারী, পরে বা পিছনে আগমনকারী। যেসব মানুষ রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকালে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু কোন কারণে ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত থেকে যান। তবে তাঁর কোন সাহাবীকে দেখার সুযোগ লাভে ধন্য হন। তেমনিভাবে যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর জন্মগ্রহণ করেন, ঈমানদার মুসলমান হিসেবে বড় হন এবং কমপক্ষে রাসূলুল্লাহর (সা) একজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন– তাঁরা সবাই হলেন তাবি'ঈ। এক কথায়, যেসব মুসলমান রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখার সৌভাগ্য লাভ করেননি, তবে তাঁর কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় তাবি'ঈন। আর যাঁরা কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেননি, তবে কোন তাবি'ঈর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা হলেন তাবি'-তাবি'ঈন।

রাসূলে কারীমের (সা) উপর হিরা গুহায় প্রথম ওহী নাযিলের দিন থেকে তাঁর ওফাতের দিন পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় 'নুবুওয়াত ও রিসালাত'-এর যুগ। এর পরের ধারাবাহিক তিনটি যুগ হলো : সাহাবী, তাবি'ঈন ও তাবি'-তাবি'ঈন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) একটি হাদীছের প্রেক্ষিতে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, সাহাবীদের যুগ শেষ হয়েছে হিজরী ১১০ সনে। হিজরী ১১০ সনের পরে কোন সাহাবী বেঁচে ছিলেন বলে ধরা হয় না। তাবি'ঈদের যুগ হিজরী কত সাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়েছে, তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও হিজরী তৃতীয় শতকের কিছু সময় পর্যন্ত এ যুগ দীর্ঘায়িত হতে পারে। তবে হিজরী দ্বিতীয় শতকের গোটাটাই তাবি'ঈদের পদভারে পৃথিবী মুখর ছিল।

এই তিনটি তাবকা বা স্তরের মধ্যে দ্বিতীয় তাবকাটি এই হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, তাঁরা ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম, যাঁরা হলেন দীনের মূল উৎসধারা এবং তাবি'-তাবি'ঈন, যাঁদের মধ্যে অসংখ্য মনীষীর জন্ম হয়েছে– এই উভয় স্তরের মধ্যবর্তী

যোগসূত্র। তাঁরাই সাহাবায়ে কিরামের 'ইলম ও আখলাক তথা জ্ঞান ও নৈতিকতার কল্যাণকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন।

আল্লাহর কালাম ও রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছে এই তাবি'ঈদের বহু ফযীলত ও মর্যাদার কথা এসেছে। কুরআনে মুহাজির ও আনসারদের সাথে তাঁদের প্রতিও আল্লাহর সন্তুষ্টি ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন ঃ

وَالسَّابِقُوْنَ الأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَار وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ.

– আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মধ্যে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উদ্যানসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। [সূরা আত-তাওবা-১০০]

উল্লেখ্য যে, উপরে উদ্ধৃত আয়াতে মুহাজির-আনসারদের সাথে আর যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা হলেন তাবি'ঈন। কারণ, সত্যিকারভাবে তাঁরাই মুহাজির ও আনসারদের ইত্তেবা' ও অনুসরণকারী এবং সময় ও কালের দিক দিয়েও তাঁরা ছিলেন মুহাজির-আনসারদের পরে। এ কারণে ইসলামী পরিভাষায় তাঁদেরকে তাবি'ঈ বলা হয়েছে। [ইবন তায়মিয়্যা, আর-রিসালা আত-তাদমুরিয়্যা, পৃ. ৩৭; তাফসীর মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ৫৯০]

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছে এর চেয়ে আরো স্পষ্টভাবে তাঁদের পরিচয় এসেছে এবং তাঁদেরকে "خَيْرٌ" তথা 'সবচেয়ে ভালো' অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন :

خَيْرُ أُمَّتِىْ اَلْقَرْنُ الَّذِيْنَ يَلُوْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

– আমার উম্মাতের মধ্যে সেই যুগের লোক সবচেয়ে ভালো যারা আমাকে পেয়েছে (সাহাবা)। তারপর ঐসব লোক যারা তাদেরকে পেয়েছে (তাবি'ঈন)। তারপর ঐসব লোক যারা তাদেরকে পেয়েছে (তাবি'-তাবি'ঈন)। [সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল]

অন্য একটি বর্ণনায় কথাটি এভাবে এসেছে :

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .

– আমার যুগের লোকেরা সবচেয়ে ভালো। তারপর যারা তাঁদেরকে পেয়েছে (তাবি'ঈ)। তারপর যারা তাঁদেরকে পেয়েছে (তাবি'-তাবি'ঈ)। [সহীহ্ মুসলিম]

এই তিনটি যুগের লোকেরা স্বস্ব যুগের জন্য ছিলেন খায়র ও বরকত তথা শুভ ও কল্যাণের নিমিত্ত। তাঁদেরই কল্যাণে ইসলামের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত বিজয় অর্জিত

কল্যাণের নিমিত্ত। তাঁদেরই কল্যাণে ইসলামের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত বিজয় অর্জিত হয়। [সহীহ মুসলিম]

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يأتى على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم.

– নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে যখন একদল লোক জিহাদ করবে। অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন যিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখেছেন? তারা জবাব দিবে : হ্যাঁ। তখন তাদেরই জন্য বিজয় দেওয়া হবে। অতঃপর একটি দল জিহাদ করবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কোন সাহাবীকে দেখেছেন? তারা বলবে : হ্যাঁ। তখন তাদের সম্মানে তাদের বিজয় দেওয়া হবে।

মানবজাতির এই পবিত্র প্রজন্মটি 'ইলম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মে ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের প্রতিচ্ছায়া। তাঁরা রাসূলে কারীমের শিক্ষা এবং সাহাবায়ে কিরামের জ্ঞান ও নীতি-আদর্শের উত্তরাধিকারকে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। রিসালাত যুগের দূরত্ব এবং ব্যক্তিতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রভাবে ইসলামী জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে সকল দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছিল তার সংশোধন তাঁরা করেন। আর সংশোধন করতে না পারলেও ইসলামের মূল ও স্বচ্ছ ঝর্নাধারাকে বাইরের ধুলোবালি ও ময়লা-আবর্জনা থেকে নিজেদের চেষ্টায় নিরাপদ রাখেন। দীনী জ্ঞানের সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে নতুন নতুন জ্ঞান ও শাস্ত্রের ভিত্তি রচনা করেন, ইসলামী খিলাফতের সীমা-পরিধির বিস্তার ঘটান ও ইসলামকে ছড়িয়ে দেন। মোটকথা, সাহাবীদের যুগে যে সকল কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছিল তারা তা পূর্ণতায় পৌঁছে দেন এবং যা কিছু সে যুগে সম্পূর্ণ হয়েছিল, তা সংরক্ষণ করেন।

ইমাম যুহ্রী, মাকহূল শামী, ইবরাহীম নাখা'ঈ, কাজী শুরায়হ, 'আকরামা, সালিম (রহ) ইসলামী জ্ঞানের দিকটি সামাল দেন, আর মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, মুহাম্মাদ ইবন যুবায়র, ইমাম যায়নুল আবিদীন (রহ) নৈতিক শিক্ষাকে সজীব ও সতেজ করেন। হাসান বসরী, উওয়াইস কারানী, 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ (রহ) খোদায়ী 'ইশক ও মুহাব্বতের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতে রাশিদার নমুনাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। মোটকথা, তাবি'ঈন কিরাম 'ইলম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন। জ্ঞান ও নীতি-আদর্শের এই বিভক্তি কেবলমাত্র

আপেক্ষিক এবং প্রাধান্য লাভকারী গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে। অন্যথায় জ্ঞান ও নৈতিকতার যাবতীয় সৌন্দর্য কম-বেশী সাধারণভাবে এইসব মহান ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

তাঁদের সামষ্টিক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড হলো দীনী 'উলূম তথা দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞান যার উপর ইসলামী জীবন বিধানের অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তার সংরক্ষণ, প্রচার-প্রসার এবং কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক বিভিন্ন জ্ঞানের ভিত্তি রচনা করা। যদি এ সকল মনীষী জ্ঞানের এই ভাণ্ডারকে সংরক্ষণের জন্য সীমাহীন সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার না করতেন তাহলে তার একটি বড় অংশ হারিয়ে যেত। এই তাবি'ঈদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবি'-তাবি'ঈন, যাঁদের মধ্যে অসংখ্য ইমাম-মুজতাহিদের জন্ম হয়েছে, যাঁদের কল্যাণে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং পৃথিবীতে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে– তাঁরা এই তাবি'ঈদেরই সুযোগ্য শিষ্য-শাগরিদ।

সাধারণভাবে এমন প্রত্যেক নারী-পুরুষই তাবি'ঈ যিনি কোন সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেছেন, অথবা সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। কিন্তু যেমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে স্তরভেদ আছে তেমনি আছে তাবি'ঈদের মধ্যেও। আবূ বকর সিদ্দীকও (রা) সাহাবী, আর আবূ সুফয়ানও (রা) একজন সাহাবী। বিভিন্ন বিবেচনায় তাঁদের উভয়ের মর্যাদায় বিস্তর ব্যবধান। তেমনিভাবে ইমাম যায়নুল 'আবিদীনও (রহ) একজন তাবি'ঈ, আর ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়াও (রা) একজন তাবি'ঈ। কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্র নিকট এ দু'জনের সম্মান ও মর্যাদা সমান হবার নয়। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য।

তাছাড়া এই তাবি'ঈদের মধ্যে ছিলেন অনেক বড় বড় বিজয়ী বীর ও যোদ্ধা যাঁদের অসির শক্তি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল পেশীশক্তিকে নির্মূল করে দেয়। কিছু শাসক ও রাষ্ট্রনায়কও ছিলেন যাঁদের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই শ্রেণীর তাবি'ঈর সকল প্রচেষ্টাকে মুসলিম উম্মাহ্ চিরকাল কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। তবে আমরা এসব শাসক ও রাষ্ট্রনায়কদের জীবন ও কর্মের আলোচনায় যাব না। কারণ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নামে স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে যা পড়া ও পড়ানো হয় তা মূলতঃ তাঁদেরই ইতিহাস। তাঁদের সম্পর্কে গবেষণা ও লেখালেখির লোকের অভাব নেই। আমরা কেবল সেই সব তাবি'ঈর জীবন আলোচনা করবো যাঁরা মুসলিম জাতির জন্য দীনী ও নৈতিক আদর্শ রেখে গেছেন, যাঁদের নৈতিক আদর্শের দ্বারা ইসলাম নতুন জীবন লাভ করেছে এবং যাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির প্রাসাদ রচিত হয়েছে। 'আবদুল মালিক, ওয়ালীদ, সুলাইমান, কুতাইবা ইবন মুসলিম, মূসা ইবন নুসায়র, মাসলামা, মুহাল্লাব ইবন আবী সুফরা প্রমুখের মত বীর যোদ্ধা ও রাষ্ট্রনায়ক মুসলিম উম্মাহ্ প্রতিটি যুগেই পেতে পারে; কিন্তু হাসান আল-বসরী, উওয়াইস আল-কারানী, সা'ঈদ ইবন আল মুসায়্যিব, ইবন শিহাব যুহরী, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন-এর

মত মানুষ জন্মের জন্য প্রয়োজন হয় শত শত বছরের। আমরা তাঁদেরই কথা পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

'তাবি'ঈদের জীবনকথা' প্রথম খণ্ডে বিশ জন বিখ্যাত তাবি'ঈর জীবনী স্থান পেয়েছে। অতি সংক্ষেপে তাঁদের জীবন ও কর্মের কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠক একটু গভীরভাবে পাঠ করলে লক্ষ্য করবেন যে, তাঁদের মধ্যে বিচিত্রমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। তাঁদের অনেককে দেখা যায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের নিকট ছড়িয়ে থাকা ইসলামের বিভিন্ন জ্ঞান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য জীবনপাত করছেন, কাউকে দেখা যায় স্বৈরাচারী উমাইয়্যা শাসকদের যুল্ম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন, আবার কেউ বা দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব ও সুখ-সম্ভোগ হতে দূরে থেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে নির্ভেজাল যুহ্‌দ ও তাকওয়ার জীবন যাপন করছেন। তবে তাঁদের সবার উপরে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও কর্মের ছাপ ও প্রভাব পুরোপুরি বিদ্যমান। সত্য, সুন্দর ও মানবতার আহ্বানে সাড়া দিতে কাউকে ইতস্ততঃ দেখা যায় না। আর তাই দেখা যায়, দুনিয়ার প্রতি সম্পূর্ণ নির্মোহ স্বভাবের এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে 'ইবাদাত-বন্দেগীতে মশগুল উওয়াইস আল-কারানীকে জিহাদে যোগদান করে শাহাদাত বরণ করতে। আর 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহর মত 'আবিদ ব্যক্তি জিহাদের ডাক এলেই নির্বাচিত বন্ধুদের নিয়ে একটি দল গঠন করে জিহাদে চলে যেতেন। হাসান আল-বসরী (রহ) যাঁকে সুফীকুল শিরোমণি মানা হয়, আজকের দিনের তথাকথিত সুফীদের জীবন ও তাঁর জীবনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। আল-আহনাফ ইবন কায়সের (রহ) মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও তাকওয়া-পরহিযগারীর এক অপূর্ব সমন্বয়। মোটকথা, সাহাবায়ে কিরামের (রা) সাহচর্য তাবি'ঈদের যাবতীয় সুপ্ত প্রতিভা ও যোগ্যতাকে আলোড়িত ও উৎকর্ষমণ্ডিত করে তোলে। তাঁদের একেক জনের মধ্যে একেকটি এবং কারো মধ্যে একাধিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইতিপূর্বে আমরা যেমন 'আসহাবে রাসূলের জীবনকথা'য় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছি, তেমনিভাবে এ ক্ষেত্রে তাবি'ঈদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ধারাবাহিকভাবে পাঠকদের নিকট উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাবি'ঈদের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করে চলছেন।

তাবি'ঈদের জীবনকথা প্রথম খণ্ড পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি।

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

بسم الله الرحمن الرحيم

'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র (রা)

হযরত 'উরওয়া (রহ)-এর ডাক নাম আবূ 'আবদিল্লাহ। তাঁর পিতা-বিখ্যাত সাহাবী এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী হযরত যুবায়র ইবন আল-'আওয়াম (রা) এবং মাতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) কন্যা হযরত আসমা' (রা)। তাঁর ধমনীতে একদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী যুবায়র (রা) ও অন্য দিকে রাসূলুল্লাহর বন্ধু আবূ বকরের খুন প্রবহমান ছিল। উমাইয়্যা স্বৈরশাসনের প্রতি বিদ্রোহী প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) ছিলেন তাঁর সহোদর এবং মুস'আব ইবন যুবায়র ছিলেন বৈমাত্রেয় ভাই।[১]

তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।[২] তাঁর জন্মসন নিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। খলীফা ইবন খায়্যাত হিজরী ২৩ সনে তাঁর জন্মের কথা বলেছেন। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হিঃ ২৩ সনের পরে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] অনেকে, হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতের শেষ অথবা হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন- কথাটি এভাবে বলেছেন।[৪] ইবন খাল্লিকান হিঃ ২২, মতান্তরে হিঃ ২৬ সনে তাঁর জন্মের কথা উল্লেখ করেছেন।[৫] হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতের ছয় বছর অতিক্রম করার পর তাঁর জন্ম হয়- একথা বলেছেন মুস'আব ইবন 'আবদিল্লাহ।[৬] 'আল্লামা যিরিকলী হিঃ ২২ খ্রীঃ ৬৪৩ সনে জন্ম ও হিঃ ৯৩ খ্রীঃ ৭১২ সনে মৃত্যুর কথা বলেছেন।[৭]

হযরত 'উরওয়ার (রহ) শিশু ও কিশোর জীবনের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বিক্ষিপ্ত কিছু কথা বিভিন্ন গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন শিশু অবস্থায় তাঁর মহান পিতা তাঁকে কোলে করে দোলাতে দোলাতে নীচের এই শ্লোকটি গুন্ গুন্ করে আওড়াতেন :[৮]

أَبْيَضُ مِنْ آلِ أَبِي عَتِيْق+ مُبَارَكٌ مِنْ وَلْدِ الصِّدِّيْقِ
أَلَذُّ كَمَا رِيْقِي.

- তুমি আবূ 'আতীকের সন্তান-সন্ততিদের চেয়ে শুভ্রতর, সিদ্দীকের সন্তানদের থেকেও

---

[১] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৪
[২] তাবাকাত-৫/১৮২
[৩] সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৪২২
[৪] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৩
[৫] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৮
[৬] তারীখ ইবন 'আসাকির-১১/২৮৩
[৭] আল-আ'লাম-৪/২২৬
[৮] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৮০

কল্যাণময়। আমার নিকট অধিকতর সুস্বাদু, যেমন আমার মুখের লালা আমার নিকট সবচেয়ে বেশী সুস্বাদু।

হযরত 'উরওয়া বলেছেন, 'আমি আমার শৈশব অবস্থায় 'উছমানকে (রা) যারা গৃহবন্দী করেছিল তাদেরকে দেখতে একদিন দাঁড়ালাম। দেখলাম, একটি লোক 'উছমানের নিকট পৌঁছার জন্য কাঠের সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে। আমার ভাই 'আবদুল্লাহ্ তাকে মেরে মাটিতে শুইয়ে দেন। আমি আমার সংগের অন্য ছেলেদেরকে বললাম : এ লোকটিকে মেরেছে আমার ভাই। এরপর বিদ্রোহীরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আমাকে ন্যাংটা করে ফেলে। যখন তারা দেখে, আমি এক নাবালক শিশু তখন ছেড়ে দেয়।'[৯] উটের যুদ্ধে তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যাওয়া হয়নি। তিনি বলেছেন, 'উটের যুদ্ধের সময় যুদ্ধে যাওয়ার বয়স না হওয়ার কারণে আবূ বকর ইবন 'আবদির রহমান ইবন আল-হারিছ ও আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।'[১০] ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন বলেন, 'উরওয়ার বয়স সে সময় তেরো বছর ছিল।'[১১]

হযরত 'উরওয়া বিয়ে করেন খলীফাতু রাসূলিল্লাহ 'উমার ইবনুল খাত্তাবের পৌত্রী সাওদা বিন্ত 'আবদিল্লাহ (রা)কে। তাঁর বিয়ের ঘটনাটিও বেশ চমকপ্রদ। হজ্জ মওসুমে সাওদার পিতা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) সহ বহু সাহাবী মদীনা থেকে মক্কায় গেছেন। বিপুল সংখ্যক সাহাবীর সাথে হযরত 'আবদুল্লাহ্ (রা) কা'বা তাওয়াফ করছেন। 'উরওয়াও (রা) তাঁদের পিছে পিছে তালবিয়্যা পাঠ করতে করতে তাওয়াফ করে চলেছেন। হযরত 'আবদুল্লাহর মেয়ে সাওদার কথা 'উরওয়া জা'নতেন এবং মনে মনে তাঁকে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন। তাঁর মহান পিতার নিকট প্রস্তাবটি দেওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় তিনি ছিলেন। এখন এই তাওয়াফের মাঝে তিনি সুযোগ পেয়ে যান। তাওয়াফের এক পর্যায়ে তিনি হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) একেবারে কাছাকাছি চলে যান এবং অত্যন্ত সাহসের সাথে বলে ফেলেন : 'চাচা, আমি আপনার মেয়ে সাওদাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক।' হযরত 'আবদুল্লাহ্ (রা) কথাটি শুনে একটু ঘাড় কাত করে 'উরওয়ার দিকে তাকালেন। কোন জবাব দিলেন না। তারপর আপন মনে তালবিয়্যা ও দু'আ-ইসতিগফার পাঠ করতে করতে তাওয়াফে মশগূল হয়ে গেলেন।

হজ্জ শেষে হযরত 'আবদুল্লাহ্ (রা) মদীনায় ফিরে গেলেন। আর 'উরওয়াও আল-'আকীকে তাঁর নিজের বাড়ীতে ফিরে গেলেন। বিষয়টি তিনি মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন না। তিনি মদীনায় হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) বাড়ীতে গিয়ে আবার প্রস্তাব দানের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিছুদিন পর তিনি 'আবদুল্লাহর (রা) সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ীতে গেলেন। তখন কথার মাঝে এক পর্যায়ে তিনি 'উরওয়াকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন : তুমি সাওদা সম্পর্কে কি যেন বলছিলে? 'উরওয়া বললেন : হাঁ, বলেছিলাম। তিনি বললেন :

---

৯. তারীখ ইবন 'আসাকির-১১/২৮৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৪২৩

১০. তাবাকাত-৫/১৭৯

১১. তারীখ ইবন 'আসাকির-১১/২৮৩; তাহযীব আত-তাহযীব-৭/১৮৩

তুমি যখন তার কথা বলেছিলে তখন আমরা তাওয়াফের মধ্যে ছিলাম। আল্লাহ্ আমাদের সামনে হাজির ছিলেন। তা তোমার কি তার প্রতি আগ্রহ আছে? 'উরওয়া সায় দিলেন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ ও তাঁর দাস নাফি'কে ডাকার জন্য লোক পাঠালেন।

ছেলে 'আবদুল্লাহ ও দাস নাফি' আসার পর তাঁদেরকে লক্ষ্য করে হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন : এ হচ্ছে 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র ইবন আল-'আওয়াম। তোমরা তার অবস্থা জান। সে সাওদাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। আমি রাজি হয়েছি এবং সাওদাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিলাম। 'উরওয়া, তুমি কবুল করছো?
'উরওয়া বললেন : হাঁ, আমি কবুল করেছি।
'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার : আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি দান করুন।
এভাবে অতি সরল ও অনাড়ম্বরভাবে 'উরওয়া ও সাওদার বিয়ে সম্পন্ন হয়।[১২]

এই সাওদার গর্ভে জন্ম নেন তাঁদের বিখ্যাত চার ছেলে : ইয়াহইয়া, 'উছমান, হিশাম ও মুহাম্মাদ। এ চারজনই তাঁদের পিতা 'উরওয়া থেকে বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে হিশাম ইবন 'উরওয়া তাঁর অন্য তিন ভাইকে ডিঙ্গিয়ে যান।[১৩]

হযরত 'আলী (রা) ও হযরত মু'আবিয়ার (রা) দ্বন্দ্ব-সংঘাতে তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করেননি।

হযরত 'উরওয়ার (রহ) ভাই হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) ও তাঁর প্রতিপক্ষ উমাইয়্যা খলীফা 'আবদুল মালিকের মধ্যে যে সব দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তাতে তিনি ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করেন। 'আবদুল্লাহর (রা) বাহিনীকে স্বৈরাচারী শাসকের প্রতিভূ হাজ্জাজের বাহিনী মক্কায় অবরোধ করে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়। তখন 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পরিবার ও কুরায়শ বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আলোচনায় বসেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকলে হাজ্জাজের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করার জন্য আহ্বান জানান। 'উরওয়া (রহ্) ভাইয়ের পাশে একই খাটের উপর বসা ছিলেন। তিনি হাজ্জাজের সাথে আপোষ-মীমাংসার পরামর্শ দেন এবং এ ব্যাপারে হযরত হাসান ইবন 'আলীর (রা) পদাঙ্ক অনুসরণের আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, হযরত হাসান (রা) হযরত মু'আবিয়ার (রা) অনুকূলে তাঁর খিলাফতের অধিকার ত্যাগ করেন। 'উরওয়ার কথা শোনার সাথে সাথে হযরত যুবায়র (রা) তাঁর একটি পা উঁচু করে 'উরওয়াকে এমন জোরে একটি লাথি মারেন যে, তিনি খাটের উপর থেকে ছিট্‌কে নীচে পড়ে যান। তারপর তিনি 'উরওয়াকে লক্ষ্য করে বলেন : ওহে 'উরওয়া! তোমার কথা শুনলে আমার অন্তর তোমার অন্তরের মত হয়ে যাবে। তোমরা যা বলছো তা মেনে নিলেও আমি খুব অল্প সময়ই বাঁচবো। অপমানের একটি লাথির চেয়ে সম্মানের একটি অসির আঘাত খাওয়া অনেক ভালো।[১৪]

---

১২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৪৩২
১৩. 'আসরুত তাবি'ঈন-৫১
১৪. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪১৫

হাজ্জাজের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) শাহাদাত বরণ করলেন। হাজ্জাজ তাঁর লাশটি দাফন-কাফনের জন্য না দিয়ে মক্কার এক উন্মুক্ত স্থানে ঝুলিয়ে রাখেন। এ সময় 'উরওয়া মক্কা থেকে পালিয়ে শামে খলীফা 'আবদুল মালিকের দরবারে হাজির হন। খলীফা তাঁকে প্রীতি ও সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। 'উরওয়ার সাথে বুক মিলিয়ে একই আসনে পাশাপাশি বসান। হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) নিহত হওয়ার খবর খলীফা তখনো পাননি। 'উরওয়ার মুখেই খবরটি প্রথম লাভ করেন এবং সাথে সাথে সিজদায়ে শোকর আদায় করেন। তারপর 'উরওয়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে তক্ষুণি 'আবদুল্লাহর (রা) লাশ হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়ে হাজ্জাজের নিকট চিঠি পাঠান। আর সেই সাথে তাঁর এমন আচরণের জন্য খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

এদিকে 'আবদুল্লাহকে হত্যার পর হাজ্জাজ 'উরওয়ার সন্ধানে ছিলেন। যখন তাঁর কোন সন্ধান পেলেন না তখন তিনি 'আবদুল মালিককে লিখলেন যে, 'উরওয়া তাঁর ভাইয়ের সাথে ছিলেন। ভাই নিহত হওয়ার পর তিনি আল্লাহর সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে কোথাও পালিয়ে গেছেন। 'উরওয়া তখন শামে খলীফার দরবারে। এ কারণে 'আবদুল মালিক জবাবে লিখলেন যে, "তিনি পালিয়ে যাননি। বরং আমার বায়'আত গ্রহণ করেছেন। আমি তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে নিরাপত্তা দান করেছি। তিনি মক্কায় ফিরে যাচ্ছেন। সেখানে তাঁর সাথে যেন কোন রকম অসদাচরণ করা না হয়।" এ ভাবে তিনি 'আবদুল মালিকের আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করে মক্কায় ফিরে যান। তাঁর ফেরার পর 'আবদুল্লাহর লাশ দাফন করা হয়।[১৫]

'উরওয়া যদিও 'আবদুল মালিকের আনুগত্যের বায়'আত করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে আর কোন তিক্ততা বিদ্যমান ছিল না তবুও তিনি উমাইয়্যাদের অমানবিক আচরণ ও স্বৈরাচারী রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এ কারণে তিনি শহরের আবাস ছেড়ে মদীনার অদূরে 'আকীক উপত্যকার পল্লীতে বসবাস শুরু করেন।[১৬]

'আবদুল্লাহ ইবন হাসান বর্ণনা করেন, 'আলী ইবন হুসায়ন (যায়নুল 'আবেদীন) ও 'উরওয়া প্রতিদিন 'ঈশার নামাযের পর মসজিদে নাবাবীর এক কোণে বসতেন। আমিও তাঁদের সাথে বসতাম। একদিন কথার মধ্যে বানূ উমাইয়্যাদের জুলুম-অত্যাচারের প্রসঙ্গ উঠলো। তিনি এ মত প্রকাশ করলেন যে, যখন কারো মধ্যে তাদের এ অত্যাচার-উৎপীড়নে বাধা দানের ক্ষমতা নেই তখন কতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে থাকা সমীচীন। আল্লাহ এ জুলুমের শাস্তিস্বরূপ একদিন না একদিন তাদের উপর 'আযাব নাযিল করবেন। 'উরওয়া 'আলী ইবন হুসায়নকে বললেন, যে ব্যক্তি জালিমদের থেকে দূরে থাকবে, আল্লাহ তার এই অসন্তুষ্টির কথা অবগত হবেন। আশা করা যায়, আল্লাহ যখন তাদের উপর কোন মুসীবত নাযিল করবেন তখন তাদের থেকে দূরে

---

[১৫] আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/২৯১

[১৬] তাবাকাত-৫/১৭৯

অবস্থানকারীদেরকে– তা সে সামান্য দূরত্বেই হোক না কেন, নিরাপদে রাখবেন। এ আলোচনার পর তিনি 'আকীক চলে যান।[১৭] লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তাদের মসজিদে খেল-তামাসা, তাদের হাট-বাজারে অহেতুক কাজ-কারবার এবং তাদের রাস্তা-ঘাটে নির্লজ্জতার প্লাবন বয়ে চলেছে।[১৮] তাঁকে যখন মদীনায় ফিরে যাবার কথা বলা হতো তখন বলতেন, মদীনায় এখন কী আছে? সেখানে এখন আছে শুধু কারো সম্পদের প্রতি ঈর্ষাকাতর অথবা কারো বিপদে উৎফুল্ল মানুষ।[১৯]

ইবন ইউনুসের বর্ণনা মতে জানা যায় যে, 'উরওয়া সাত বছর মিসরে ছিলেন।[২০] 'উরওয়া ছিলেন ঐসব মহান ব্যক্তিবর্গের উত্তরসূরী যাঁরা ছিলেন ইল্ম ও 'আমল– এ দুইটি সীমাহীন সাগরের সঙ্গমস্থল। তাঁর মহান পিতা যুবায়র ইবন আল-'আওয়াম ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী, নানা ছিলেন সিদ্দীক ও রাসূলুল্লাহর (সা) বন্ধু, খালা 'আইশা (রা) ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন, মা আসমা' (রা) লাভ করেছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে 'জাতুন নিতাকায়ন' উপাধি, তাঁর বড় ভাই 'আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন একজন 'আলিম সাহাবী। মোটকথা তাঁর গোটা পরিবারই ছিল 'ইলম, আমল, এবং দীন ও আখলাকের মর্যাদায় আদর্শ স্থানীয়। এই পরিবেশে 'উরওয়া চোখ খোলেন এবং বেড়ে ওঠেন। এ কারণে তিনি 'ইলম, 'আমল এবং দীনী ও আখলাকী মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ পারিবারিক মীরাছ হিসেবে লাভ করেন। ইমাম নাবাবী লিখেছেন, তাঁর গুণ ও বৈশিষ্ট্য অগণিত। তাঁর মহত্ত্ব, উঁচু মর্যাদা ও জ্ঞানের ব্যাপকতার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য আছে।[২১] ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে মদীনার ইমাম ও 'আলিম বলে উল্লেখ করেছেন।[২২] হাদীছ ও ফিকাহ্ উভয় শাস্ত্রে তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল। ইবন সা'দ বলেছেন :[২৩] 'তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত রাবী, প্রচুর হাদীছের বর্ণনাকারী, উঁচু মর্যাদা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ফকীহ্।' 'আল্লামা যিরিকলী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন এভাবে :[২৪]

أحد الفقهاءالسبعة بالمدينة. كان عالما بـالدين، صالحـا، كريمـا، لم يدخل فى شىء من الفتن.

– তিনি মদীনার সাত ফকীহ্র অন্যতম। দীনের একজন 'আলিম, নেক্কার ও শরীফ মানুষ ছিলেন। কোন রকম গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলায় জড়াননি।

'উরওয়া তাঁর ভাই, মা, খালা সবার নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন।[২৫] হযরত

---

[১৭] প্রাগুক্ত
[১৮] মুখতাসার সিফাতুস সাফওয়া-৩২
[১৯] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/৩৪৫
[২০] তাহযীব আত-তাহযীব-৭/১৮৫
[২১] তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩২
[২২] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৩
[২৩] তাবাকাত-৫/১৭৯
[২৪] আল-আ'লাম-৪/২২৬
[২৫] তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৭/১৮১

'আয়িশা (রা) থেকে বিশেষভাবে এ জ্ঞান অর্জন করেন। কুবায়সা বলেন, আমাদের সবার চেয়ে 'উরওয়া 'আয়িশার (রা) নিকট বেশী যাওয়া-আসা করতেন। আর 'আয়িশা (রা) ছিলেন সবার চেয়ে বেশী জ্ঞানের অধিকারিনী। তিনি হযরত 'আয়িশার (রা) জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রায় নিজের বুকের মধ্যে ধারণ করে ফেলেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আয়িশার (রা) মৃত্যুর চার-পাঁচ বছর পূর্বে তাঁর সব হাদীছ আমি সংরক্ষণ করে ফেলেছিলাম। তিনি যদি সেই সময় মারা যেতেন তাহলে তাঁর কোন হাদীছ বাকী থাকার জন্য আমার কোন আফসোস থাকতো না। কারণ, তাঁর সব হাদীছই তো আমি তখনই স্মৃতিতে ধারণ করে ফেলেছিলাম।[২৬]

হযরত 'আয়িশা (রা) ছাড়াও তিনি একদল উঁচু স্তরের সাহাবীর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন।[২৭] যেমন : 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা), উসামা ইবন যায়দ (রা), যায়দ ইবন ছাবিত (রা), আবূ আইউব আল-আনসারী (রা), আবূ হুরায়রা (রা), সা'ঈদ ইবন যায়দ (রা), 'আমর ইবন নুফায়ল (রা), হাকীম ইবন হিযাম (রা), হিশাম ইবন হাকীম (রা), জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা), মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা), হাসান ইবন 'আলী (রা), নুমান ইবন বাশীর (রা), 'আমর ইবন আল-'আস (রা), মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান (রা), 'আমর ইবন সালামা (রা), উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা), উম্মু হাবীবা (রা) ও আরো অনেকে। এমনিভাবে তিনি তাবি'ঈদের একটি বিরাট সংখ্যা থেকে হাদীছ শোনেন।[২৮]

উল্লিখিত এসব মহান ব্যক্তির রূহানী ফয়েজ ও বরকতে 'উরওয়ার জ্ঞানের সীমা ও পরিধি চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রশস্ততা লাভ করে। ইবন শিহাব আয-যুহ্রী বলতেন, 'উরওয়া ছিলেন হাদীছের সাগর যা কখনো ঘোলা হয় না।[২৯]

'উরওয়ার ছেলে হিশাম, যিনি নিজেই একজন বড় মাপের মুহাদ্দিছ ছিলেন, বলতেন আমরা পিতার হাদীছের দু'হাজার ভাগের এক ভাগও অর্জন করতে পারিনি।[৩০] ইবন 'উয়ায়না বলতেন, 'আয়িশার (রা) হাদীছের জ্ঞান তিন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী ধারণ করেন– আল-কাসিম, 'উরওয়া ও 'আমারাহ্।[৩১]

বিখ্যাত তাবি'ঈদের একটি দল তাঁর থেকে হাদীছ শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। যেমন: 'আতা', ইবন আবী মুলায়কা, 'আররাক ইবন মালিক, আবূ সালামা ইবন 'আবদির

---

[২৬] প্রাগুক্ত-৭/১৮২

[২৭] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৫

[২৮] তাবাকাত-৫/১৭৯; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬২; তাহ্যীবুল আসমা'-১/৩৩১; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৭/১৮১

[২৯] তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৭/১৮২; তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৩৩২

[৩০] তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৩৩২

[৩১] প্রাগুক্ত

রহমান, যুহ্‌রী, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, তাঁর নিজের ছেলেরা- হিশাম, মুহাম্মাদ, ইয়াহইয়া, 'আবদুল্লাহ, 'উছমান, পৌত্র 'উমার ইবন 'আবদিল্লাহ এবং আবুয যান্‌দ, ইবনুল মুনকাদির, সালিহ্ ইবন কায়সান ও আরো অনেকে।[৩২]

তবে তাঁর বিশেষ শাস্ত্র ছিল ফিকাহ্। এ শাস্ত্রের জ্ঞানও তিনি খালা 'আয়িশার (রা) নিকট থেকে অর্জন করেন।[৩৩] এ শাস্ত্রে তিনি এত বড় পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, তৎকালীন মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত ফকীহ্‌র মধ্যে গণ্য হতেন।[৩৪]

ফিকাহ্ বিষয়ে তিনি কিছু গ্রন্থও রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর কিছু হাররার হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলার সময় যখন ইয়াযীদের বাহিনী মদীনায় হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালায় তখন তিনি নিজেই জ্বালিয়ে দেন। কিন্তু পরে এই জ্বালিয়ে ফেলার জন্য আফসোস করতেন।[৩৫] তিনি বলতেন, অমরা আল্লাহর কিতাবের বর্তমানে অন্য কোন পুস্তক রচনা করতাম না। এ কারণে আমি আমার লেখা বই নষ্ট করে ফেলি। কিন্তু আল্লাহর কসম, এখন আমার এমন ইচ্ছা হয় যে, যদি আমার পুস্তকগুলি বিদ্যমান থাকতো এবং আল্লাহ্‌র কিতাবও যথাস্থানে চিরকাল বর্তমান থাকতো তাহলে কতনা ভালো হতো।[৩৬]

তিনি বলতেন, যে মানুষটির মধ্যে তুমি একটি ভালো গুণ দেখবে তাকে ভালোবাসবে এবং বিশ্বাস করবে তার মধ্যে এ রকম আরো বহু ভালো গুণ আছে। আর যার মধ্যে একটি মন্দ দেখবে তাকে ঘৃণা করবে এবং বিশ্বাস করবে তার মধ্যে এ রকম আরো মন্দ লুকিয়ে আছে।[৩৭]

তিনি যখন মানুষকে বিলাস-ব্যাসন ও বিত্ত-বৈভবের দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকে যেতে দেখতেন তখন তাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের অভাব দারিদ্র ও রূঢ় বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির বলেছেন : একদিন আমার সাথে 'উরওয়ার দেখা হলো। আমার একটি হাত মুঠ করে ধরে তিনি বললেন : ওহে আবূ 'আবদিল্লাহ! আমি সাড়া দিলাম। তিনি বললেন : আমি একদিন আমার মা 'আয়িশার (রা) কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন : আমার ছেলে শোন! আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে এমনভাবে কাটিয়েছি যে, কোন কোন সময় একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীতে বাতি জ্বলতো না এবং অন্য কোন প্রয়োজনেও আগুন জ্বলতো না। আমি বললাম : আম্মা! আপনারা তাহলে জীবন ধারণ করতেন কিভাবে? বললেন : খেজুর ও পানির উপর নির্ভর করে।[৩৮]

---

৩২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬২; তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/৩৩১
৩৩. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫৩
৩৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪২১; তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/৩৩১
৩৫. তাবাকাত-৫/১৭৯
৩৬. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/১৮৩
৩৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/২০২
৩৮. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৫০

ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর যোগ্যতা এত পরিমাণ ছিল যে, অনেক বড় বড় সাহাবী বিভিন্ন মাসয়ালায় তাঁর শরণাপন্ন হতেন। তবে এত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন। কোন মাসয়ালায় শুধু যুক্তি ও কিয়াসের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত দিতেন না।[৩৯]

তিনি তরুণদেরকে জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ দিতেন। বলতেন, তোমাদের মত আমরাও এক সময় ছোট ছিলাম। আজ সেই দিন এসেছে যখন আমাদেরকে বড়দের মধ্যে গণ্য করা হয়। তোমরা যদিও আজ তরুণ, তবে এমন এক সময় আসবে যখন বড় হবে। এ কারণে জ্ঞান অর্জন করে নেতা হয়ে যাও– যাতে মানুষ তোমাদের প্রয়োজন অনুভব করে।[৪০]

'ইলমের সাথে 'উরওয়ার মধ্যে 'আমলও ছিল। তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের বাস্তব নমুনাস্বরূপ ছিলেন। 'ইজলী বলেন, 'উরওয়া সত্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন।[৪১] ইবন শিহাব যুহ্‌রী বলেন, তিনি সৎ 'আলিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৪২]

তিনি একজন বড় মাপের 'আবিদ ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ মানুষ ছিলেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন, তাঁর সত্তার মধ্যে জ্ঞান, রাজনীতি ও 'ইবাদাত, সব কিছুর সমাবেশ ঘটেছিল।[৪৩] অত্যন্ত নিয়ম-নিষ্ঠার সাথে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। একবার একটি রোগের কারণে যখন তাঁর পা কাটা হয়েছিল তখন একটি রাত ছাড়া আর কখনো তাহাজ্জুদ বাদ যায়নি।[৪৪] 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহার নিষিদ্ধ দিনগুলি ছাড়া বাকী বারো মাসই রোযা রাখতেন। সফর অবস্থায়ও রোযা ছাড়তেন না। অন্তিম রোগ শয্যায়ও এ অভ্যাসে কোন পরিবর্তন হয়নি। মৃত্যুর দিনও তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। তাঁর পুত্র হিশাম বলতেন, তাঁর পিতা সারা বছর লাগাতার সিয়াম পালন করতেন।[৪৫]

কুরআন তিলাওয়াত ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কাজ। এক-চতুর্থ অংশ কুরআন প্রতিদিন নাজেরা তিলাওয়াত করতেন। অবশিষ্ট অংশ রাতে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে শেষ করতেন।[৪৬] এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে শুধু সেই রাতে যে রাতে পা-টি কেটে ফেলা হয়।

তিনি ছিলেন সবর ও ইসতিক্বামাত–ধৈর্য ও দৃঢ়তার বাস্তব প্রতীক। বড় বড় পরীক্ষা ও বিপদ-আপদে মুখ থেকে কখনো উহ্ ধ্বনিও উচ্চারিত হতো না। একবার শামে গেলেন খলীফা 'আবদুল মালিকের দরবারে। সাথে ছেলে মুহাম্মাদও ছিলেন। তিনি গেলেন শাহী আস্তাবল দেখতে। সেখানে একটি পশু তাকে গুতা দেয়। আর সেই আঘাতে তিনি মারা

---

৩৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/১৮৩
৪০. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/২০৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৯; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/২০২
৪১. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/১৮২
৪২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/৫৪
৪৩. শাযারাত আয-যাহাব-১/১০৩
৪৪. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫৪
৪৫. তাবাকাত-৫/১৮০
৪৬. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/১৮৩; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬২

যান। এ ঘটনার পরপরই 'উরওয়ার পায়ে একটি মারাত্মক বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হয়। চিকিৎসকরা পা-টি কেটে ফেলার পরামর্শ দেয়। অন্যথায় সারা দেহে পচন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। যদিও 'উরওয়া সে সময় বার্ধক্যে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তবে তিনি একজন নব্যযুবকের মত সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দান করেন। পা বিচ্ছিন্ন করার পূর্বে চিকিৎসক তাঁকে সামান্য মদ পান করতে বলে, যাতে কষ্টের অনুভূতি কিছুটা কম হয়। তিনি বললেন, যে রোগে আমার সুস্থ হওয়ার সামান্য আশা আছে তাতে আমি হারাম বস্তুর সাহায্য নিব না। চিকিৎসক বললো, তাহলে অচেতন করে দেয় এমন কিছু ঔষধ সেবন করুন। বললেন, আমার দেহের একটি অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হবে, আর আমি তার কষ্ট অনুভব করবো না– এ আমার পছন্দ নয়। অপারেশনের সময় তাঁকে ধরার জন্য কয়েক ব্যক্তি আসে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এখানে কি কাজ? তারা বললো, বেশী কষ্টের সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। এ কারণে আমরা আপনাকে সামাল দিতে এসেছি। তিনি বললেন, আমার বিশ্বাস আছে, তোমাদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন আমার হবে না। অত্যন্ত শান্ত ও স্থির অবস্থায় তাঁর পা কেটে ফেলা হয়। পায়ের পাতার উপর গিরা থেকে যখন কাটা হয় তখন তাঁর মুখ থেকে তাসবীহ ও তাহ্‌লীল উচ্চারিত হচ্ছিলো। রক্ত বন্ধ করার জন্য যখন ক্ষতস্থান সেলাই করা হয় তখন ব্যথার তীব্রতায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তবে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পান। নিজ হাতে মুখের ঘাম মোছেন।। তারপর পা'র বিচ্ছিন্ন অংশটুকু চেয়ে নিয়ে ওলট-পালট করে দেখেন এবং তাকে লক্ষ্য করে এ কথাগুলো উচ্চারণ করেন :[৪৭] সেই সত্তার শপথ! যিনি তোমার দ্বারা আমার দেহের ভার বহন করিয়েছেন। তিনি ভালো করেই জানেন আমি তোমার দ্বারা কোন হারাম অথবা পাপের পথে চলিনি। যেদিন তাঁর পা-টি কেটে ফেলা হয় সেদিনও তাঁর তাসবীহ-তিলাওয়াতের নিয়মে কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।[৪৮]

ইবন কুতায়বা বলেছেন, শামে খলীফা আল-ওয়ালীদের তত্ত্বাবধানে যখন 'উরওয়ার পায়ের অপারেশন করা হয় তখন আল-ওয়ালীদ বন্ধুদের সাথে কথা বলছিলেন। এত নীরবে কাজটি সম্পন্ন হয় যে, তিনি টের পেলেন না অপারেশন কখন শেষ হলো। যখন সেঁক দেওয়া হচ্ছিল তখন সেঁকের গন্ধে তিনি বুঝতে পারেন, অপারেশন শেষ হয়েছে।[৪৯]

এ সফরে তাঁর পুত্র-বিয়োগ ও দেহের উপর মারাত্মক বিপদ সত্ত্বেও তাঁর মুখ দিয়ে কখনো কোন অভিযোগের শব্দ উচ্চারিত হয়নি। সব সময় আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আমার চার হাত-পা থেকে তুমি মাত্র একটি নিয়েছো এবং তিনটি অবশিষ্ট আছে। চার ছেলের মধ্য

---

৪৭. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৬-২৫৭; সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৮
৪৮. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৫
৪৯. আল-মা'আরিফ-২২২; ওয়াফয়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৫

থেকে মাত্র একটিকে নিয়েছো, এখনো তিনটি জীবিত রেখেছো। তুমি কিছু নিলে অনেক কিছু এখনো রেখে দিয়েছো। কিছুদিন বিপদ-আপদে রাখলেও অনেক দিন সুস্থ ও শান্তিতে রেখেছো।[৫০] এ সফর থেকে মদীনায় ফেরার পর আত্মীয়-বন্ধু ও আম-জনতা সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি তাদের সামনে আল কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করেন :[৫১]

لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا.

– আমরা আমাদের এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।[৫২]

হযরত 'উরওয়ার (রহ) পা কেটে ফেলার পর অনেকেই তাঁকে সান্ত্বনা দান করেন। সেই সময় 'ঈসা ইবন তালহা একদিন তাঁকে সান্ত্বনা দেন এভাবে : আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে দিয়ে কুস্তি লড়াতাম না। আল্লাহ্ আমাদের জন্য আপনার বেশীর ভাগ জিনিসই বিদ্যমান রেখেছেন। আপনার কান, চোখ, জিহ্বা, বুদ্ধি, দুই হাত ও একটি পা এখনো আমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন। তাঁর একথা শুনে তিনি বলেন, হে 'ঈসা, আল্লাহর কসম! আপনি যে ভাষায় আমাকে সান্ত্বনা দিলেন তেমন আর কেউ দেয়নি।[৫৩]

হযরত 'উরওয়ার পা কেটে ফেলার পর 'আব্স গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আল-ওয়ালীদের দরবারে আসে। তাদের মধ্যে একজন অন্ধ ব্যক্তিও ছিল। আল-ওয়ালীদ লোকটির চোখ কিভাবে নষ্ট হয়েছে তা জানতে চান। লোকটি বললো : আমীরুল মু'মিনীন! আব্স গোত্রে আমার চেয়ে বেশী সম্পদশালী কেউ ছিল না। এক রাতে আমি এক উপত্যকায় অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ প্লাবন দেখা দেয় এবং আমার পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ, গবাদি পশু সবই ভাসিয়ে নিয়ে যায়, বেঁচে থাকে শুধুমাত্র একটি উট ও একটি সদ্যভূমিষ্ঠ শিশু। উটটি ছিল খুবই বেপরোয়া ও অবাধ্য। সে ছুটে পালিয়ে যায়। আমি তার পিছু ধাওয়া করে কিছু দূর যেতেই আমার ছোট্ট ছেলেটির আর্তচিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখি তার মাথাটি একটি নেকড়ের মুখে। নেকড়ে শিশুটিকে খাচ্ছে। আমি উটটি ধরলাম। কিন্তু সে আমার মুখে এমন প্রচণ্ড লাথি মারে যে আমার মুখ গুঁড়ো হয়ে যায় এবং আমার চোখ দু'টি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলে। এভাবে আমি ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, চোখ– সব হারানো একজন ব্যক্তিতে পরিণত হই।

লোকটির দুঃখের কাহিনী শোনার পর আল-ওয়ালীদ বলেন, তোমরা একে 'উরওয়ার নিকট নিয়ে যাও। তাহলে তিনি জানতে পারবেন, তাঁর চেয়ে বড় বিপদগ্রস্ত মানুষও এ পৃথিবীতে আছে।[৫৪]

---

৫০. আল'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/২২০; মুখতাসার সিফাতুস সাফওয়া-১৩১
৫১. সূরা আল-কাহ্ফ-৬২
৫২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৬
৫৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৭০
৫৪. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৬

হযরত 'উরওয়ার (রহ) দৃষ্টিতে পার্থিব বিত্ত-বৈভব ও ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের কোনই গুরুত্ব ছিল না। এ কারণে তিনি কখনো আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট দুনিয়ার কোন সুখ-সম্পদ চাননি। একবার হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালে 'উরওয়া, তাঁর ভাই মুস'আব ও 'আবদুল্লাহ এবং 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান– এই চারজন মসজিদুল হারামে একত্র হন। তাঁদের কেউ একজন প্রস্তাব করলেন, আসুন, আজ আমরা এই ঘরে আল্লাহকে সামনে রেখে প্রত্যেকে নিজের একান্ত বাসনার কথা প্রকাশ করি। সবাই প্রস্তাবটি মেনে নিলেন। প্রথমে 'উরওয়ার ভাই 'আবদুল্লাহ বললেন, আমি এই দুই হারামের বাদশাহ ও খিলাফতের মসনদে আসীন হই– এই আমার ইচ্ছা। মুস'আব বললেন, আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে, আমি 'ইরাকীদের কর্তৃত্বের অধিকারী হই এবং কুরাইশদের সবচেয়ে দুই সুন্দরী নারী–সাকীনা বিনত হুসায়ন ও 'আয়িশা বিনত তালহাকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করি। 'আবদুল মালিক বললেন, আমি মু'আবিয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গোটা পৃথিবীর বাদশাহ হই– এই আমার বাসনা। সবার শেষে 'উরওয়া বললেন, তোমরা যা চাচ্ছো তার কিছুই আমি চাই না। আমি দুনিয়াতে যুহ্‌দ, আখিরাতে কামিয়াবী চাই এবং এমন ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে চাই যার থেকে এই 'ইলম বর্ণনা করা হবে।[৫৫]

আল্লাহ পাক চারজনের দু'আই কবুল করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) সাত বছর হারামের খলীফা ছিলেন। সাকীনা ও 'আয়িশা দুই সুন্দরীকেই মুস'আব বিয়ে করেন। 'আবদুল মালিক সিন্ধু থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল খিলাফতের খলীফা হন, আর 'উরওয়া আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বিশেষ ব্যক্তিদের মর্যাদা লাভ করেন। এ কারণে খলীফা 'আবদুল মালিক বলতেন : কেউ যদি কোন জান্নাতী লোককে দেখে খুশী হতে চায় সে যেন 'উরওয়া ইবন যুবায়রকে দেখে।[৫৬]

খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের দৃষ্টিতে 'উরওয়া ছিলেন অতি উঁচু স্তরের মানুষ তিনি 'উরওয়ার জ্ঞান-গরীমার প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একবার আমি মদীনার কিছু লোকের সাথে খলীফা 'আবদুল মালিকের দরবারে গেলাম। দলটির মধ্যে আমাকে সর্ব কনিষ্ঠ দেখে খলীফা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কে? আমি পরিচয় দিলাম। তিনি বললেন : তোমার বাপ-চাচা ইবনুল আশ'আছের বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলায় ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। আমি বললাম : আমীরুল মু'মিনীন! আপনার মত ব্যক্তিরা ক্ষমা করে দিলে তা আর মনে রাখে না। কথাটি তাঁর ভালো লাগে। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তুমি কোথায় বড় হয়েছো? বললাম, মদীনায়। আবার জিজ্ঞেস করলেন : কার কাছে শিক্ষা লাভ করেছো? বললাম : সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, সুলায়মান ইবন ইয়াসার ও কাবীসা ইবন যুআয়বের নিকট। তিনি বললেন : তা 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়রের নিকট

---

[৫৫] প্রাগুক্ত-৩/২৫৮

[৫৬] প্রাগুক্ত

যাওনি কেন? তিনি এমন সাগর যে ছোট ছোট নদী-নালার পানি তা ময়লা করতে পারে না। যুহ্‌রী বলেন : অতঃপর আমি সেখান থেকে মদীনায় ফিরে 'উরওয়ার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করিনি।[৫৭]

খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান একবার 'উরওয়াকে সঙ্গে করে তাঁর একটি বাগানে গেলেন। "কি সুন্দর!" বলে 'উরওয়া তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করলেন। সাথে সাথে 'আবদুল মালিক বলে উঠলেন : আল্লাহর কসম! আপনি এর চেয়েও সুন্দর। এই বাগানটি তো বছরে মাত্র একবার ফল দেয়। আর আপনি তো আপনার ফল দেন প্রতিদিন।[৫৮]

হযরত 'উরওয়ার ভাই হযরত 'আবদুল্লাহ নিহত হবার পর একবার তিনি খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের দরবারে যান। একদিন খলীফাকে বললেন : আমি চাই আপনি আমার ভাইয়ের তরবারিটি আমাকে ফেরত দিন। খলীফা বললেন : সেটা তো অনেক তরবারির মধ্যে আছে, আমি তো তা চিনতে পারবো না। 'উরওয়া বললেন : সব তরবারি আমার সামনে হাজির করা হলে আমি আমার ভাইয়ের তরবারিটি চিনতে পারবো। খলীফা সব তরবারি হাজির করতে বললেন। সবগুলো হাজির করা হলে তিনি তার মধ্য থেকে একখানি ধারভাঙ্গা ভোঁতা তরবারি বেছে নেন, বলেন : এটিই আমার ভাইয়ের তরবারি। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন : এটি কি আপনি আগে চিনতেন? বললেন : না। খলীফা প্রশ্ন করলেন : তাহলে এখন কিভাবে চিনলেন? বললেন : জাহিলী কবি আন-নাবিগা আয-যুবয়ানীর এই পংক্তিটি দ্বারা :[৫৯]

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم + بهن فلول من قراع الكتائب.

– শত্রু সৈন্যদেরকে অতিরিক্ত আঘাত করার কারণে তরবারির ধার ভেঙ্গে যাওয়া ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোন ত্রুটি নেই।

উমাইয়্যা খিলাফতের খলীফারা ও তাঁদের আঞ্চলিক শাসকেরা বিভিন্ন সময় তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। খলীফা আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিকের খিলাফতকালে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) মদীনার ওয়ালীর দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি মদীনায় আসলেন। মদীনাবাসীরা তাঁর আবাসস্থলে এসে তাঁকে স্বাগতম ও সালাম জানালো। তিনি জুহ্‌রের নামায আদায় করার পর মদীনার তৎকালীন দশজন বিখ্যাত ফকীহ্‌কে– যাঁদের নেতা ছিলেন 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র, ডেকে পাঠালেন। তাঁরা উপস্থিত হলে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও স্বাগতম জানানোর পর্ব শেষ করে এক বৈঠকে বসেন। বৈঠকের শুরুতে তিনি এক স্বাগত ভাষণে বলেন : 'আমি আপনাদেরকে এমন একটি বিষয়ের জন্য ডেকেছি যাতে আপনাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে এবং আপনারা সত্যের ব্যাপারে আমার সহযোগী হবেন। আমি আপনাদের সবার

---

[৫৭] সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৫২
[৫৮] আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/১৪৪, ২৩০
[৫৯] প্রাগুক্ত-২/২৩০

অথবা কোন একজনের মত ও সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন হুকুম জারী করবো না। আপনারা যদি দেখেন কেউ কারো প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করছে, অথবা আমার কোন কর্মকর্তার কোন জুলুম-অত্যাচারের কথা আপনারা জানতে পারেন, সাথে সাথে তা আমাকে জানানোর জন্য আমি আপনাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। বৈঠক শেষে 'উরওয়া 'উমারের সাফল্য কামনা করে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন।[৬০]

যদিও তিনি দুনিয়ার ধন-ঐশ্বর্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, তা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাঁকে অঢেল সম্পদ দান করেন। তিনি একজন বড় বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। পিতা হযরত যুবায়র (রা) তৎকালীন আরবের একজন বড় সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি কয়েক কোটি দিরহাম রেখে যান। এ বিপুল অর্থ-সম্পদ তাঁর ছেলেরা লাভ করেন। 'উরওয়াও তাঁর একটি অংশ লাভ করেন। হযরত যুবায়রের (রা) সম্পদের এক-অষ্টমাংশে তাঁর চার জন স্ত্রীর প্রত্যেকে বারো লাখ করে পেয়েছিলেন।[৬১] এ দ্বারা তাঁর পরিবারের সম্পদ সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা যায়।

আল্লাহ তা'আলা 'উরওয়াকে যেমন বিত্তশালী করেন তেমনি তাঁর চিত্তের প্রশস্ততাও দান করেন। তিনি বড় দরাজ দিলের মানুষ ছিলেন। অনেকগুলো খেজুরের বাগান ছিল তাঁর। খেজুর পাকার মওসুমে বাগানের ঘেরা তুলে দেওয়া হতো। মানুষ বাগানে ঢুকে ইচ্ছেমত খেত এবং যাওয়ার সময় প্রচুর নিয়ে যেত। এ সময় তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন :[৬২]

وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ .

– যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন এ কথা কেন বললে না : আল্লাহ যা চান তাই হয়। আল্লাহর দেওয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই।[৬৩]

তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। মদীনায় 'বি'রে 'উরওয়া' নামে দীর্ঘকাল যাবত যে পাতকুয়াটি প্রসিদ্ধ ছিল তা তিনিই মানুষের পানি-কষ্ট দূর করার জন্য খনন করেন। বলা হয়েছে যে, মদীনায় অন্য কোন কুয়ার পানি এ কুয়ার পানির চেয়ে বেশী মিষ্টি ছিল না।[৬৪]

হযরত 'উরওয়া (রহ) যদিও একজন 'আবিদ ও দুনিয়াবিরাগী মানুষ ছিলেন, তবে তাঁর স্বভাবে একটা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ ছিল। প্রতিদিন গোসল করতেন, দামী পোশাক পরতেন, গরমের মওসুমে রেশমের আঁচলযুক্ত কিংখাবের আবা তাঁর গায়ে শোভা পেত। মুহাম্মাদ ইবন হিলাল বলেন : আমি 'উরওয়াকে দেখেছি, তিনি গোঁফ বেশী লম্বা

---

[৬০] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৭
[৬১] বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু বারাকাকাতিল গাযী ফী মালিহি
[৬২] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৬; সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৮
[৬৩] সূরা আল-কাহ্ফ-৩৯
[৬৪] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৭

হতে দিতেন না। সুন্দর করে ছেঁটে ফেলতেন। তিনি জাফরানী রংয়ের চাদর গায়ে দিতেন। কালোর কাছাকাছি রংয়ের খিজাব লাগাতেন।[৬৫]

তিনি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করেন। এক সময় বসরায় আবাসন গড়ে তোলেন। মিসরেও যান। সেখানে বিয়ে করেন এবং সাত বছর অবস্থান করেন। শেষ জীবনে মদীনায় ফিরে আসেন এবং মদীনার নিকটবর্তী 'ফুর'আ'র পার্শ্ববর্তী 'মাজাহ' নামক তাঁর নিজ পল্লীতে ইনতিকাল কলেন। এই পল্লীটির অবস্থান ছিল 'আর-রাবযা'র পাশে এবং মদীনা থেকে চার রাত্রির পথের দূরত্বে। পল্লীটি ছিল খেজুর উদ্যানে সুশোভিত এবং মিষ্টি পানিতে সমৃদ্ধ। ফকীহ্‌দের রীতি অনুযায়ী এই পল্লীতেই তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর সনটিকে ফকীহ্‌দের সন বলা হতো। কারণ, এ বছর বহু ফকীহ্‌র মৃত্যু হয়। তাঁর জন্মের সনের মত মৃত্যু-সন নিয়েও মতভেদ আছে। হিজরী ৯৩, ৯৪ ও ৯৯ সনের কথা বলা হয়েছে।[৬৬]

---

[৬৫] তাবাকাত-৫/১৭৯, ১৮০

[৬৬] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬৩, তাহযীব আল-আসমা'-১/৩৩২, তাবাকাত-৫/১৮২, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৮

হাসান আল-বসরী (রহ)

হযরত হাসান (রহ)-এর ডাক নাম আবূ সা'ঈদ। পিতার নাম ইয়াসার। জ্ঞানগত পূর্ণত্বার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী তাবি'ঈদের পুরোধা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎ:কর্ষের দিক দিয়ে ছিলেন ওলীকুল শিরোমণি।

হযরত হাসান আল-বসরীর পিতা ইয়াসার ছিলেন দাস। তাঁর দাসত্বের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। একটি বর্ণনা এ রকম যে, তাঁর পিতা ছিলেন দক্ষিণ ইরাকের মায়সানের বন্দীদের একজন। আনাস ইবন মালিকের ফুফু রুবায়' বিন্ত নাদার তাঁকে খরীদ করে মুক্তি দেন। দ্বিতীয় বর্ণনাটি এ রকম, তাঁর পিতা-মাতা উভয়ে ছিলেন বানু নাজ্জার তথা এক আনসারীর দাস-দাসী। তিনি তাঁদেরকে তাঁর স্ত্রীর মাহরের বিনিময়ে বানু সালামাকে দান করেন। আর বানু সালামা তাঁদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়। তৃতীয় একটি বর্ণনা এ রকম যে, তাঁর পিতা ছিলেন হযরত যায়িদ ইবন ছাবিতের দাস, আর মাতা খায়রাহ্ ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামার (রা) দাসী। তবে এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, ইয়াসার ও তাঁর স্ত্রী উভয়ে ছিলেন দাস-দাসী।[1] আর এই তৃতীয় বর্ণনাটি সর্বাধিক সঠিক ও গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়।

হযরত হাসান আল-বসরী হিজরী ২১ খ্রীষ্টাব্দ ৬২৪ সনে হযরত ফারূকে আ'জমের (রা) খিলাফতকালের দুই বছর বাকী থাকতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।[2] উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামার (রা) সাথে তাঁর মায়ের দাসত্বের সম্পর্ক থাকায় তিনি যে সৌভাগ্য লাভ করেন তা খুব কম ভাগ্যবান ব্যক্তিই লাভ করতে পেরেছেন। সা'ঈদ নামে হযরত হাসানের এক বড় ভাই ছিলেন। তিনি হিঃ ১০০ সনে ইনতিকাল করেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামার (রা) নিকট সংবাদবাহক এ সুখবর নিয়ে এলো যে, তাঁর দাসী 'খায়রা' একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছে। উম্মুল মু'মিনীনের (রা) অন্তর খুশীতে ভরে গেল এবং তাঁর গম্ভীর মুখমণ্ডল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি সাথে সাথে লোক পাঠালেন, সদ্যজাত শিশু ও তার মাকে নিয়ে আসার জন্য, যাতে শিশুর মা সুস্থ হয়ে উঠা পর্যন্ত তাঁর কাছে থাকতে পারে। উল্লেখ্য যে, 'খায়রা' ছিল উম্মুল মু'মিনীনের অতিপ্রিয় দাসী। তিনি তার সন্তান প্রসবের এ খবরটি পাওয়ার জন্য খুবই উদগ্রীব ছিলেন। তাই তার পুত্র সন্তান প্রসবের খবর শুনে মা ও সন্তানকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই 'খায়রা' তার সদ্যজাত শিশুকে কোলে করে উম্মুল মু'মিনীনের নিকট চলে আসলো। শিশুটির উপর চোখ পড়তেই তার প্রতি উম্মুল মু'মিনীনের অন্তরে গভীর মায়ার সৃষ্টি হয় এবং প্রশান্তিতে অন্তরটি ভরে যায়। শিশুটির ছিল মায়াবী ও সবার দৃষ্টিকাড়া সুন্দর চেহারা। যে দেখতো তারই অন্তরে শিশুটির জন্য মায়া-মমতা সৃষ্টি হয়ে

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ- ১/৭১; আল-আ'লাম-২/২২৬

২. ড. 'উমার ফাররূখ : তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী- ১/৬৪৫

যেত। উম্মুল মু'মিনীন (রা) 'খায়রা'কে জিজ্ঞেস করলেন : বাচ্চার নাম রেখেছো? বললো: আম্মা, এখনো নাম রাখা হয়নি। আপনি রাখবেন তাই আমরা কিছু চিন্তা করিনি। তিনি বললেন : আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণার উপর ভরসা করে আমি এর নাম রাখছি আল-হাসান। তারপর তিনি হাত তুলে শিশুর কল্যাণের জন্য দু'আ করেন।

আল-হাসানের জন্মগ্রহণের এ আনন্দ কেবল উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামার (রা) গৃহেই সীমিত থাকেনি, বরং এ আনন্দে মদীনার আরো একটি গৃহ অংশগ্রহণ করে। সে গৃহটি ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) কাতিবে ওহী (ওহী লেখক) মহান সাহাবী হযরত যায়দ ইবন ছাবিতের (রা)। কারণ, শিশু হাসানের পিতা ইয়াসার ছিলেন হযরত যায়দের সবচেয়ে বেশী সম্মানিত ও প্রিয় ব্যক্তি।

এই শিশু আল-হাসান ইবন ইয়াসার- যিনি পরবর্তীকালে হাসান আল বসরী নামে প্রসিদ্ধ হন, রাসূলুল্লাহর (সা) একটি পরিবারে, তাঁর অন্যতম বেগম হিন্দা বিন্‌ত সুহায়ল, উরফে উম্মু সালামার (রা) ঘরে লালিত-পালিত হয়ে বেড়ে ওঠেন। উম্মু সালামা (রা) ছিলেন বুদ্ধি, দৃঢ়তা ও মর্যাদার দিক দিয়ে তৎকালীন 'আরবের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণতার অধিকারিণী। রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমদের মধ্যে বিদ্যা ও হাদীছ বর্ণনার দিক দিয়ে হযরত 'আয়িশার (রা) পরেই যাঁর স্থান। যাঁর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) তিনশো সাতাশিটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সেই জাহিলী 'আরব সমাজে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মহিলা কিছু লিখতে-পড়তে জানতেন, তিনি তাঁদেরই একজন।

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামার (রা) সাথে শিশু হাসানের সম্পর্কের এখানেই শেষ নয়। সম্পর্ক মাতৃত্বের পর্যায়ে চলে যায়। শিশু হাসানের মা উম্মুল মু'মিনীনের এটা-ওটা কাজের জন্য এদিক ওদিক গেলে তিনি যখন কান্না জুড়ে দিতেন তখন উম্মুল মু'মিনীন তাঁকে থামানোর জন্য মায়ের আদরে কোলে নিয়ে নিজের পবিত্র স্তনের বোঁটা তাঁর মুখে পুরে দিতেন। শিশু হাসান উম্মুল মু'মিনীনের বুকের পবিত্র দুধ পান করে পরিতৃপ্ত হতেন এবং কান্না থামিয়ে দিতেন। এভাবে হযরত উম্মু সালামা (রা) দুই দিক দিয়ে হযরত হাসানের মা হন : কুরআন ঘোষিত বিশ্বের সকল ঈমানদার ব্যক্তিদের মা এবং দুধ মা। হযরত উম্মু সালামার ঘরের শিশু হবার সুবাদে অন্যান্য উম্মুহাতুল মু'মিনীনের (রা) আদর ও স্নেহ লাভে ধন্য হন এবং চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সবার ঘরে অবাধে যাতায়াতের সুযোগ লাভ করেন। তারপর তিনি পিতার সাথে বসরায় চলে যান এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। এ কারণে তাঁকে আল-বসরী বল হয়।[৩]

হযরত হাসানের পিতা-মাতা উভয়ে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। তারপর এই পরিবারটি 'ওয়াদি আল-কুরা'তে বসবাস করতো। মাঝে মাঝে তারা মদীনায় আসতো। হাসানের মা শুধুমাত্র উম্মু সালামার (রা) সাথেই যোগাযোগ রাখতেন না, বরং তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমদের সকলের কাছেই যেতেন। মায়ের সাথে শিশু হাসানও তাঁদের

---

৩. ড. রা'ফাত আল-বাশা : সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন- ২/৬-১১

কাছে আসা-যাওয়া করতেন। সুতরাং দু'জনই তাঁদের আলো এবং নুবুওয়াত ও রিসালাতের আলো থেকে অনেক কিছু অর্জন করেন। মা তাঁর ছেলেকে এ অর্জনে সাহায্যও করেন। ফলে তিনি আরবী ভাষার উপর চমৎকার দক্ষতা অর্জন করেন। মা খায়রা উম্মু সালামার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) অনেক হাদীছ বর্ণনা করতেন। তিনি তাঁর অনেক উপদেশের মধ্যে এসব হাদীছ মানুষকে শোনাতেন। আর এর একটা গভীর প্রভাব পড়ে তাঁর দুই ছেলে হাসান ও সা'ঈদের উপর। হাসান শৈশব থেকেই জামি' মসজিদে যাওয়া-আসা শুরু করেন। আর এর মধ্য দিয়ে কুরআন হিফ্জ করেন ও লেখা শিখে ফেলেন। তারপর মদীনার অলি-গলিতে রিসালাত ও নুবুওয়াতের যে ফয়েজ ও বরকতের প্লাবন তখন বয়ে চলেছিল তা থেকে অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন।

হযরত 'আলীর (রা) খিলাফতকালে পৌঁছে আমরা দেখতে পাই এ পরিবারটি তার মাতৃভূমিতে ফিরে যাচ্ছে এবং বসরায় বসতি স্থাপন করছে। আমরা আরো দেখতে পাই হাসান, তাঁর সময়ের বিচিত্রমুখী ঘটনাবলীতে অংশগ্রহণ সযত্নে এড়িয়ে চলছেন। বিভিন্ন ঘটনা ও ফিত্না-বিশৃঙ্খলায় কোনভাবে অংশগ্রহণ না করার নীতি ও পন্থাকে তিনি আজীবন আঁকড়ে থাকেন। সূক্ষ্ম ও সঠিক অর্থে তিনি দীনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। আল-কুরআনের পঠন-পাঠন, হাদীছের বর্ণনা এবং ইসলামী বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন। আমরা এটাও দেখি যে, হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতের ব্যাপারে হযরত হাসান (রা)সহ উম্মাতের ঐকমত্যের পর খিলাফতের পূর্বাঞ্চলে প্রেরিত বাহিনীর সাথে তিনিও যোগ দিচ্ছেন। খুরাসের কোন কোন ওয়ালীর সেক্রেটারী হিসেবেও কাজ করছেন। সেখানে প্রায় দশ বছর কাটানোর পর বসরায় ফিরে আসেন। হিজরী ১১০ সনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই বসরাতেই অবস্থান করেন। তারপর তিনি দীনী বিষয়ে পঠন-পাঠনে একনিষ্ঠভাবে মনোযোগী হন। সে সময়ে বসরার এমন কোন জ্ঞানকেন্দ্র ছিল না যেখান থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেননি। অল্প দিনের মধ্যে তিনি একজন বড় ওয়া'ইজ তথা ধর্মীয় বক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। বসরার যুবক শ্রেণীর মানুষ তাঁর প্রতি এমন আগ্রহী হয়ে ওঠে যে, তার কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। হাজ্জাজের সময়ে তিনি বসরার সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও বক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বয়ান ও বাগ্মিতায় তাঁর মত দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না।[৪]

হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) যে সময় জন্মগ্রহণ করেন তখন সাহাবায়ে কিরামের বিশাল একটি সংখ্যা বিদ্যমান ছিলেন। আর এমন স্থানে তিনি বেড়ে ওঠেন যার প্রতিটি অলি-গলি ছিল মহানবীর (সা) জ্ঞানের ভাণ্ডার। সর্বোপরি তিনি এমন সব মহান ব্যক্তির সুহবত ও সাহচর্য লাভ করেন যাঁরা ছিলেন ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির জীবন্ত নমুনা এবং নবীর (সা) আখলাক ও নৈতিকতার বাস্তব রূপ। ফলে তাঁর গোটা জীবন জ্ঞান ও কর্ম,

---

৪. ড. শাওকী দায়ফ : তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী– ২/৪৪৬

মহত্ত্ব ও পূর্ণতা, তাকওয়া ও খোদাভীরুতার মত যাবতীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীতে পূর্ণ হয়ে যায়। ইবন সা'দ লিখেছেন :[৫]

كان الحسن جامعًا، عالما عاليا، رفيعا فقيها مأمونا عابدا ناسكا، كبيرالعلم فصيحا جميلا وسيفاً.

–হাসান বসরী ছিলেন বহু পূর্ণতার সমাবেশ, উঁচু স্তরের 'আলিম, সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি, ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ফকীহ্, পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি নির্মোহ 'আবিদ, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাষী সুদর্শন এক পুরুষ।

মোট কথা, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ যোগ্যতা ও উৎকর্ষের পূর্ণরূপ ছিলেন তিনি। ইমাম আয-যাহাবী লিখেছেন :[৬]

حافظ، علامة من بحور العلم، فقيه النفس، كبير الشان، عديم النظير، مليح التذكير، بليغ الموعظة، رأس فى أنواع الخير.

– তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিজ, জ্ঞানের সাগর, ফকীহ্, বিশাল কর্মকাণ্ডের অধিকারী, অতুলনীয়, চমৎকার উপদেশ দানকারী, বাগ্মী-বক্তা এবং বহু রকম কল্যাণকর কাজের নেতা।

'আল্লামা নাবাবী লিখেছেন : তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত 'আলিম। তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে সবাই একমত।[৭] ইমাম আয-যাহাবী হাদীছ গ্রন্থাবদ্ধকারীদের তৃতীয় স্তর (তাবকা), যাকে তিনি তাবি'ঈদের মধ্যম স্তর বলেছেন, হাসান আল-বসরীকে (রহ) তার প্রধান পুরুষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৮]

তাঁর সময়ের সকল জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম শা'বী বলতেন, আমি এই দেশের (ইরাকে) অন্য কাউকে তাঁর চেয়ে ভালো পাইনি। কাতাদা মানুষকে এই বলে উপদেশ দিতেন, তোমরা হাসান বসরীর অনুসরণ করবে। আমি মতামত ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাঁর চেয়ে বেশী আর কাউকে দেখিনে। আ'মাশ বলতেন, হাসান জ্ঞান সংরক্ষণ করতেন এবং তা বলতেন। ইমাম বাকির বলতেন, হাসানের কথা আম্বিয়ায়ে কিরামের (আ) কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

গালিব আল-কাত্তান বলতেন, তাঁর যুগের 'আলিমদের উপর হাসানের এ শ্রেষ্ঠত্ব ছিল পাখীদের মধ্যে চড়ুই পাখীর উপর বাজপাখীর শ্রেষ্ঠত্বের মত। কেউ যদি সে যুগের

---

[৫] তাবাকাত– ৭/১১৪
[৬] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ– ১/৭২
[৭] তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত– ১/১৬১
[৮] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ– ১/৭১

সবচেয়ে বড় 'আলিমকে দেখতে চায় সে যেন হাসানকে দেখে। 'আমর ইবন মুররা বলতেন, হাসান ও মুহাম্মাদ- এই দুই শায়খের কারণে আমার বসরাবাসীদের প্রতি ঈর্ষা হয়। ইউনুস ইবন 'উবায়দুল্লাহ ও হুমায়দ আত-তাবীল বলতেন, আমি বহু ফকীহ্কে দেখেছি, কিন্তু হাসানের চেয়ে পূর্ণ ব্যক্তিত্বের আর কাউকে পাইনি। 'আতা' ইবন আবী রাবাহ মানুষকে উপদেশ দিতেন, তোমরা তোমাদের মসলা-মাসায়িলের ব্যাপারে হাসানের কাছে যাও। তিনি একজন অনেক বড় 'আলিম, ইমাম ও নেতা। ইমাম মালিক বলতেন, তোমরা হাসানের নিকট মসলা-মাসায়িল জিজ্ঞেস করবে। কারণ তিনি জ্ঞান সংরক্ষণ করেছেন, আর আমরা ভুলে গেছি। অনেকে তো এমন কথাও বলতেন, হাসান যদি পূর্ণ বয়সের সময় সাহাবীদের যুগ লাভ করতেন তাহলে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উঁচু স্তরের সাহাবীরা তাঁর মুখাপেক্ষী হতেন।[৯]

যদিও হাসানের মধ্যে বহু জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছিল তা সত্ত্বেও তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হয়েছে ইবাদাত-বন্দেগী ও আধ্যাত্মিক সাধনার কর্মকাণ্ডে। এ কারণে তাঁর রূহানী মর্যাদার তুলনায় তাঁর 'ইলমী যোগ্যতার খুব কম বিবরণ পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও যতটুকু পাওয়া যায় তদদ্বারা তাঁর বিভিন্ন শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রমাণ লাভ করা যায়। তাফসীর, ফিকাহ্, হাদীছ তথা সকল দীনী জ্ঞানে তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল।

আল-কুরআনের মুফাসসির বা ভাষ্যকার হিসেবে তিনি তেমন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেননি। তবে অত্যন্ত পরিশ্রম করে তাফসীরের জ্ঞান অর্জন করেন। মাত্র বারো বছর বয়সে কুরআনের হাফিজ হন। আবূ বকর আল-হিন্দীর বর্ণনা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এক একটি সূরার তাফসীর, তাবীল, শানে নুযূল ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন শেষ না হতো তিনি সামনে এগুতেন না।[১০] তাঁর এ অধ্যবসায় তাঁকে কুরআনের একজন বড় 'আলিম বানিয়ে দেয় এবং তিনি তাফসীরের দারসও দিতেন।[১১]

ইমাম আয-যাহাবী যে বলেছেন, তিনি মহাজ্ঞানী ও জ্ঞানের সাগর ছিলেন,[১২] এ দ্বারাই তাঁর হাদীছ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির আন্দাজ করা যায়। হাদীছের জ্ঞান তিনি যে সব মহান ব্যক্তির নিকট থেকে অর্জন করেন তাঁরা সকলে ছিলেন এ শাস্ত্রের এক একজন স্তম্ভস্বরূপ। সাহাবীদের মধ্যে 'উছমান (রা), 'আলী (রা), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা), আনাস ইবন মালিক (রা), জাবির ইবন মু'আবিয়া (রা), মা'কাল ইবন ইয়াসার (রা), আবূ বাকরা (রা), সামুরা ইবন জুনদুব (রা), মুগীরা ইবন শু'বা (রা), 'আমর ইবন তাগলিব (রা), 'ইমরান ইবন হুসাইন ও জুনদুব আল-বাজালী

---

[৯] দ্র. তাবাকাত- ৭/১১৪; হাসান আল-বসরীর জীবনী।

[১০] শাজারাতুয যাহাব- ১/১৩৭

[১১] তাহযীব আত-তাহযীব- ২/২৬৪

[১২] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৬২

থেকে সরাসরি এবং 'উমার ইবন আল-খাত্তাব, উবাই ইবন কা'ব (রা), সা'দ ইবন 'উবাদা, 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা), 'উছমান ইবন আবিল 'আস (রা) এবং মা'কাল ইবন সিনান থেকে পরোক্ষভাবে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। তাছাড়া উঁচু স্তরের তাবি'ঈদের বিরাট একটি দলের নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন।[১৩]

যতদূর জানা যায়, সম্ভবত তাঁর বিশেষ কোন হালকায়ে দারস ছিল না। আর এটা তিনি পছন্দও করতেন না। অনেকটা বাধ্য হয়ে তিনি হাদীছ বর্ণনা করতেন। তিনি বলতেন, "আল্লাহ যদি জ্ঞানী ব্যক্তিদের থেকে অঙ্গীকার না নিয়ে থাকতেন তাহলে আমি তোমাদের সব জিজ্ঞাসার জবাবে হাদীছ বর্ণনা করতাম না।"[১৪]

কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব এমন ছিল যে, মানুষ তাঁর পিছু ছাড়তো না। অধিকাংশ জ্ঞানপিপাসু মানুষ তাঁর সামনে হাজির হয়ে উপকৃত হতেন। তিনি যেখানে যেতেন সেখানে মানুষের ভিড় জমে যেত। সে সময় মদীনার পরে মক্কা ছিল জ্ঞানের দ্বিতীয় কেন্দ্রস্থল। তিনি সেখানে গেলেও মানুষের ভিড় জমে যেত। মক্কাবাসীরা তাঁকে মঞ্চে বসিয়ে হাদীছ শুনতো। শ্রোতাদের মধ্যে মুজাহিদ, 'আতা' ও তাউসের (রহ) মত লোকেরাও থাকতেন। তাঁরা সবাই বলাবলি করতেন, আমরা এ ব্যক্তির মত দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি।[১৫]

রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে উচ্চারিত শব্দ ও বাক্যে হাদীছ বর্ণনা করা অতি জরুরী বলে মনে করতেন না। বরং ভাব ও অর্থ বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করতেন। হাদীছের পরিভাষায় যাকে 'রিওয়ায়াত বিল মা'না' বলা হয়। তাঁর বেশীর ভাগ বর্ণনা 'রিওয়ায়াত বিল মা'না' হতো। অনেক সময় একই হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে শব্দের পার্থক্য ও কম-বেশী হয়ে যেত। তবে ভাব ও অর্থের কোন তারতম্য হতো না।[১৬] ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেন, আমি ইবন 'আওনকে বলতে শুনেছি ঃ আমি ছয়জনকে পেয়েছি যাঁদের মধ্যে তিনজন শব্দ ও বর্ণসহ বর্ণনার ব্যাপারে ভীষণ কঠোর ছিলেন। আর অপর তিনজন ভাব ও অর্থ বর্ণনার অনুমতি দিতেন। প্রথম তিনজন হলেন : আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, রাজা' ইবন হায়ওয়া ও মুহাম্মাদ ইবন সীরীন। আর শেষোক্ত তিনজন হলেন : আল-হাসান, শা'বী ও ইবরাহীম আ'ন-নাখা'ঈ।[১৭]

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও তাঁর শিষ্য-শাগরিদের গণ্ডি ও পরিধি ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত। এখানে তাঁর কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ হুমায়দ আত-তাবীল, য়াযীদ ইবন আবী মারয়াম, কাতাদা, বাকর ইবন 'আবদিল্লাহ মুযনী, জারীর ইবন আবী হাযিম, আবু আশহাব, রাবী' ইবন সাবীহ, সা'ঈদ ইবন জারীরী, সা'দ ইবন ইবরাহীম, সাম্মাক ইবন হারব, ইবন 'আদন, খালিদ আল-

---

[১৩] প্রাগুক্ত- ১/৬১; তাহযীব আত-তাহ্যীব- ২/২৬৪
[১৪] তাবাকাত- ৭/১১৭
[১৫] প্রাগুক্ত
[১৬] প্রাগুক্ত
[১৭] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন- ২/৩২২

হায্‌যা, 'আতা' ইবন সাইব, 'উছমান আল-বাত্তি, কুররা ইবন খালিদ, মুবারাক ইবন ফুদালা, ইয়া'লা ইবন যিয়াদ, হিশাম ইবন হাস্‌সান, ইউনুস ইবন 'উবায়দ, মানসূর ইবন যাদান, সা'ঈদ ইবন বিলাল, মুজাহিদ, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ্‌, তাঊস (রহ্‌) ও আরো অনেকে।[১৮]

তিনি ছিলেন ফিকাহ্‌ শাস্ত্রের একজন ইমাম এবং বসরার 'মুফতীয়ে আ'জম (সর্বশ্রেষ্ঠ মুফতী)। কাতাদা বলেছেন, হাসান হালাল ও হারামের সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন।[১৯] আইউব বলেছেন, আমার চোখ হাসানের চেয়ে বড় কোন ফকীহ্‌কে দেখেনি। রাবী ইবন আনাস বলেছেন, আমি পুরো দশ বছর হাসানের নিকট যাওয়া-আসা করেছি এবং সব সময় তাঁর নিকট থেকে নতুন নতুন মাসআলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি।[২০]

কিছু বর্ণনায় জানা যায়, তিনি হাদীছ্‌ ও ফিকাহ্‌ বিষয়ে, কিছু বইও লিখেছিলেন। ইবন আবী লায়লা 'ঈসা ইবন মূসার সূত্রে বলেন : হাসান ছিলেন বসরার ফকীহ্‌।[২১]

এই ইজতিহাদ ও গবেষণার জন্য গবেষকসুলভ জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল। সুতরাং যে সব বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডারে কোন রিওয়ায়াত না থাকতো, সে ক্ষেত্রে তিনি কিয়াস ও ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত দিতেন। একবার আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যে সব মাসআলায় মানুষকে ফাতওয়া দেন, তার সব ক্ষেত্রে কি আপনার নিকট কোন 'রিওয়ায়াত' থাকে? বললেন : আল্লাহর কসম! সব ক্ষেত্রে থাকে না। তবে আমার মতামত ও সিদ্ধান্ত প্রশ্নকারীদের সিদ্ধান্তের চেয়ে তাদের জন্য ভালো হয়ে থাকে।

শুদ্ধ ও সঠিক হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত ও মতামত সিদ্ধান্ত দানকারী সাহাবাদের সমমান ও পর্যায়ের হতো। আবূ কাতাদা মানুষকে মসলা-মাসাইল জানার জন্য হাসানের নিকট যাওয়ার কথা বলতেন। তিনি বলতেন আল্লাহর কসম! আমি তার সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশী অন্য কারো সিদ্ধান্তকে 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) সিদ্ধান্তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিনি। কোন কোন বিজ্ঞ 'আলিম তো এমন কথাও বলেছেন, হাসানের যদি সাহাবায়ে কিরামের যুগে জ্ঞান-বুদ্ধির বয়স হতো, তাহলে তাঁরা তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী হতেন।[২২]

তিনি ইসলামী জ্ঞান ছাড়াও ভাষা ও সাহিত্যের একজন বড় বিশেষজ্ঞ এবং বিশুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাষী ব্যক্তি ছিলেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন, তিনি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষিতায় রা'উবা ইবন 'আজাজের সমকক্ষ ছিলেন।[২৩] তার বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা-

---

[১৮] তাহযীব আত-তাহযীব- ২/২২৪; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ- ১/৭১
[১৯] তাবাকাত- ৭/১১৮
[২০] তাহযীব আত-তাহযীব- ২/২৬৫; বুতরুস আল-বুসতানী : দাইরাতুল মা'আরিফ- ৭/৪৪
[২১] আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ- ৩/৪১৫
[২২] তাবাকাত- ৭/১১৮
[২৩] শাজারাতুয যাহাব- ১/১৩৮

ভাষণ শুনে কোন কোন আরব ব্যক্তি মন্তব্য করতো তিনি বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাষিতায় একজন নির্ভরযোগ্য আরব।[২৪]

উমায়্যা যুগের শ্রেষ্ঠ দুই আরব কবি জারীর ও ফারাযদাক। দুই জনের মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ছিল। ফারাযদাক সব সময় হাসান আল-বসরীর মজলিসে উঠাবসা করতেন। আর জারীর বসতেন ইবন সীরীনের (রহ) মজলিসে। তাঁরা দুইজন এই দুই কবির কবিতা শুনতেন।[২৫]

প্রখ্যাত ভাষাবিদ আবূ 'আমর ইবন আল-'আলা' বলেছেন :[২৬]

لم أرقرويين أفصح من الحسن والحجاج

–'আমি আল-হাসান আল-বসরী ও হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও শুদ্ধভাষী দুইজন গ্রামবাসীকে দেখিনি।'

তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হলো, এ দুইজনের মধ্যে কে বেশী শুদ্ধভাষী? বললেন : হাসান। ইমাম আল-গাযালী (রহ) বলেছেন :[২৭]

وكان الحسن البصرى أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء، وأقربهم هديا من الصحابة، وكان غاية فى الفصاحة.

–'মানুষের মধ্যে হাসান আল-বসরী ছিলেন কথার দিক দিয়ে নবীদের কথার সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ এবং হিদায়াতের দিক দিয়ে সাহাবীদের বেশী নিকটবর্তী। তাছাড়া ভাষার শুদ্ধতায় ও স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি ছিলেন একজন চূড়ান্ত পর্যায়ের মানুষ।'

তিনি ভুল আরবী বলা মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বললো : আমাদের একজন ইমাম আছেন যিনি কুরআন পাঠে ভুল করেন। বললেন : তাকে বিদায় করে দাও। কারণ, স্বর-ধ্বনি হলো কথার অলঙ্কার।

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে– 'ইয়া আবূ সা'ঈদ' বলে ডাক দেয়। (শুদ্ধ হবে ইয়া আবা সা'ঈদ) তিনি বললেন : দীনার-দিরহামের চিন্তা তোমাকে– ইয়া আবা সা'ঈদ বলা থেকে বিরত রেখেছে।[২৮]

জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাহচর্য এবং তাঁদের সাথে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, বিতর্ক ও চিন্তা-অনুধ্যান তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। একবার কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি সাক্ষাতের জন্য আসলেন। কথায় কথায় দুপুর হয়ে গেল। শুধু দুপুর নয়, বরং দুপুরও গড়িয়ে গেল। তখন তাঁর ছেলে এসে

---

[২৪] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন– ১/২০৫

[২৫] আল-'ইক্দ আল-ফারীদ– ৫/৩৮৩; ৬/১২৫

[২৬] ইবন খাল্লিকান : ওয়াফায়াতুল আ'য়ান– ২/৭০; বুতরুস আল-বুসতানী–৭/৪৪; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন– ১/১৬৩

[২৭] ইহইয়া'উ 'উলূম আদ-দীন– ১/১৬৮; আল-আ'লাম– ১/১০৬

[২৮] আল-'ইক্দ আল-ফারীদ– ২/৪৭৯-৪৮০

অতিথিদের বললেন, আপনারা আমার পিতার উপর অনেক বড় বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে একটু বিশ্রাম নিতে দিন। এখনো পর্যন্ত তিনি কিছু খাননি। তিনি ছেলের কথা শুনে তাকে ধমক দিয়ে বললেন, তাঁদের দর্শনের চেয়ে বেশী আমার চোখের প্রশান্তির জন্য আর কোন কিছু নেই। যখন দুইজন মুসলমান পরস্পর মিলিত হতেন, তাঁরা একে অপরকে হাদীছ শোনাতেন, আল্লাহর যিকর ও তাহমীদ-তাকদীস করতেন। এমন কি তাঁদের দুপুরের বিশ্রামের কোন সময় ও সুযোগ হতো না।[২৯]

তিনি মনে করতেন, একজন মানুষ শুধু জ্ঞান অর্জন করলেই তাকে প্রকৃত জ্ঞানী বলা যায় না। বরং প্রকৃত জ্ঞানী হওয়ার জন্য বহুবিধ শর্ত আছে। একবার মাতারুল ওয়াররাক তাঁর কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করে বললেন, অন্য ফকীহ্‌রা তো আপনার বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে কাঁদাক! তুমি কি কখনো ফকীহ্ দেখেছো এবং ফকীহ্ কাকে বলে তা জান? ফকীহ্ তিনি, যিনি পার্থিব সুখ-সম্পদের প্রতি বিমুখ, খোদাভীরু, নিজের চেয়ে উঁচু মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির প্রতি বেপরোয়া, নিজের চেয়ে নিচু মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে নিয়ে হাসি-তামাসা করেন না এবং আল্লাহ তাঁকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা দ্বারা তুচ্ছ পার্থিব সুখ-সুবিধা পেতে চান না।[৩০]

তিনি কুরআনের ধারক-বাহকদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করতেন। বলতেন, এক ব্যক্তি কুরআনকে পণ্যের মত এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে যায় এবং বিনিময়ে মানুষের নিকট থেকে অর্থ-সম্পদ পেতে চায়। আরেক ব্যক্তি কুরআনের বর্ণসমূহ মুখস্থ করে, কিন্তু তার সীমা-সরহদের কোন পরোয়া করে না। তার বিনিময়ে শাসক শ্রেণীর নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, দেশবাসীর অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নেয়। এ জাতীয় কুরআনের বাহকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। আর তৃতীয় এক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, তার ঔষধ তার নিজের অন্তরের রোগের উপর প্রয়োগ করে, রাত জাগে, তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, খোদাভীতি ও আত্মমর্যাদাবোধের পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করে এবং অন্তরে ব্যথা-বেদনা অনুভব করে। আল্লাহর কসম! এ জাতীয় কুরআনের বাহকের সংখ্যা লাল দিয়াশলাইয়ের সংখ্যার চেয়েও কম। তাঁদের বরকতেই আল্লাহ বৃষ্টি দেন, বিজয় দান করেন এবং বালা-মুসীবত দূর করেন।[৩১]

হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) একজন বাগ্মী, বাকপটু ও মিষ্টভাষী মানুষ ছিলেন। তিনি যখন কথা বলতেন তখন মুখ দিয়ে যেন মুক্তো ঝরে পড়তো। বিখ্যাত আরব পণ্ডিত আল-জাহিজ বলেছেন :[৩২] 'হাসান ছিলেন একজন দুনিয়া=বিরাগী 'আবিদ, বড় মাপের 'আলিম, তুখোড় বক্তা ও ভালো কাহিনী বলিয়ে মানুষ।' তিনি অনেক বাগ্মী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেছেন, 'আমরা হাসান আল-বসরীর চেয়ে বড় কোন বক্তাকে জানিনে।'[৩৩]

---

২৯. তাবাকাত- ৭/১১৯

৩০. প্রাগুক্ত,

৩১. আল-ইক্‌দ আল-ফারীদ- ২/২৪০

৩২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৩০৮, ৩৬৭

৩৩. প্রাগুক্ত-১/৩৫৪

সে যুগে বসরায় একদল খোদাভীরু 'আবিদ লোক ছিলেন, যারা জীবন যাপনে ছিলেন অতি সাধারণ। বাঁশ জাতীয় এক প্রকার গাছ দিয়ে তৈরি সাধারণ ঘরে বসবাস করতেন। বক্তৃতা-ভাষণের মাধ্যমে তারা মানুষকে উপদেশ দিতেন। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ বলেন :[৩৪]

أخطب الناس صاحب العمامـة السوداء بين أخصاص البصرة، إذا شاء خطب وإذا شاء سكت.

'বসরায় বাঁশের ঘরে বসবাসকারীদের মধ্যে এই কালো পাগড়ীধারী (হাসান) হলেন সবচেয়ে বড় খতীব। তিনি যখন ইচ্ছা ভাষণ দেন, আর যখন ইচ্ছা চুপ থাকেন।' তিনি যখন আখিরাতের বর্ণনা করতেন কিংবা সাহাবায়ে কিরামের যুগের চিত্র তুলে ধরতেন তখন চোখ দিয়ে তাঁর অশ্রুর বন্যা বয়ে যেত।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপকতা সম্পর্কে ছাবিত ইবন কুররার অভিমত এ রকম : 'তিনি স্বীয় 'ইলম ও তাকওয়া, যুহ্দ ও পরহেযগারী, পরমুখাপেক্ষীহীনতা ও দৃঢ় মনোবল, সৌন্দর্য ও পবিত্রতা, অনুধাবন শক্তি ও 'ইলমে মা'রিফাতের দিক দিয়ে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ছিলেন।

নানা ধরনের লোক সমবেত হতো এবং সবাই সমানভাবে তাঁর উপদেশ থেকে উপকৃত হতো। একই মজলিসে তাঁর নিকট থেকে কেউ হাদীছের জ্ঞান অর্জন করছেন, কেউ তাফসীর শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করছেন, কেউ 'ইলমে ফিকাহ্র দারস গ্রহণ করছেন, কেউ ফাতওয়া জিজ্ঞেস করছেন, বিচার-আচারের নিয়ম-কানুন শিখছেন এবং কেউ ওয়াজ শুনছেন। তিনি ছিলেন যেন এক মহা সমুদ্র যাকে উত্তাল তরঙ্গ সর্বদা আন্দোলিত করছে। তিনি যেন এক উজ্জ্বল প্রদীপ যা মজলিসকে আলোকিত করছে। আমর বিন মা'রূফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার তথা ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ-এর ক্ষেত্রে তাঁর কর্মধারা, বাকপটুতা এবং শাসকমণ্ডলী ও আমীর-উমারাদের সামনে তাঁর মর্যাদা পূর্ণ ভাষায় সত্য প্রকাশ্যের ঘটনাবলী ভুলবার মত নয়।'[৩৫]

তিনি কেবল বাগ্মী ও কামালিয়াতের অধিকারীই ছিলেন না, একজন হৃদয়বান ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি যা কিছু বলতেন তা তার অন্তরের গভীরতম স্থান থেকেই বের হতো। আর তাই অন্যের অন্তরে গভীর প্রভাব ফেলতো। তাঁর বক্তৃতা-ভাষণ শুনে শ্রোতার সর্বাঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো। আর এ কারণে বসরা থেকে কূফা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় অনেক বড় বড় 'আলিম ও শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও তাঁর দারসের হালকা মানুষকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করতো। আর এর মূল কারণ হলো কালামে নুবুওয়াতের সাথে তাঁর কথার গভীর মিল।

---

[৩৪] প্রাগুক্ত-১/৩৯৮; ২/২৮৬

[৩৫] তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমাত, (বাংলা অনু.)-১/৪৬-৪৭

মানুষ তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা ছিল অভিভূত এবং তাঁকে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মধ্যে গণ্য করতো। তৃতীয় শতাব্দীর অমুসলিম দার্শনিক ছাবিত বিন কুর্‌রাহ্‌-এর মন্তব্য হচ্ছে, উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার যে কয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপর অন্যান্য উম্মার ঈর্ষা করা উচিত, তাঁদের মধ্যে হাসান আল-বসরী (রহ) অন্যতম। মক্কা আল-মুকাররামা সব সময়ই ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সেখানে সকল শাস্ত্রের জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাগম ঘটে, কিন্তু মক্কার অধিবাসীরাও হাসান আল-বসরীর জ্ঞানের গভীরতা দেখে এবং তাঁর বক্তৃতা-ভাষণ শুনে বিস্ময়ের সাথে বলেছে : আমরা তাঁর মত কোন লোক আর দেখিনি।[৩৬]

জাহিরী 'ইলমে যদিও হাসান আল-বসরী তাঁর সময়ে শায়খুল ইসলামের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তবে তাঁর গর্ব ও গৌরব এবং খ্যাতির মূল ভিত্তি এটাই ছিল না। বরং 'ইরফান ও হাকীকাত ছিল তাঁর আসল ও প্রকৃত শাস্ত্র। তাঁর সত্তাটি তাসাউফের উৎস এবং 'ইলমে বাতিনের মূল ঝর্নাধারা। তাসাউফের সকল নদী এই উৎস থেকেই প্রবাহিত হয়েছে। সুতরাং তাসাউফের অধিকাংশ বড় বড় সিলসিলা তাঁরই মাধ্যমে হযরত 'আলী (রা) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এভাবে তাঁরই মাধ্যমে যেন দুনিয়াতে এ নূরের দরিয়া বহমান রয়েছে।

হযরত 'আলী (রা) থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি মুহাদ্দিছদের নিকট প্রমাণিত নয়। তবে 'ইলমে তাসাউফের ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) হযরত 'আলী (রা) থেকেই রূহানী ফয়েজপ্রাপ্ত ছিলেন। হযরত শাহ ওয়ালী আল্লাহ (রহ) লিখেছেন, "তরীকতের ইমামদের মতে হাসান আল-বসরী নিশ্চিতভাবে হযরত 'আলীর (রা) সাথে সম্পৃক্ত। মুহাদ্দিছীন কিরামের নিকট এ সম্পর্ক প্রমাণিত নয়। তবে শায়খ আহমাদ কাসতাশী তাঁর 'ইকদুল ফারীদ ফী সালাসিলি আহলিত তাওহীদ' গ্রন্থে একটি আলোচনায় তাসাউফপন্থীদের সমর্থন করেছেন।" অন্য এক স্থানে তিনি লিখেছেন, সূফীরা এ ব্যাপারে একমত যে, হাসান আল-বসরী (রহ) হযরত 'আলীর (রা) নিকট থেকে ফয়েজ লাভ করেছেন।[৩৭]

প্রথম পর্বের ও পরবর্তী কালের সকল সূফী হযরত হাসান আল-বসরীকে এই নূরানী সিলসিলার উৎসধারা এবং 'শায়খুশ শুয়ূখ' (শায়খদের শায়খ) বলে গণ্য করেন। তাঁর বাণী দ্বারা তাঁরা প্রমাণ উপস্থাপন করেন। সূফীদের আলোচনায় তাঁর নামটি তালিকার শীর্ষস্থানে থাকে। তাঁর সকল বাণী ও কথা তাসাউফ শিক্ষার পাঠ্যসূচী হিসেবে গণ্য করা হয়। শায়খ ফরীদ উদ্দীন 'আত্তার, শায়খ 'আলী ইবন 'উছমান হাজবীরী (মৃত্যু ৪৬৫হি.), শায়খ আবূ নাসর সাররাজ (মৃত্যু ৩৭০ হি.), শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রাওয়ার্দি (রহ) প্রমুখ

---

৩৬. ইবনুল জাওযী ঃ আল-হাসান আল-বসরী-৬৯-৭০
৩৭. ইনতিবাহুন ফী সালাসিলি আওলিয়াইল্লাহ, ১৮, ৩১

সূফী তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য ও লেখায় হযরত হাসান আল-বসরীর কথাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।[৩৮]

হযরত হাসান আল-বসরী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীতে পূর্ণতা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন যুহ্দ ও তাকওয়ার বাস্তব প্রতিকৃতি এবং নৈতিক গুণাবলীর জীবন্ত চিত্র। তিনি যদিও নুবুওয়াত ও রিসালাতের পবিত্র যুগ দেখার সুযোগ পাননি এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সুহ্বত লাভের গৌরব অর্জন করতে পারেননি, তবুও তাঁর চরিত্র ও নৈতিকতা যেন সেই পবিত্র ছাঁচে ঢালাই করে গড়ে তোলা হয়। তাবি'ঈদের দলে তাঁর চেয়ে বেশী আর কারো জীবন রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের জীবনের অনুরূপ ছিল না। তাঁর প্রতিটি আচরণে সাহাবীদের আচার-আচরণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতো। উঁচু স্তরের তাবি'ঈগণও একথা অকপটে স্বীকার করেছেন। হযরত আবূ বুরদা, যিনি ছিলেন একজন উঁচু স্তরের তাবি'ঈ, বলতেন, আমি সাহাবীদের দলের বাইরের কোন লোককে হাসানের চেয়ে বেশী রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিনি।[৩৯] ইমাম শা'বী সত্তর জন সাহাবীকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আর এ সৌভাগ্যে সম্ভবত তিনি হাসান আল-বসরী থেকেও এগিয়ে ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রতি সীমাহীন সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাতেন। একবার ইমাম শা'বীর ছেলে প্রশ্ন করলো, আব্বা! আমি দেখি, আপনি এই শায়খ (হাসান)-এর সাথে যেমন আচরণ করেন, তেমন আচরণ আর কারো সাথে করেন না। এর কারণ কি? তিনি বললেন : বেটা, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সত্তর জন সাহাবীকে দেখেছি। কিন্তু হাসানের চেয়ে অন্য কাউকে তাঁদের মত দেখিনি।

হৃদয়ের দুঃখ-বেদনাই হলো আধ্যাত্মিকতার উৎস। সেখান থেকেই উৎসারিত হয় যাবতীয় 'ইবাদাত-বন্দেগী, তাকওয়া-পরহেযগারী, আত্মসংযমের অনুশীলনী ইত্যাদির মত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী। হযরত হাসানের অন্তরটি সব সময় এত বেদনাবিধুর থাকতো যে, তার থেকে ব্যথার সুর ছাড়া আর কিছুই ধ্বনিত হতো না। ইউনুস বলেন, তাঁর উপর সব সময় একটা বেদনা ও বিষণ্ণতার ছাপ লেগে থাকতো। তাঁর ঠোঁট হাসি যে কি জিনিস তা জানতো না। তিনি বলতেন, মু'মিনের হাসি হলো তার উদাসীনতার ফল। বেশী হাসলে অন্তর মরে যায়। তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে অস্থিরভাবে কাঁদতেন।

তাঁর মধ্যে এত বেশী পরিমাণে খোদাভীতি সৃষ্টি হয় যে, প্রতিটি মুহূর্ত ভীত-শংকিত থাকতেন। ইউনুস ইবন 'উবায়দ বলেন, হাসান যখন আসতেন, মনে হতো তাঁর কোন অতি প্রিয়জনকে কবরে দাফন করে আসছেন। আর যখন বসতেন তখন মনে হতো তিনি এমন একজন কয়েদী যাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর যখন জাহান্নামের আলোচনা করতেন তখন মনে হতো তা কেবল তাঁর জন্যই তৈরী করা হয়েছে।[৪০]

---

[৩৮] ৩৮. তাযকিরাতুল আওলিয়া-১/৩২৪

[৩৯] ৩৯. তাবাকাত-৭/১৮

[৪০] ৪০. শাযারাতুয যাহাব-১/১৩৮

হযরত হাসান আল-বসরীর জীবনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবটুক যুহ্দ ও তাকওয়ার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। তাঁর সত্তাটি ছিল 'ইবাদাত-বন্দেগী ও রূহানী রিয়াদাত বা আধ্যাত্মিক সাধনা ও অনুশীলননের বাস্তব প্রতিকৃতি। হাজ্জাজ আল-আসওয়াদ বলেন, এক ব্যক্তি কামনা করতো, যদি সে হাসানের যুহ্দ, ইবন সীরীনের তাকওয়া, 'আমির ইবন 'আবদি কায়সের 'ইবাদাত এবং সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের ফিকাহ্র জ্ঞান অর্জন করতে পারতো! লোকেরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের পর দেখতে পেল, এক হাসানের মধ্যে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর মজলিস-মাহফিলে এক আখিরাত ছাড়া আর কোন কিছুর আলোচনা হতো না। আশ'আছ বর্ণনা করেছেন, যখন আমরা হাসানের কাছে যেতাম তখন আমাদের কাছে না দুনিয়ার কোন খবর জিজ্ঞেস করা হতো, আর না দুনিয়ার কোন খবর দেওয়া হতো। কেবল আখিরাতের আলোচনাই চলতো। আল-'উতবা বলেন, আমি আমার শায়খদের বলতে শুনেছি : তাবি'ঈদের আট ব্যক্তি পর্যন্ত এসে যুহ্দ (তপস্যা ও বৈরাগ্য) শেষ হয়েছে। তাঁরা হলেন : 'আমির ইবন 'আবদিল কায়স, আল-হাসান ইবন আবিল হাসান আল-বসরী, হারিম ইবন হায়্যান, আবু মুসলিম আল-খাওলানী, উওয়ায়স আল-কারানী, আর-রাবী' ইবন খুছায়ম, মাসরূক ইবন আল-আজদা' ও আল-আসওয়াদ ইবন য়াযীদ।[৪১]

ফরজ ও সুন্নাত ছাড়া তাঁর বিশেষ 'ইবাদাতসমূহ সম্পূর্ণ গোপনে ও নির্জনে হতো। সে সময় তিনি ভিন্ন এক জগতে অবস্থান করতেন। হুমায়দ বলেন, একবার আমরা যখন মক্কায় ছিলাম তখন শা'বী হাসানের সাথে একান্তে সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আমি তাঁর ইচ্ছার কথা হাসানকে জানালাম। তিনি বললেন, যখন ইচ্ছা, আসুক। দেখা হবে। কথামত একদিন তিনি আসলেন। আমি দরজায় হাজির ছিলাম। আমি তাঁকে জানালাম, এখন হাসান ঘরে একাকী আছেন। আপনি ভিতরে যান। কিন্তু একা ভিতরে যাওয়ার সাহস তাঁর হলো না। এ কারণে, আমাকেও সাথে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সুতরাং আমিও সাথে চললাম। যখন আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম তখন হাসান কিবলামুখী হয়ে এক বিস্ময়কর ভঙ্গি ও অবস্থায় উচ্চারণ করে চলেছেন : ওহে বানী আদম, তুমি কিছু ছিলেনা, তোমাকে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তুমি চেয়েছো, তোমাকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যখন তোমার পালা এসেছে, তোমার কাছে চাওয়া হয়েছে, তখন তুমি অস্বীকার করে বসেছো। আফসোস! তুমি কত বড় খারাপ কাজ করেছো। একথা বলতে বলতে তিনি অচেতন হয়ে পড়ছিলেন। তারপর আবার চেতনা ফিরে পেয়ে একই বাক্যগুলি আবার আওড়াচ্ছিলেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে শা'বী আমাকে বললেন, ফিরে চলো। এখন শায়খ ভিন্ন জগতে আছেন।

খালিদ ইবন সাফওয়ানের নিকট হাসান আল-বসরী (রহ) সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন : হাসানের বাহির ভিতরের সাথে এবং ভিতর বাইরের সাথে সবচেয়ে বেশী

---

[৪১] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৭১

সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তিনি অন্যকে যা কিছু করার জন্য বলতেন নিজে তা সবচেয়ে বেশী 'আমল করতেন। দুনিয়ার যা কিছু মানুষের হাতে, সে ব্যাপারে তিনি মুখাপেক্ষীহীন। আর দীনের যা কিছু তাঁর কাছে আছে সে ব্যাপারে মানুষ তাঁর মুখাপেক্ষী।[৪২]

তাঁর কাছে যুহ্দ ও তাকওয়া কেবল মৌখিক দাবী এবং বাহ্যিক বেশ-ভূষার নাম নয়। বরং তার মূল প্রাণসত্তা হলো 'আমল ও ইখলাস। তিনি বলতেন, মানুষ মুখে যা কিছু বলে তার কিছু যদি করতো, তাহলে তা তার জন্য মর্যাদার কাজ হতো। আর যদি করার চেয়ে বেশী বলে, তাহলে তা হবে তার জন্য লজ্জার বিষয়। তাঁর গোটা জীবনই ছিল কর্মের বাস্তব নমুনা। আবু বাকর আল-হুযালী বলেন, তিনি যতক্ষণ নিজে কোন কাজ না করতেন ততক্ষণ অন্যকে করার জন্য বলতেন না। আর যতক্ষণ কোন কাজ নিজে ছেড়ে না দিতেন, অন্যকে তা থেকে বিরত থাকার কথা বলতেন না। কোন এক ব্যক্তি ইউনুস ইবন 'উবায়দের কাছে প্রশ্ন করে : তুমি এমন কাউকে কি জান যিনি হাসান আল-বসরীর মত এত 'আমল করেন! তিনি বলেন : এত 'আমল তো দূরের কথা, এমন কোন ব্যক্তিকেও আমি জানিনে যিনি মুখে হাসানের মত কথা বলেন।[৪৩]

ইখলাস ছাড়া শুধু হালকায় বসে যিকর-আযকার করা এবং ছিঁড়া মোটা কাপড় পরাকে তিনি ধোঁকাবাজি বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন, আমাদের হালকায় বহু লোক বসে। কিন্তু তাদের অনেকের উদ্দেশ্য থাকে পার্থিব সুখ-সুবিধা প্রাপ্তি। একবার তাঁর সামনে মোটা পোশাক পরার আলোচনা উঠলে তিনি বলেন, এ ধরনের লোকেরা তাদের অন্তরের গভীরে অহংকারের প্রতিমা লুকিয়ে রাখে, আর প্রকাশ্য পোশাক-আশাকে বিনয়ী ও স্বল্পে তুষ্টি ভাব প্রকাশ করে। এমন মোটা পোশাকের চেয়ে মূল্যবান পোশাক পরা অনেক শ্রেয়।[৪৪]

মোটা ও কমদামী পোশাকের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য মাঝে মধ্যে তিনি মূল্যবান পোশাকও পরতেন। কুলছুম ইবন জাওশান বলেন, একবার হাসান দামী জোব্বা গায়ে দিয়ে চাদর ঝুলিয়ে বাইরে গেলেন। তাঁকে এ পোশাকে দেখে এক ব্যক্তি বললো, আপনার মত মানুষের গায়ে এ পোশাক মানায় না। তিনি বললেন, তোমরা জান না যে, দোযখীদের বড় একটি অংশ কমদামী মোটা পশমী পোশাক পরিধানকারীরাই হবে।

মানুষের সবচেয়ে বড় দুশমন তার 'নাফ্স' নিজে। সে তাকে আত্মতুষ্টি, রিয়াকারি, অহংকার ইত্যাদি ধোঁকার জালে আবদ্ধ করে ধ্বংস করে দেয়। হযরত হাসান আল-বসরী এই ধোঁকা এবং চাকচিক্যময় মরীচিকার ব্যাপার নিয়ে সব সময় ভীষণ ভীত থাকতেন এবং উঠতে বসতে এই দু'আ করতেন : 'হে আল্লাহ, শিরক, অহমিকা, কপটতা, রিয়া, ধোঁকাবাজি, খ্যাতি ও প্রচারের ইচ্ছা এবং আমার দীনের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে আমাদের অন্তরগুলিকে দীনের উপর স্থির ও অটল রাখ এবং সত্য-সঠিক ইসলামকে

---

[৪২] প্রাগুক্ত-২/২৩০

[৪৩] শাযারাতুয যাহাব-১/১৩৭

[৪৪] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/১৫৩; 'উয়ূন আল-আখবার-২/৩৭২

আমাদের দীন বানিয়ে দাও। তিনি বলতেন, নাফসের স্বভাব হলো কামনা-বাসনার প্রতি ঝোঁক প্রবণতা, তোমরা যিকরের সাহায্যে তা পরিশুদ্ধ কর।[৪৫]

তিনি সাধারণ মানুষের ভক্তি ও ভালোবাসাকেও একটি পরীক্ষা বলে মনে করতেন। কারণ, তাতে যে ব্যক্তিকে অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানো হয় তার মনে অহংকার জন্ম নিতে পারে। আর তাতে তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই তিনি অহেতুক ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানো পছন্দ করতেন না।

নাফসের ধোঁকা ও আত্ম-অহমিকার হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি নিজের প্রশংসা শোনা একেবারেই পছন্দ করতেন না। সা'ঈদ ইবন মুহাম্মাদ আছ-ছাকাফী বলেন, যদি কেউ হাসানের সামনে তাঁর প্রশংসা করতো, তা হলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন। আর যদি মানুষ তাঁর জন্য দু'আ করতো, তিনি দারুণ সন্তুষ্ট হতেন। তিনি মনে করতেন, একজন উপদেশ দানকারীর উপদেশের প্রভাব ও কার্যকারিতা নির্ভর করে তার নিজের অন্তরের নিষ্ঠা ও পরিশুদ্ধির উপর। অপরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে কাউকে উপদেশ দান করলে তা শ্রোতার মনে কোন রেখাপাত করে না। একবার এক ব্যক্তি হযরত হাসানের (রহ) উপস্থিতিতে মন গলে যায়, উপদেশমূলক এমন অনেক কথা বললেন। হাসান মনোযোগ সহকারে লোকটির কথা শুনলেন। কিন্তু তিনি তাঁর অন্তর নরম হওয়ার মত কিছুই অনুভব করলেন না। তখন তিনি লোকটিকে বললেন : হয় আমাদের মধ্যে কোন মন্দ আছে, নয়তো আছে তোমার মধ্যে।[৪৬]

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি তাঁর যুগের দুনিয়া বিরাগী লোকদের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ব্যাপকভাবে এ দুনিয়াতে যুহ্দ ও তাকওয়া অবলম্বনের আহ্বান জানাতেন। তবে প্রচলিত অর্থে তিনি কোন সূফী ছিলেন না। আসলে তাসাউফ ও যুহ্দ দু'টি ভিন্ন জিনিস। তবে সূফীরা যাহিদ হয়ে থাকেন। তবে সব যাহিদ ব্যক্তি সূফী হন না। তাসাউফ ও সূফী মতবাদের উৎপত্তি তো হাসান আল-বসরীর (রহ) যুগের বেশ পরে। আর একথাই বলেছেন বিশিষ্ট মিশরীয় পণ্ডিত ডঃ শাওকী দায়ফ।[৪৭]

যুহ্দ ও তাকওয়া বা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার প্রতি উদাসীনতা ও খোদাভীরুতার জন্য তাঁর সময়কালের লোকেরা যেমন তাঁকে অনেক উঁচু স্তরের ব্যক্তি বলে মনে করেছে, তেমনিভাবে পরবর্তীকালের পৃথিবীর মানুষ তাঁকে তেমনই বিশ্বাস করেছে। তাঁর এ যুহ্দ ও তাকওয়ায় কোন রকম ভনিতা ও কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। এর ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণ ইসলামী আদব-আখলাকের উপর। নুবুওয়াতের কেন্দ্রভূমি মদীনায় অবস্থিত তার প্রকৃত উৎস থেকে তিনি তা আহরণ করেন। পরবর্তীকালের প্রত্যেকটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদেরকে তাঁরই অনুসারী বলে দাবী করেছে। তাদের 'আকীদা-বিশ্বাসকে তাঁরই 'আকীদা-বিশ্বাস বলে মনে করেছে। যেমন জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের

---

[৪৫] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৪১; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৯৭

[৪৬] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৪/২৯

[৪৭] ডঃ শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব-২/৪৭

লোকেরা যেমন বলতো, তিনি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন, জগতের সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। তেমনিভাবে কাদরিয়্যা সম্প্রদায় দাবী করতো যে, তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ তাঁর কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর সূফীরা তো তাঁকে তাদের ইমামের স্থান দান করেন।

পরস্পর বিরোধী বর্ণনা বিচার-বিশ্লেষণ করে অনেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তিনি ছিলেন একজন কাদরী। কারণ, তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি এমন বিশ্বাস পোষণ করে যে, সব ধরনের পাপ আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, কিয়ামতের দিন সে কালো মুখ নিয়ে উঠবে। আর তিনি যদি জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতেন তাহলে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের 'আকীদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী 'আব্বাসী যুগের প্রখ্যাত লেখক আল-জাহিজ তাঁর ভূয়ষী প্রশংসা করতেন না। তাঁর 'আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন' গ্রন্থে যেখানেই হাসান আল-বসরীর নামটি এসেছে, অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে খুব বড় করে উল্লেখ করেছেন। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, একবার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ 'কাদর' সম্পর্কে হযরত হাসানের (রহ) মতামত জানতে চেয়ে তাঁকে একটি চিঠি লেখেন। তিনি সে চিঠির যে জবাব দেন তাতে ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার করা আল্লাহর জন্য অপরিহার্য– যা তিনি বিশ্বাস করতেন, লেখেন। খলীফা আবদুল মালিকের নিকট পাঠানো অপর একটি চিঠিতে একই ভাব ব্যক্ত করেন বলে বলা হয়েছে।[৪৮]

কিছু কিছু বর্ণনা দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, হযরত হাসান আল-বসরী 'কাদরিয়্যা' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু একথা সঠিক নয়। সম্ভবত এমন প্রচারের কারণ এই যে, উঁচু স্তরের তাবি'ঈদের অনেকে এ ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, কাদরিয়্যাদের অনেকের সাথে মেলামেশাও পছন্দ করতেন না। আর তিনি তাদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসায় কোন দোষ মনে করতেন না। তাঁদের সাথে খোলামেলা আলোচনাও করতেন।[৪৯] তাঁর এ উদারতার কারণে কোন কোন অনভিজ্ঞ লোক তাঁকে কাদরিয়্যাদের বিশ্বাসের প্রতি সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। অথচ তিনি এমন বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। 'উমার বলেন, কাদরিয়্যারা হাসানের নিকট আসা-যাওয়া করতো। তবে তাদের ধ্যান-ধারণা পরস্পরের বিপরীতে ছিল। হাসান বলতেন, আদমের সন্তানেরা! তোমরা আল্লাহকে নারাজ করে কোন মানুষের খুশী অর্জন করবে না। আল্লাহর নাফরমানীর ব্যাপারে কারো আনুগত্য করবে না, আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কোন মানুষের প্রশংসা করবে না। যে জিনিস আল্লাহ তোমাকে দেননি তার জন্য কোন মানুষকে তিরস্কার করবে না। আল্লাহ মাখলূকাতকে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজের সৃষ্টি করার নীতির উপর চলছেন। কোন ব্যক্তি যদি ধারণা করে যে, সে তার লোভের দ্বারা রিযিক বৃদ্ধি করতে পারে,

---

[৪৮] প্রাগুক্ত-২/৪৮

[৪৯] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/৩৭৭, ৩৮৬-৩৮৭

তাহলে সে তার জীবনকাল বৃদ্ধি করে, তার দেহের রং পরিবর্তন করে, তার অঙ্গ-প্রতঙ্গের মধ্যে কিছু সংযোজন করে তার সত্যতা প্রমাণ করুক। যখন এমনটি হবার নয় তখন বুঝা যায় মানুষের কোন কর্তৃত্ব নেই। সবকিছু আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী চলছে।[৫০]

আসল কথা হলো, তাঁর কিছু দ্ব্যর্থবোধক অস্পষ্ট কথার ভুল অর্থ করা হয়েছে। যদি কোনভাবেই কাদরিয়্যাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন তাহলে পরবর্তীকালে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ইমাম আল-আসমা'ঈ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাসান এক পর্যায়ে কদর-এর কিছু অংশের উপর আলোচনা করতেন। কিন্তু পরে তা থেকে ফিরে আসেন। কাজী 'আতা' ইবন ইয়াসার ছিলেন একজন কাদারী। তাঁর বাগ্মিতাও ছিল জাদুর মত ক্রিয়াশীল। তিনি এবং সা'ঈদ জুহানী হাসানের নিকট আসতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কাছে প্রশ্ন করতেন। তাঁরা বলতেন, আবু সা'ঈদ! এই শাসকরা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করে, তাদের ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়, আর বলে এসব কাজ আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী হচ্ছে। হাসান একথা শুনে বলতেন, আল্লাহর এই দুশমনেরা মিথ্যাবাদী। এ জাতীয় কিছু ঘটনার দ্বারা কিছু লোক তাঁকে কাদারী বলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।[৫১] অথচ এ একটি বিশেষ ঘটনা ছিল, কাদরের 'আকীদার সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই।

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের প্রধান পুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবন 'আতা ছিলেন হাসান আল-বসরীর (রহ) অন্যতম ছাত্র। একবার হাসান আল-বসরীকে কাবীরা গোনাহ্ বা মারাত্মক পাপের অধিকারী ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। অর্থাৎ পরকালে তার অবস্থান কোথায় হবে- জান্নাত না জাহান্নামে? তিনি জবাব দিতে কিছুক্ষণ দেরী করলেন। এই দেরী দ্বারা সম্ভবত তিনি এটাই বুঝাচ্ছিলেন যে, সেটা নির্ভর করবে আল্লাহর ফয়সালা ও মর্জির উপর। কিন্তু তাঁর ছাত্র ওয়াসিল ইবন 'আতা প্রশ্নটির চূড়ান্ত জবাব দিয়ে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, কাবীরা গোনাহকারীর অবস্থান হলো দুইটি অবস্থার মধ্যবর্তী একটি পর্যায়ে। সে পূর্ণ মু'মিন নয়। কারণ সে ঈমানের বিষয়সমূহের অন্তত কোন একটি বাদ দিয়েছে। তেমনিভাবে সে পূর্ণ কাফিরও নয়। কারণ, এখনো সে ঈমানের আনুসঙ্গিক বহু কর্ম সম্পাদন করে থাকে। তবে সে ফাসিক। সুতরাং সে 'ফিস্ক'-এর পর্যায়ে আছে, যা ঈমান ও কুফর-এর মধ্যবর্তী একটি পর্যায়। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না এবং আখিরাতে সে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি স্থানে অবস্থান করবে। হাসান আল-বসরীর (রহ) যে সকল ছাত্র ওয়াসিলের এই মতকে গ্রহণ করে, তিনি তাদেরকে হাসানের দারসের মজলিস থেকে সরিয়ে নিয়ে মসজিদের এক কোণে বসান এবং তাদের সামনে নিজের মতটি ব্যাখ্যা করতে থাকেন। যারা সেদিন ওয়াসিলকে অনুসরণ করে তাদের লক্ষ্য করে হাসান আল-

---

[৫০] তাবাকাত-৭/১২৭
[৫১] শাযারাতুয যাহাব-১/১৩৮

বসরী (রহ) বলেন : إِعْتَزَلَ عَنَّا - সে আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আর সেই থেকে ওয়াসিলের বিরুদ্ধবাদীরা ওয়াসিল ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি 'আল-মু'তাযিলা' নামটি আরোপ করে।[৫২]

হযরত হাসান আল-বসরীর শিরা-উপশিরার রক্ত সর্বদা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য টগবগ করতো। যদিও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ছাড়া তাঁর জিহাদে অংশগ্রহণের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে সীরাত বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত যে, শৈশব থেকে তাঁর অন্তরে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর তীব্র বাসনা বিদ্যমান ছিল এবং তিনি বুদ্ধি-জ্ঞান হওয়ার পর জিহাদকে নিজের জীবনের বিশেষ 'আমল বা কর্ম হিসেবে গ্রহণ করেন।[৫৩]

কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি তাঁর সময়ে সংঘটিত অধিকাংশ জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তবে কাবুল, আন্দাকান ও উজবেকিস্তানের অভিযান ছাড়া অন্যান্য অভিযানের ব্যাপারে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত এর কারণ এই যে, তিনি ছিলেন একজন নীরব কর্মী মানুষ। খ্যাতি ও প্রচার ছিল তাঁর খুবই অপ্রিয়। তাঁর জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য হতো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। এ জন্য একজন সাধারণ সিপাহী হিসেবে সৈন্য-বাহিনীতে যোগদান করতেন। আর এ ধরনের সাধারণ সিপাহীদের বিবরণ ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে বিশেষ একটা স্থান পায় না।

হযরত হাসান (রহ) যে একজন সাহসী পুরুষ ছিলেন সে কথা অনেকেই বলেছেন। ইমাম আয-যাহাবী (হি. ৭৪৮/খ্রী. ১৩৪৭) বলেছেন :

" كان أحد الشجعان الموصوفين يذكر مع قطرى بن الفجاءة."

–হাসান ছিলেন নন্দিত সাহসী বীরদের একজন– কাতারী ইবন আল-ফুজায়ার সাথে যার নামটি স্মরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, কাতারী ছিলেন উমাইয়্যা যুগের একজন বিখ্যাত খারিজী নেতা।

অত্যাচারী শাসক এবং স্বৈরাচারী আমীর-উমারার মুখোমুখি সত্যের ঘোষণা দান এবং আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ছিল উম্মাতের সত্যনিষ্ঠ মানুষের চিরকালীন বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তবে এক্ষেত্রে হাসান আল-বসরীর কর্মপদ্ধতি ছিল ভিন্ন ধরনের। তিনি তাদের বিপরীতে নীরব থাকা উত্তম মনে করতেন। 'আম্মারা ইবন মাহ্‌রান বলেন, একবার লোকেরা হাসান আল-বসরীকে বললো, আপনি শাসকদের নিকট গিয়ে তাঁদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করেন না কেন? জবাব দিলেন, একজন মু'মিনের তার আত্মাকে হেয় করা উচিত নয়। এ যুগের আমীরদের তলোয়ার আমাদের জিহ্বাকে অতিক্রম করে গেছে। যখন আমরা তাঁদের সাথে কথা বলি তখন

---

[৫২] আবদুল কাহির আল-বাগদাদী ঃ আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক, পৃ. ৯৭-৯৮; ডঃ 'উমার ফাররূখ ঃ তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-১/৬৪৬

[৫৩] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৭১

তাঁরা আমাদেরকে জবাব দেয় তলোয়ার দিয়ে। এ অবস্থায় তিনি জুলুমের তরবারির মুকাবিলায় তাওবার ঢাল ব্যবহারের উপদেশ দিতেন। আবু মালিক বলেন, হাসানকে যখন বলা হতো, আপনি ময়দানে নেমে এই অবস্থার পরিবর্তন করেন না কেন? বলতেন, আল্লাহ্ তরবারির সাহায্যে নয়, বরং তাওবার সাহায্যে পরিবর্তন করেন। তিনি বলতেন, যখন মানুষকে তাদের শাসকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের বিপদ-মুসীবতে ফেলা হয়, আর তারা ধৈর্য ধারণ করে, তখন আল্লাহ তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি সেই মুসীবত থেকে মুক্ত করেন। তবে যারা তরবারি কোষমুক্ত করে এবং তার উপর নির্ভর করতে আরম্ভ করে, আল্লাহর কসম! কখনো তার ভালো ফলাফল বের হয় না।

এ কারণে তিনি সব সময় যাবতীয় হৈ-হাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব থেকে দূরে থাকতেন। উমায়্যাদের শাসনকালে অনেক বড় বড় বিপ্লব ও বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী তাদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু হযরত হাসান আল-বসরী নিজের নীতির ভিত্তিতে তার কোনটিতে অংশগ্রহণ করেননি। শুধু তাই নয়, তিনি অন্যদেরকেও তাদের খপ্পরে পড়া থেকে বিরত রাখতেন। খলীফা 'আবদুল মালিকের সময় যখন ইবনুল আশ'আছ এবং ইয়াযীদ ইবন আবদুল মালিকের সময় ইবনুল মুহাল্লাব বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেন তখন কিছু মানুষ হাসান আল-বসরীকে জিজ্ঞেস করলো, এই ফিতনা ও বিশৃঙ্খলায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে আপনার মত কি? বললেন, দুই দলের কোনটির সাথে যোগ দেবে না। একজন শামী ব্যক্তি প্রশ্ন করে বসলো, আমীরুল মু'মিনীনের সাথেও কি যোগ দেওয়া যাবে না? তিনি শামী ব্যক্তিকে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পূর্বে উচ্চারিত বাক্যটি আবার উচ্চারণ করে বললেন, হাঁ, আমীরুল মু'মিনীনের সাথেও না।[৫৪]

ইবনুল আশ'আছ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিশাল একটি দল, যার মধ্যে কিছু উঁচুস্তরের তাবি'ঈও ছিলেন, তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে। 'উকবা ইবন আবদুল গাফির, আবুল জাওযা' ও আবদুল্লাহ ইবন গালিবের মত কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন : আবু সা'ঈদ এমন খোদাদ্রোহী, যে অন্যায়ভাবে মানুষের রক্ত প্রবাহিত করে, অবৈধভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করে, নামায ত্যাগ করে, এমন এমন করে– তার সাথে লড়াই করার ব্যাপারে আপনার মত কি?

বললেন, আমার মতে লড়াই করা উচিত নয়। কারণ, সে যদি আল্লাহর 'আযাব হয়ে থাকে তাহলে তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে হঠাতে পারবে না। আর যদি বিপদ-মুসীবত হয়ে থাকে তাহলে ধৈর্য ধারণ করা উচিত। যতক্ষণ না আল্লাহ্ নিজেই তার ফায়সালা করেন। আল্লাহ বড় ফায়সালাকারী।

ইবনুল আশ'আছের বিপ্লব ও বিদ্রোহের সময়কালে হযরত হাসান আল-বসরী নিজেই বড় ধরনের মুসীবতে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোন রকম নিজকে

---

[৫৪] তাবাকাত-৭/১১৮-১১৯

বিপদমুক্ত করেন। তিনি এত বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে, শুধু বসরা কেন, গোটা ইরাকে তাঁর বিরাট প্রভাব ছিল। ইবনুল আশ'আছের বিপ্লব থেকে তাঁর দূরে থাকার কারণে বহু সতর্ক মানুষ তাঁকে সাহায্য না করে দূরে সরে থাকতো। এ কারণে লোকেরা ইবনুল আশ'আছকে বললো, আপনি যদি চান যে, যেভাবে মানুষ উটের যুদ্ধে 'আয়িশার (রা) উটের পাশে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছে, সেভাবে আপনার জন্য যুদ্ধ করুক তাহলে যে কোন ভাবে হাসানকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে চলুন। এ পরামর্শের পর ইবনুল আশ'আছ তাঁকে জোর-জবরদস্তি সহকারে নিয়ে যান। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে তিনি তো গেলেন। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি যেই না তাঁর থেকে একটু উদাসীন হয়েছে, অমনি তিনি জীবন বাজি রেখে একটি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপর সাঁতার কেটে কোন রকম জীবন বাঁচিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন।

সেই সময় সা'ঈদ ইবন আবিল হাসান নামে এক ব্যক্তি– যিনি হাজ্জাজের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং মানুষকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতেন, হাসান আল-বসরীর নিকট জানতে চাইলেন, আমরা না আমীরুল মু'মিনীনের আনুগত্য ত্যাগ করেছি, আর না তাঁকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনতে চাচ্ছি। আমরা বরং কেবল এ কারণে আমীরুল মু'মিনীনের উপর বিরক্ত যে, তিনি হাজ্জাজের মত একজন জালিম ব্যক্তিকে শাসক বানিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনার মতামত কি? আর শামবাসীদের ব্যাপারেও বা আপনার ধারণা কি? তিনি হামদ ও ছানা পেশের পর বলেন : ওহে জনগণ! আল্লাহ হাজ্জাজকে শাস্তি হিসেবে চাপিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে তরবারির সাহায্যে আল্লাহর শাস্তির মুকাবিলা করবে না।[৫৫] বরং ধৈর্য, সহনশীলতা ও নীরবতা অবলম্বন কর। ... আর আল্লাহর দরবারে অন্তরের প্রশান্তি ও বিনীত ভাব দ্বারা কাজ করবে। আপনারা শামীদের ব্যাপারে আমার মত জানতে চেয়েছেন। আমার ধারণা যে, হাজ্জাজ দুনিয়ার কিছু তাজা গ্রাসের বিনিময়ে তাদের দ্বারা কাজ করাতে পারেন।[৫৬]

হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) সর্বক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসকদের জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীরব থাকেননি। যখনই তিনি নিজের মতামত, সিদ্ধান্ত ও ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছেন তখনই নির্ভীক চিত্তে সঠিক কথা বলে দিয়েছেন। এ বিষয়ে অনেক ঘটনা ও তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইয়াযীদ ইবন 'আবদুল মালিকের সময়ে 'উমার ইবন হুবায়রা খুরাসান ও 'ইরাকের ওয়ালী নিযুক্ত হন। তিনি 'ইরাকে এসে তথাকার শ্রেষ্ঠ 'আলিম, যেমন : হাসান আল-বস্‌রী, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন এবং ইমাম শা'বীকে ডেকে ফাত্‌ওয়া জিজ্ঞেস করার ভঙ্গিতে তাঁদেরকে প্রশ্ন করলেন : ইয়াযীদ আল্লাহর খলীফা। আল্লাহ তাঁকে বান্দাদের উপর তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। আল্লাহ তাঁর নিকট থেকে নিজের আনুগত্য এবং আমাদের (আমীরদের) থেকে ইয়াযীদের আদেশ-নিষেধের বাস্তবায়নের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। আপনাদের জানা আছে যে,

---

[৫৫] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/৫০

[৫৬] তাবাকাত-৭/১১৮-১২০

তিনি আমাকে ওয়ালী নিয়োগ করেছেন এবং আমার নিকট বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ পাঠান। আমি তা কার্যকর করে থাকি। এ অবস্থায় এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? ইবন সীরীন ও শা'বী তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেকটা পরোক্ষভাবে জবাব দিলেন। হাসান একেবারেই চুপচাপ ছিলেন। সবশেষে ইবন হুবায়রা তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। তিনি জবাব দিলেন এভাবে : 'ওহে ইবন হুবায়রা, ইয়াযীদের ব্যাপারে আপনি আল্লাহকে ভয় করুন, আল্লাহর ব্যাপারে ইয়াযীদকে ভয় করবেন না। আল্লাহ আপনাকে ইয়াযীদের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। কিন্তু সে আপনাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারবে না। সে সময় খুবই নিকটে যখন আল্লাহ আপনার নিকট এমন ফেরেশতা পাঠাবেন যে আপনাকে রাষ্ট্রীয় পদ থেকে নামিয়ে এবং প্রাসাদের প্রশস্ততা থেকে বের করে কবরের সংকীর্ণতার মধ্যে নিক্ষেপ করবেন। সে সময় কেবল আপনার কর্ম ছাড়া আর কেউ আপনাকে উদ্ধার করতে পারবে না।

আল্লাহ তাঁর দীন এবং তাঁর বান্দাদের সাহায্যের জন্য বাদশাহ ও বাদশাহী বানিয়েছেন। এ কারণে আল্লাহর দেয়া বাদশাহীর বদৌলতে আপনারা আল্লাহর দীন এবং তাঁর বান্দাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসবেন না। আল্লাহর অবাধ্যতার ব্যাপারে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা উচিত নয়। সুতরাং ইয়াযীদ যা লিখেছেন তা আল্লাহর কিতাবের সাথে মিলান। যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে পালন করুন। আর যদি আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থী হয়, পালন করবেন না। কারণ, ইয়াযীদের চেয়ে আল্লাহ এবং ইয়াযীদের চিঠির চেয়ে আল্লাহর কিতাব আপনার নিকট অগ্রগণ্য। হাসানের (রহ) এ বক্তব্য শুনে ইবন হুবায়রা তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে থাপ্পড় মেরে বলেন : কা'বার প্রভুর শপথ! এই শায়খ আমাকে সত্য কথা বলেছেন। তারপর তিনি অঝোরে কাঁদতে থাকেন। এরপর তিনি হাসানকে (রহ) চার হাজার ও অন্যদেরকে দুই হাজার করে দিরহাম দানের নির্দেশ দেন। হাসান তাঁর দিরহামগুলি দরিদ্র লোকদের মধ্যে বিলি করে দেন।[৫৭]

তিনি তিন ধরনের মানুষের সমালোচনাকে গীবত বলে মনে করতেন না। ১. প্রকাশ্য পাপাচারে লিপ্ত ফাসিক, ২. অত্যাচারী শাসক, ৩. বিদ'আতী ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে তার বিদ'আত ত্যাগ করে।[৫৮]

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ জুম'আর খুতবা এত দীর্ঘ করতেন যে, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যেত। শ্রোতারা যখন বিরক্ত হয়ে বার বার সূর্যের দিকে তাকাতো তখন তিনি তাদেরকে ধমক দিতেন এবং মনোযোগ সহকারে তাঁর বক্তব্য না শোনার জন্য তিরস্কার করতেন। হাসান আল-বসরী (রহ) হাজ্জাজের এরূপ আচরণের কঠোর ভাষায় নিন্দা করতেন। একবার তিনি হাজ্জাজ সম্পর্কে বলেন : 'এই ক্ষীণ ও দুর্বল দৃষ্টির ক্ষুদ্র লোকটির কর্মকাণ্ড

---

[৫৭] ইবন খাল্লিকান : ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/১২৮; ইবন কুতায়বা : 'উয়ূন আল-আখবার-২/৩৪৩; ইবন আবিল হাদীদ : শারহু নাহ্‌জিল বালাগা-৪/৫৯

[৫৮] আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/৩৩৭

কতনা বিস্ময়ের! সে এসে আমাদের দীনের ব্যাপারে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছে, সে মিম্বরে উঠে খুতবা দিয়ে থাকে, আর লোকেরা সূর্যের দিকে তাকায়। সে বলে : তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা সূর্যের দিকে তাকাও কেন? আল্লাহর কসম! আমরা সূর্যের জন্য নামায পড়ি না। আমরা নামায পড়ি সূর্যের প্রভুর জন্য। তোমরা কেন বলো না : হে আল্লাহর দুশমন, নিশ্চয় আল্লাহর রাতের কিছু অধিকার আছে যা তিনি দিনের বেলা কবুল করেন না। তেমনিভাবে আছে দিনের বেলার কিছু অধিকার যা তিনি রাতে কবুল করেন না।... এমন কথা তারা কেমন করে উচ্চারণ করবে? তাদের প্রত্যেকের মাথার উপর যে তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন করে তাগড়া জোয়ান সৈনিক।'[৫৯] আর একবার তিনি হাজ্জাজের একটি ভাষণ শুনে মন্তব্য করেন : এর জন্য দুর্ভাগ্য। আল্লাহর ব্যাপারে সে কতনা ধোঁকার মধ্যে আছে।[৬০] হাজ্জাজের মৃত্যুর খবর শুনে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। একবার ইয়াযীদ আর-রাক্কাশী হাসান আল-বসরীর (রহ) মজলিসে বললেন : আমি হাজ্জাজের ভালো আশা করি। হাসান (রহ) বলে উঠলেন : আমি আশা করি আল্লাহ তোমার আশার বিপরীত কাজ করবেন।[৬১]

বর্ণিত হয়েছে যে, হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ওয়াসিত[৬২] নগরে একটি 'আলিশান বাড়ী তৈরী করেন। নির্মাণ কাজ শেষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু মানুষকে আমন্ত্রণ জানান। হাসান আল-বসরীকেও (রহ) আমন্ত্রণ জানানো হলো। সেখানে জনসমাগম হবে এবং উপদেশমূলক কিছু কথা বলা যাবে- হযরত হাসান (রহ) এ সুযোগ হারাতে চাইলেন না। তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, অসংখ্য আমন্ত্রিত মানুষ ঘুরে-ফিরে বাড়ীটি দেখছে এবং তার নির্মাণ-শৈলী, কারুকাজ, মনোরম সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছে। তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং নিজেকে প্রস্তুত করে সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে ভাষণ দিতে আরম্ভ করলেন। ভাষণটির কিছু অংশ নিম্নরূপ :

'সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের। পৃথিবীর রাজা-বাদশারা সবসময় নিজেদের সম্মান ও মর্যাদাকে দেখে, আর আমরা প্রতিদিন তাদের মধ্যে একটি করে উপদেশ ও অভিজ্ঞতা পেয়ে থাকি। তাদের অনেকে প্রাসাদ নির্মাণ করে, কারুকাজ করে, সুদৃশ্য ও কোমল বিছানায় সুসজ্জিত করে। উৎকৃষ্ট ও মনোরম পোশাক-পরিচ্ছদ ও উন্নত জাতের বাহনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। তারপর লোভী-পারিষদবর্গ, নরকের শয্যাসঙ্গিনী ও অসৎ সহচররা তাকে সবসময় ঘিরে থাকে। আর সে বলে : ওহে তোমরা দেখ, আমি কী তৈরী করেছি! ওহে বিভ্রান্ত ব্যক্তি, আমরা দেখেছি। ওহে নিকৃষ্ট পাপাচারী, তারা কী ছিল? আসমানের অধিবাসীরা তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, আর দুনিয়ার

---

৫৯. ড. আবদুল জলীল শালবী : আল-খিতাবা ওয়া ই'দাদ আল-খাতীব, পৃ. ২৬৭

৬০. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৪/১২৪

৬১. প্রাগুক্ত-৫/৪৯

৬২. দক্ষিণ ইরাকে দাজলা ও ফুরাতের মধ্যবর্তী স্থানের একটি শহর। হাজ্জাজ এ শহরটি পত্তন করেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। (জামহারাতু খুতাবিল আরাব-২/৪৯৪)

অধিবাসীরা তোমাকে অভিশাপ দিয়েছে। তুমি অস্থায়ী ঘরকে বানিয়েছো, আর চিরস্থায়ী ঘরকে ধ্বংস করেছো, ধোঁকার জগতে তুমি ধোঁকা খেয়েছো। সুতরাং প্রতিফল লাভের জগতে অবশ্যই হেয় ও অপমানিত হবে। তিনি এভাবে বলে চলেছেন। এমন সময় শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন হাজ্জাজের প্রতিশোধের ভয়ে ভীত হয়ে বললো : ওহে আবু সা'ঈদ, থামুন, আপনি থামুন। যথেষ্ট হয়েছে। তারপর তিনি একথা বলতে বলতে বেরিয়ে যান : নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 'আলিমদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তাঁরা যেন মানুষের নিকট আল্লাহর বিধান বর্ণনা করেন এবং তা যেন গোপন না রাখেন।'

হযরত হাসানের এ বক্তব্য হাজ্জাজের কানে গেল। তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্য থেকে শামের অধিবাসীদের ডেকে একত্র করলেন। তারপর তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : ওহে শামের অধিবাসীগণ, তোমাদের উপস্থিতিতে বসরার একজন দাস আমাকে গালাগালি করলো, আর তোমরা তার কোন প্রতিবাদ করলে না? তারপর হাজ্জাজ হযরত হাসানকে (রহ) তাঁর দরবারে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। তিনি ঠোঁট নেড়ে অস্ফুট স্বরে বিড় বিড় করে কিছু আওড়াতে আওড়াতে হাজ্জাজের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে হাজ্জাজ বলে উঠলেন : ওহে আবু সা'ঈদ, আপনি যা কিছু বলেছেন, তা বলার সময় আমার ইমারাতের (শাসন কর্তৃত্বের) কোন হক কি আপনার উপর ছিল না? হযরত হাসান (রহ) জবাবে বললেন : হে আমীর! আল্লাহ্ আপনার প্রতি সদয় হোন! নিশ্চয় যে ব্যক্তি আপনাকে ভয় দেখিয়ে আপনার নিরাপত্তার বিশ্বাসকে শঙ্কাগ্রস্ত করে তুলেছেন, তিনি আপনার অধিকতর মঙ্গল আকাংখী ঐ ব্যক্তির থেকে যে আপনাকে নিরাপত্তার বাণী শুনায়। আপনি যা ধারণা করেছেন, আমার উদ্দেশ্য তা ছিল না। এখন আপনার হাতে দুইটি বিষয় আছে : ক্ষমা ও শাস্তি। আপনি প্রথমটি করুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম মুখপাত্র। তাঁর এ কথায় হাজ্জাজ লজ্জিত হন এবং যথেষ্ট হাদিয়া-তোহফা দিয়ে সম্মানের সাথে তাঁকে বিদায় করেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত হাসান (রহ) প্রবেশের পর হাজ্জাজ তাঁকে হাত দিয়ে ইশারা করে বলেন : এখানে, আমার কাছে বসুন। বসার পর হাজ্জাজ প্রশ্ন করেন: 'আলী ও 'উছমান সম্পর্কে আপনি কি বলে থাকেন? হাসান বললেন : আমি বলে থাকি আমার চেয়ে ভালো ব্যক্তির সেই কথাটি যা তিনি আপনার চেয়ে মন্দ এক ব্যক্তির নিকট বলেছিলেন। ফির'আওন মূসাকে (আ) বলেছিল :[৬৩]

فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الأُوْلٰى؟ قَالَ : عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتَابٍ لاَيَضِلُّ رَبِّىْ وَلاَ يَنْسَى.

---

[৬৩] সূরা ত্বাহা-৫১

– অতঃপর সেই পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা কি? মূসা বললেন : তাদের জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা হারিয়ে ফেলেন না এবং ভুলেও যান না।

'আলী ও 'উছমান (রা) সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। হাজ্জাজ বললেন : আবু সা'ঈদ, সত্যি আপনি 'আলিমদের নেতা। একথা বলার পর তিনি মূল্যবান সুগন্ধি ও 'আতর আনান এবং হযরত হাসানের (রহ) দাড়িতে নিজ হাতে মাখিয়ে দেন। তারপর সম্মানের সাথে তাঁকে বিদায় দেন। তিনি যখন হাজ্জাজের দরবার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন দারোয়ান তাঁর পিছনে কিছুদূর যেয়ে বলে : আবু সা'ঈদ, হাজ্জাজ আপনার সাথে যে আচরণ করেছেন, আপনাকে ডেকে আনার উদ্দেশ্য কিন্তু তাঁর ভিন্ন ছিল। আপনি যখন হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন সেখানে উন্মুক্ত তরবারি হাতে জাল্লাদ দাঁড়িয়ে ছিল এবং মাথা কাটার জন্য চামড়াও বিছানো ছিল। আমার প্রশ্ন হলো, আপনি হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত হওয়ার সময় ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কি আওড়াচ্ছিলেন? বললেন : আমি বলছিলাম :[৬৪]

'يَا عُدَّتِي عند كربتى، ويا صاحبى عند شِدَّتِي، ويا ولىَّ نعمتى، وَيَا إلهــى
وإله آبائى إبراهيمَ واسحاقَ ويعقوب، ارزقنى مودَّته، واصرف عنى أذاه.،

–'আমার বিপদের সময় হে আমার সাজ-সরঞ্জাম, আমার কষ্টকর ও দুঃসহ সময়ে হে আমার বন্ধু, হে আমার দান ও অনুগ্রহের মালিক, হে আমার ইলাহ এবং আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুবের (আ) ইলাহ! আপনি আমাকে তার ভালোবাসা দান করুন এবং তার শাস্তি থেকে আমাকে বাঁচান।' আমার প্রভু আমার কথা শুনেছেন।

বসরায় মারওয়ান ইবন আল-মুহাল্লাব মানুষকে শামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিতেন। আর হাসান আল-বসরী সে সময় তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে বারণ করতেন। তিনি বলতেন : ওহে মানুষ! তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর, তোমাদের হাতকে গুটিয়ে রাখ এবং তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর। অস্থায়ী দুনিয়া এবং তার ভিতরের অতি তুচ্ছ জিনিস যার অধিকারীরা কেউ স্থায়ী নয়, তার প্রতি লোভের বশবর্তী হয়ে তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না। এই দুনিয়াদার লোকেরা যা কিছু অর্জন করেছে আল্লাহ তাদের প্রতি খুশী নন। জেনে রাখ, ফিতনা যখন দেখা দেয় তখন তার অধিকাংশ শিকার হয় বাগ্মী বক্তাগণ, কবিরা, নির্বোধ ব্যক্তিবর্গ এবং অহংকারী ও ভবঘুরে লোকেরা। একমাত্র অজ্ঞাত-অপরিচিত এবং অতি পরিচিত আল্লাহভীরু লোকেরা তা থেকে নিরাপদ থাকে। তোমাদের মধ্যে যারা গোপনে অপরিচিত অবস্থায় আছে তাদের

---

[৬৪] ইবনুল জাওযী : আল-হাসান আল-বাসরী, পৃ. ৫৩; আস-সায়্যিদ আল-মুরতাদা : কিতাবুল আমালী, ১/১১২

উচিত সত্যকে আঁকড়ে থাকা এবং এই দুনিয়া নিয়ে মানুষ যে ঝগড়া-বিবাদ করছে তা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখা। তাদের সত্য-প্রীতির জন্য আল্লাহ্ তাদরেকে মর্যাদা দান করবেন। আর তোমাদের প্রসিদ্ধ ভদ্রজনেরা– যারা তাদেরই সমগোত্রীয় লোকদের দুনিয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব-ফাসাদ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে, আল্লাহ তাঁদেরকে হিদায়াত দান করবেন, বড় রকমের প্রতিদান দিবেন এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট তারা সম্মানিত হবে।[৬৫]

হযরত হাসানের (রহ) এসব কথা মারওয়ান ইবন আল-মুহাল্লাবের কানে গেল। তিনি জনগণকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন : 'আমি জেনেছি, এই গর্বিত, পথভ্রষ্ট বৃদ্ধ (হাসান) মানুষকে আমার আহ্বানে সাড়া দিতে বারণ করছে। আল্লাহ্‌র কসম! তাঁর প্রতিবেশী যদি তাঁর ঘরের একটি বাঁশ খুলে নেয় তাহলে তাঁর নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। আমাদের কল্যাণ আমরা চাইবো, আমাদের উপর যে অত্যাচার-উৎপীড়ন চালানো হয় তার প্রতিবাদ আমরা করবো, তাতে কি তিনি আমার ও আমার শহরবাসীর বিরুদ্ধাচরণ করবেন? আল্লাহ্‌র কসম! হয় তিনি আমাদের আলোচনা এবং বসরার উবুল্লায় ও ফুরাতের তীরে বসবাসকারী নিম্ন শ্রেণীর লোক– যারা আমাদের কেউ নয়, তাদেরকে আমাদের পাশে সমবেত করা থেকে বিরত থাকবেন, না হয় আমি তাঁকে শক্ত লোহার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করবো।' মারওয়ানের এ কথা হযরত হাসানের (রহ) কানে গেলে তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! তার ইচ্ছা ও কামনা দ্বারা আল্লাহ্ আমাকে সম্মানিত করলে আমি অপছন্দ করবো না। লোকেরা বললো : মারওয়ান যদি আপনার বিরুদ্ধে লড়তে চায়, আর আপনিও যদি তাই চান তাহলে আপনাকে আমরা রক্ষা করবো। হযরত হাসান (রহ) তাদেরকে বললেন : তাহলে তো আমি আপনাদেরকে যা করতে নিষেধ করে থাকি, তারই বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। আমি আপনাদেরকে অন্যদের সাথে মিলে একে অপরকে হত্যা না করতে বলে থাকি। আর আমিই এখন আমার সাথে যোগ দিয়ে একে অপরকে হত্যা করার জন্য আপনাদেরকে আহ্বান জানাবো? মারওয়ানের বিরুদ্ধে হযরত হাসান (রহ) তাঁর বক্তব্য বন্ধ করেননি। মারওয়ানও আর বেশী বাড়াবাড়ি করেননি।[৬৬]

আন-নাদার ইবন 'আমর যখন বসরার ওয়ালী তখন একদিন তিনি হাসান আল-বসরীকে (রহ) বলেন : ওহে আবু সা'ঈদ! আল্লাহ্ তা'আলা তো এই দুনিয়া এবং তার মধ্যে যত সৌন্দর্য ও ভোগের বস্তু আছে সবই তাঁর বান্দার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন :[৬৭]

كلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين.

---

[৬৫] তারীখ আত-তাবারী-৮/১৫৩

[৬৬] প্রাগুক্ত-৮/৫১৩

[৬৭] সূরা আল-আ'রাফ-৩১

–তোমরা খাও, পান কর। অপচয় করো না। কারণ, তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

তিনি আরো বলেছেন :[৬৮]

قل من حرَّم زينة الله التى أخرج لعباده والطيِّبات من الرزق، قل هى للذين امنوا فى الحياة الدنيا.

–আপনি বলুন : আল্লাহর সাজ-সজ্জাকে– যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন : এসব অনুগ্রহ আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য।

জবাবে হাসান (রহ) বললেন : ওহে জনাব, আল্লাহকে ভয় করুন। যে কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আপনি আপনার অন্তরে প্রাধান্য দিচ্ছেন তা ত্যাগ করুন। কারণ, তা আপনাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। না দুনিয়া, আর না আখিরাতের কল্যাণ কাউকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী দেয়া হয়। ইহকাল ও পরকাল এই দুইটি ভিন্ন জগত। যে এখানে কাজ করবে সে তা লাভ করবে। আর সে এখানে তার জন্য নির্ধারিত অংশটুকুই পাবে। আর যে কাজ না করবে সে ইহ ও পরকাল উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু নবী মুহাম্মাদকে (সা) নির্বাচন করেন এবং তাঁকে রিসালাত দান করে গোটা সৃষ্টি জগতের প্রতি রাসূল হিসেবে পাঠান। তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেন। দুনিয়াতে তাঁর জন্য কিছু সীমা নির্ধারণ করে দেন এবং এখানে তাঁর জীবনকালও বেঁধে দেন। তারপর আল্লাহ বলেন :[৬৯]

لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة.

–নিশ্চয় তোমাদের জন্য আছে আল্লাহর রাসূলের জীবনের মধ্যে উত্তম আদর্শ।

–আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমরা যেন তাঁর আদেশ মেনে চলি, তাঁর পথ অনুসরণ করি, তাঁর সুন্নাতের উপর 'আমল করি। আমরা যতটুকু তা করতে পারবো, মনে করবো, তা সম্ভব হয়েছে সেই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে। আর যতটুকু করতে অপারগ হবো, তার জন্য আল্লাহর সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করবো। আর এটাই আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ। আর আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার মধ্যে যেমন কোন কল্যাণ নেই, তেমনি নেই তাদের মধ্যেও যারা আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করে।

আন-নাদার বললেন : ওহে আবু সা'ঈদ! আমরা যে জীবনের মধ্যে আছি, সে অবস্থায় আমরা আমাদের প্রতিপালককে ভালোবাসবো।

হাসান (রহ) বললেন : রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে একদল লোক এমন কথাই বলেছিল। আল্লাহ তখন এ আয়াতটি নাযিল করেন :[৭০]

---

[৬৮]. প্রাগুক্ত-৩২

[৬৯]. সূরা আল-আহযাব-২১

[৭০]. সূরা আলে 'ইমরান-৩১

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.

–(হে মুহাম্মাদ) আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণকে ভালোবাসার চিহ্ ও প্রমাণ হিসেবে, আর যারা তাঁর বিরোধী হবে তাদেরকে মিথ্যাবাদী ঘোষণা করেছেন। সুতরাং ওহে জনাব, আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহর কসম! আপনার পূর্বে বহু জাতিকে আমি আপনার অবস্থানে দেখেছি। তারা সুউচ্চ গম্বুজ তৈরী করেছে, উন্নত জাতের বাহন পশু তাদেরকে খুশী করেছে, মানুষকে দেখানোর জন্য গর্বভরে দীর্ঘ আঁচল টেনে চলেছে, প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, ভালো জিনিসগুলো নিজেরা বেছে নিয়েছে, পোশাক-পরিচ্ছদে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করেছে, কিন্তু একদিন তাদের ক্ষমতা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, দুনিয়ায় যা কিছু তারা জমা করেছিল, সবই ছেড়ে যেতে হয়েছে। তাদেরকে তাদের মহাপ্রভুর সামনে হাজির হতে হয়েছে। তাদের কর্ম তাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে। শেষ বিচারের দিন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। সেদিন তাদের অবস্থা হবে এরূপ :[৭১]

يوم يفر المرأ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.

–যেদিন মানুষ পালাবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে। তার মা, বাবা, স্ত্রী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।[৭২]

আর একদিন তিনি আন-নাদার ইবন 'আমরের দরবারে উপস্থিত হয়ে নিম্নের উপদেশমূলক কথাগুলো বলেন :

ওহে আমীর! আল্লাহ আপনার সহায় হোন! সেই ব্যক্তি আপনার বন্ধু যে দীনের ব্যাপারে আপনাকে উপদেশ দেয়, আপনার দোষ দেখিয়ে দেয় এবং আপনাকে সত্য-সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়। আর সেই ব্যক্তি আপনার শত্রু যে আপনাকে ধোঁকা দেয় এবং আপনার প্রশংসা করে। ওহে আমীর! আল্লাহকে ভয় করুন! সত্য-সঠিক পথ, জীবনাচার, প্রকাশ্য ও গোপন সর্বক্ষেত্রে আপনি আপনার জাতির বিরুদ্ধাচরণ করছেন। তা সত্ত্বেও আপনি আশার পিছনে ছুটছেন এবং ওজর ও কৈফিয়ত তৈরি করছেন। আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন! মানুষ দু'ধরনের : দুনিয়ার অন্বেষণকারী ও আখিরাতের অন্বেষণকারী। আল্লাহর কসম! আখিরাতের অন্বেষণকারী তার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পেয়ে গেছে এবং প্রশান্তিতে আছে। আর অন্য দলটি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব,

---

[৭১] সূরা 'আবাসা-৩৪

[৭২] ইবনুল জাওযী : আল-হাসান আল-বাসরী, পৃ. ৫০-৫১

হে আমীর! আপনি ক্ষণস্থায়ী জীবনের অন্বেষণ এবং চিরস্থায়ী জীবন পরিত্যাগের মাধ্যমে দুর্ভাগ্য ডেকে আনবেন না। তাহলে পরিণতিতে আপনাকে লজ্জা ও অনুশোচনায় জর্জরিত হতে হবে। শুনুন, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন :

'সেইসব রাজা-বাদশারা কোথায় যারা তাদের অংশের ব্যাপারে উদাসীন ছিল। আর এ অবস্থায় সাকী তাদেরকে মৃত্যুর পিয়ালা পান করিয়েছে?'

আমি বৃদ্ধির পর ঘাটতির এবং সত্য-সঠিক পথ প্রাপ্তির পর পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে আল্লাহর পানাহ্ চাই। ওহে আমীর! কোন একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষের একটি কথা আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলতেন : 'একজন মানুষের ধোঁকা ও প্রতারণার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে কোন প্রতারকের বিশ্বাসভাজন হবে এবং তার কর্মকাণ্ডের সহায়ক হবে।[৭৩]

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের (রহ) খিলাফতকাল ছিল হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) জীবনের সবচেয়ে বেশী আনন্দময় সময়। কারণ, তিনিও ছিলেন একজন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ যাহিদ খলীফা। হযরত হাসান মাঝে মাঝে তাঁর দরবারে যেতেন এবং তাঁকে উপদেশ দিতেন। তাঁর সময়ে কিছু দিনের জন্য হযরত হাসান বিচারকের পদও অলংকৃত করেন। উভয়ের মধ্যে সব সময় পত্র যোগাযোগ হতো। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে তাঁদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পত্র সংরক্ষিত রয়েছে।[৭৪] 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর হযরত হাসানকে লিখলেন :

'এ দায়িত্ব দিয়ে আমাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আমাকে সাহায্য করতে পারে এমন কিছু সাহায্যকারী আমার জন্য দেখুন।' জবাবে হযরত হাসান (রহ) লিখলেন : 'দুনিয়াদার লোক– তা তাদেরকে তো আপনি চাচ্ছেন না। আর আখিরাতমুখী মানুষ– তা তারা তো আপনাকে চাইবে না। সুতরাং আপনি আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন।'[৭৫]

খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের (রহ) পুত্র আবদুল মালিকের ইনতিকালের পর হযরত হাসান (রহ) খলীফাকে সমবেদনা জানিয়ে একটি পত্র লেখেন। পত্রে কবিতার এই চরণটিও উল্লেখ করেন :[৭৬]

وَعُوِّضْتَ أَجْرًا مِنْ فَقِيْدٍ فَلَايَكُنْ + فَقِيْدُكَ لَايَأْتِيْ وَأَجْرُكَ يَذْهَبُ ·

– মৃতের বিনিময়ে আপনাকে প্রতিদান দেয়া হয়েছে। সুতরাং এমন যেন না হয় যে, আপনার মৃত ছেলেও ফিরে এলো না এবং আপনার প্রতিদানও চলে গেল।

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর ন্যায়পরায়ণ শাসকের গুণাবলী কি তা জানতে চেয়ে হযরত হাসানকে (রহ) একটি পত্র লেখেন।

---

[৭৩] জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-২/৪৯৪

[৭৪] আল'-ইকদ আল-ফারীদ-১/৩৪; ৩/১৫০; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-২/৪৯৫-৪৯৮; ইবনুল জাওযী : সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১২১

[৭৫] আল-আ'লাম-২/১০৬

[৭৬] আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/৩০৩, ৩১১

জবাবে হযরত হাসান (রহ) খলীফাকে যে পত্রটি লেখেন তাতে ন্যায়পরায়ণ শাসকের একটি পরিচিতি তুলে ধরেন। পত্রটির কিছু অংশ নিম্নরূপ :[৭৭]

'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ শাসককে প্রত্যেক ঝোঁকপ্রবণ মানুষের জন্য অবলম্বন, প্রত্যেক অত্যাচারীর জন্য সত্য-সঠিক পথ, প্রত্যেক বিনষ্ট ও বিকৃত মানুষের জন্য সংশোধন, প্রত্যেক দুর্বলের জন্য শক্তি, প্রত্যেক অত্যাচারিতের জন্য সুবিচার এবং প্রত্যেক দুঃখিতজনের আশ্রয়স্থল করে দিয়েছেন। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন সেই রাখালের মত যে তার উটের প্রতি দয়াশীল, উটগুলোকে উৎকৃষ্ট চারণভূমিতে চরায়, বিপজ্জনক চারণভূমি থেকে রক্ষা করে, হিংস্র জীব-জন্তু থেকে আগলে রাখে এবং ঠাণ্ডা-গরমের কষ্ট থেকে রক্ষা করে। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন সেই পিতার মত যিনি তাঁর সন্তানদের প্রতি স্নেহপ্রবণ। তাদের শৈশব কালে আদর-স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেন, বড় হলে শিক্ষা দান করেন। জীবনকালে তাদের জন্য আয় করেন এবং মৃত্যুর পরেও তাদের খরচের জন্য সঞ্চয় করে রেখে যান। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন সেই স্নেহময়ী মায়ের মত যিনি তাঁর সন্তানকে পেটে ধারণ করার ও দুধ পান করানোর কষ্ট স্বীকার করেন, শৈশবে লালন-পালন করেন, সন্তান জেগে থাকলে তিনিও জেগে রাত কাটান, সন্তান ঘুমালে তিনিও ঘুমান, সন্তানকে কখনো দুধ পান করান, আবার কখনো দুধ পান থেকে বিরত রাখেন, সন্তানের সুস্থতায় উৎফুল্ল হন এবং অসুস্থতায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে দণ্ডায়মান। তিনি আল্লাহর কথা শোনেন, বান্দাদের শোনান, তিনি আল্লাহকে দেখেন, তাদেরকে দেখান, তিনি আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং তাদেরকে সেদিকে চালিত করেন। অতএব, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ আপনাকে যা কিছুর অধিকারী করেছেন সে সব বিষয়ে আপনি সেই দাসের মত হবেন না যার নিকট তার মনিব কোন কিছু গচ্ছিত রেখেছে, তার অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছেন, অতঃপর সে অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করে পরিবার-পরিজনকে বিতাড়িত করেছে। ফলে তারা বিত্তহীন হয়ে পড়েছে।

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা এবং সেখানে আপনার লোক-লস্কর ও সাহায্যকারীর স্বল্পতার কথা স্মরণ করুন। আপনি মৃত্যু ও তার পরবর্তী মহা ভীতিকর অবস্থার জন্য পাথেয় প্রস্তুত করুন। হে আমীরুল মু'মিনীন! জেনে রাখুন, আপনি যে বাড়ীতে আছেন, সেটি ছাড়াও আপনার অন্য একটি বাড়ী আছে। সেখানে আপনার অবস্থান হবে অনেক দীর্ঘ। আপনার আত্মীয়-বন্ধুরা আপনাকে একাকী কবরের গর্তে রেখে আপনার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। আপনি সেই দিনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করুন যে দিন কেউ আপনার সংগী হবে না। যে দিন মানুষ তার ভাই, মাতা-পিতা, স্ত্রী ও

---

[৭৭] প্রাগুক্ত-১/৩৪; আল-হাসান আল-বাসরী-৫৬

সন্তানদের থেকে পালিয়ে যাবে। হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে। তখন সকল গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর গ্রন্থ ছোট-বড় কিছুই উপেক্ষা করছে না। সবই লিখে রাখছে। অতএব হে আমীরুল মু'মিনীন! মৃত্যুর আগমন এবং আশা-আরজু বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে আপনি সুযোগের ব্যবহার করুন। আপনি আল্লাহর বান্দাদেরকে জাহিলী আইন ও রীতি-পদ্ধতিতে শাসন করবেন না। আপনি তাদের সাথে অত্যাচারী শাসকদের মত আচরণ করবেন না। তাদের উপর ক্ষমতাগর্বী ও অহঙ্কারীদের মত প্রভুত্ব কায়েম করবেন না।'

একবার তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) এক পত্রের জবাবে তাঁকে উপদেশ দেন এভাবে :[৭৮] 'এ দুনিয়া হচ্ছে স্বপ্ন, আর আখিরাত হচ্ছে বাস্তব। মৃত্যু এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা। আমরা আছি স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে। যে ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের হিসাব করেছে সে লাভবান হয়েছে, আর যে উদাসীন থেকেছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে পরিণতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছে সে মুক্তি লাভ করেছে। যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। যে ধৈর্য ধরেছে, সফলকাম হয়েছে। যে ভয় করেছে, নিরাপদ থেকেছে। যে চিন্তা করেছে, দেখেছে। যে দেখেছে, বুঝেছে। যে বুঝেছে, জেনেছে। যে জেনেছে, 'আমল করেছে। আপনার যখনই পদস্খলন হবে, ফিরে আসবেন। যখন অনুতপ্ত হবেন, চলা শুরু করবেন। যখন কোন কিছু জানা না থাকে, জিজ্ঞেস করবেন। যখন রেগে যাবেন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। মনে রাখবেন, নিজের নফ্সকে সব সময় অনুগত রাখাই হলো সবচেয়ে ভালো কাজ।'

হাসান আল-বসরী (রহ) বিশ্বাস করতেন, হযরত 'উছমান ইবন 'আফ্ফান (রা) অন্যায়ভাবে নিহত হন। তিনি একথাও বিশ্বাস করতেন যে, সিফ্ফীন যুদ্ধের পরে 'আলী ইবন আবী তালিব (রা) ও মু'আবিয়া ইবন আবী সুফয়ানের মধ্যের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শালিস নিয়োগ সঠিক ছিল না। তাঁর মতে খিলাফতের প্রকৃত অধিকারীর শালিস মেনে না নেয়াটাই উচিত ছিল।[৭৯]

এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো : আবূ সা'ঈদ! লোকেরা ধারণা করে, আপনি নাকি 'আলীর (রা) প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন? একথা শুনে তিনি এত কাঁদলেন যে চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। তারপর বললেন : 'আলী (রা) ছিলেন আল্লাহর শত্রুদের প্রতি নিক্ষিপ্ত তাঁর একটি সঠিক তীর। এই উম্মাতের রাব্বানী বা আল্লাহ্ ওয়ালা মানুষ, অনেক মর্যাদার অধিকারী এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট-আত্মীয়। আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে উদাসীন ও নিদ্রিত থাকতেন না, আল্লাহর অধিকারের ব্যাপারে বিতৃষ্ণ ও

---

[৭৮] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৫১

[৭৯] 'উমার ফাররূখ : তারীখ আল-আদাব-১/৬৪৫

বীতস্পৃহ হতেন না, আল্লাহর অর্থও আত্মসাৎ করতেন না। আল-কুরআন তার সিদ্ধান্ত সমূহ দান করেছে, আর তিনি তা বাস্তবায়নে সফলকাম হন।[৮০]

সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে। একবার তাঁর উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কিরাম প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলো। তিনি বললেন :[৮১]

رَحِمَ اللهُ، شَهِدُوْا وَغِبْنَا، وَعَمِلُوْا وَجَهِلْنَا، فَمَا اجْتَمَعُوْا عَلَيْهِ اِتَّبَعْنَا، وَمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَقَفْنَا.

– আল্লাহ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করুন। তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, (উপস্থিত থেকেছেন) আমরা অনুপস্থিত ছিলাম। ঐকমত্য পোষণ করেছেন আমরা তা অনুসরণ করেছি। আর যা কিছুর ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন, আমরা সেখানে থেমে গিয়েছি।

মুহাম্মাদ ইবন য়াযীদ বলেছেন। আবূ সা'ঈদ আল-হাসান আল-বসরী শাসক শ্রেণীকে অপছন্দ করতেন। তাঁদের মতের সাথে একমত হতেন না। তাঁর মজলিসে 'উছমানের (রা) প্রসঙ্গ উঠলে তাঁর প্রতি তিনবার আল্লাহর রহমত কামনা করতেন। আর যারা তাঁকে হত্যা করেছে তাদেরকে তিন বার লা'নাত (অভিশাপ) দিতেন। তিনি বলতেন, আমরা যদি তাদরেকে লা'নাত না দেই তাহলে আমাদেরকে লা'নাত দেয়া হবে। তারপর 'আলীর (রা) প্রসঙ্গ উঠলে বলতেন : তিনি ছিলেন সব সময় সফলকাম, আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত মানুষ।[৮২]

অহেতুক ও বাজে কথা তিনি খুব কম বলতেন। তাঁর বেশীরভাগ কথা ও আলোচনা হতো জ্ঞান ও উপদেশমূলক।[৮৩]

বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তিনি মানুষকে উপদেশ দান করতেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রহস্যাবলী ও বিধি-নিষেধ স্পষ্টভাবে তুলে ধরতেন। তাঁর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাণীসমূহের কিছু এখানে উপস্থাপন করা হলো:[৮৪]

১. অন্তরমাঝে যে সব কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয় এবং দূর হয়ে যায়, তা সব শয়তানের পক্ষ থেকে। এ সব কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য আল্লাহর যিকর ও কুরআন তিলাওয়াতের সাহায্য নেয়া উচিত। আর যে সব কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়ে স্থায়ী হয়ে যায়, বুঝতে হবে

---

[৮০] আবূ 'আলী আল-কালী : আল-আমালী-৩/১৯৪; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/৫৪; আল-'ইকদ-২/২২৯

[৮১] আল-'ইকদ-২/২৩০

[৮২] প্রাগুক্ত-২/২৩৫

[৮৩] শাযারাতুয যাহাব-১/১৩৮

[৮৪] দ্রঃ সিফাতুস সাফওয়া-৪/১২৬; আল-ইক্দ আল-ফারীদ-২/২২০, ২২২, ২২৭, ২৪০, ২৪৪, ২৯৩, ৩২২, ২৫৯; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৭২, ২৪২; ৩/১৩২-১৩৭; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-২/৪৯৯

তা নফ্‌সের পক্ষ থেকে। আর তা দূর করার জন্য নামায, রোযা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাহায্য নেয়া উচিত।

২. আল্লাহ্ যে বান্দার কল্যাণ চান তাঁকে পরিবার-পরিজনের বন্ধন ও ভালোবাসার মধ্যে জড়িত করেন না।

৩. বিনীত ও বিনম্র হওয়ার শর্ত এই যে, ঘর থেকে বেরিয়ে যার সাথে দেখা হবে তাকে নিজের চেয়ে ভালো ও বড় মনে করবে।

৪. বান্দা যখন পাপ করার পর তাওবা করে তখন তা আল্লাহর সাথে তার নৈকট্য বৃদ্ধি করে দেয়।

৫. এক ব্যক্তি হযরত হাসানের (রহ) নিকট তার অন্তর কঠোর ও শক্ত হওয়ার অভিযোগ করলো। তিনি তাকে বললেন, তুমি তোমার অন্তরকে যিক্‌র ও ফিকরের বিভিন্ন স্তরে উন্নীত কর।

৬. মৃত ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর হয় তারই পরিবার-পরিজন। কারণ, তারা তার জন্য কান্নাকাটি করে। অথচ এর পরিবর্তে মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা কি তাদের জন্য সহজ হতো না?

৭. এক ব্যক্তির সাথে শত্রুতার বিনিময়ে হাজার মানুষের বন্ধুত্বও ক্রয় করো না।

৮. লালসা একজন 'আলিমকে হেয় ও অপমান করে।

৯. মানুষের প্রকাশ্যে নিজের নফসের নিন্দে মন্দ করা মূলত: তার প্রশংসা করারই নামান্তর।

১০. নিজের ভাইয়ের সম্মান করবে। তাহলে তাদের সাথে তোমার ভালোবাসার সম্পর্ক চিরকাল অটুট থাকবে।

১১. যদি নিজের মৃত্যুর চলাফেরার প্রতি আদম সন্তানের দৃষ্টি থাকতো তাহলে তার ধোঁকাবাজ আশা তার দুশমন হয়ে যেত।

১২. যে ব্যক্তি তার বিনয়ীভাবের জন্য পশমের মোটা পোশাক পরে, আল্লাহ্ তার দৃষ্টি ও অন্তরের আলো বাড়িয়ে দেন। আর যে লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে পরে, তাকে খোদাদ্রোহীদের সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

১৩. হায়, আমি যদি এমন কোন খাবার খেতে পেতাম যা পেটে গিয়ে ইটে পরিণত হয়ে যেত! কারণ, আমি শুনেছি, ইট পানিতে তিন শো বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে।

১৪. একবার তাঁর সামনে আলোচনা হচ্ছিল যে, ফকীহ্ এমন এমন কথা বলেন। তিনি বললেন, তোমরা কখনো ফকীহ্ দেখেছো কি? ফকীহ্ তিনি যিনি দুনিয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখেন, দীনের ব্যাপারে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হন এবং সব সময় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ইবাদাতে নিমগ্ন থাকেন।

১৫. তিনি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলতেন, যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ ও সোনাকে সম্মান দিয়েছে, আল্লাহ্ তাকে হেয় ও অপমান করেছেন।

১৬. জ্ঞানী ব্যক্তিদের জিহ্বা তাদের অন্তরের পিছনে থাকে। যখন সে কিছু বলতে চায় তখন প্রথমে অন্তরের সাথে পরামর্শ করে। যদি সে কথায় তার কোন উপকার

থাকে তাহলে বলে। অন্যথায় থেমে যায়। আর মূর্খ ব্যক্তির অন্তর থাকে তার জিহ্বার একেবারে আগায়। সে তার অন্তরের সাথে কোন পরামর্শ করে না। জিহ্বায় যা আসে তাই বক বক করে বলে যায়। তার পক্ষে হোক বা বিপক্ষে।

১৭. প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া হচ্ছে তোমাদের বাহন। যদি তোমরা তার পিঠে আরোহী হয়ে যাও সে তোমাদেরকে বহন করবে। আর সে যদি তোমাদের পিঠে আরোহী হয় তাহলে তোমাদের ধ্বংস করে ছাড়বে।

১৮. যদি তোমরা কোন ব্যক্তির সাথে শত্রুতা করতে চাও তাহলে প্রথমে তার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ। যদি সে আল্লাহর বাধ্য ও অনুগত হয় তাহলে এ কাজ থেকে দূরে থাক। কারণ, আল্লাহ কখনো তাকে তোমাদের আয়ত্তে দেবেন না। তোমাদের জন্য একাকীও তাকে ছেড়ে দেবেন না। আর যদি সে আল্লাহর না ফরমান বান্দা হয় তাহলে তোমাদের তার সাথে শত্রুতার কোন প্রয়োজনই নেই। নিজেদের নফ্‌সকে অহেতুক এ শত্রুতায় জড়িয়ে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত করো না। কারণ, সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর সাথে শত্রুতাই তার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।

১৯. যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে তার সাথে বন্ধুত্ব করা তোমাদের জন্য জরুরী। কারণ, যে ব্যক্তি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষকে ভালোবাসে, সে যেন আল্লাহকেই ভালোবাসে।

২০. আমি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিনি যে দুনিয়া চেয়েছে এবং সে আখিরাত পেয়েছে। এর বিপরীতে যে আখিরাত চায় সে দুনিয়াও পেয়ে যায়। তাহলে এমন জিনিস কেন চাওয়া হবে না যাতে দুইটি জিনিসই পাওয়া যায়?

২১. ইসলাম এই যে, তুমি তোমার অন্তর আল্লাহর নিকট অর্পণ করবে এবং প্রত্যেক মুসলিম তোমার হাত থেকে নিরাপদ থাকবে।

২২. তিনি বলতেন, দুনিয়ার সব মানুষের যদি প্রচুর বুদ্ধি থাকতো তাহলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত।

তাঁর মতে মানুষ তিন প্রকারের। এক প্রকারের মানুষ খাদ্যের মত যা সবার প্রয়োজনে আসে। আর এক প্রকারের মানুষ হলো ঔষধের মত– মাঝে মাঝে যার প্রয়োজন পড়ে। তৃতীয় প্রকারের মানুষ হলো রোগের মত। কোন দিন যার কোন প্রয়োজন কেউ বোধ করে না।

২৩. তিনি বলতেন : মন্দের মূল তিনটি এবং শাখা ছয়টি। মূল তিনটি হলো : হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা এবং দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা। আর শাখা ছয়টি হলো : নিদ্রা, পেট ভরে খাওয়া, আরাম-আয়েশ, নেতৃত্ব, প্রশংসা পাওয়া ও গর্ব-অহংকারের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা।

২৪. তাঁর মতে, একজন মানুষ 'আলিম হলেই 'আবিদ হয় না। কখনো কোন মানুষ 'আলিম হয়, কিন্তু 'আবিদ হয় না। এ দু'টি ভিন্ন জিনিস। দু'টিকে পৃথকভাবে অর্জন করতে হয়। তাই অনেক সময় অনেক নির্বোধ ও স্বল্পবুদ্ধির মানুষও বড় 'আবিদ হয়ে থাকেন। কথাটি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলতেন : একজন

মানুষ কখনো 'আবিদ হয়, কিন্তু বুদ্ধিমান হয় না। আবার কখনো একজন মানুষ 'আবিদ ও বুদ্ধিমান- দু'টিই হয়, কিন্তু জ্ঞানী হয় না।

২৫. তিনি বলতেন : জ্ঞান দুই প্রকার। অন্তরে অর্জিত জ্ঞান ও জিহ্বায় অবস্থিত জ্ঞান। প্রথম প্রকারের জ্ঞানই কল্যাণকর। আর দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান আল্লাহর বান্দাদের উপর তাঁর সাক্ষ্য-প্রমাণ।

হযরত হাসান (রহ) তাঁর সংগী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রয়োজনের প্রতি সব সময় সতর্ক থাকতেন। তিনি বলতেন : এক বছরের 'ইবাদতের চেয়ে আমার কোন ভাইয়ের একটি প্রয়োজন পূরণ করা আমার নিকট বেশী প্রিয়।[৮৫]

তিনি আমীর-উমারাদের প্রদত্ত হাদীয়া-তোহফা গ্রহণ করতেন। হিশাম ইবন হাস্সান বলেন : আমি নিশানা দেয়া চার কোণা বিশিষ্ট একটি কালো কাপড়ের উপর হাসানকে নামায আদায় করতে দেখেছি। মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক সেই কাপড়টি তাঁকে হাদীয়া দেন।[৮৬]

তিনি ছিলেন বিনয় ও নম্রতার প্রতীক। ভদ্রতা, ও শিষ্টাচারিতার বাস্তব নমুনা। ইমাম আল-আসমা'ঈ বর্ণনা করেছেন। 'উছমান আশ-শাহহাম একদিন হাসানের (রহ) দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ডাকালেন : ওহে আবূ সা'ঈদ! তিনি সাড়া দিলেন এই বলে : ওহে জনাব, আমি আপনার সামনে হাজির। তিনি বললেন : আমার আহ্বানে এমনভাবে সাড়া দিচ্ছেন? হাসান বললেন : আমি আমার চাকর-বাকরের ডাকেও এমনভাবে সাড়া দিয়ে থাকি।[৮৭]

কারো সংগে দেখা হলে তার সাথে সালাম বিনিময়ের পূর্বে ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করা তিনি পছন্দ করতেন না। আবূ বাকর ইবন আবী শায়বা বলেন : হাসান, ইবরাহীম ও মায়মূন ইবন মাহ্‌রান– কোন ব্যক্তি আস্-সালাম না বলা পর্যন্ত 'আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন'– এ জাতীয় কথা বলা মোটেই পছন্দ করতেন না।[৮৮]

ইবন 'আবদি রাব্বিহি বলেছেন, অসাধারণ প্রতিভা, ফিকাহ্ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান এবং অতুলনীয় যুহ্দ ও তাকওয়ার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হাসান আল-বসরী (রহ) তাঁর জীবনে এক পর্যায়ে খুরাসানে আর-রাবী' ইবন যিয়াদ আল-হারিছীর সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেন। তারপর হযরত 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীয (রহ) তাঁকে বসরার কাজী নিয়োগ করেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে প্রশ্ন করে : বসরার কাজী হিসেবে কাকে নিয়োগ দিলেন? তিনি বললেন : আমি তাবি'ঈদের নেতা আল-হাসান ইবন আবিল হাসান আল-বসরীকে বসরার কাজী নিয়োগ করেছি।[৮৯]

---

[৮৫] আল-'ইকদ-১/২৩৪

[৮৬] প্রাগুক্ত-১/২৭৪

[৮৭] আল'-ইকদ আল-ফারীদ-১/৩৪; ৩/১৫০; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-২/৪৯৫-৪৯৮; ইবনুল জাওযী : সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১২১

[৮৮] আল-আ'লাম-২/১০৬

[৮৯] আল'-ইকদ আল-ফারীদ-১/৩৪; ৩/১৫০; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-২/৪৯৫-৪৯৮; ইবনুল জাওযী : সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১২১

এভাবে তিনি হযরত হাসান আল-বসরীকে তাবি'ঈদের নেতা বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত হাসান ছিলেন নন্দিত সাহসী বীরদের একজন। বীরত্ব ও সাহসিকতায় উমাইয়্যা যুগের বিখ্যাত খারিজী নেতা কাতারী ইবন ফুজাআর সাথে তাঁর নামটি স্মরণ করা হয়।[৯০]

হযরত হাসানের (রহ) ওয়াজ-নসীহতের ভিত্তি ছিল আল-কুরআন, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবন ও কর্ম। বিশেষতঃ 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) জীবন। তিনি 'উমারের (রা) বহু কথা ও উপদেশ বাণী বর্ণনা করেছেন।[৯১]

তিনি তাঁর ওয়াজ-নসীহতে সব সময় মানুষকে এই দুনিয়া ও এর ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসিতা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানাতেন। পরকালের জীবন এবং সেখানে পাপীরা যে শাস্তি ভোগ করবে তা স্মরণ করিয়ে দিতেন। তাকওয়া ও 'আমলে সালিহ্-এর প্রতি উৎসাহ দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ, যাঁরা দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে আখিরাত কামনা করেছেন, তাঁদেরকে অনুসরণের আহ্বান জানাতেন। তিনি বলতেন : তাঁরা ছিলেন আঙ্গুর গাছের মত, যার পাতা সুন্দর এবং ফল সুমিষ্ট।[৯২] আল-জাহিজ তাঁর বহু উপদেশ বাণী সংকলন করেছেন। এখানে তাঁর একটি ওয়াজের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো :[৯৩]

'ওহে আদমের সন্তান! তুমি তোমার দুনিয়াকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। তাহলে দু'টিতেই লাভবান হবে। দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে বিক্রি করো না, আর তা করলে দু'টিতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ওহে আদমের সন্তান! যখন তুমি কাউকে কোন ভালো কাজ করতে দেখবে তখন তুমি তার প্রতিযোগিতা করবে। আর যদি কাউকে কোন খারাপ কাজের মধ্যে দেখ তাহলে তার প্রতিযোগিতার ইচ্ছা করবে না। এখানে অবস্থান অল্পদিনের, আর সেখানের অবস্থান অতি দীর্ঘ। আল্লাহর কসম! জেনে রাখ, তোমাদের এই উম্মাতের পর আর কোন উম্মাত নেই। আর তোমাদের নবীর পরে অন্য কোন নবী নেই এবং তোমাদের কিতাবের পরে আর কোন কিতাব নেই। তোমরা মানুষকে চালনা করছো, আর সময় বা কাল তোমাদেরকে চালিত করছে। যিনি মুহাম্মাদের (সা) সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, দেখেছেন যে, তিনি প্রতিদিনের প্রয়োজন পূরণের জন্য সকাল-সন্ধ্যা কাজ করেছেন। তিনি ইটের উপর ইটও যেমন রাখেননি, তেমনি বাঁশের উপর বাঁশও রাখেননি। তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

এ পৃথিবীর বহু জাতি ও সম্প্রদায় তাঁর জীবনের প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং তাঁর রব বা প্রভু যে জন্য তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তা তারা ঘৃণা করেছে। তাই আল্লাহ তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।

ওহে আদমের সন্তানেরা! তোমরা জেনে রাখ, যে দিন তোমরা মায়ের পেট থেকে পড়েছো, সেদিন থেকেই তোমাদের নির্ধারিত আয়ু কমছে। আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি

---

৯০. আল-আ'লাম-২/১০৬

৯১. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/৩০৩, ৩১১

৯২. প্রাগুক্ত-১/৩৪; আল-হাসান আল-বাসরী-৫৬

৯৩. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৫১

করুণা করুন, যে দেখে, তারপর চিন্তা করে। চিন্তা করে, তারপর উপদেশ গ্রহণ করে। দেখে, তারপর ধৈর্য ধরে। অনেক জাতি-গোষ্ঠী দেখে, কিন্তু ধৈর্য ধারণ করে না, ভয়-ভীতি তাদের অন্তরকে নিয়ে যায়। তারা যা চায় তা পায়নি এবং যা ছেড়ে এসেছে সেখানে আর ফিরে যায়নি।

ওহে আদমের সন্তান! তোমরা আল্লাহর এ বাণী স্মরণ কর :[৯৪]

وكل انسان الزمناه طـائره فـى عنقـه ونخـرج لـه يـوم القيامـة كتابـا يلقـاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.

– আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাবো তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।

তোমরা দুনিয়ার স্বচ্ছতাকে গ্রহণ কর এবং পঙ্কিলতাকে বর্জন কর। যা পঙ্কিল হয় তা স্বচ্ছ নয়, আর যা স্বচ্ছ হয় তা পঙ্কিল নয়। যা তোমাদেরকে সন্দেহ-সংশয়ে ফেলে তা ছেড়ে দাও- সেই পর্যন্ত যা তোমাদেরকে সন্দেহে ফেলে না। অনৈতিকতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, আলিমদের সংখ্যা কমে গেছে, সুন্নাহর বিলুপ্তি ঘটেছে এবং বিদ'আত ছড়িয়ে পড়েছে। আমি এমন সব লোকের সঙ্গ পেয়েছি যাঁদের সাহচর্য চোখের পুত্তলি ও অন্তরের স্বচ্ছতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু হারাম করেছেন তা তোমরা যতটুকু পরিহার করে চলো, তাঁরা তার চেয়ে বেশী পরিহার করে চলতেন আল্লাহ তাঁদের জন্য যা কিছু হালাল করেছেন, তা। তোমরা উত্তর ঠিক করে রেখ। কারণ, তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি সেই যে তার নিজের মত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার দীনকে গ্রহণ করে না। বরং তার প্রভুর পক্ষ থেকে যেভাবে এসেছে সেভাবে গ্রহণ করে। যে দুনিয়ার প্রশংসা করেছে, সে আখিরাতের নিন্দামন্দ করেছে। আল্লাহর সাক্ষাৎকে কেবল সেই ব্যক্তি অপছন্দ করে যে তাঁর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির মধ্যে অবস্থানকে পছন্দ করেছে।'

হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) ওয়াজ ছিল সাহাবীদের ওয়াজ-নসীহতের ন্যায় সহজ সরল ও আকর্ষণীয়। তাতে দুনিয়ার অনিত্যতা, জীবনের অবিশ্বস্ততা, আখিরাতের গুরুত্ব, ঈমান ও 'আমলের শিক্ষা, তাকওয়া ও খোদাভীতির প্রশিক্ষণ এবং নাফ্সের ফেরেব ও ধোঁকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকতো। যে যুগে মানুষের কাঁধের উপর বস্তুবাদের মারাত্মক দানব ভর করেছিল, মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) বিধি-বিধান সম্পর্কে গাফিল হয়ে পড়েছিল এবং সাধারণ মানুষ, এমন কি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও ধন-দৌলত, সুখ-সম্ভোগ ও ভোগ-বিলাসিতার সয়লাবে খড়কুটোর ন্যায় ভেসে যাচ্ছিল, সে যুগে এরূপ ওয়াজ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনও ছিল। যেহেতু তিনি সাহাবায়ে কিরামের (রা) যুগ নিজ চোখে দেখেছিলেন, তাঁদের সুহবত ও সাহচর্যের ফয়েয ও বরকত লাভে ধন্য হয়েছিলেন,

---

[৯৪] উমার ফাররূখ : তারীখ আল-আদাব-১/৬৪৫

তারপর উমায়্যাদের স্বৈরাচারী শাসনও দেখেছিলেন, তাই তাঁর ওয়াজ-নসীহতে অধিকাংশ সময় বিরাট আবেগ ও দরদের সাথে সাহাবায়ে কিরামের (রা.) ঈমানী অবস্থা এবং 'আমল-আখলাকের বৈশিষ্ট্যগুলোর চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যেত। যখন তিনি তাঁর দেখা দুটো যুগের তুলনা করতেন তখন তাঁর দরদী অন্তরে দারুণ আবেগ সৃষ্টি হতো। ফলে তাঁর বর্ণনা অব্যর্থ তীরে পরিণত হতো। তাঁর ওয়াজসমূহ শুধু হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষকই ছিল না; বরং তা ছিল সে যুগের বাকপটুতা, আলংকারিক ভাষা ও উন্নতমানের সাহিত্যেরও নমুনা। একবার তিনি তাঁর এক ওয়াজে সে যুগের অধিবাসীদের অবস্থার পর্যালোচনা এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) আদর্শ চরিত্রের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :[৯৫]

'হায় আফসোস! আশা-আকাংখা ও কল্পনা-বিলাসী পরিকল্পনা মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছে। মুখে বড় বড় কথা আছে, কিন্তু কাজে নেই। 'ইলম ও মা'রিফাত আছে, কিন্তু তার দাবী পূরণ করবার জন্য ধৈর্য নেই। ঈমান আছে, কিন্তু য়াকীন নেই। আমার কী হয়েছে, আমি মানুষ দেখি, তবে কোন বুদ্ধিমান মানুষ পাই না। লোকেরা প্রবেশ করে, অতঃপর তারা বের হয়ে যায়। তারা সবকিছু জানে, তারপর তা অস্বীকার করে। প্রথমে তারা একটি বস্তুকে হারাম করে, তারপর তাকেই আবার হালাল করে নেয়। তোমাদের দীন ও ধর্ম তোমাদের মুখের একটি মিষ্টি-মধুর উচ্চারণ ছাড়া আর কিছু নয়। যদি প্রশ্ন করা হয়, হিসাব-নিকাশের দিনে তুমি বিশ্বাসী? জবাব দেয়, হাঁ। শেষ বিচার দিনের মালিকের কসম! সে মিথ্যা বলে। মু'মিনের আখলাক ও চরিত্র এই যে, দীনের ক্ষেত্রে সে হবে শক্ত, ঈমানে হবে পাকাপোক্ত। তার থাকবে 'ইলম-এর সাথে 'হিলম' (বিচক্ষণতা) এবং হিলম-এর সাথে 'ইলম। সে হবে বুদ্ধিমান, তবে নম্র প্রকৃতির। সংযম তার দারিদ্র ও অভাব-অনটনকে ঢেকে দেবে। ধনী হয়ে গেলেও মধ্যমপন্থা সে কখনো পরিত্যাগ করবে না। ব্যয়ের ক্ষেত্রে সে মিতাচারী, বিপর্যস্ত মানুষের প্রতি দয়ালু ও দানশীল, অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে দরাজ হস্ত, উদার মন এবং ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে জোর তৎপর ও অনড়।'

এভাবে এ বক্তৃতায় তিনি মু'মিনের চরিত্রের গুণ-বৈশিষ্ট্য অতি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

প্রায় অধিকাংশ ওয়াজের পর তিনি বলতেন : এই ওয়াজ ও নসীহতের ভিতর তো কোন জিনিসের ঘাটতি নেই, তবে অন্তরের মধ্যেও প্রাণ স্পন্দন থাকতে হবে।[৯৬]

হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) একবার রমাদান মাসে একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা হাসাহাসি করছিল, তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : 'ওহে

---

৯৫. আবূ 'আলী আল-কালী : আল-আমালী-৩/১৯৪; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/৫৪; আল-'ইকদ-২/২২৯

৯৬. আল-'ইকদ-২/২৩০

লোকেরা! আল্লাহ তা'আলা রমাদান মাসকে তাঁর সৃষ্টির জন্য প্রতিযোগিতার ময়দান করে দিয়েছেন। যেখানে তারা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রতিয়োগিতা করবে। একটি দল অগ্রগামী হয়েছে। সুতরাং তারা সফলকাম হয়েছে। আরেকটি দল পিছনে পড়ে গেছে। সুতরাং তারা ব্যর্থ হয়েছে। আজকের দিনে অহেতুক হাসি-তামাশায় লিপ্ত ব্যক্তিদের দেখে অবাক হতে হয়, যে দিন প্রতিযোগিতায় অগ্রগামীরা সফলকাম হচ্ছে, আর পশ্চাৎগামীরা ব্যর্থ হচ্ছে। ওহে, আল্লাহর কসম! দৃষ্টির পর্দা যদি উঠে যেত তাহলে সৎকর্মশীলকে তার সৎকাজ এবং অসৎকর্মশীলকে তার অসৎকাজ ব্যস্ত করে রাখতো।'[৯৭]

তিনি বলতেন : ওহে আদমের সন্তান! তুমি তোমার নির্ধারিত জীবনকাল অতিক্রম করতে পারবে না। তোমার সব আশা-আকাংখাও পূর্ণ করতে পারবে না। তোমার নির্ধারিত রিযক লাভেও ব্যর্থ হবে না। নির্ধারিত রিযকের বাইরে অতিরিক্ত রিযকও তোমাকে দেয়া হবে না। তাহলে তুমি কিসের জন্য জীবনপাত করছো?'[৯৮]

'আব্বাসীয় যুগের প্রখ্যাত লেখক আল-জাহিজের 'আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন', ইবন কুতায়বার ''উয়ূন আল-আখবার', ইবন 'আবদি রাব্বিহি-এর 'আল-'ইকদ আল-ফারীদ'সহ বিভিন্ন বিখ্যাত গ্রন্থে হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) প্রচুর ওয়াজ-নসীহত ও বাণী সংকলিত রয়েছে। আস-সাররাজের 'আল-লুম'আ' ও আবূ নু'আয়মের 'হিলয়াতুল আওলিয়া' গ্রন্থসহ বহু প্রাচীন গ্রন্থে তাঁর জীবনী আলোচিত হয়েছে। ইমাম আল-গাযালী তাঁর 'ইহ্য়া'উ 'উলূম আদ-দীন' গ্রন্থে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বার বার তাঁর নাম ও বাণী উল্লেখ করেছেন।

হাসান আল-বসরীর ব্যক্তিত্ব এবং দা'ঈ হিসেবে তাঁর যোগ্যতা

হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সেই সব যোগ্যতারই সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন যা সেই যুগের বিশেষ অবস্থায় দীন ও ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং দীনী দা'ওয়াত কার্যকর করার জন্য খুবই জরুরী ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে সামগ্রিকতা, হৃদয়গ্রাহিতা এবং পরিপূর্ণতার সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি দীনের ক্ষেত্রে পূর্ণ পাণ্ডিত্য এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। উন্নত ও উঁচু স্তরের মুফাস্সির এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ ছিলেন। তাঁকে বাদ দিয়ে সে যুগে ইজতিহাদ ও সংস্কারমূলক কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হতো না। সাহাবায়ে কিরামের (রা) একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি পেয়েছিলেন এবং সে যুগটিকে তিনি খুব ভালোমতই অধ্যয়ন করেছিলেন। মুসলমানদের জীবনে এবং ইসলামী সমাজে যে সব পরিবর্তন ঘটেছিল তিনি সে সবের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তিনি তাঁর যুগের সমাজ এবং সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর জীবন-যিন্দেগী সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। সমাজের বৈশিষ্ট্যাবলী এবং তার রোগব্যাধি সম্পর্কেও একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় ওয়াকিফহাল ছিলেন।

---

৯৭. প্রাগুক্ত-২/২৩৫

৯৮. শাযারাতুয যাহাব-১/১৩৮

হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) দা'ওয়াত ও ইসলাহী (আহ্বান ও সংস্কার) কর্মকাণ্ডের শক্তি ও প্রভাবের মধ্যে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি জীবনের এক একটি দিক পাকড়াও করেছেন এবং সমাজের আসল রোগ কোথায় তা খতিয়ে দেখেছেন। তাঁর যুগে আরো অনেক ওয়া'ইজ ও দা'ঈ ছিলেন, কিন্তু তৎকালীন সমাজ যেভাবে তাঁর দা'ওয়াতকে গ্রহণ করেছিল সেভাবে অন্য কারো দা'ওয়াতকে গ্রহণ করেনি। এর কারণ, তাঁর বক্তৃতা-ভাষণ ও দারস থেকে সে যুগের বিগড়ে যাওয়া সমাজের উপর সরাসরি চপেটাঘাত পড়তো। যেমন, তিনি নিফাকের স্বরূপ বর্ণনা করতেন, মুনাফিকদের চরিত্র ও অভ্যাসসমূহ স্পষ্ট করে তুলে ধরতেন। কারণ, তিনি দেখেছিলেন সে যুগের শাসক শ্রেণী, সামরিক কর্মকর্তা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগামী ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল সদস্যদের জীবনে কিভাবে তার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। তিনি আখিরাত বিস্মৃতি এবং পার্থিব কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসার প্রাবল্যের নিন্দা করতেন। সে যুগের অনেক লোকই এই সংক্রামক রোগের শিকার হয়ে গিয়েছিল। তিনি মৃত্যু ও তার পরবর্তী অনন্ত জীবনের ছবি আঁকতেন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে শ্রোতার চোখের সামনে তা তুলে ধরতেন। ক্ষমতাশীল ও প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী লোকদের এমন একটি শ্রেণী সে সময়ে গড়ে উঠেছিল যারা মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হয়ে পড়েছিল।

মোট কথা, তাঁর দা'ওয়াত, ওয়াজ-নসীহত ও সংস্কারমূলক দার্‌স সে যুগের মন-মানস ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সংগে এতই সংঘাত ও সংঘর্ষশীল ছিল যে, তৎকালীন সমাজের পক্ষে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা কিংবা সম্পর্কচ্যুত হয়ে থাকা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তাই অধিকহারে লোক তাঁর বক্তৃতা-ভাষণ শুনতো এবং তাদের পাপক্লিষ্ট মনে দাগ-কাটতো। তিনি তাঁর বক্তৃতা ও হালকায়ে দারস থেকে দীন ও ঈমানের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতেন এবং নিজের সাহচর্য ও 'আমল দ্বারা তাদের আত্মাকেও প্রশিক্ষণ দিতেন। ষাট বছরের দীর্ঘ সময় ধরে তিনি এই দা'ওয়াতী কার্যক্রম ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। আর এতে ঈমান, ইসলাম ও 'আমলের বাস্তব সত্য লাভ করে ধন্য হয়েছে অগণিত মানুষ। 'আওয়াম ইবন হাওশাব বলেন : হাসান (রহ) ষাট বছর পর্যন্ত স্বীয় কাওমের মধ্যে সেই কাজটি করেছেন যা আম্বিয়ায়ে কিরাম নিজ নিজ উম্মাতের মধ্যে করতেন।[৯৯]

আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিদের অনেকে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার আগেই আল্লাহ ইশারা-ইঙ্গিতে দুনিয়াবাসীকে তা জানিয়ে দেন। খোদ কুরআন পাকেই রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের ইঙ্গিত দান করা হয়েছিল। কোন কোন ব্যক্তি স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) ওফাতের ইশারা লাভ করেছিলেন। তাঁর ওফাতের অল্প কিছু দিন পূর্বে এক ব্যক্তি

---

৯৯. দ্রঃ সিফাতুস সাফওয়া-৪/১২৬; আল-ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/২২০, ২২২, ২২৭, ২৪০, ২৪৪, ২৯৩, ৩২২, ২৫৭; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৭২, ২৪২; ৩/১৩২-১৩৭; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-২/৪৯৯

স্বপ্নে দেখে যে, একটি পাখী মসজিদের সবচেয়ে সুন্দর পাথরটি উঠিয়ে নিয়ে গেছে। সে যুগে স্বপ্নের সবচেয়ে বিখ্যাত তা'বীর (ব্যাখ্যা)কারী ছিলেন হযরত ইবন সীরীন। তিনি এ স্বপ্নের তা'বীর করেন এই বলে যে, হাসান (রহ) ইনতিকাল করবেন।[১০০]

এই স্বপ্নের অল্প কিছু দিন পরেই হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) অন্তিম রোগে আক্রান্ত হন। অসুস্থতার মধ্যে তিনি বলতেন, "হায়, মানুষ যদি তার সুস্থতার সময় অসুস্থতার সময়ের জন্য কিছু রেখে দিত।" জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে তিনি ছেলেকে তাঁর রচনাবলী একত্র করার নির্দেশ দিলেন। ছেলে নির্দেশ পালন করলেন। তারপর চাকরকে চুলা জ্বালাতে বললেন। তারপর সেই আগুনে নিজের সমস্ত রচনাবলী নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিলেন। শুধুমাত্র একখানি গ্রন্থ বাকী রাখলেন।[১০১] সম্ভবত: এটি পবিত্র কুরআন বিষয়ক ছিল। কুরআনের সম্মানেই এটি রেখে দেন।

জীবনের একেবারে প্রান্তবেলায় লেখককে ডেকে তিনি লেখালেন : হাসান একথা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে,

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ.

– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। আর যে মরণকালে অন্তরের সাথে এই সাক্ষ্য দিয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১০২]

এই সব প্রস্তুতির পর হিজরী ১১০/খ্রীষ্টাব্দ ৭২৮ সনের এক জুম'আর দিনের রাতে আখিরাতের পথে যাত্রা করেন।[১০৩] বিখ্যাত তাবি'ঈ মুহাদ্দিছ হযরত আইউব ও হযরত হুমায়দ আত-তাবীল (রহ) তাঁকে গোসল দেন।[১০৪] দ্বিতীয় দিন জুম'আর নামাযের পর জানাযার নামায পড়া হয়। জানাযায় মানুষের উপচে পড়া ভিড় জমে। লাশ দাফনের জন্য বসরার সব মানুষ গোরস্তানে চলে যায়। ফলে শহর একেবারেই শূন্য হয়ে যায় এবং ঐ দিন বসরার জামে' মসজিদে 'আসরের নামায আদায়ের জন্য কোন নামাযী ছিল না। ফলে সেদিন মসজিদে 'আসরের নামাযের জামা'আত হতে পারেনি।[১০৫] তিনি ৮৮ বছর জীবিত ছিলেন।[১০৬]

হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের সাথে বাহ্যিক রূপ ও সৌন্দর্যও লাভ করেছিলেন। দৈহিকভাবে তিনি দারুণ সুন্দর ছিলেন।[১০৭] এই সৌন্দর্যের সাথে

---

১০০. আল-'ইকদ-১/২৩৪
১০১. প্রাগুক্ত-১/২৭৪
১০২. প্রাগুক্ত-২/৪২৬
১০৩. প্রাগুক্ত-২/৪৩৪
১০৪. প্রাগুক্ত-৪/১৬৭, ১৬৯
১০৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭১
১০৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/১৩৭
১০৭. ড: শাওকী দায়ফ : তারীখুল আদাব-২/৪৪৭

আল্লাহ তাঁর মধ্যে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও ভীতির ভাবও দান করেছিলেন। যে কোন মজলিসে বা মাহফিলে তিনি বসতেন না কেন, সবার মধ্যে মানুষের দৃষ্টি তাঁর উপর গিয়ে পড়তো। 'আসিম আহ্ওয়াল বর্ণনা করেছেন। একবার তিনি বসরা যাবার সময় ইমাম শা'বীকে জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে কি আপনার কোন প্রয়োজন আছে? শা'বী বললেন, হাসানকে আমার সালাম পৌঁছে দেবে। 'আসিম বললেন, আমি তো তাঁকে চিনি না। শা'বী তাঁকে এই চিহ্ন বলে দিলেন যে, বসরায় প্রবেশ করার পর সবচেয়ে সুন্দর যে লোকটি তোমার নজরে পড়বে এবং যাঁকে দেখে তোমার অন্তরে সবচেয়ে বেশী সম্ভ্রমমূলক ভীতি সৃষ্টি হবে, তাঁকেই সালাম পৌছাবে। এই চিহ্নে র উপর ভিত্তি করে শা'বী সালাম পাঠান, আর 'আসিম ঠিকভাবেই হাসান আল-বসরীকে চিনে ফেলেন।[১০৮]

তিনি ছিলেন সুদর্শন মানুষ। দৈহিক সৌন্দর্যের সাথে পোশাক-পরিচ্ছদও হতো খুবই সুন্দর। অতি মূল্যবান ও সুন্দর কাপড় ব্যবহার করতেন। বড় বড় মজলিস-মাহফিলে যাওয়ার জন্য ভালো কাপড় ও পোশাক আনাতেন। শাতা'র কাতান, ইয়ামনের চাদর এবং ফুল করা চাদর ব্যবহার করতেন। জুব্বা, চাদর এবং পাগড়ী ছিল তাঁর মূল পোশাক। মাথায় পাগড়ী ছাড়া ঘর থেকে বের হতেন না।

---

১০৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/১৩২; 'উয়ূন আল-আখবার-২/৩৪৪

ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ আত-তায়মী (রহ)

ইবরাহীম আত-তায়মীর ডাকনাম আবূ আসমা। পিতা ইয়াযীদ ইবন শারীক আত-তায়মী। পিতা-পুত্র উভয়ে ছিলেন কূফার ভোগ-বিলাস বিমুখ তাপস শ্রেণীর তাবি'ঈদের অন্তর্ভুক্ত। সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে ইবরাহীম বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন না। তবে কূফার বা 'আমল 'আলিমদের মধ্যে গণ্য হতেন।[1] ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে হাদীছের হাফিজদের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং তাঁর 'তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ' গ্রন্থে তৃতীয় স্তরে তাঁর নামটি সন্নিবেশ করেছেন।[2]

ইবরাহীম আত-তায়মীর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যুহ্দ ও তাকওয়া। তাঁর পিতা ইয়াযীদও ছিলেন একজন বিখ্যাত 'আবিদ ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ স্বভাবের মানুষ। তিনি অনেক সম্পদ অর্জন করেন, কিন্তু ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দেননি। এমনকি তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদেও ঐশ্বর্যের কোন ছাপ পড়তে পারেনি। একবার ছেলে ইবরাহীম পিতার গায়ে একটি অতি সাধারণ তুলোর জামা দেখে, যার হাতাটা কবৃজি পর্যন্ত ছিল, বলেন, আব্বা আপনি একটু ভালো পোশাক কেন পরেন না? জবাবে তিনি বলেন, বেটা, যখন আমি বসরা থেকে এসেছিলাম, তখন বহু ভালো পোশাক তৈরি করেছি। কিন্তু তাতে আমার আনন্দে, আমার চিত্তের উৎফুল্লতায় কোন বৃদ্ধি ঘটেনি। আর তা দ্বিতীয়বার লাভ করার ইচ্ছাও আমার মধ্যে জাগেনি। আমি এটা চাই যে, যে পবিত্র লুকমাটি আমি আহার করি সেটি আমার সবচেয়ে অপ্রিয় ব্যক্তির মুখে থাক। কারণ, আমি আবু দারদার (রা) মুখ থেকে শুনেছি, দুনিয়াতে এক দিরহামের অধিকারী ব্যক্তির চেয়ে দুই দিরহামের অধিকারী ব্যক্তির নিকট থেকে বেশী হিসাব নেয়া হবে।[3]

পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন পিতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কল্যাণে ইবরাহীম শৈশব থেকেই দুনিয়ার সুখ-ঐশ্বর্যের প্রতি বিমুখ হয়ে যুহ্দ ও 'ইবাদাতের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তাই পরবর্তীকালে তিনি তাঁর সময়ের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আবিদের মধ্যে পরিগণিত হন। ইবন হিব্বান বলেছেন : তিনি ছিলেন একজন 'আবিদ ব্যক্তি এবং একাধারে অনেক দিন ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করার উপর ক্ষমতাবান।[4] ইবন হাজারও একথা বলেছেন।[5] আল-আ'মাশ বলেন ঃ আমি ইবরাহীম আত্-তায়মীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি একাধারে তিরিশ দিন না খেয়ে থাকতে পারেন।[6] 'ইবাদাতের প্রতি তিনি এত গুরুত্ব দিতেন যে, ফরজ নামাযের জামা'আতে কখনো তাঁর প্রথম তাকবীর তথা তাকবীর তাহরীমা ছুটে যেত না।

---

১. তাষকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩; তাকরীব আত-তাহযীব-১/৭৫

২. দ্র. তাষকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩; জীবনী নং ৬৮।

৩. ইবন সা'দ, তাবাকাত-৬/২৮৬

৪. তাহ্যীবুত তাহযীব-১/১৫৪

৫. তাহযীবুল কামাল ফী-আসমা' আর-রিজাল-২/২৩২

৬. প্রাগুক্ত-১/২৩৩; তাযকিরাতুল-হুফ্ফাজ-১/৭৩

আর যারা এ ব্যাপারে উদাসীন থাকতো তাদের সম্পর্কে তিনি বলতেন, প্রথম তাকবীরের ব্যাপারে যাদেরকে তোমরা উদাসীন দেখবে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।[৭] তিনি এত একাগ্রচিত্তে নামায আদায় করতেন যেন তাঁর ইহজাগতিক সব চিন্তা ও অনুভূতি লোপ পেতো। আল-আ'মাশ বলেন, তিনি যখন সিজদারত অবস্থায় থাকতেন তখন পাখী উড়ে এসে তাঁর পিঠের উপর বসতো এবং ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মারতো।[৮] তিনি একাধারে দুই মাস রোযা রাখতেন এবং এ সময়কালে প্রতিদিন শুধু একটি আঙ্গুর দ্বারা ইফতার করতেন। এ ছাড়া আর কিছুই খেতেন না।[৯]

'ইবাদাতে এত গভীর নিমগ্নতা এবং দুনিয়ার প্রতি এমন চরম উপেক্ষা সত্ত্বেও একে তিনি যথেষ্ট মনে করতেন না। তিনি বলতেন, আমি যখন আমার কথা ও কাজের মধ্যে তুলনা করি তখন আমার মিথ্যাবাদী হওয়ার ভয় দেখা দেয়।[১০]

তিনি ছিলেন আত্মত্যাগ ও আত্মদানের বাস্তব নিদর্শন। অন্যের জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে আত্মত্যাগের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হন। তাঁর এমন আত্মত্যাগের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পাওয়া দুষ্কর। বিখ্যাত 'আলিম তাবি'ঈ ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ ছিলেন তাঁর সমসাময়িক মানুষ। আর এই ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ ছিলেন স্বৈরাচারী ও জালিম শাসক হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের দুশমন। হাজ্জাজ তাঁকে ধরার জন্য তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দেন। সরকারী বাহিনী ইবরাহীম আন-নাখা'ঈকে খুঁজতে থাকে। ইবরাহীম আন-নাখা'ঈর প্রতি হাজ্জাজের দুশমনীর কথা ইবরাহীম আত-তায়মীর জানা ছিল। একদিন পুলিশ আন-নাখা'ঈর খোঁজে ইবরাহীম আত্-তায়মীর বাড়িতে হানা দেয়। তারা আন– নাখা'ঈকে চিনতো না। তারা জিজ্ঞেস করলো ইবরাহীম কে? আত্-তায়মী বললেন! আমি ইবরাহীম। তিনি জানতেন, তারা ইবরাহীম আন-নাখা'ঈকে তালাশ করছে! কিন্তু তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে, এ আশঙ্কায় তাঁকে বাঁচানোর জন্য নিজের সঠিক পরিচয় গোপন রাখেন। পুলিশ আন-নাখা'ঈ মনে করে ইবরাহীম আত্-তায়মীকে হাজ্জাজের কাছে নিয়ে যায়। হাজ্জাজ তাঁকে দীমাস জেলখানায় বন্দী করে রাখার নির্দেশ দেন। এ জেলখানাটি হাজ্জাজ তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের উপর নির্যাতনের জন্য বিশেষভাবে নির্মাণ করেন। এটাকে বন্দীশালা না বলে মৃত্যুর ঠিকানা বলাই অধিক সঙ্গত।

সেখানে ঠাণ্ডা-গরম ও রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তারপর একই শৃঙ্খলে দুই কয়েদী বেঁধে রাখার ব্যবস্থা ছিল। এই মাত্রাছাড়া যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগের কারণে অল্পদিনের মধ্যে তাঁর মুখমণ্ডলের রং পাল্টে যায়। তাঁর মা একদিন তাঁকে দেখতে যান, কিন্তু ছেলে ইবরাহীম আত্-তায়মী কথা না বলা পর্যন্ত তাঁকে চিনতে পারেননি। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এ নির্যাতন সহ্য করতে থাকেন। অবশেষে একদিন এই বন্দীদশায়

---

[৭] শা'রানী, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, পৃ: ৩৬

[৮] তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১/১৫৪

[৯] আশ-শা'রানী, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, ১/৩৬; তাবি'ঈন, পৃ. ২

[১০] তাবাকাত ইবন সা'দ-৬/২৮৫

তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর রাতে হাজ্জাজ স্বপ্নে দেখেন যে, শহরে আজ একজন জান্নাতী ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সকালে খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন যে, জেলখানায় ইবরাহীম আত্-তায়মী মৃত্যুবরণ করেছেন। একথা শুনে তিনি মন্তব্য করেন, মনে হচ্ছে স্বপ্নটি ছিল একটি শয়তানী ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা)। অতঃপর হাজ্জাজের নির্দেশে ইবরাহীম আত্-তায়মীর মৃতদেহটি ময়লা-আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়া হয়।[১১] খলীফা ইবন খায়্যাত তাঁর তারীখে হিজরী ৯৩ সনে যে সকল মনীষী মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ আত-তায়মী ওয়াসিতে হাজ্জাজের বন্দীশালায় মৃত্যুবরণ করেন।' মুগলাতায় বলেছেন, 'হাজ্জাজ, ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ আত-তায়মী ও ইবরাহীম আন-নাখা'ঈকে খুঁজছিলেন। আন-নাখা'ঈ আত্মগোপন করলেও আত-তায়মী করেননি। তাঁকে জেলে নেওয়া হয় এবং সেখানে তাঁকে হত্যা করা হয়।' অবশ্য ড. বাশ্শার 'আওয়াদ মা'রূফ বলেছেন, তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত যত বর্ণনা পাওয়া যায় তা পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, হাজ্জাজ তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেননি, বরং জেলখানায় অন্য কোন কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।[১২]

আবূ দাউদ বলেছেন, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়নি।[১৩] তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের একটু মতভেদ আছে। আল-আজরী বলেন ঃ আমি আবূ দাউদকে বলতে শুনেছি যে, ইবরাহীম, হাজ্জাজ ও সা'ঈদ ইবন যুবাইর একই বছর মারা যান। আর সেই সনটি হলো হিজরী ৯৫।[১৪] ইমাম আয-যাহাবী বলেছেন, তিনি আনাস ইবন মালিক (রা)-এর আগে মারা যান। আর সেটা হলো হিজরী ৯২ সন।[১৫] আল-ওয়াকিদী বলেছেন, তিনি হিজরী ৯৪ সনে মারা গেছেন।[১৬]

ইবরাহীম আত-তায়মী আনাস ইবন মালিক (রা), তাঁর পিতা ইয়াযীদ ইবন শারীক আত-তায়মী, আল-হারিস ইবন সুওয়াইদ, 'আমর ইবন মায়মূন আল-আওদী' 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা ও উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে 'আয়িশার (রা) সূত্রে তাঁর বর্ণিত হাদীছ মুরসাল শ্রেণীর।[১৭] কারণ, তিনি সরাসরি 'আয়িশার (রা) নিকট থেকে হাদীছ শোনেননি। একথা বলেছেন ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী। দারুকুতনী বলেছেন, তিনি হাফসা ও 'আয়িশা (রা) থেকে হাদীছ শোনার সুযোগ পাননি। কারণ, তিনি তাঁদের দুই জনের যুগ লাভ করেননি।[১৮]

আর তাঁর থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা হলেন ঃ বায়ান ইবন বিশর, আল-হাকাম ইবন 'উতাইবা, যুবাইদ ইবন আল-হারিস,

---

[১১] প্রাগুক্ত; তাহ্যীবুত তাহযীব-১/১৫৪
[১২] তাহযীবুল কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-২/২৩৩
[১৩] তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১/১৫৪
[১৪] তাহযীবুল কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-২/২৩৩
[১৫] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩
[১৬] তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১/১৫৪
[১৭] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩; তাহ্যীবুল কামাল-২/২৩২
[১৮] তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১/১৫৪; মীযানুল ই'তিদাল-১/৭৪

মুসলিম আল-বিত্তীন, ইউনুস ইবন 'উবাইদ ও আরো অনেকে।[১৯] হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর স্থান নিরূপণ করতে গিয়ে রিজাল শাস্ত্রবিদগণ অভিন্ন মতে পৌছতে পারেননি। ইবন মু'ঈন, আবু যুর'আ, ও ইমাম জাহাবী তাঁকে ছিকা' (বিশ্বস্ত) বলেছেন। আবূ হাতিম বলেছেন, তাঁর থেকে হাদীছ গ্রহণ করা যায়। ইবন হিব্বান তাঁকে তাঁর আস-ছিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[২০] অনেকে তাঁকে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে 'তাদলীস' করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। আল-কারাবীসী বলেছেন, যায়দ ইবন ওয়াহাব থেকে তিনি যা বর্ণনা করেছেন, তার অধিকাংশ মুদাল্লাস।[২১]

ইবরাহীম আত-তায়মী বিভিন্ন ধরনের কিস্‌সা-কাহিনী ও ইতিহাসের ঘটনাবলী বলে মানুষকে ও'আজ নসীহত করতেন।[২২] তাঁর এমন কিছু কথা আছে যা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ। যেমন তিনি বলতেন, মানুষের জন্য জ্ঞানের ফলাফলের মধ্যে খোদাভীতি এবং মূর্খতার ফলাফলের মধ্যে নিজের কর্মের উপর গর্ব ও অহংকার যথেষ্ট। লোভ মানুষকে খারাপ কাজের জন্য উৎসাহিত করে।[২৩]

ইবরাহীম আত-তায়মী তাঁর দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন জীবনে লাল রঙের বিশেষ ধরনের কাপড় ও পোশাক ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। 'আওয়াম ইবন হাওশাব বলেন ঃ 'আমি ইবরাহীম আত-তায়মীর গায়ে লাল চাদর দেখেছি। আমি তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখেছি লাল কাপড়-চোপড় এবং লাল পর্দা।'[২৪]

---

[১৯] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩; তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১/১৫৪

[২০] প্রাগুক্ত

[২১] তাহ্যীবুত তাহযীব-১/১৫৪

[২২] ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-২/৪৩৫

[২৩] শা'রানী, তাবাকাত-১/৩৬

[২৪] ইবন সা'দ, তাবাকাত-৬/২৮৫

ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ আন-নাখা'ঈ (রহ)

ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ (রহ) কূফার বিশিষ্ট তাবি'ঈ ফকীহ্দের একজন। তাঁর ডাকনাম আবূ 'ইমরান ও আবু 'আম্মার এবং পিতার নাম ইয়াযীদ ইবন আসওয়াদ আন-নাখা'ঈ। আন-নাখা' ইয়ামনের মাযহিজের একটি বড় গোত্রের নাম। আন-নাখা' ছিল মূলত জাসার ইবন 'আমর ইবন 'উল্লাহ্ ইবন খালিদ ইবন উদাদ-এর উপাধি। আন-নাখা' অর্থ দূরে সরে যাওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া। যেহেতু তিনি তাঁর মূল গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যান, তাই এ উপাধি লাভ করেন। তাঁর সাথে আরো বহু মানুষ গোত্রের আদি বাসস্থান থেকে বেরিয়ে যায়। একথা ইবনুল কালবী তাঁর 'জামহারাতু আন নাসাব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[১] ইবরাহীম এ গোত্রের সন্তান তাই তাঁকে আন-নাখা'ঈ বলা হয়। এ শাখা গোত্রটি কূফায় বসবাস করতো। তাঁর মা আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ ও 'আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদের বোন মুলায়কা বিন্ত ইয়াযীদ।[২] ইবরাহীমের জন্মসন হি. ৪৬/খ্রী. ৬৬৬।

ইবরাহীমের গোত্র আন-নাখা' হিজরী ১১ সনে আরতাত ইবন শুরাহীল ও আল-আরকাম আল-জুহায়শ নামক দু'ব্যক্তিকে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠায়। তাঁরা মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করেন। রাসূল (সা) তাঁদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন এবং তাঁরা বিনা দ্বিধায় ও বিনা প্রশ্নে সে দা'ওয়াত কবুল করেন। সেখানে তাঁরা তাঁদের গোটা গোত্রের পক্ষ থেকে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) হাতে বায়'আত করেন। রাসূল (সা) তাঁদের এমন সুন্দর আচরণে ভীষণ খুশী হন। তিনি তাঁদের দু'জনকে প্রশ্ন করেন : তোমাদের গোত্রে তোমাদের মত লোক আরো আছে কি? তাঁরা বলেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের পিছনে এমন সত্তর (৭০) জন লোক রেখে এসেছি যাঁদের প্রত্যেকেই আমাদের দু'জনের চেয়ে ভালো। তখন রাসূল (সা) তাঁদের জন্য এই দু'আ করেন : اللّٰهُمَّ بَارِكْ فِى النَّخْعِ – হে আল্লাহ! নাখা' গোত্রে বরকত ও সমৃদ্ধি দান করুন! উল্লেখ্য যে, এই আরতাত ও তাঁর ভাই দুরায়দ (রা) কাদেসিয়ার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৩]

রাসূলুল্লাহর (সা) এই দু'আ কবুল হয়। এই দু'আর বরকতে এই নাখা' গোত্রে অনেক বড় বড় 'আলিম, মুহাদ্দিছ ও ফকীহ্র জন্ম হয়।

ইবরাহীমের পরিবারটি ছিল 'ইলম ও 'আমলের পরিবার। চাচা 'আলকামা ও মামা আল আসওয়াদ– দু'জনই ছিলেন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে তিনি বেড়ে ওঠেন। 'আলকামার দারসে হাদীছের পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে, মুহাম্মাদ ইবন সীরীনের মত বিখ্যাত মুহাদ্দিছও তাতে অংশগ্রহণ করতেন। ইবরাহীমও এই হালকায়ে দারস থেকে জ্ঞান

---

১. ইবন খাল্লিকান : ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৫-২৬

২. তাহযীব আল-কামাল-ফী আসমা' আর-রিজাল-২/২৩৪; আল-আ'লাম-১/৮০

৩. আসরুত তাবি'ঈন-৪৯২

আহরণ করেন।[৪] তাছাড়া চাচা ও মামার মাধ্যমে তখনকার অনেক বড় বড় ব্যক্তি ও মনীষীর বৈঠকে বসা ও মেলামেশার সুযোগ তিনি লাভ করেন। শৈশবে তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট আসা-যাওয়া করতেন। আবু মা'শার বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম রাসূলুল্লাহর (সা) কোন কোন বেগমের ('আয়িশার রা.) নিকট আসা-যাওয়া করতেন।[৫] আবূ আয়্যুব তাঁর এ বর্ণনার প্রতিবাদ করে বলেন, তা কেমন করে সম্ভব। জবাবে তিনি বলেন, শৈশবে বালিগ হবার আগে তিনি চাচা 'আলকামা ও মামা আসওয়াদের সাথে হজ্জে যেতেন। আর ঐ দুইজনের ছিল হযরত 'আয়িশার (রা) প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা। হযরত 'আয়িশার (রা) মজলিসে তাঁদের আসা-যাওয়া ছিল।[৬] যদিও হযরত 'আয়িশার মুখ থেকে ইবরাহীমের হাদীছ শুনার কোন প্রমাণ নেই, তবুও তাঁর মত উঁচু স্তরের ব্যক্তিত্বের মজলিসে শরীক হওয়া কল্যাণ ও সৌভাগ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট ছিল। আহমাদ ইবন 'আবদিল্লাহ্ আল-'ইজলী বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কোন সাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেননি। তবে তিনি সাহাবীদের একটি দলকে লাভ করেছেন। 'আয়িশাকে (রা) দেখেছেন। তাঁর সময়ে তিনি ও শা'বী কুফাবাসীদের ফকীহ্ ছিলেন।[৭] ইমাম আয-যাহাবী বলেন, তিনি যায়দ ইবন আরকাম ও অন্য সাহাবীদের দেখেছেন। তবে কোন সাহাবী থেকে হাদীছ শোনেননি।[৮]

এ সব মহান ব্যক্তিদের সুহবত ও সাহচর্য ইবরাহীমকে জ্ঞানের সাগরে পরিণত করে। তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের মধ্যে পরিগণিত হন। ইমাম নাবাবী লিখেছেন, তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদা এবং দীনের তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণতার ব্যাপারে সবাই একমত। আবূ যুর'আ নাখা'ঈ বলেন, তিনি ছিলেন ইসলামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম।[৯] হাদীছ ও ফিকাহ্ উভয় শাস্ত্রে তাঁর ছিল সমান পারদর্শিতা। ইবন খাল্লিকান তাঁকে ফকীহ্ ও বিখ্যাত ইমামদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন।[১০]

তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছের একজন। ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে দ্বিতীয় তাবকার হাফিজে হাদীছের মধ্যে গণ্য করেছেন। হাদীছের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন তাঁর দুই মামা আসওয়াদ ও 'আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ এবং মাসরূক, 'আলকামা, আবু মা'মার, হাম্মাম ইবন হারিছ, কাজী শুরায়হ, সাহম ইবন মিনজাব প্রমুখের ন্যায় বিখ্যাত মুহাদ্দিছদের নিকট থেকে। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর শিষ্য শাগরিদদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেন : আ'মাশ, মানসূর, ইবন 'আওন, যুবায়র আল-ইয়ামানী, হাম্মাদ ইবন সুলায়মান, মুগীরা ইবন মাকসাম আদ-দাব্বী ও আরো অনেকে।[১১]

---

৪. ইবন সা'দ : তাবাকাত-৬/২৭০
৫. ইবন খাল্লিকান-১/২৫; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪; সিফাতুস সাফওয়া-৩/৪৭
৬. তাবাকাত-৬/২৭১
৭ তাহ্যীবুল কামাল-২/২৩৭
৮. মীযানুল 'ইতিদাল ফী নাকদির রিজাল-১/৭৪
৯. তাহ্যীবুল আসমা'-১/১০৪
১০. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৫
১১. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১/১৭৭; তাহ্যীবুল কামাল-২/২৩৫-২৩৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর জানার পরিধি ছিল সীমাহীন। আ'মাশ বলতেন, আমি যখনই ইবরাহীমের নিকট কোন হাদীছ বর্ণনা করেছি, তখনই তিনি সেই হাদীছের ব্যাপারে অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে আমার জানার পরিধির বিস্তার ঘটিয়েছেন।[১২] ইবন মু'ঈন ইমাম শা'বীর মুরসাল বর্ণনার চেয়ে ইবরাহীমের মুরসাল হাদীছসমূহকে বেশী পছন্দ করতেন।[১৩] হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে মূল শব্দের বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতেন না। রিওয়ায়াত বিল মা'না বা অর্থ ও ভাবের বর্ণনাকে তিনি যথেষ্ট মনে করতেন।[১৪] আবু উসামা আল- অ'মাশের সূত্রে বলেন :

كان إبراهيم صيرفيُّ الحديث -

ইবরাহীম ছিলেন হাদীছের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী বিশেষজ্ঞ।[১৫]

তবে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি আরোপ করে হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে তিনি অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। মারফূ' হাদীছ তাঁর স্মৃতিতে থাকা সত্ত্বেও তিনি তা বর্ণনা করতেন না। আবু হাশিম বর্ণনা করেছেন। আমি ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহর (সা) কোন হাদীছ কি আপনার নিকট পৌঁছেনি? সেগুলি আমাদেরকে শোনালে আমরা বর্ণনা করতে পারতাম। তিনি জবাব দিলেন, কেন পৌঁছুবে না। তবে 'উমার, 'আবদুল্লাহ্, 'আলকামা ও আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করা আমার জন্য সহজ মনে করি।[১৬]

ফিকাহ্ ছিল ইবরাহীমের বিশেষ শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ ও ইমাম। এ শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতার ব্যাপারে সবাই একমত।[১৭] 'আল্লামা যাহাবী তাঁকে ইরাকের ফকীহ্ এবং ইমাম নাওবী কূফার ফকীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শা'বী ইবরাহীমের মৃত্যুর সময় বলেন, তিনি নিজের চেয়ে বড় কোন 'আলিম এবং বড় কোন ফকীহ্ রেখে যাননি। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হাসান বসরী ও ইবন সীরীনও কি নয়? শা'বী জবাব দিলেন, শুধু হাসান বসরী ও ইবন সীরীন কেন, বসরা, কূফা, হিজায ও শামে কেউ নেই।[১৮] তাঁর সময়ের অনেক বড় বড় 'আলিম ফিকহী মাসআলার প্রশ্নকারীদেরকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। সা'ঈদ ইবনে জুবাইরের নিকট কেউ কোন ফাতওয়া জিজ্ঞেস করতে আসলে তিনি বলতেন, ইবরাহীমের বর্তমানে আমার নিকট জিজ্ঞেস করছো?[১৯] আবূ ওয়াইলের নিকট কোন ফাতওয়া জিজ্ঞেসকারী এলে তিনি তাকে ইবরাহীমের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তাকে একথাও বলে দিতেন যে, তাঁর জবাবটি আমাকে জানিয়ে যাবে।[২০] ইবন হাজার বলেন ঃ

---

১২. তাবাকাত-৬/১৮৯

১৩. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১/১৭৭

১৪. তাবাকাত-৬/১৯০

১৫. তাহ্যীবুল কামাল-২/২৩৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩ আবূ নু'আয়ম : আল-হিলয়া-৪/২২০

১৬. তাবাকাত-৬/২৭২

১৭. তাহ্যীবুল আসমা'-১/১০৪

১৮. প্রাগুক্ত-১/১০২; তাহ্যীবুল কামাল-২/২৩৮

১৯. তাবাকাত-৬/২৭০

২০. প্রাগুক্ত-৬/২৭২

তিনি ছিলেন একজন ফকীহ্ ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ। তবে তাঁর থেকে বহু মুরসাল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[২১]

শা'বী, ইবরাহীম ও আবুদ দুহা মসজিদে বসে হাদীছ বিষয়ে আলোচনা করতেন। যখন তাঁদের কাছে কোন বিষয়ে হাদীছ না থাকতো, তাঁরা ইবরাহীমের দিকে তাকাতেন।[২২]

তাঁর এত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জ্ঞানের প্রকাশ ও প্রচার হোক তা পছন্দ করতেন না। এ কারণে কেউ কিছু জিজ্ঞেস না করলে নিজের থেকে কোন জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন না।[২৩] প্রশ্ন করলেও প্রথমত ভড়কে যেতেন। যুবায়দ বলেছেন, আমি যখনই কোন বিষয় সম্পর্কে ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করেছি তখনই তাঁর চেহারায় একটা বিরক্তির ছাপ লক্ষ্য করেছি।[২৪]

এর একটা বড় কারণ এই ছিল যে, জ্ঞানের একটা মস্ত বড় জিম্মাদারী অনুভব করতেন। তিনি বলতেন, এমন এক সময় ছিল, মানুষ যখন কুরআনের তাফসীর করতে ভয় করতো। আর এখন এমন হয়েছে যে, কারো ইচ্ছা হলেই মুফাস্সির হয়ে যাচ্ছে। আমার এটাই বেশি পছন্দ যে, জ্ঞানের ব্যাপারে আমি মুখ থেকে একটি শব্দও উচ্চারণ না করি। যে সময়ে আমি ফকীহ্ হয়েছি, এটি খুব বাজে সময়।[২৫] আমি এমন সব লোককেও দেখেছি, যারা ভরা মজলিস-মাহফিলেও তাঁদের সবচেয়ে বেশী জানা হাদীছগুলোও বর্ণনা করতেন না।

মূলত এই জিম্মাদারী ও সতর্কতার কারণে বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব দানের ব্যাপারে সীমাহীন সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আ'মাশ বলেন, একবার আমি ইবরাহীমকে বললাম, আমি আপনার নিকট কয়েকটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে চাই। বললেন : এ আমার মোটেই পছন্দ নয় যে, কোন বিষয়ে আমি বলি যে, এটা এমন, অথচ সেটা তার বিপরীত।[২৬]

তাঁর জ্ঞানের প্রচারবিমুখ হবার দ্বিতীয় কারণ এ হতে পারে যে, তিনি খ্যাতি ও লোক দেখানো ভাবকে খুবই ঘৃণা করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, যে ব্যক্তি মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে মুখ থেকে একটি শব্দও উচ্চারণ করে সে তাঁরই বদৌলতে সোজা জাহান্নামে গিয়ে পড়বে। এর জন্য তাঁর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ উদ্দেশ্য হবার কোন প্রয়োজন নেই।[২৭]

ইবন খাল্লিকান বলেন, ইবরাহীমের সাথে কোন লোক সাক্ষাৎ করতে চাইলে, সাক্ষাৎ দান পছন্দ করতেন না। দাসী বলে দিতেন : তাঁর সাথে মসজিদে সাক্ষাৎ করুন। অনেক সময় তিনি তাঁর ছাত্র, সঙ্গী-সাথী ও বাড়ির লোকদের বলে দিতেন, আমি কোথায় আছি, কেউ যদি তোমাদের কাছে জানতে চায়, তোমরা তাকে বলে দিবে, আমরা জানিনে। আর এটা কোন

---

[২১] তাকরীব আত্-তাহ্যীব-১/৪৬

[২২] তাহ্যীবুল কামাল-২/২৩৮; আবূ হাতিম : আল-জারহ্ ওয়াত তা'দীল-১/১৪৪

[২৩] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭২

[২৪] তাবাকাত-৬/২৭১

[২৫] শা'রানী ঃ আত্-তাবাকাত আল-কুবরা-১/৩৬

[২৬] ইবন সা'দ ঃ তাবাকাত-৬/১৯০

[২৭] শা'রানী-১/৩৬

মিথ্যা হবে না। কারণ, আমার স্থান থেকে বেরিয়ে যাবার পর আমি কোথায় আছি তাতো তোমাদের জানা থাকেনা।[২৮]

তবে সীমাহীন সতর্কতা সত্ত্বেও তিনি নিজ থেকে তাঁর 'ইলমের প্রচার-প্রসারের দ্বার রুদ্ধ করে দেননি। তিনি মানুষের জিজ্ঞাসার জবাবে মাসআলা বলতেন। আর এ জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দেন যখন ইচ্ছুক প্রত্যেকেই মাসআলা জিজ্ঞেস করতে পারতো। তখন তিনি জবাব দিতেন। হাসান ইবন 'উবায়দুল্লাহ্ বলেন, একবার আমি ইবরাহীমকে বললাম, আপনি আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করবেন না? তিনি বললেন, তোমরা চাও যে আমি অমুকের মত হয়ে যাই। তুমি যা বলছো তাই যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তাহলে গোত্রের মসজিদে চলে এসো। সেখানে যখন কোন ব্যক্তি কিছু জিজ্ঞেস করবে, তোমরাও জবাবটি জেনে যাবে।[২৯]

ইসলামের প্রথম পর্বের অনেক ইমাম মুজতাহিদ জ্ঞানকে গ্রন্থাবদ্ধ করণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা স্মৃতিতে ধারণ ও সংরক্ষণ করতেন। ইবরাহীমেরও তাঁদের মত লেখার চেয়ে স্মৃতির উপর আস্থা ছিল বেশী। তিনি লিখতেন না। ফুদায়ল বলেন, আমি একবার ইবরাহীমকে বললাম যে, আমি অনেক মাসআলা খাতায় লিখেছিলাম। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আল্লাহ্ আমার নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছেন। জবাবে তিনি বললেন, মানুষ যখন কোন কিছু লিখে নেয় তখন ঐ লেখার উপরই তাঁর সবটুকু আস্থা এসে যায়। আর মানুষ যখন জ্ঞানের সন্ধান করে তখন আল্লাহ্ তাকে প্রয়োজন মত দান করেন।[৩০]

এই অগাধ 'ইলমের সাথে সাথে তাঁর মধ্যে 'আমলও ছিল। তিনি তাঁর 'ইল্ম অনুযায়ী 'আমল করতেন। তিনি ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের একজন 'আবিদ ও যাহিদ ব্যক্তি। খোদাভীতির চরম রূপ তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। পার্থিব ভোগ-বিলাসিতার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে উঠেছিলেন। রাতের নির্জনতায় মানুষের চোখের আড়ালে আল্লাহর 'ইবাদাতে মশগুল হয়ে যেতেন। তালহা বলেন, মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে ইবরাহীম ভালো একটি নতুন কাপড় পরে সুগন্ধি গায়ে লাগিয়ে মসজিদে চলে যেতেন। সকাল পর্যন্ত সেখানে থাকতেন। সকালে রাতের সুন্দর পরিচ্ছদ খুলে আবার সাধারণ পোশাক পরতেন।[৩১]

এভাবে সারারাত 'ইবাদাতে নিমগ্ন থাকার কারণে তার দেহ একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে যেত। আ'মাশ বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম অধিকাংশ সময় নামায শেষ করে আমাদের কাছে আসতেন। অপরাহ্ন পর্যন্ত মনে হতো তিনি যেন অসুস্থ। একদিন পর পর তিনি নিয়মিত রোযা রাখতেন।[৩২]

ঈমান ও 'আকীদার ব্যাপারে পূর্বসূরীদের 'আকীদা-বিশ্বাস থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়া তিনি মোটেই বরদাশত করতেন না। মুরজিয়াদের 'আকীদা তেমন কোন মারাত্মক বিষয়

---

২৮. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৫

২৯. তাবাকাত-৬/২৭০

৩০. প্রাগুক্ত-৬/২৭২

৩১. প্রাগুক্ত-৬/২৭৬

৩২. প্রাগুক্ত-৬/২৭৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪

ছিল না। অনেক খ্যাতিমান তাবি'ঈ এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ইবরাহীম ছিলেন এর ঘোর বিরোধী। তিনি বলতেন, এটা একটি বিদ'আত। তোমরা সব সময় এর থেকে দূরে থাকবে। মুরজিয়াদের সাথে উঠাবসা করবে না। যারা মুরজিয়াদের মতবাদে বিন্দুমাত্র বিশ্বাসী হতো তাদেরকে তাঁর নিকট আসতে বারণ করতেন।[৩৩]

উম্মাতের সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের দু'আর দরখাস্ত করার ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। সাহাবী ও তাবি'ঈরাও একে অপরের কাছে দু'আর আবেদন করেছেন এবং তাঁরা দু'আও করেছেন। কিন্তু এ কাজটি কিছু বিদ'আতের পথ খুলে দেয় এবং সাধারণ মানুষের 'আকীদায় দুর্বলতা সৃষ্টি করে। এ কারণে, ইবরাহীম এ কাজকে অপছন্দ করতেন। একবার এক ব্যক্তি এসে বললো, আবু 'ইমরান, আপনি একটু দু'আ করুন যেন আল্লাহ আমাকে রোগ থেকে মুক্তি দেন।

লোকটির এ ধরনের আবেদনকে তিনি মোটেই পছন্দ করলেন না। তিনি লোকটিকে বললেন, একবার এক ব্যক্তি হুযায়ফার (রা) নিকট তার মাগফিরাতের জন্য দু'আর আবেদন করে। হুযায়ফা দু'আর পরিবর্তে বলেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা না করুন। এ কথা শুনেই লোকটি হুযায়ফা থেকে দূরে সরে যায়। কিছুক্ষণ পর হুযায়ফা লোকটিকে ডেকে তার জন্য দু'আ করেন এই বলে, আল্লাহ যেন তোমাকে হুযায়ফার স্থানে প্রবেশ করান। এ দু'আর পর তিনি লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি খুশী হয়েছো? তোমাদের মধ্য থেকে কিছু কিছু মানুষ কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট এই বিশ্বাস নিয়ে যায় যে, সে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সকল স্তর অতিক্রম করে এক উঁচু মর্যাদার ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে। তাকে এ ঘটনা শুনিয়ে তিনি সুন্নাতের কিছু আলোচনা করে তা অনুসরণের আদেশ দেন এবং বিদ'আতের আলোচনা করে তার প্রতি তাঁর অনীহার কথা প্রকাশ করেন।[৩৪]

তবে ছোট ছোট ব্যাপারে তিনি তেমন কঠোর হতেন না এবং কঠোর হওয়া পছন্দও করতেন না। একদিন দুই ব্যক্তি তাঁর নিকট আসে। একজনের মাথার চুল ছেড়ে দেওয়া এবং অন্যজনের বটা। কারকাদ সানূজী ইবরাহীমকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আবু 'ইমরান, ঐ ব্যক্তির চুল খোলা রাখতে এবং ঐ ব্যক্তিকে চুল বটতে বারণ করবেন না?

ইবরাহীম বললেন, একথা আমার বুঝে আসে না যে, তোমাদের মধ্যে বানূ আসাদের কঠোরতা সৃষ্টি হয়ে গেছে, না বানূ তামীমের নিষ্ঠুরতা?[৩৫]

সাহাবায়ে কিরামের পরস্পরের বিভেদ, ঝগড়া ও মত পার্থক্যের সমালোচনা, সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ এবং কোন একপক্ষ অবলম্বন করাকে তিনি ভীষণ অপছন্দ করতেন। এ ব্যাপারে তিনি চুপ থাকা সমীচীন মনে করতেন। তাঁর এক শাগরিদ হযরত 'উসমান (রা) ও 'আলী (রা)-এর বিবাদ সম্পর্কে একবার তাঁকে প্রশ্ন করে। জবাবে তিনি শুধু বলেন, আমি না সাবাঈ, আর না মুরজী। আর একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বলে, আবু বাকর (রা) ও 'উমারের (রা) তুলনায় 'আলী (রা) আমার নিকট বেশী প্রিয়। তিনি তাকে বলেন, একথা 'আলী (রা)

---

৩৩. তাবাকাত-৬/২৭৩-২৭৪

৩৪. প্রাগুক্ত-৬/২৭৬

৩৫. প্রাগুক্ত

শুনলে তোমাকে শাস্তি দিতেন। যদি তোমার এ ধরনের কথা বলতেই হয় তাহলে আমার কাছে বসবেনা। তিনি বলতেন, 'উসমানের (রা) চেয়ে 'আলীর (রা) প্রতি আমার মুহাব্বত বেশী। তবে আকাশ থেকে আমি মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাই তাও ভালো, কিন্তু এ আমি কল্পনাও করবো না যে, 'উসমানের (রা) প্রতি আমার অন্তরে কোন রকম খারাপ ধারণা পোষণ করি।[৩৬]

তিনি তাঁর এত মহত্ব ও উঁচু মর্যাদা সত্ত্বেও খুবই চুপচাপ ও একাকী থাকতেন। অতি সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। লোক-লৌকিকতার কোন পরোয়া করতেন না। তাঁর মধ্যে বিনয় ও নম্রতার অবস্থা এমন ছিল যে, ঠেস দিয়ে বসাও তিনি পছন্দ করতেন না।[৩৭] কখনো কখনো সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য মানুষের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। আ'মাশ বর্ণনা করেন যে, আমি অনেক সময় ইবরাহীমকে অন্যের বোঝা মাথায় উঠানো অবস্থায় দেখেছি। তিনি বলতেন, আমি সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে এমনটি করে থাকি।[৩৮]

তাঁর এহেন বিনয় ও নম্র ভাব প্রকাশ সত্ত্বেও মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি একটা সম্ভ্রম মিশ্রিত ভীতি বিরাজমান থাকতো। মুগীরা বলেন, আমরা শাসক শ্রেণীর আমীর-উমারাদের মত ইবরাহীমকে ভয় করতাম।[৩৯]

দেশের শাসন কর্তৃত্বে যথা ওয়ালী ও আমীর -উমারাদের সাথে ইবরাহীমের সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মাঝে মাঝে উপহার-উপঢৌকন বিনিময় হতো। বেশীরভাগ বিশিষ্ট আমীরগণ তাঁর সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতেন।[৪০] শাসক শ্রেণীর হাদীয়া তোহফা গ্রহণে তিনি কোন রকম দোষ মনে করতেন না। তিনি বরং এটাকে খারাপ মনে করতেন যে, আল্লাহ কাকেও কিছু দান করেন, আর সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তবে তিনি শুধু গ্রহণ করতেন না, তাদেরকে দিতেনও। আল-হাসান ইবন 'আমর বলেন : তিনি হাঁস কিনে ঘিয়ে ভেজে আমীরদের নিকট পাঠাতেন।[৪১]

তবে তিনি অত্যাচারী ও উৎপীড়ক আমীর-উমারার ভীষণ বিরোধী ছিলেন। এ কারণে স্বৈরাচারী হাজ্জাজের সাথে কোনদিন আপোষ করেননি। হাজ্জাজ ছিলেন তাঁর চরম দুশমন। তিনি হাজ্জাজের কঠোর সমালোচনা করতেন। তাঁর উপর অভিশাপ দিতেও দোষের কিছু মনে করতেন না। একবার এক ব্যক্তি হাজ্জাজ এবং তাঁর মত অন্য জালিমের উপর লা'নাত বা অভিশাপ দানের ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করে। জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহ নিজেই তো বলেছেন :[৪২]

أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ -

---

[৩৬] প্রাগুক্ত-৬/২৭৫

[৩৭] তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১/১৭৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৪

[৩৮] তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১/১৯৪; তাবাকাত-৬/২৭৮

[৩৯] তাবাকাত-৬/২৭২, তাকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪

[৪০] তাবাকাত-৬/২৭৭

[৪১] প্রাগুক্ত-৬/২৭৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪

[৪২] তাবাকাত-৬/২৭৯

–'ওহে জেনে রাখ, অত্যাচারী উৎপীড়কদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।' হাজ্জাজের মৃত্যুর পর তিনি এত খুশী হন যে, সিজদায় লুটিয়ে পড়েন এবং চোখ থেকে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।[৪৩]

তিনি হাজ্জাজকে গালি দিতেন এবং বলতেন, হাজ্জাজের নির্দেশে একজন মানুষ অন্ধ হলে তাই তার যুলমের জন্য যথেষ্ট।[৪৪]

হাজ্জাজের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েন। লোকেরা তাঁর এমন অস্থিরতার কারণ জিজ্ঞেস করলো। বললেন, এর চেয়ে মারাত্মক সময় আর কোনটি আছে যখন আল্লাহর দূত জান্নাত অথবা জাহান্নামের পয়গাম নিয়ে উপস্থিত হবে? আমি এই পয়গামের বিপরীতে কিয়ামত পর্যন্ত বর্তমান অবস্থায় বিদ্যমান থাকতে পছন্দ করি।[৪৫] এই অসুস্থতায় হিজরী ৯৫ সনের শেষ অথবা ৯৬ সনের প্রথম দিকে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল উনপঞ্চাশ বা পঞ্চাশ বছর অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী।[৪৬] হাজ্জাজের ভয়ে আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে একথা বলেছেন আহমাদ আল-'ইজলী।[৪৭]

পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি খুব পরিপাটি থাকতেন। মূল্যবান রঙ্গীন পোশাক পরতেন। জাফরানী ও লাল পোশাক পরাকে কোন দোষ মনে করতেন না। শীতের মওসুমে খেঁকশিয়ালের চামড়ার পোশাক পরতেন। খেঁকশিয়ালের চামড়ার টুপি মাথায় দিতেন। পাগড়ী পরতেন। লোহার আংটি ডান হাতের আঙ্গুলে পরতেন।[৪৮] ইমাম শা'রানী বলেছেন, তিনি নিজেকে গোপন করার জন্য রঙ্গীন পোশাক পরতেন। যাতে এটা বুঝা না যায় যে, তিনি কারীদের কেউ, না দুনিয়াদার লোকদের কেউ।[৪৯]

তিনি অনেক জ্ঞানগর্ভ ও উপদেশমূলক কথা বলতেন। যেমন তিনি বলতেন :

১. একজন মানুষ চল্লিশ বছর পর্যন্ত যে স্বভাবের উপর বিদ্যমান থাকে, পরে তা আর পরিবর্তন করতে পারে না।[৫০]

২. ঈমানের পরে একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করা।

   এ কারণে অসুস্থতার কথা বলাও তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, যখন রোগীর নিকট তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তার উচিত প্রথমে ভালো বলা, তারপর প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা। কারণ, কষ্টের কথা বলাও ধৈর্যের পরিপন্থী কাজ।

---

৪৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪
৪৪. তাবাকাত-৬/২৭৮-২৭৯
৪৫. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৫
৪৬. তাক্বরীবুত তাহযীব-১/৪৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪; তাবাকাত-৬/২৮৪
৪৭. তাহযীবুল কামাল-২৩৭, ২৪০
৪৮. তাবাকাত-৬/২৮০-২৮১
৪৯. তাবাকাতে শা'রানী-১/৩৬
৫০. তাবাকাত-৬/২৭৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩

৩. একজন মানুষের জন্য এতটুকু পাপই যথেষ্ট যে, মানুষ দীন অথবা দুনিয়ার কোন ব্যাপারে তার প্রতি আঙ্গুল দিয়ে দেখায়।[৫১]

৪. তিনি বলেছেন, অতিরিক্ত কথা ও অতিরিক্ত সম্পদে মানুষ ধ্বংস হয়।[৫২]

৫. তিনি আরো বলেছেন, ওজর ও কৈফিয়াত দান থেকে দূরে থাক। কারণ, তা মিথ্যাকে মিশিয়ে দেয়।[৫৩]

৬. একবার তিনি মানসূর ইবন মু'তামিরকে (মৃ. হি. ১৩২) বলেন ঃ বোকার মত প্রশ্ন করবে এবং বুদ্ধিমানের মত মনে রাখবে।[৫৪]

তিনি খুব নির্বিরোধ মানুষ ছিলেন। তিনি বলেছেন : আমি কখনো কারো সাথে ঝগড়া করিনি।[৫৫]

ইবরাহীম তাঁর ঘরে খুরমা রাখা পছন্দ করতেন। কোন ব্যক্তি তাঁর ঘরে এলে, কোন কিছু না থাকলে, বাড়ির লোকদের বলতেন, আমাদেরকে খুরমা দাও। কোন ভিক্ষুক এলে কিছু না থাকলে তাকে খুরমা দিবে।[৫৬]

ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ কুরআন বুঝে পড়ার প্রতি গুরুত্ব দিতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো যে, সে প্রতি তিন দিনে কুরআন শেষ করে। তিনি তাকে বললেন : তুমি যদি ত্রিশ দিনে শেষ করতে এবং জানতে যে তুমি কি জিনিস পড়ছো তা হলেই ভালো হতো। তিনি তাঁর ছাত্র-শিষ্য ও সঙ্গী-সাথী এবং অনুরাগীদেরকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন : তোমরা যখন কারো বাড়িতে যাবে তখন বাড়িওয়ালা যেখানে বসায় সেখানে বসবে। আবূ বাকর ইবন আবী শায়বা বলেন : আল-হাসান, ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ ও মায়মুন ইবন মাহরান—এ তিনজন কোন ব্যক্তি কাউকে সালাম দেয়ার আগে 'আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন' বলা ভীষণ অপছন্দ করতেন।[৫৭]

তিনি অস্বাভাবিক কোন ঘটনা বা বস্তুতে তেমন বিশ্বাস করতেন না। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন যে রাতের অন্ধকারে আলো দেখে? তিনি বলেন : সে আলো শয়তানের পক্ষ থেকে। এমন আলো যদি ভালো কোন কিছু হতো তাহলে তা বদরবাসীদেরকে দেখানো হতো। বাকিয়্যা বলেন : ইবরাহীম আমাকে বলেন : তুমি লেজ হও, মাথা হয়োনা। কারণ, মাথা ধ্বংস হয়, লেজ বেঁচে যায়।[৫৮]

---

[৫১] তাবাকাতে শা'রানী-১/৩৬

[৫২] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-'১/২৫০, ২৯৯ প্রাগুক্ত-১/১৯২; 'উয়ূন আল-আখবার-৩/১০১

[৫৩] প্রাগুক্ত-১/১৯২; 'উয়ূন আল-আখবার-৩/১০১

[৫৪] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৫০, ২৯৯

[৫৫] তাবাকাত-৬/২৭৩

[৫৬] প্রাগুক্ত-৬/১৯০; ২৭৫

[৫৭] ইবন 'আবদি রাব্বিহি : আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/২২৯, ২৩৪, ২৩৯

[৫৮] প্রাগুক্ত-৩/১৯৮, ২০১

সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ)

হযরত সা'ঈদের ডাক নাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতা মুসায়্যিব ইবন হায্‌ন কুরায়শ গোত্রের মাখযূমী শাখার সন্তান এবং মা উম্মু সা'ঈদ নামে যিনি পরিচিত, আসলাম গোত্রের হাকীম ইবন উমায়্যার কন্যা।[১]

হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব ছিলেন সেই সব অতি সম্মানিত ও পবিত্র-আত্মা মহান তাবি'ঈর একজন যাঁরা তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর পথিকৃৎ ও ইমামের মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁর সম্মানিত পিতা মুসায়্যিব (রা) ও পিতামহ হায্‌ন (রা) উভয়ে ছিলেন সাহাবী। দু'জনই মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নিয়ম ছিল, জাহিলী যুগে রাখা যে সব নামের মধ্যে কোন মন্দ অর্থ পেতেন, তা পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখা। অকল্যাণ ও অশুভ অর্থবহ কোন নাম তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। এ কারণে হায্‌ন (রা) ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নামটি পরিবর্তন করে সাহ্‌ল রাখতে চান। উল্লেখ্য যে, হায্‌ন শব্দটির অর্থ কষ্ট, শোক, দুঃখ, বিষণ্ণতা ইত্যাদি। কিন্তু হযরত হায্‌ন (রা) তখন একজন নও মুসলিম। আজন্ম লালিত বিশ্বাস ও সংস্কার সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। তাই তিনি বিনয়ের সাথে 'আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ নামটি আমার পিতা-মাতার দেওয়া। তাছাড়া এ নামেই আমি সবার কাছে পরিচিত। অনুগ্রহ করে এটি পাল্টাবেন না। রাসূল (সা) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন এবং পূর্বের নামটি বহাল রাখেন। কিন্তু এ নামের অশুভ পরিণতি এ পরিবারটিকে ভোগ করে যেতে হয়।

পরবর্তীকালে সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব বলতেন, দুঃখ-কষ্ট চিরকাল আমাদের পরিবারের নিত্য সঙ্গী হয়ে থেকেছে।[২]

হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) খিলাফতের দ্বিতীয়, মতান্তরে চতুর্থ বছরে হযরত সা'ঈদ (রহ) জন্মগ্রহণ করেন। একটি বর্ণনা এমনও আছে যে, হযরত 'উমারের (রা) শাহাদাতের দু'বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। তবে প্রথম বর্ণনাটি অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়।[৩]

হযরত সা'ঈদ (রহ) খিলাফতে রাশিদার শেষ পর্যায়ে একেবারেই অল্প বয়স্ক ছিলেন। তাই তাঁর জীবনে এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নেই। হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালেও তাঁকে কোন দৃশ্যপটে দেখা যায় না। তবে একথা জানা যায় যে, তিনি তখন জ্ঞান অর্জনের পালা শেষ করে তাদরীস ও ইফতা (শিক্ষা ও ফাতওয়া দান)-এর মসনদে আসীন হয়েছেন।[৪]

---

[১] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৬২

[২] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/৩০১; তাবাকাত-৫/৮৮

[৩] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৭৮; সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৪; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫৪

[৪] তাবাকাত-৫/৯০

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়রের (রা) সময়কাল থেকে তাঁর পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। আর এ ইতিবৃত্তের সূচনা হয়েছে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সত্য উচ্চারণের মাধ্যমে। সত্য বলার ব্যাপারে তিনি কারো পরোয়া করতেন না। এমন কি খলীফা ও স্বৈরাচারী আমীর উমারার বিরুদ্ধেও তিনি চুপ থাকেননি। আর তাই দেখা যায় তাঁর কর্ম-জীবনের সূচনাতেই খলীফাদের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা) খিলাফতের দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। জাবির ইবন আসওয়াদ তাঁর পক্ষে মদীনাবাসীদের বায়'আত নেওয়ার জন্য আসলেন। তখন সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করে বললেন, যতক্ষণ না কোন এক ব্যক্তির ব্যাপারে মুসলমানদের ঐকমত্য হয় ততক্ষণ কারো হাতে বায়'আত করা উচিত নয়।[৫]

সে সময় সা'ঈদকে মদীনার বিশিষ্ট বুযর্গ ব্যক্তি গণ্য করা হতো। তাঁর বিরোধিতার অর্থ ছিল মদীনার একটি হাতও বায়'আতের জন্য বাড়ানো হবে না। এ কারণে জাবির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তাকে বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু শত নিপীড়ন ও নির্যাতন সত্ত্বেও সত্য বলা থেকে তাঁর মুখ বন্ধ করা যায়নি। বেত্রাঘাতের সময়ও তিনি মুখে সত্যের ঘোষণা দিতে থাকেন। জাবিরের ছিল চার স্ত্রী। একজনকে তিনি তালাক দেন। তাঁর 'ইদ্দাত শেষ হওয়ার আগেই তিনি পঞ্চম বিয়েটি করে ফেলেন। এমন কাজ স্পষ্টতঃই হারাম ছিল। যখন সা'ঈদের পিঠে বেত্রাঘাত চলছিল তখন তিনি বলছিলেন, আল্লাহ্র কিতাবের হুকুম শোনানো থেকে কেউ আমাকে বিরত রাখতে পারবে না; আল্লাহ বলেছেন :[৬]

فَانْكِحُوْا ماطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.

- আর যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সে সব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত।

আর আপনি চতুর্থ স্ত্রীর 'ইদ্দাতকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন।

খুব শিগগিরই আপনার জন্য একটি খারাপ সময় আসবে। এ ঘটনার অল্প কিছুদিন পর হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা) নিহত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের সাথে জাবিরের এই অসদাচরণের কথা জানতে পেরেছিলেন। তিনি সা'ঈদের সম্মান ও মর্যাদার কথা জানতেন। এ কারণে তিনি জাবিরকে একটি চিঠি লিখে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেন এবং তাঁর সাথে যে কোন রকমের রূঢ় আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলেন।[৭]

---

৫. প্রাগুক্ত

৬. সূরা আন-নিসা-৩

৭. তাবাকাত-৫/৯০

'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) পরে 'আবদুল মালিক খলীফা হন। তাঁর সাথেও সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের বিরোধ বজায় থাকে। উমাইয়া রাজতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খলীফা মারওয়ান ইবন হাকাম তাঁর মৃত্যুর পূর্বে যথাক্রমে 'আবদুল মালিক ও তাঁর ভাই 'আবদুল আযীযকে খলীফা মনোনীত করে যান। মারওয়ানের মৃত্যুর পর 'আবদুল মালিকের মনে অসৎ উদ্দেশ্যের উদয় হয়। তিনি তাঁর দুই ছেলে ওয়ালীদ ও সুলায়মানকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যেতে চান। কিন্তু কাবীসা ইবন যুওয়াইব তাঁকে বোঝান যে, এ কাজ করলে আপনার সুনাম নষ্ট হবে। তাই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। কিন্তু 'আবদুল মালিকের সৌভাগ্য যে, কিছু দিন পর 'আবদুল 'আযীয স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

'আবদুল 'আযীযের মৃত্যুর পর 'আবদুল মালিকের ইচ্ছা পূরণের বাধা দূর হয়ে যায়। তিনি নিজের মৃত্যুর পর যথাক্রমে ওয়ালীদ ও সুলায়মানকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে তাঁদের পক্ষে বায়'আত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশের শাসকদের নির্দেশ দেন। মদীনার তৎকালীন ওয়ালী হিশাম ইবন ইসমা'ঈল মদীনাবাসীদের বায়'আত গ্রহণের ধারাবাহিকতায় সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবকে ডেকে পাঠান। তিনি হিশামকে বলেন, আমি একটু চিন্তা-ভাবনা না করে বায়'আত করতে পারছিনে। মতান্তরে, তিনি একথা বলেন যে, বর্তমান খলীফা 'আবদুল মালিকের জীবদ্দশায় অন্য কারোর বায়'আত করতে পারিনে।

হযরত সা'ঈদের এমন স্পষ্ট জবাবে হিশাম ক্ষেপে যান এবং তাঁকে বেত্রাঘাত করেন। তারপর রা'স আছ-ছানিয়্যা- যেখানে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো, অত্যন্ত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পাঠিয়ে দেন। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব বুঝেছিলেন, নিশ্চিত তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। তিনি ফাঁসিতে ঝুলার জন্য প্রস্তুত হয়েও গিয়েছিলেন। ফাঁসিতে ঝুলানোর পরে পরনের কাপড় খুলে গিয়ে সতর উন্মুক্ত হয়ে যেতে পারে ভেবে নীচে জাঙ্গিয়াও পরে নিয়েছিলেন। সম্ভবত রা'স আছ-ছানিয়্যা নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে ভয় দেখানো। এ জন্য সেখানে নিয়ে আবার ফিরিয়ে আনা হয়। যখন ফিরিয়ে আনা হয় তখন সা'ঈদ প্রশ্ন করেন : আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? তারা জবাব দেয় : জেলখানায়। তাঁকে জেলে বন্দী করে রাখা হয়। হিশাম তাঁর এসব কর্মকাণ্ডের বিবরণ খলীফার দরবারে পাঠিয়ে দেন।[৮]

জেলে বন্দী অবস্থায় তাঁকে বুঝিয়ে নরম করার চেষ্টা করা হয়। আবূ বাকর 'আবদুর রহমান তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, সা'ঈদ আপনি একেবারেই বোধ-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন। জবাবে তিনি বলেন, আবূ বাকর, আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাঁকে দুনিয়ার সকল শক্তির উপর মহাশক্তি বলে বিশ্বাস করুন। আবূ বাকর হাল ছেড়ে দেননি। তিনি বার বার জেলখানায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে একই কথা বলে তাঁকে নরম করার চেষ্টা

---

৮. প্রাগুক্ত-৫/৯২-৯৩; আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৪/৪২১

করতে থাকেন। সা'ঈদ তাঁকে শেষ জবাব দেন এই বলে : আল্লাহর কসম! আপনার অন্তর ও চোখ,উভয়ের আলো যেতে বসেছে। এমন শক্ত জবাব শুনে আবূ বাকর ফিরে যান। হিশাম আবূ বাকরের নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চান, সা'ঈদ কি মার খাওয়ার পর একটু নরম হয়েছে? আবূ বাকর জবাব দেন, আল্লাহর কসম! তাঁর সাথে আপনার এরূপ আচরণে তিনি আরো শক্ত হয়ে গেছেন। এখন তাঁকে বশে আনার আশা আপনার ত্যাগ করা উচিত।[৯]

কাবীসা ইবন যুওয়াইব ছিলেন 'আবদুল মালিকের ব্যক্তিগত সচিব। সকল শাহী ডাক প্রথমে তাঁর কাছে আসতো। প্রথমে তিনি সেগুলি পড়তেন, তারপর খলীফা 'আবদুল মালিকের সামনে পেশ করতেন। হিশাম সা'ঈদের সাথে তাঁর আচরণের বিবরণ দিয়ে যে চিঠিটি খলীফার নিকট পাঠান স্বাভাবিকভাবে সেটিও কাবীসার হাতে পড়ে। তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান পরিণামদর্শী মানুষ। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি। এ কারণে হিশামের ফিরিস্তি পাঠ করে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। সাথে সাথে তিনি চিঠিটি নিয়ে 'আবদুল মালিকের নিকট যান এবং তাঁকে বলেন, হিশাম স্বেচ্ছাচারীর মত যা ইচ্ছা তাই করে। ইবন মুসায়্যিবকে এভাবে পেটায় এবং ঢোল-শোহরাত করে তা প্রচার করে। আল্লাহর কসম! এই বাড়াবাড়ি ও কঠোরতার কারণে তিনি আরো শক্ত হয়ে যাবেন। যদি তিনি বায়'আত নাও করেন তাহলেও তাঁর দিক থেকে বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। তিনি এমন লোকদের কেউ নন যাঁদের মধ্যে কপটতা আছে অথবা ইসলাম ও মুসলমানদের কোন রকম ক্ষতির কারণ হতে পারে। তিনি আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আ'র অন্তর্গত একজন মানুষ। আপনি নিজেই সা'ঈদের নিকট হিশামের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে একটি চিঠি লিখুন। 'আবদুল মালিক বললেন, তুমিই আমার পক্ষ থেকে একটি চিঠি লিখে পাঠাও। তাতে একথা স্পষ্ট করে বলে দেবে যে, হিশাম আমার ইচ্ছার বিপরীত কাজ করেছে। এটা তার নিজেরই সিদ্ধান্ত ছিল। কাবীসা তখনই সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবকে একটি চিঠি লেখেন। তিনি সেটি পাঠ করে মন্তব্য করেন, আমার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। তার ও আমার মাঝখানে আল্লাহ আছেন।

সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবকে চিঠি পাঠানোর পর খলীফা 'আবদুল মালিক হিশামের কর্মকাণ্ডে বিরক্তি প্রকাশ ও তাকে তিরস্কার করে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবকে বেত্রাঘাতের পরিবর্তে তাঁর সাথে সদাচরণ করা উচিত ছিল। আমার ভালো করেই জানা আছে, তাঁর দিক থেকে কোন রকম বিরোধিতা ও বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা নেই। এ চিঠি পেয়ে হিশাম ভীষণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এবং সা'ঈদকে মুক্তি দেন।[১০]

হিশাম তাঁকে বেত্রাঘাত করে যখন জনগণের সম্মুখে এনে দাঁড় করান তখন এক মহিলা সা'ঈদেকে বলে : শায়খ, আপনাকে হেয় ও লাঞ্ছনার স্থলে এনে দাঁড় করিয়েছে। তিনি

---

৯. তাবাকাত-৫/৯৪

১০. প্রাগুক্ত-৫/৯৩-৯৪; হিলয়াতুল আওলিয়া-২/১৭১-১৭২

জবাব দেন, না, আমি বরং লাঞ্ছনা থেকে পালিয়েছি।[১১]

একবার মুসলিম ইবন 'উকবা সা'ঈদকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। তখন 'আমর ইবন 'উছমান ও মারওয়ান সাক্ষ্য দেন যে, তিনি একজন পাগল। অতঃপর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।[১২]

একথা ঠিক যে খলীফা ওয়ালীদের সাথে হযরত সা'ঈদের বড় রকমের কোন বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। তবে তাঁর সামনে কোন দিন মাথাও নত করেননি।

এটা অবাক হবার মত ব্যাপার যে, হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের মত স্বৈরাচারী ও জালিম শাসক, যাঁর নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে সে যুগের উমায়্যা শাসনের বিরোধী খুব কম লোকই রেহাই পেয়েছে, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের সাথে কোন রকম অসদাচরণ করেননি। আর এতে সে যুগের মানুষ দারুণ বিস্ময় প্রকাশ করতো। অনেকে কৌতূহলবশতঃ সা'ঈদকে জিজ্ঞেসও করতেন, এটা কি করে সম্ভব যে, হাজ্জাজ আপনার নিকট কাউকে পাঠাচ্ছে না, আপনার স্থান থেকে আপনাকে অপসারণ করছে না এবং আপনাকে কোন রকম কষ্টও দিচ্ছে না? তিনি জবাব দিতেন, আল্লাহর কসম! আমি নিজেও এর কারণ জানিনে। অবশ্য একটি ঘটনা একবার তাঁর সাথে আমার ঘটেছিল। সে তার পিতার সাথে মসজিদে নামায পড়ছিল। ঠিকমত রুকূ-সিজদা হচ্ছিল না। আমি তাকে সতর্ক করার জন্য একমুঠ কঙ্কর তার প্রতি ছুড়ে মারি। মানুষের ধারণা, এরপর থেকে তার নামায ঠিক হয়ে যায়।[১৩]

খলীফা ওয়ালীদের সময়কালে হিজরী ৯৪ সনে হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) অন্তিম রোগে আক্রান্ত হন। জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্তে পুত্র মুহাম্মাদকে দাফন-কাফনের ব্যাপারে ওয়াসীয়াত করেন। তিনি বলেন, লাশের খাটিয়া লাল চাদর দিয়ে ঢাকবে না, গোরস্তানে নেওয়ার সময় আগুন জ্বালাবে না, এমন সব লোক শবানুগামী হবে না যারা আমার এমন সব গুণের কথা বলে বিলাপ করবে যা প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে নেই। শববাহী খাটিয়া উঠানোর কোন ঘোষণা দেবে না। তা উঠানোর জন্য মাত্র চার ব্যক্তিই যথেষ্ট। কবরের পাশে তাঁবু স্থাপন করবে না।

একেবারে অন্তিম মুহূর্তে নাফি' ইবন জুবায়র পাশে ছিলেন। তিনি মুহাম্মাদকে বললেন বিছানা কিবলামুখী করে দিতে। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব তখনও সচেতন ছিলেন। তিনি বলেন, এমনটি করার প্রয়োজন নেই। আমি এই কিবলার উপর জন্মেছি, এর উপরই মরবো এবং ইন্‌শাআল্লাহ কিয়ামতের দিন এই কিবলার উপরই উঠবো।

কিছুক্ষণ পর অচেতন অবস্থা দেখা দেয়। তখন নাফি' শয্যাটি কিবলামুখী করে দেন। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব আবার চেতনা ফিরে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার শয্যাটি কিবলামুখী করে দিয়েছে কে? কারো জবাব দানে হিম্মত হলো না। কিন্তু তিনি জ্ঞান থাকা অবস্থায় নাফি'কে বলতে শুনেছিলেন। তাই তিনি স্বগতোক্তির মত জবাব

---

১১. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৩/১৬৯

১২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৭৭; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫৬

১৩. তাবাকাত-৫/৯৫

দিলেন, নাফি' করে থাকবে। তারপর বললেন : আমি যদি মুসলমান হই তাহলে যে দিকেই মুখ করে মরি না কেন, কিবলামুখীই থাকবো। আর যদি ইসলামী মিল্লাতের উপর না থাকি, আর অন্তর কিবলামুখী না থাকে, তাহলে মুখ কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেওয়াতে কোন লাভ নেই। আমি মুসলমান। যে দিকেই আমার মুখ থাকুক না কেন, তা কিবলামুখীই হবে।

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ[১৪]

– যেদিকেই তোমরা তোমাদের মুখ ফেরাও না কেন সেদিকেই আল্লাহর মুখমণ্ডল।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অল্প কিছু দীনার তাঁর কাছে ছিল। তার জন্য আল্লাহর দরবারে কৈফিয়াত দেন এই বলে : হে আল্লাহ! তুমি ভালো করেই জান, এগুলি আমি আমার লজ্জাস্থান ঢাকা এবং দীনের হিফাজতের উদ্দেশ্যে রেখে দিয়েছিলাম।

এই রোগেই হিজরী ৯৪ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[১৫] মোট পঁচাত্তর (৭৫) বছর জীবন লাভ করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ বছর বড় বড় অনেক ফকীহ্‌র ইনতিকাল হয়। এ কারণে এ বছরকে 'সানাতুল ফুকাহা' (ফকীহ্‌দের বছর) বলা হয়।[১৬] মাকহূল বলেন, সা'ঈদের মৃত্যুর খবর যখন তাঁর নিকট পৌঁছে তখন মানুষ তা শুনে দাঁড়িয়ে যায়।[১৭]

হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন নুবুওয়াত ও রিসালাতের পবিত্র অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে। তবে সেই সমাপ্তির পর খুব বেশী দিন অতিক্রান্ত হয়নি। মদীনার অলি-গলিতে দু'চারজন ছাড়া অধিকাংশ উঁচু স্তরের সাহাবী তখনো তা'লীম ও তারবিয়্যাতের সুমহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। হযরত সা'ঈদের ছিল জ্ঞান অর্জনের প্রতি স্বভাবগত তীব্র স্পৃহা। এ কারণে, ঐ সকল মহান ব্যক্তির সাহচর্য, ফয়েজ ও বরকত তাঁকে 'ইলম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের মোহনায় পরিণত করে। এ ব্যাপারে সকল সীরাত লেখক ও রিজাল শাস্ত্রবিদ একমত যে, তিনি তাঁর সময়ে 'ইলম ও 'আমল এবং সামগ্রিকভাবে জ্ঞান, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী, পূর্ণতা ও উৎকর্ষে একক ও অতুলনীয় ছিলেন। ইমাম নাবাবী লিখেছেন, অগ্রগামিতা, নেতৃত্ব, মহত্ত্ব, জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যান্য কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে তিনি যে তাঁর সমকালীনদের ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে সকল 'আলিম একমত।

ইবন হিব্বান লিখেছেন, তিনি তাঁর যুগে মদীনার সকল অধিবাসীর নেতা ছিলেন।[১৮]

---

১৪. সূরা আল-বাকারা-১১৫

১৫. তাঁর মৃত্যু-সন সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। আল-হায়ছাম ইবন 'আদী, সা'ঈদ ইবন 'উফায়র, ইবন নুমায়র প্রমুখ ব্যক্তিরা হি. ৯৪ সনের কথা বলেছেন। কাতাদা হি. ৮৯, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান ৯১, দামরা ৯২ এবং আলী আল-মাদানী ও ইবন মা'ঈন ১০৫ সনের কথা বলেছেন। হাকেম বলেছেন, হাদীছের অধিকাংশ ইমাম শেষোক্ত মতের উপর। ইমাম আয-যাহাবী বলেছেন, হি. ৯৪ সনের মতটি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। (ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৭৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৬)

১৬. তাবাকাত-৫/১০৫-১০৬

১৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৫

১৮. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২২০

ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে ইমাম, শাইখুল ইসলাম ও শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯] ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন, তাঁর সত্তার মধ্যে হাদীছ, ফিকাহ্, যুহ্দ, তাকওয়া, 'ইবাদাত তথা সার্বিক জ্ঞান ও কর্মগত পূর্ণতার সমাবেশ ঘটেছিল।[২০]

'ইবনুল 'ইমাদের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, কুরআনের তাফসীরে হযরত সা'ঈদের পূর্ণ পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা ছিল। কিন্তু কুরআনের ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের কারণে মুফাস্সির হিসেবে তিনি তেমন খ্যাতি লাভ করেননি। কুরআনের তাফসীরের ব্যাপারে তিনি এত সতর্ক ও কঠোর ছিলেন যে, কোন আয়াতের তাফসীরের ব্যাপারে কখনো মুখ খোলেননি। কোন আয়াতের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে বলতেন : আমি কুরআনের ব্যাপারে কোন কথা বলবো না।[২১] এমন সীমাহীন সতর্কতা অবলম্বনের কারণে কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা কতখানি ছিল তা প্রকাশ পায়নি।

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছের ব্যাপারে তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ ও রুচি। মাত্র একটি হাদীছের জন্য বহু রাত ও বহু দিনের পথ সফর করতেন।[২২] তাঁর মধ্যে হাদীছ শোনা ও সংগ্রহ করার যেমন একটা প্রবল উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল, তেমনিভাবে তাঁর জন্মস্থান মদীনা ছিল ইল্মে হাদীছের মূল স্তম্ভ সাহাবায়ে কিরামের পদভারে সর্বদা সরগরম। হযরত 'উছমান, 'আলী, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার, ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, যায়দ ইবন ছাবিত, হাস্সান ইবন ছাবিত, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, আবূ হুরাইরা, আবূ দারদা' আনসারী, আবূ যার আল গিফারী, আবূ কাতাদা আনসারী, হাকীম ইবন হিযাম, জুবায়র ইবন মুত'ইম, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র, সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, মিসওয়ার ইবন মাখরামা, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, আবূ সা'ঈদ খুদরী, মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান, মা'মার ইবন 'আবদিল্লাহ, 'আবদুল্লাহ্ ইবন যায়দ হারিছী, 'আত্তাব ইবন উসায়দ, 'উছমান ইবন আবিল 'আস (রা)সহ আরো অনেক বিশিষ্ট সাহাবীকে তিনি জীবদ্দশায় পান এবং তাঁদের থেকে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান লাভের সুযোগ হাতছাড়া করেননি। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রা), যিনি সর্বাধিক সংখ্যক রাসূলুলুল্লাহর (সা) হাদীছ স্মৃতিতে ধারণ করেন– তিনি ছিলেন সা'ঈদের শ্বশুর। আর এই সম্পর্কের কারণে তিনি বিশেষভাবে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে সবচেয়ে বেশী ফয়েজ ও বরকত লাভে ধন্য হন। আর তাই, তাঁর হাদীছের বেশীর ভাগ হযরত আবূ হুরাইরার (রা) সূত্রে বর্ণিত দেখা যায়।[২৩] হযরত সা'ঈদের (রহ) মেধা এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, কোন কথা একবার শ্রুতিগোচর হলে

---

[১৯] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৬

[২০] শাযারাতুয যাহাব-১/১০৩

[২১] তাবাকাত-৫/১০১

[২২] প্রাগুক্ত-৫/৮৯; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৫

[২৩] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৭৫; তাহযীবুত তাহযীব-৪/৮৪; তাহযীবুল আসমা'-১/২২; সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৫

আর কখনো তা ভুলতেন না। চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যেত।[২৪] তাঁর এমন তীক্ষ্ণ মেধা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের পরিধিকে অনেক বাড়িয়ে দেয়।

সে যুগের সকল 'আলিম স্মৃতিতে হাদীছ ধারণ করার তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার কথা এক বাক্যে স্বীকার করতেন। মাকহূল ছিলেন সে যুগের একজন ইমাম ও মুহাদ্দিছ। তিনি বলতেন, আমি জ্ঞানের অন্বেষণে গোটা পৃথিবী ভ্রমণ করেছি। কিন্তু সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের মত 'আলিম কোথাও পাইনি।[২৫] ইমাম যাইনুল 'আবিদীন বলতেন, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব ছিলেন অতীত কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে বেশী জানা মানুষ।[২৬] 'আলী ইবন আল-মাদীনী বলতেন, আমি তাবি'ঈদের মধ্যে সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের মত এত বিশাল জ্ঞানের অধিকারী আর কাউকে জানিনে।[২৭]

হাদীছ শাস্ত্র বিশারদদের নিকট হযরত সা'ঈদের বর্ণিত হাদীছের স্থান এত উঁচুতে ছিল যে, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) ও অন্যরা তাঁর মুরসাল হাদীছকেও সহীহ্-এর মর্যাদা দান করতেন।[২৮] ইমাম শাফি'ঈ বলতেন, সা'ঈদের 'মুরসাল' হাদীছসমূহ আমাদের নিকট 'হাসান' হাদীছের সমতুল্য।[২৯] যদিও হযরত 'উমারের (রা) নিকট সা'ঈদের (রহ) হাদীছ শুনার কোন প্রমাণ নেই, তা সত্ত্বেও ইমাম আহমাদ তাঁর সূত্রে সা'ঈদের সরাসরি বর্ণিত হাদীছ দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন।[৩০] ইয়াহইয়া ইবন মু'ঈন হযরত সা'ঈদের (রহ) 'মুরসাল' হাদীছসমূহকে হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) 'মুরসাল'সমূহের উপরও প্রাধান্য দিতেন। 'আলী ইবন আল-মাদীনী বলতেন : কোন মাসআলায় সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের শুধু এতটুকু বলে দেওয়া যে, এ ব্যাপারে হাদীছ বিদ্যমান আছে– যথেষ্ট মনে করা হয়।[৩১]

হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের (রহ) পঠন-পাঠনের বিশেষ বিষয় ছিল ফিকাহ্ শাস্ত্র। তিনি তাঁর সময়ের মদীনার সেই সাতজন ফকীহ্র মধ্যে গণ্য হতেন যাঁরা ছিলেন এই শাস্ত্রের ইমাম।[৩২] শুধু তাঁদের মধ্যে নয় বরং গোটা তাবি'ঈ জামা'আতের মধ্যে তাঁর স্থান ও মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চে। ইবন হিব্বানের বর্ণনা এ রকম যে, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব তাঁর সময়ে মদীনাবাসীদের নেতা ছিলেন এবং ফাতওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ছিল তাঁদের সবার উপরে। তাঁকে 'ফকীহ্ আল-ফুকাহা' (ফকীহ্দের ফকীহ্) বলা হতো। কাতাদা (রহ) বলতেন, আমি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের চেয়ে বেশী হালাল ও হারাম জানা ব্যক্তি কাউকে দেখিনি। সুলায়মান ইবন মূসার বর্ণনা এ রকম যে, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব ছিলেন

---

২৪. তাবাকাত-৫/৯০
২৫. তাহ্যীবুল আসমা'-১/২২০; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৪
২৬. তাবাকাত-৫/৫০
২৭. তাহযীবুল আসমা'-১/২২০
২৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৪
২৯. তাহযীবুত তাহযীব-৪/৮৬
৩০. প্রাগুক্ত-৪/৮৫
৩১. তাহযীবুল আসমা'-১/২২০
৩২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৭৫; আ'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন-১/২৫

'আফকাহুত তাবি'ঈন' (তাবি'ঈদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ্)।[৩৩] মদীনার বাইরে থেকে ফিকাহ্ শাস্ত্রের যে সব ছাত্র মদীনায় আসতো তাদেরকে সোজা তাঁর বাড়ীটি দেখিয়ে দেওয়া হতো। মায়মূন ইবন মাহরান বর্ণনা করেছেন, আমি যখন মদীনায় গেলাম এবং সেখানকার সবচেয়ে বড় ফকীহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম তখন লোকেরা আমাকে সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিল।[৩৪] 'আবদুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলাম বর্ণনা করেছেন, চার 'আবদুল্লাহ- 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, 'আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা)-এর পরে ইসলামী বিশ্বে ফিকাহ্র পদটি মাওয়ালীদের দখলে চলে যায়। মক্কার ফকীহ ছিলেন 'আতা', ইয়ামানের তাউস, ইয়ামামার ইয়াহইয়া ইবন আবী কাছীর, বসরার হাসান আল-বসরী, কূফার ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ, শামের মাকহূল এবং খুরাসানের 'আতা' খুরাসানী। কেবল মদীনার পদটি একজন কুরায়শী অর্থাৎ সা'ঈদের অধিকারে ছিল।[৩৫]

হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব যদিও হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও হযরত আবূ বাকরের (রা) যুগটি পাননি এবং হযরত 'উমার ফারূকের খিলাফতকালে ছিলেন অল্প বয়স্ক, তা সত্ত্বেও নিজের চেষ্টা-সাধনার দ্বারা তাঁদের সকলের বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত সমূহের সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। তিনি নিজেই বলতেন, এখন রাসূল (সা), আবূ বাকর ও 'উমারের (রা) ফায়সালা ও সিদ্ধান্তসমূহ আমার চেয়ে বেশী জানা কোন লোক নেই। বিশেষভাবে 'উমারের (রা) বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে বেশী অভিজ্ঞ ছিলেন। এ কারণে তাঁকে 'রাবিয়াতু 'উমার' বলা হতো।[৩৬] হযরত 'উমারের (রা) বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল যে, হযরত 'উমারের (রা) পুত্র 'আবদুল্লাহ- যিনি তাঁর জ্ঞান-গরিমার জন্য 'হাবরুল উম্মাহ' নামে খ্যাত ছিলেন, নিজের পিতার কোন কোন বিষয় ও অবস্থা তাঁর নিকট থেকে জেনে নিতেন।[৩৭] ফিকাহ্ শাস্ত্রে হযরত 'উমারের (রা) স্থান ও মর্যাদা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর সময়ে অসংখ্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হয় এবং তিনি তার সমাধান দান করেন। এসব সমাধান ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব সবচেয়ে বেশী জানতেন। তেমনি হযরত 'উছমানের (রা) ফায়সালা ও সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। ইমাম যুহ্রী বলতেন :[৩৮]

كان أعلم بقضاء عمر وعثمان

---

৩৩. তাহ্যীবুল আসমা'-১/২২০
৩৪. তাবাকাত-৫/৯০
৩৫. শাযারাতুয যাহাব-১/১০৩
৩৬. প্রাগুক্ত-১/৮৯
৩৭. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৪/৮৪
৩৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৫

– তিনি ‘উমার ও ‘উছমানের ফায়সালা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।

তাঁর এ সব বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপকতা শুধু তাবি‘ঈ কেন, সাহাবীদের মধ্যেও খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। এ কারণে সাহাবীদের যুগেই তিনি ইফতার মসনদ অলঙ্কৃত করেন। অনেক বড় বড় ও উঁচু স্তরের সাহাবী তাঁর এ যোগ্যতার কথা স্বীকার করতেন। হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার বলতেন, আল্লাহর কসম! তিনি মুফতীদের মধ্যে একজন।[৩৯] মাঝে মাঝে তিনি তাঁর নিকট আগত ফাতওয়া জিজ্ঞেসকারীদেরকে সা‘ঈদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁর নিকট কোন একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাকে বললেন, তুমি সা‘ঈদ ইবন মুসায়্যিবের কাছে যাও। তারপর তিনি যে জবাব দেন, আমাকে একটু জানিয়ে যাবে। লোকটি তার নির্দেশ পালন করেন। ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার (রা) সা‘ঈদের জবাব শুনে মন্তব্য করেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি না যে, তিনি ‘আলিমদেরই একজন।[৪০] ইমাম আয-যুহ্‌রী বলেন, বংশ বিদ্যার জ্ঞান অর্জনের জন্য ইবন সু‘বারের মজলিসে বসতাম। একদিন আমি তাঁর কাছে ফিকাহ্ বিষয়ের একটি মাসয়ালা জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে সা‘ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের কাছে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন।[৪১] ইমাম যুহ্‌রী ও ইমাম মাকহূলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : আনপারা যাঁদের থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফাকীহ্ কে? তাঁরা জবাব দেন : সা‘ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব।[৪২]

হযরত সা‘ঈদের সমকালীন বড় বড় ‘আলিম ও উঁচু স্তরের তাবি‘ঈগণ তাঁর যোগ্যতা ও পূর্ণতার স্বীকৃতি দান করেছেন। তাঁরা তাঁদের নিকট আসা বহু জটিল মাসয়ালার সমাধানের জন্য তাঁর সাহায্য নিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে তাঁর থেকে উপকৃত হওয়ার উপদেশ দিতেন। হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) মত বিশাল ব্যক্তিও যখন কোন মাসয়ালার সমাধান বের করতে সমস্যায় পড়তেন তখন তাঁর কাছে লিখে পাঠাতেন।[৪৩] ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রী বর্ণনা করেছেন, ‘আবদুল্লাহ ইবন ছা‘লাবা আমাকে এই উপদেশ দেন যে, যদি তুমি ফিকাহ্ অর্জন করতে চাও তাহলে এই শায়খের (সা‘ঈদ ইবন মুসায়্যিব) পিছু লও।[৪৪]

হযরত ‘উমার ইবন ‘আবদিল ‘আযীয (রহ) তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করা ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত দিতেন না। তিনি তাঁকে এত বেশী তা‘জীম করতেন যে, কোন কিছু জানার প্রয়োজন হলে তাঁকে ডেকে পাঠানো সমীচীন মনে করতেন না, বরং লোক পাঠিয়ে জেনে নিতেন। তিনি বলতেন, মদীনায় এমন কোন ‘আলিম নেই যিনি তাঁর ‘ইলমসহ ‘আমার নিকট আসেননি। শুধু ইবন মুসায়্যিবের ‘ইলম আমার কাছে আনা হয়, তাঁকে আসার কষ্ট

---

[৩৯] তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব-৪/৮৪

[৪০] ওয়াফায়াতুল আ‘য়ান-১/৩৭৫

[৪১] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৯৮

[৪২] ওয়াফায়াতুল আ‘য়ান-২/৩৭৫

[৪৩] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৫

[৪৪] তাহযীবুত তাহযীব-৪/৮৪

দিইনা।[৪৫] একবার তিনি এক ব্যক্তিকে ইবন মুসায়্যিবের নিকট কোন একটি মাসয়ালার সিদ্ধান্ত জানার জন্য পাঠান। লোকটি তাঁকেই সংগে করে তাঁর দরবারে হাজির হন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে দেখা মাত্র বলে ওঠেন, সে ভুল করে আপনাকে আসার কষ্ট দিয়েছে। আমি তো তাকে শুধু আপনার নিকট থেকে সমাধানটি জেনে আসার জন্য পাঠিয়েছিলাম।[৪৬]

হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের (রহ) শিষ্য-শাগরিদের বেষ্টনী অত্যন্ত প্রশস্ত। তাঁর কয়েকজন বিশেষ বিখ্যাত শাগরিদের নাম এখানে দেওয়া হলো :

সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার, যুহরী, কাতাদা, শুরায়ক ইবন আবী-নুমায়র, আবুয যানাদ, সা'ঈদ ইবন ইবরাহীম, 'আমর ইবন মুররা, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আনসারী, দাঊদ ইবন আবী হিন্দা, তারিক ইবন 'আবদির রহমান, 'আবদুল হামীদ ইবন জুবায়র, শু'বা, 'আবদুল খালিক ইবন সালামা, 'আবদুল মাজীদ ইবন সুহায়ল, 'আমর ইবন মুসলিম, ইমাম বাকির, ইবন মুনকাদির, হাশিম ইবন হাশিম ইবন 'উতবা, ইউনুস ইবন ইউসুফ ও আরো অনেকে।[৪৭]

হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) তৎকালীন আরবের একজন শ্রেষ্ঠ বংশবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। 'আল্লামা আল-জাহিজ বলেছেন : 'এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম বংশ বিদ্যাবিশারদ হলেন আবূ বাকর (রা)। তারপর যথাক্রমে 'উমার (রা), জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা), সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব ও তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ।' তিনি মানুষকে এ বিদ্যা শিক্ষাও দিতেন।[৪৮]

আরবী ভাষায় তাঁর প্রচণ্ড দখল ছিল। তিনি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির ভাষা জ্ঞান সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন। একবার কেউ একজন তাঁকে প্রশ্ন করলো : আচ্ছা বলুন তো, সবচেয়ে বেশী শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষী কে? বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা)। লোকটি বললো : না, আমি তাঁর বিষয়ে জানতে চাচ্ছিনে। জানতে চাচ্ছি, আপনার সমকালীনদের মধ্যে কে? বললেন : মু'আবিয়া, তাঁর পুত্র, সা'ঈদ আল-আশদাক ও তাঁর পুত্র 'আমর ইবন সা'ঈদ। আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবায়র তাঁদের পরের স্তরের। তবে তাঁর কথায় তেমন সম্মোহনী শক্তি নেই।[৪৯]

হযরত সা'ঈদ ছিলেন একজন নির্ভেজাল সম্মানিত দীনী ব্যক্তিত্ব। তা সত্ত্বেও একজন কাব্য-রসিক ব্যক্তি ছিলেন। কবিতা আবৃত্তি শুনার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। এটাকে তিনি তাকওয়া-পরহিযগারীর পরিপন্থী কাজ বলে মনে করতেন না। আল-আসমা'ঈ বলেছেন : একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, 'ইরাকে কিছু তাপস লোক এমন আছেন

---

[৪৫] তাবাকাত-৫/৯০

[৪৬] প্রাগুক্ত

[৪৭] তাহযীবুত তাহযীব-৪/৮৫; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৫

[৪৮] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৩১৮, ৩২০, ৩২৮, ৩৫৬

[৪৯] প্রাগুক্ত-১/৩১৪

যাঁরা কবিতা শুনা ও কাব্যচর্চা করা খারাপ মনে করেন। তিনি মন্তব্য করলেন, তাঁরা অনারব তপস্য-সংস্কৃতি ধারণ করেছেন।[৫০] তিনি নিজে কবিতা রচনা করতেন না, তবে কবিতা শুনতে পছন্দ করতেন।[৫১] তিনি বলেছেন : আবূ বাকর (রা) একজন কবি ছিলেন। 'উমার (রা) ও 'আলী (রা)- উভয়ে কবি ছিলেন। 'আলী (রা) এই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবি।[৫২]

স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন বড় বিশেষজ্ঞ। এই শাস্ত্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রায় স্বভাবগত। এ শাস্ত্রের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন হযরত আবূ বাকর সিদ্দীকের (রা) কন্যা হযরত আসমা'র কাছ থেকে। আর তিনি অর্জন করেন তাঁর মহান পিতার থেকে।[৫৩]

স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর ভীষণ খ্যাতি ছিল এবং অসংখ্য মানুষ তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য তাঁর কাছে আসতো। যখন কোন ব্যক্তি তাঁর নিকট কোন স্বপ্ন বর্ণনা করতো, তিনি তা শুনার পর প্রথমেই বলতেন, তুমি ভালো স্বপ্ন দেখেছো।[৫৪] এখানে কয়েকটি স্বপ্ন ও তার তা'বীর বর্ণনা করা হলো :

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) ও খলীফা 'আবদুল মালিকের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের সময়কালে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, 'আবদুল মালিককে আমি চিৎ করে ফেললাম। তারপর উপুড় করে তাঁর পিঠে চারটি পেরেক মেরে দিলাম। এ স্বপ্নের কথা শুনে তিনি লোকটিকে বললেন, তুমি নিজে স্বপ্ন দেখনি। লোকটি বললো, আমিই দেখেছি। তখন সা'ঈদ (রহ) বললেন, যদি তুমি সত্য কথাটি না বল তাহলে আমিই বলে দিচ্ছি। তখন লোকটি স্বীকার করলো যে, সে নয় বরং 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) স্বপ্নটি দেখেছেন এবং ব্যাখ্যা জানার জন্য তাকে পাঠিয়েছেন। সা'ঈদ (রহ) বললেন : তুমি যদি স্বপ্নটি সঠিকভাবে বর্ণনা করে থাক তাহলে 'আবদুল মালিক 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রকে হত্যা করবে এবং তাঁর বংশধারা থেকে চারজন খলীফা হবে।

আরেক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে, 'আবদুল মালিক চারবার মসজিদে নববীর সামনে পেশাব করেছেন। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) তার এই ব্যাখ্যা দেন যে, 'আবদুল মালিকের বংশ থেকে চারজন খলীফা হবে। এই দুইটি স্বপ্নের ব্যাখ্যাই সত্যে পরিণত হয়। 'আবদুল মালিকের সাথে সংঘর্ষে ইবন যুবায়র নিহত হন। 'আবদুল মালিকের চার ছেলে ওয়ালীদ, সুলায়মান, ইয়াযীদ (২য়) ও হিশাম খলীফা হন।[৫৫]

আবুল হাসান আল-মাদায়িনী বলেন : খলীফা 'আবদুল মালিক একবার স্বপ্নে দেখেন যে,

---

[৫০] প্রাগুক্ত-১/২০২

[৫১] তাবাকাত-৫/৬৮

[৫২] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/২৮৩

[৫৩] তাবাকাত-৫/৯১

[৫৪] প্রাগুক্ত-৫/৯২

[৫৫] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৭৮

তাঁর স্ত্রী 'আয়িশা বিনত হিশাম তাঁর মাথা বিশ টুকরো করে ফেলেছেন। ঘুম ভেঙ্গে যাবার পর ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। স্বপ্নটির ব্যাখ্যা জানার জন্য সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের নিকট লোক পাঠালেন। এই 'আয়িশা ছিলেন নির্বোধ মহিলা। সা'ঈদ বললেন: একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিবে এবং সেই সন্তান বিশ বছরের জন্য দেশের রাজা হবে। এ ব্যাখ্যা সত্যে পরিণত হয়েছিল। আয়িশার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন 'আবদুল মালিকের পুত্র হিশাম।[৫৬]

শুরায়ক ইবন নুমায়র একবার বর্ণনা করলেন যে, আমি দেখলাম, আমার একটি দাঁত আমার হাতে খসে পড়লো এবং সেটাকে মাটিতে পুঁতে রাখলাম। সা'ঈদ (রহ) তার ব্যাখ্যা দিলেন যে, তোমার খান্দানের মধ্যে তোমার সমবয়সী কোন ব্যক্তির মৃত্যু হবে এবং তুমি তাকে দাফন করবে। আরেক ব্যক্তি একবার বর্ণনা করলো যে, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার নিজের হাতে আমি পেশাব করছি। সা'ঈদ ব্যাখ্যায় বললেন, তোমার স্ত্রী তোমার মাহরিম (নিকট আত্মীয়- যাকে বিয়ে করা বৈধ নয়)। অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, লোকটির স্ত্রী তার দুধ বোন। মুসলিম আল-খায়্যাত বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি তার স্বপ্নের বর্ণনায় বললো, একটি কবুতর মসজিদের মিনারের উপর এসে বসে পড়লো। ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, হাজ্জাজ, জা'ফর ইবন আবী তালিবের (রা) পৌত্রীকে বিয়ে করবেন। আরেক ব্যক্তি তার স্বপ্নের বর্ণনা দেয়, সে দেখে একটি ছাগল মদীনার ছানিয়্যাতুল বিদা থেকে দৌড়ে এসে বলতে থাকে– আমাকে জবাই কর। আমাকে জবাই কর, আমি জবাই করলাম। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) ব্যাখ্যায় বললেন, ইবন সালা' মৃত্যু বরণ করবে। ইবন সালা' মদীনার মওয়ালীদের একজন ছিলেন।

'আবদুর রহমান ইবন সায়িব বর্ণনা করেছেন। ফাহ্‌ম গোত্রের এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে আগুনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) ব্যাখ্যা দিলেন যে, তুমি মৃত্যুর পূর্বে সমুদ্র ভ্রমণ করবে এবং তোমার মৃত্যু হবে হত্যার মাধ্যমে। 'আবদুর রহমান বলেন, সত্যিই লোকটি সমুদ্র ভ্রমণ করে এবং ভ্রমণকালে মরতে মরতে বেঁচে যায়। তারপর 'কুদায়দ'-এর যুদ্ধে সে নিহত হয়।

হুসাইন ইবন 'উবাইদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। আমার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার কোন সন্তান হলো না। একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, কে যেন আমার কোলে একটি ডিম ছুড়ে দিল। আমি সা'ঈদ ইবন আল- মুসায়্যিবের (রহ) নিকট স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, ঐ ডিমটি একটি অনারব মুরগীর ডিম। তুমি কোন অনারব মেয়েকে বিয়ে কর। একথার পর আমি একটি অনারব দাসীকে বিয়ে করি। তারই গর্ভে আমার এক ছেলের জন্ম হয়।

একবার এক ব্যক্তি বর্ণনা করলো, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি ছায়ায় বসে আছি। তারপর উঠে রোদে গেলাম। হযরত সা'ঈদ এর ব্যাখ্যায় বললেন, আল্লাহর কসম! যদি

---

[৫৬] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৪৬

তোমার এ স্বপ্ন সত্য হয় তাহলে তুমি ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। এ কথা শুনে লোকটি তার বর্ণনা ঠিক করে বলে, আমাকে জোর করে রোদে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর আমি সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে আসি। তখন হযরত সা'ঈদ তাঁর পূর্ব ব্যাখ্যার সাথে একথাটি যোগ করেন- 'কাফির হওয়ার জন্য তোমার উপর চাপ প্রয়োগ করা হবে।' লোকটি খলীফা 'আবদুল মালিকের খিলাফতকালে কোন একটি যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর হাতে বন্দী হয় এবং চাপের মুখে ইসলাম ত্যাগ করে। পরে মুক্তি পেয়ে মদীনায় ফিরে আসে। ঘটনাটি সে নিজেই বর্ণনা করতো। এসব স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার কথা ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে বর্ণনা করেছেন।

হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণী

তিনি বলতেন, শয়তান যখন কোন কাজের ব্যাপারে কোন মানুষের নিকট থেকে হতাশ হয়ে যায় তখন সে কোন নারীর মাধ্যমে তা সম্পন্ন করে। আমি আমার নফ্স-এর ব্যাপারে নারীকে বেশী ভয় করি। উপস্থিত লোকেরা বললো, আবূ মুহাম্মাদ! আপনার মত বয়োবৃদ্ধ মানুষের তো নারীর প্রতি কোন আকর্ষণ থাকার কথা নয়। তাছাড়া কোন নারীও আপনার প্রতি কোন রকম আকর্ষণ বোধ করবে না। তাহলে ভয় কিসের? বললেন, তা সত্ত্বেও আমি যা কিছু তোমাদেরকে বলছি, সেটাই হলো বাস্তবতা।[৫৭]

তিনি বলতেন, বান্দার জন্য তার নফ্স-এর সবচেয়ে বড় সম্মান করা হলো আল্লাহর আনুগত্য করা, আর তার সবচেয়ে বড় অবমাননা হলো আল্লাহর নাফরমানী করা। এ দুনিয়া এমন এক মরীচিকা যার দিকে প্রত্যেকে ঝুঁকে যায়, যাকে অন্যায়ভাবে সকলে অর্জন করতে চায়, অন্যায়ের মাধ্যমে পেতে চায় এবং অনুপযুক্ত স্থানে তা ব্যয় করে। দুনিয়ার ধন-সম্পদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই- যদি না তা নিজের দীন ও আত্মসম্মানের রক্ষণাবেক্ষণ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়। জুলমের সহায়ক ও সহযোগীকে যখনই দেখবে, ঘৃণা করবে। যাতে তোমার ভালো কাজগুলো নষ্ট হয়ে না যায়।

তিনি বলতেন, সব মানুষ তার সব কর্ম সম্পাদন করে আল্লাহর আশ্রয় ও তত্ত্বাবধানে। আল্লাহ্ যখন কাউকে হেয় ও অপমান করতে চান তখন তাকে স্বীয় আশ্রয় ও তত্ত্বাবধান থেকে বের করে দেন। ফলে মানুষের মধ্যে তার গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে যায়।

কোন ভদ্র মানুষ, কোন 'আলিম এবং কোন পূর্ণ মানব এমন নেই যার মধ্যে কিছু না কিছু ত্রুটি নেই। তবে তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ এমন আছেন যাঁদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা উচিত নয়। আর তাঁরা হলেন ঐসব লোক যাঁদের ভালো কাজ তাঁদের মন্দ কাজের চেয়ে বেশী। তাঁদের এ ভালো কাজের জন্য তাঁদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করা উচিত।[৫৮]

হযরত সা'ঈদের (রহ) দাস 'বারদ' একবার তাঁর মনিবের নিকট কিছু মানুষের 'ইবাদাত

---

৫৭. তাবাকাত-৫/১০০; সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৪

৫৮. সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৫

প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেন : মানুষ জুহ্‌র থেকে 'আসর পর্যন্ত একাধারে 'ইবাদাত করতে থাকে। হযরত সা'ঈদ (রহ) বললেন, আল্লাহর কসম! এটা 'ইবাদাত নয়। তুমি কি জান 'ইবাদাত কাকে বলে? 'ইবাদাত বলে, আল্লাহর আদেশসমূহের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা ও তাঁর নিষেধসমূহ থেকে দূরে থাকাকে।[৫৯]

হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) যেমন জ্ঞানগত পূর্ণতার অধিকারী ছিলেন, তেমনিভাবে উন্নত নৈতিকতা, চারিত্রিক গুণাবলী ও যোগ্যতারও অধিকারী ছিলেন। 'ইলম ও 'আমল– জ্ঞান ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রে তাঁর ছিল সমান কর্তৃত্ব। তিনি ছিলেন একজন উঁচু মানের 'আবিদ ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ মানুষ। ইবন খালিকান লিখেছেন, ফিকাহ্‌, হাদীছ, দীনদারী, তাকওয়া-পরহিযগারী, 'ইবাদাত তথা সব ধরনের মহত্ত্ব ও গুণাবলীতে তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয় তাবি'ঈদের অন্তর্গত।[৬০] ইমাম নাবাবী লিখেছেন, তাঁর জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্ব এবং তাঁর দীনী মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সকল 'আলিমের মতামত ও মন্তব্যের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে।[৬১]

তিনি জামা'আতে নামায আদায়ের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। একাধারে চল্লিশ বছর, মতান্তরে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এক ওয়াকত নামাযও জামা'আত ছাড়া আদায় করেননি। কখনো এমন সময়ে মসজিদে আসার ঘটনা ঘটেনি যখন লোকেরা নামায শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। জামা'আতের প্রথম কাতারে সব সময় নামায আদায় করতেন। তিনি বলতেন, পঞ্চাশ বছর যাবত নামাযের মধ্যে অন্য কারো পশ্চাদ্দেশের উপর আমার দৃষ্টি পড়ার কোন সুযোগ হয়নি।[৬২]

রাজনৈতিক হৈ-হাঙ্গামা ও বিপর্যয়- বিশৃঙ্খলার সময় যখন ঘর থেকে বের হওয়া মোটেই নিরাপদ ছিল না, তখনও তিনি মসজিদ ছাড়েননি। মদীনার ইতিহাসে 'হাররা'র বিশৃঙ্খলা একটি বিখ্যাত ঘটনা। এ ঘটনা ইয়াযীদ ও 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) বিরোধের সময়কালে সংঘটিত হয়। মদীনাবাসীরা যখন ইয়াযীদের আনুগত্য ত্যাগ করে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) পক্ষে 'আবদুল্লাহ ইবন হানজালাকে তাঁদের ওয়ালী বলে ঘোষণা দেয়, তখন ইয়াযীদের বাহিনী মদীনা ঘেরাও করে একাধারে তিন দিন পর্যন্ত মদীনায় পাইকারীভাবে গণহত্যা চালায় এবং লুটপাট করে। এমন ভীতিকর ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় কেউ ঘরের বাইরে পা রাখতে সাহস করতো না। মদীনার মসজিদগুলো একেবারে জনশূন্য হয়ে থাকতো। এমন ভয়াবহ ও ভীতিকর সময়েও হযরত সা'ঈদ (রহ) মসজিদে যাওয়া থেকে একদিনও বিরত থাকেননি। তিনি মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন। বানূ উমাইয়্যারা তাঁকে দেখে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতো, তোমরা এই বৃদ্ধকে একটু দেখ। এমন অবস্থায়ও তিনি মসজিদ ছাড়ছেন না।

---

[৫৯] তাবাকাত-৫/১০০

[৬০] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/২৬২; তাহযীবুত তাহযীব-৪/৮৭

[৬১] তাহ্‌যীবুল আসমা'-১/২২০

[৬২] তাবাকাত-৫/৯৭; ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/২৬২

জামা'আতের সাথে নামায আদায় করার প্রবল ইচ্ছার কারণে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও এমন স্থানে যেতেন না যেখানে জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের ব্যবস্থা থাকতো না। তাঁর চোখে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। লোকেরা তাঁকে মদীনার বাইরে 'আকীক' চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কারণ, সেখানকার সবুজ পরিবেশ তাঁর চোখের জন্য উপকারী হতে পারে। তিনি বললেন, সকালের ফজরের নামাযের জামা'আতে অংশগ্রহণের কি হবে?

ইবন শিহাব যুহরী বর্ণনা করেছেন। একবার আমি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের (রহ) সামনে পল্লী এলাকার সৌন্দর্য এবং সেখানকার চমৎকার জীবনাচারের আলোচনা করে তাঁকে বললাম, আপনি যদি কিছু দিনের জন্য সেখানে গিয়ে থাকতেন তাহলে ভালো হতো। তিনি বললেন, আমার রাত্রিকালীন নামাযের জামা'আতে উপস্থিতির কি হবে?

হযরত সা'ঈদের (রহ) 'ইবাদাতের মূল সময় ছিল রাতের অন্ধকার। সেই সময় তিনি আত্মসমালোচনা করতেন। প্রত্যেক রাতে তিনি নিজের নফসকে সম্বোধন করে বলতেন, ওহে যাবতীয় মন্দ ও খারাপের উৎস, ওঠো, তোমাকে আমি ঐ উটের মত বিধ্বস্ত করে ছাড়বো যে পরিশ্রান্ত ও দুর্বলতার জন্য চলার সময় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। একথা বলে তিনি তাহাজ্জুদ নামাযে নিমগ্ন হয়ে যেতেন এবং সুবহে সাদিক পর্যন্ত নামায আদায় করে চলতেন। রাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দু'টি পা ফুলে যেত। সকালে আবার নফসকে সম্বোধন করে বলতেন : তোমাকে এ কাজেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এ কাজের জন্যই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৬৩] বর্ণিত হয়েছে, পঞ্চাশ, মতান্তরে চল্লিশ বছর যাবত 'ঈশার নামাযের ওজুতে ফজরের নামায আদায় করেছেন।[৬৪]

নিষিদ্ধ দিনগুলি ছাড়া তিনি সারা বছর রোযা রাখতেন। মাগরিবের সময় বাড়ী থেকে কিছু পানীয় পাঠিয়ে দেওয়া হতো তা দিয়েই মসজিদে ইফতার সেরে নিতেন।

প্রায় প্রত্যেক বছরই হজ্জ আদায় করতেন। কিছু কিছু বর্ণনা মতে তাঁর হজ্জের মোট সংখ্যা পঞ্চাশে পৌঁছেছে।[৬৫] বানূ উমাইয়্যাদের সাথে মতপার্থক্য ও বিরোধের কারণে কিছুদিনের জন্য তারা তাঁকে হজ্জ আদায় থেকে বিরত রাখেন। 'আলী ইবন যায়দ একবার তাঁকে বলেন, আপনার সম্প্রদায়ের ধারণা, আপনাকে হজ্জ আদায়ে এ জন্য বাধা দেওয়া হয়েছিল যে, আপনি আপনার নিজের উপর এটা আবশ্যিক করে নিয়ে ছিলেন যে, যখনই কা'বা দেখবেন তখনই মারওয়ান বংশের জন্য বদদু'আ করবেন। তিনি বললেন, একথা সত্য নয়। তবে আমি প্রত্যেক নামাযের সময় তাদের জন্য বদদু'আ করে থাকি। সারা জীবনে একটি হজ্জ বা একটি 'উমরা ফরজ। কিন্তু আমি বিশটিরও বেশী হজ্জ আদায় করেছি। তোমাদের সমাজে এমন বহু মানুষ আছে, যারা নিজেদেরকে ভীষণ দীনদার বলে মনে করে থাকে। তারা হজ্জ ও 'উমরা করে মারা যায়। কিন্তু তাদের হজ্জ

---

[৬৩] সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৪

[৬৪] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/২৬২

[৬৫] সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৪

হয় না। আমি তো নফল হজ্জ ও 'উমরা অপেক্ষা জুম'আর নামাযের বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

কুরআন পাকের তিলাওয়াত কখনো বাদ যেত না। সফরের অবস্থায়ও বাহনের পিঠে বসে তিলাওয়াত করতেন। তিনি সকল সম্মানীয় ব্যক্তি ও বস্তুর খুবই তা'জীম ও সম্মান করতেন। নবী-রাসূলদের প্রতি এত বেশী ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল যে, তাঁদের নামে নিজের ছেলেদের নাম রাখা বেয়াদবী মনে করতেন। কুরআন ও মসজিদের প্রতি এত সম্মান দেখাতেন যে শব্দ দু'টির ক্ষুদ্র অর্থ বুঝানোর জন্য রূপান্তরও মনঃপূত ছিল না। ইবন হারমালা বর্ণনা করেছেন, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) বলতেন, তোমরা مصيحف ও مسيجد (ছোট মসজিদ, ছোট কুরআন) বলবে না। আল্লাহ যে জিনিসকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তাকে সম্মান কর। আল্লাহ যে জিনিসকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তা শ্রেষ্ঠ এবং ভালো।

অসুস্থ অবস্থায়ও হাদীছ বর্ণনার সময় শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে যেতেন। একবার কোন এক ব্যক্তি তাঁর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর নিকট একটি হাদীছ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি শুয়ে ছিলেন, হঠাৎ উঠে বসলেন। প্রশ্নকারী বললেন, আমি চাচ্ছিলাম আপনার কোন কষ্ট না হোক। তিনি বললেন, আমি শুয়ে শুয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ বর্ণনা করা খারাপ মনে করি।

স্বভাব-চরিত্র ও আদত-অভ্যাসে তিনি ছিলেন সাহাবায়ে কিরামের অনুরূপ। বহু বড় বড় সাহাবী তাঁর স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের তারিফ করেছেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলতেন, যদি রাসূল (সা) তাঁকে দেখতেন, খুশী হতেন। স্বভাবগত ভাবেই তিনি ছিলেন খুবই কোমল মনের ও নির্বিরোধ প্রকৃতির মানুষ। মতবিরোধ, যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব-ফাসাদ খুবই অপছন্দ ছিল। 'ইমরান ইবন 'আবদিল্লাহ খুযা'ঈ বর্ণনা করেছেন, সা'ঈদ ইবন আল মুসায়্যিব (রহ) কারো সাথে ঝগড়া করতেন না। কেউ যদি তাঁর চাদরটি কেড়ে নিতে চাইতো তাহলে তিনি তা স্বেচ্ছায় তার দিকে ছুড়ে দিতেন। শরীয়াতের নিষিদ্ধ বিষয়ের ব্যাপারে এত বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, শিশুদের খেলাধুলোর প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। নিজের মেয়েকে হাতির দাঁতের তৈরি পুতুল নিয়ে খেলতে দিতেন না। তিনি গলায় তাবীজ ঝুলানোকে কোন দোষ মনে করতেন না। একবার তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : لا بأس – এতে কোন দোষ নেই।[৬৬]

তবে সত্য বলার ব্যাপারে তাঁর এ কোমল স্বভাব রুক্ষ ও কঠোর রূপ ধারণ করতো। ইমাম আয-যাহাবী বলেছেন, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব খুবই সত্যভাষী ছিলেন। সত্য বলার প্রয়োজন হলে তিনি কখনো চুপ থাকতেন না। বানূ উমাইয়্যার সমালোচনায় তাঁর ভাষার তরবারি সবসময় কোষমুক্ত থাকতো। তাদের সমালোচনায় কখনো তিনি বিরত থাকতেন না। মুত্তালিব ইবন সায়িব বর্ণনা করেছেন, একবার আমি সা'ঈদ ইবন

---

৬৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৬/২৭৪

মুসায়্যিবের সাথে বাজারে বসে ছিলাম। এমন সময় বানূ উমাইয়্যার এক আর্দালী সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি বানূ উমাইয়্যার ডাকবাহক? সে বললো : হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : তাদেরকে তুমি কেমন দেখে এসেছো? বললো : ভালো অবস্থায়। সা'ঈদ বললেন : তারা তো মানুষকে অভুক্ত রেখে কুত্তার পেট ভরায়। একথা শুনে ডাকবাহক ভীষণ ক্ষেপে গেল। আমি তাকে কোন রকম বুঝিয়ে বিদায় করে দিই। তারপর সা'ঈদকে বললাম, আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি কেন এভাবে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তুলছেন? সা'ঈদ বললেন : ওরে নির্বোধ, চুপ কর। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহর অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করবো ততক্ষণ তিনি আমাকে তাদের হাতের মুঠোয় তুলে দেবেন না।[৬৭]

হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) খলীফা ও আমীরদের প্রতি মুখাপেক্ষীহীনতার ভাব তাঁদেরকে উপেক্ষার স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। তিনি একাধিক উমাইয়্যা খলীফার যুগ লাভ করেন। কিন্তু তাদের কারো সামনে মাথা নোয়াননি। শুধু তাই নয়, বরং তাদের কাকেও সাক্ষাৎ দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করেননি। খলীফা 'আবদুল মালিকের সাথে তাঁর এ রকম কয়েকটি ঘটনার কথাই ইতিহাসে পাওয়া যায়। যাতে তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'আবদুল মালিক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তিনি তাঁকে সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকার করতেন। একবার খলীফা 'আবদুল মালিক মদীনায় গেলেন। তিনি মসজিদে নববীর দরজায় দাঁড়িয়ে মসজিদের অভ্যন্তরে অবস্থানরত সা'ঈদের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁকে লোক মারফত ডেকে পাঠালেন। 'আবদুল মালিকের লোক সা'ঈদের নিকট গিয়ে বললো, আমীরুল মু'মিনীন দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চান। জবাবে সা'ঈদ বললেন : আমার কাছে আমীরুল মু'মিনীনের কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি আমার কাছে আমীরুল মু'মিনীনের কোন প্রয়োজন থেকেও থাকে তাহলে তা পূরণ হবার নয়। লোকটি ফিরে গিয়ে 'আবদুল মালিককে তাঁর জবাবটি জানিয়ে দিল। তিনি আবার লোকটিকে সা'ঈদের নিকট একই কথা বলে পাঠালেন। তবে বলে দিলেন, যদি তিনি না আসতে চান জোর করে আনবে না। লোকটি আবার গেল এবং একই জবাব পেল। লোকটি বললো, যদি আমীরুল মু'মিনীনের নিষেধ না থাকতো তাহলে আমি তোমার মাথা কেটে নিয়ে যেতাম। তিনি বার বার তোমাকে ডাকছেন, আর তুমি এভাবে প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছ। সা'ঈদ বললেন, যদি তিনি আমার সাথে কোন ভালো আচরণের ইচ্ছা করে থাকেন তাহলে আমি তা তোমাকে দান করলাম। আর যদি তাঁর অন্য কোন ইচ্ছা থেকে থাকে তাহলে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিশেষ বৈঠক থেকে উঠবো না যতক্ষণ না তিনি যা করতে চান তা করে ফেলেন। 'আবদুল মালিকের পাঠানো সেই লোকটি ফিরে গিয়ে তাঁকে সা'ঈদের সব কথা জানিয়ে দিল। 'আবদুল মালিক মন্তব্য করলেন : আল্লাহ্ আবূ মুহাম্মাদের প্রতি দয়া করুন! তাঁর কঠোরতা বেড়েই চলেছে।[৬৮]

---

[৬৭] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৫

[৬৮] তাবাকাত-৫/৯৫

একবার খলীফা 'আবদুল মালিক মদীনা আসলেন। একদিন রাতের বেলা তাঁর চোখে মোটেই ঘুম আসছিল না। তিনি তাঁর এক নিরাপত্তা রক্ষীকে নির্দেশ দিলেন : তুমি মসজিদে গিয়ে দেখ তো মদীনার কোন কাহিনী বলিয়ে লোক পাও কিনা। পেলে নিয়ে আসবে। নিরাপত্তা রক্ষী মসজিদে গেল। কিন্তু এত গভীর রাতে কিসসা-কাহিনী বলার লোক থাকবে কেন। হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) মসজিদের এক কোণে বসে যিকির ও দু'আ-ইসতিগফারে মশগূল ছিলেন। রক্ষীটি সা'ঈদকে চিনতো না। সে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো এবং হাতের ইশারায় তাঁকে ডাকলো। কিন্তু তিনি কোন প্রকার সাড়া না দিয়ে নিজের জায়গায় বসে রইলেন। রক্ষী মনে করলো, এ ব্যক্তি ইচ্ছা করে তার ইশারায় সাড়া দিচ্ছে না। সে আরো একটু নিকটে গিয়ে ইশারা করলো এবং বললো, আমি তোমাকে ইশারা করেছি, তুমি দেখতে পাওনি? সা'ঈদ (রহ) বললেন : তুমি তোমার প্রয়োজনের কথা বল। রক্ষী বললো : আমীরুল মু'মিনীনের চোখ খুলে গেছে। তিনি আমাকে হুকুম করেছেন : কোন কথা বলার লোক নিয়ে এসো। এ কারণে তোমাকে যেতে হবে। সা'ঈদ বললেন : তিনি কি আমাকে ডেকেছেন? রক্ষী বললো : না। তিনি বলেছেন : তুমি যেয়ে দেখ, শহরের কোন কিসসা-কাহিনী বলার লোক যদি পাও নিয়ে এসো। আমি তোমার চেয়ে উপযুক্ত কোন লোক পাইনি। একথা শুনে সা'ঈদ বললেন : তুমি ফিরে গিয়ে আমীরুল মু'মিনীনকে বলে দাও যে, আমি তাঁর গল্প-কাহিনী বলা লোক নই। এমন জবাব শুনে রক্ষী মনে করলো, এ হয়তো কোন পাগল হবে। এ কারণে সে ফিরে গেল এবং 'আবদুল মালিককে বললো, মসজিদে শুধু এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে ইশারা করলাম, কিন্তু সে তার স্থান থেকে একটুও নড়লো না। তারপর আমি তার নিকটে গিয়ে বললাম, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে পাঠিয়েছেন, কোন কাহিনী বলিয়ে লোক নিয়ে যাওয়ার জন্য। লোকটি জবাব দিল তুমি যেয়ে আমীরুল মু'মিনীনকে বল, আমি তাঁর গল্প-কাহিনী বলার লোক নই। 'আবদুল মালিক তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। এ কারণে ঘটনাটি শুনে তিনি বলে ওঠেন : এ তো সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব। তাঁকে ছেড়ে দাও।[৬৯]

তিনি খলীফা 'আবদুল মালিককে এত শক্ত জবাব দিতেন যা একজন সাধারণ মানুষকেও দেওয়া যায় না। একবার 'আবদুল মালিক তাঁকে বললেন : আবূ মুহাম্মাদ! এখন আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে, যদি কিছু ভালো কাজ করি তাহলে তাতে খুশী অনুভব করি না। আর খারাপ কাজ করলেও তাতে দুঃখ অনুভব করি না। তিনি বললেন : এখন আপনার অন্তর একেবারেই মরে গেছে।

খলীফা 'আবদুল মালিক-এর পরে তাঁর পুত্র ওয়ালীদের সাথেও হযরত সা'ঈদের (রহ) কর্মধারা একই রকম ছিল। মসজিদে নববীর পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণের পর যখন ওয়ালীদ পরিদর্শনে এলেন তখন মসজিদের অভ্যন্তরের সব মানুষকে বের করে দেওয়া হয়। সা'ঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রহ) মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। তাঁকে উঠানোর

---

৬৯. প্রাগুক্ত-৫/৯৬

হিম্মত কারো হয়নি। এক ব্যক্তি শুধু এতটুকু বলে যে, এ সময় যদি আপনি একটু সরে যেতেন! তিনি জবাব দেন, আমার ওঠার যে সময় আছে তার আগে আমি উঠবো না। তারপর তাঁর কাছে আবেদন জানানো হলো, ঠিক আছে উঠবেন না, তবে অন্ততঃ এতটুকু করুন যে, যখন আমীরুল মু'মিনীন এদিক দিয়ে যাবেন তখন সালাম দেওয়ার জন্য একটু উঠে দাঁড়াবেন। বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তার জন্য উঠে দাঁড়াতে পারিনে। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খলীফা ওয়ালীদকে মসজিদ ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। তিনি সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) মর্যাদা ও তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ কারণে তিনি সা'ঈদকে ওয়ালীদের দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্য এদিক সেদিক ঘোরাতে থাকেন। কিন্তু ওয়ালীদ কিবলার দিকে তাকাতেই এক সময় সা'ঈদের উপর দৃষ্টি পড়ে। ওয়ালীদ জিজ্ঞেস করেন : এই বৃদ্ধ কে? সা'ঈদ তো নয়? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয জবাব দিলেন : হাঁ, তিনিই। তারপর তাঁর পক্ষ থেকে কৈফিয়াত দিতে গিয়ে তাঁর বিভিন্ন অসুবিধার কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন: এখন তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন ও চোখে কম দেখেন। যদি তিনি আপনাকে চিনতে পারতেন তাহলে সালাম দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেন। ওয়ালীদ বললেন : হাঁ, আমি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অবগত। আমি নিজেই তাঁর কাছে যাচ্ছি। অতঃপর ওয়ালীদ এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে তাঁর কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : শায়খ, আপনার শরীর কেমন আছে? শায়খ নিজের জায়গায় বসে বসেই জবাব দিলেন : আলহামদুলিল্লাহ। ভালো আছি। তবে এতটুকু সৌজন্য বজায় রাখলেন যে, ওয়ালীদের কুশলও জিজ্ঞেস করলেন। এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের পর ওয়ালীদ একথা বলতে বলতে ফিরে যান যে, এ হলো পুরাতন স্মৃতি।

হযরত সা'ঈদ (রহ) শরী'আতের হুকুম-আহকামের ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন, তবে কারো গোপন পাপের কথা প্রকাশ করা মোটেই পছন্দ করতেন না। এ ব্যাপারে অন্যদেরকেও গোপন করার নির্দেশ দিতেন। ইবন হারমালা বর্ণনা করেছেন, একদিন আমি প্রত্যুষে ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এক ব্যক্তিকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পাই। আমি তাকে জোর করে টেনে-হেঁচড়ে আমার ঘরে নিয়ে আসি। এরপর সা'ঈদের সাথে আমার দেখা হয়। তাঁর কাছে আমি জানতে চাইলাম, এক ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তিকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পেল, এ অবস্থায় সে কি করবে? তাকে কি বিচারে সোপার্দ করে তার উপর হদ জারী করাবে? সা'ঈদ বললেন : তুমি যদি তাকে তোমার কাপড় দিয়ে ঢাকতে পার তাহলে ঢেকে দাও। একথা শুনে আমি ঘরে ফিরে এলাম। তখন লোকটির নেশার ঘোর কেটে গেছে। আমাকে দেখামাত্রই তার চেহারায় লজ্জা ও অনুশোচনার ভাব ফুটে ওঠে। আমি তাকে বললাম : তোমার লজ্জা হয় না? সকালে তোমাকে যদি এ অবস্থায় গ্রেফতার করে নিয়ে যেত এবং তোমার উপর হদ জারী করা হতো তাহলে মানুষের দৃষ্টিতে তোমার মর্যাদা কোথায় নেমে যেত? তোমার জীবদ্দশায় তোমার মৃত্যু হতো। তোমার সাক্ষ্য পর্যন্ত গ্রহণ করা হতো না। আমার এ উপদেশ শুনে লোকটি বললো : আল্লাহর কসম!

ভবিষ্যতে আমি এমন কাজ আর করবো না। এই গোপন রাখার ফল এই হলো যে, সে চিরদিনের জন্য তাওবা করে নিল।[৭০]

হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) মেয়ের বিয়ের ঘটনাটি আত্মত্যাগ, সহমর্মিতা, দারিদ্রপ্রীতি, আড়ম্বরহীনতা প্রভৃতি দিক থেকে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। তাঁর মেয়েটি ছিল খুবই সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। খলীফা 'আবদুল মালিক তাকে পুত্রবধূ করার প্রস্তাব পাঠান। সা'ঈদ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 'আবদুল মালিক খুব চাপ প্রয়োগ করেন এবং নানা ধরনের কঠোরতার আশ্রয় নেন। কিন্তু সা'ঈদ (রহ) প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ওপর অটল থাকেন। কিছুদিন পর তিনি কুরায়শ বংশের এক অতি সাধারণ ও দরিদ্র ব্যক্তির সাথে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেন। সেই ব্যক্তির নাম ছিল আবূ বিদা'আ।

এই ঘটনাটি আবূ বিদা'আ নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) নিকট নিয়মিত যাতায়াত করতাম। একবার কিছুদিন বিরতির পর গেলাম। সা'ঈদ প্রশ্ন করলেন : এতদিন কোথায় ছিলে? আমি বললাম : আমার স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় উপস্থিত হতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ আমাকে সংবাদ দাওনি কেন, আমিও কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করতাম। কিছুক্ষণ পর আমি যখন উঠতে গেলাম তখন তিনি বললেন, তুমি কি দ্বিতীয় বিয়ের কোন ব্যবস্থা করেছো? আমি বললাম : আমি একজন রিক্ত-নিঃস্ব সামান্য আয়ের মানুষ। আমার সাথে কে তার মেয়ের বিয়ে দেবে?

তিনি বললেন : আমি দেব। তুমি প্রস্তুতি নাও। আমি বললাম : খুবই আনন্দের বিষয়। হযরত সা'ঈদ (রহ) দুই অথবা তিন দিরহাম দেন মাহরের বিনিময়ে আমার সাথে তাঁর মেয়ের বিয়ে পড়িয়ে দেন। আমি সেখান থেকে যখন উঠলাম তখন খুশীর আতিশয্যে কি করবো তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। বাড়ীতে ফিরে এসে বউকে ঘরে তুলে আনার জন্য ধার-দেনার চিন্তা-ভাবনায় পড়ে গেলাম।

সন্ধ্যার সময় সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব মেয়েকে তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য বললেন। দু' রাক'আত নামায তিনি নিজে পড়লেন এবং দু রাক'আত নামায মেয়ের দ্বারা পড়ালেন। তারপর তাকে সংগে করে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। আমি তখন রোযা ইফতারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। হঠাৎ কেউ দরজায় টোকা দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম : কে? জবাব দিল : সা'ঈদ। আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব তো তাঁর নিজের বাড়ী এবং মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যান না। তাহলে এ সা'ঈদ কে? উঠে দরজা খুলে দেখি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব। তাকে দেখে আমি বললাম, আপনি কষ্ট করে এসেছেন কেন। আমাকে ডেকে পাঠালেই' তো পারতেন। তিনি বললেন : না, আমাকে তোমার কাছে আসা উচিত ছিল। আমি বললাম : বলুন, কি করতে হবে। বললেন : তুমি একা আছো আর এদিকে তোমার স্ত্রীও আছে। আমার মনে হলো, তুমি একাকী রাত কাটাবে কেন। এ কারণে স্ত্রীকে সংগে করে নিয়ে এসেছি। সে তার পিতার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল।

---

৭০. প্রাগুক্ত-৫/১০১

তিনি তাকে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমার স্ত্রী লজ্জায় সংকুচিত হয়ে পড়লো। আমিও ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপর আমি ঘরের ছাদে উঠে চিৎকার করে প্রতিবেশীদেরকে জানিয়ে দিলাম যে, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব তাঁর মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি আমার স্ত্রীকে আমার বাড়ীতে পৌছিয়ে দিয়ে গেছেন। আমার মা রীতি অনুযায়ী তিন দিন পর্যন্ত নতুন বউকে সাজ-গোছ করালেন। সাজ-গোছের পর আমি তাকে দেখলাম। সে ছিল খুবই সুন্দরী, কুরআনের হাফিজা, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের 'আলিমা এবং স্বামীর অধিকার সচেতন এক মহিলা।[৭১]

হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) একজন তাপস ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ মানুষ ছিলেন– একথা সত্য। তবে দুনিয়াকে এত পরিমাণ ত্যাগ করা পছন্দ করতেন না যাতে একজন মানুষ তার মান-সম্মান বজায় রাখতে এবং সমাজের অন্যদের সাথে ভদ্রভাবে ওঠা-বসা করতে পারে না। আর এ কারণে তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবসার মত একটি পবিত্র পেশা গ্রহণ করেন। যয়তুনের তেলের ব্যবসা করতেন।[৭২]

জীবনের এক পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় ভাতা পেতেন। কিন্তু পরে তা গ্রহণ করা ছেড়ে দেন। তাঁর ভাতার তিরিশ হাজার দিরহামেরও বেশী অর্থ বাইতুল মালে জমা ছিল। এ অর্থ গ্রহণ করার জন্য বহুবার তাকিদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে বার বার অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি বলতেন, যতক্ষণ আল্লাহ আমার ও বানূ মারওয়ানের মধ্যে কোন ফায়সালা না করেন ততক্ষণ আমার এ অর্থের কোন প্রয়োজন নেই।[৭৩]

শেষ জীবনে তাঁর দাড়ি ও মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল, যা কখনো স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতো, আবার কখনো দাড়িতে খিজাব লাগাতেন। গোঁফ কখনো চিকন, আবার কখনো পুরো করে ছাঁটতেন। পোশাক-পরিচ্ছদে তাঁর বিশেষ কোন রুচি ছিল না। তবে সাধারণভাবে একটু ভালো পোশাক পরতেন। সাদা পোশাক বেশী পছন্দ ছিল। পাগড়ী কালো হতো। তবে মাঝে মাঝে সাদা পাগড়ীও পরতেন। কখনো কখনো তাজ তথা মুকুটের মত উঁচু টুপি ব্যবহার করতেন। কাঁধের উপর চাদর ব্যবহার করতেন, তাতে কাতানের কারুকাজ করা আঁচল থাকতো। মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম রেশমের চাদরও পরতেন। পাজামা, জামা, লুঙ্গি, মোজা ইত্যাদিও পরতেন।[৭৪]

হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নিম্নের চরণটি আবৃত্তি করেন :

هو الموت لامنجى من الموت والذى + نحاذر بعد الموت أنكى وافظع

– এই সেই মৃত্যু যে মৃত্যুর থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। আর মৃত্যুর পরে যে জিনিসের আমরা ভয় করি তা অতি মারাত্মক ও ভয়াবহ।

---

[৭১] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/২৬৭

[৭২] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৪৭

[৭৩] প্রাগুক্ত-১/৯৫

[৭৪] প্রাগুক্ত-১/১০৩

তারপর তিনি এই দু'আ করেন : 'হে আল্লাহ আমার পদস্খলনকে কম করে দেখুন, ভুল-ক্রটিকে ক্ষমা করে দিন, আপনি আপনার জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দ্বারা সেই ব্যক্তির মূর্খতা ও বর্বরতাকে ঢেকে দিন যে আপনার নিকট ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু আশা করে না এবং শুধু আপনার উপরই সে নির্ভর করে। আপনার ক্ষমা অতি ব্যাপক। হে আমার রব! ভুল-ভ্রান্তির অধিকারী বান্দার জন্য আপনি ছাড়া পালানোর কোন স্থান নেই।' দাউদ ইবন আবী হিন্দা বলেন, মু'আবিয়ার (রা) এই শেষ উক্তিগুলির কথা শুনে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব মন্তব্য করেন : 'তিনি বাধ্য হয়ে সেই সত্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন যাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমি আশা করি আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ দেখাবেন।'[৭৫]

ইবন শিহাব আয-যুহ্রী বলেন, আমি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবকে বললাম : 'উছমান (রা) কিভাবে নিহত হলেন তা কি আমাকে একটু বলবেন? মানুষের ও তাঁর ভূমিকা কী ছিলো? মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহাবীরা তাঁকে এভাবে লাঞ্ছিত করলেন কেন? তিনি বললেন : তিনি অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন। যারা তাঁকে হত্যা করেছে তারা জালিম। আর যারা তাঁকে লাঞ্ছিত করেছে তারা মাজুর, অক্ষম। আমি প্রশ্ন করলাম : তা কিভাবে? তারপর তিনি 'উছমান (রা) হত্যার প্রেক্ষাপট বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন।[৭৬]

---

৭৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৮০

৭৬. প্রাগুক্ত-৪/২৮৭-২৯২

সা'ঈদ ইবন জুবায়র আল-ওয়ালিবী (রহ)

প্রখ্যাত তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবন জুবায়রের ডাক নাম ছিল আবূ 'আবদিল্লাহ, মতান্তরে আবূ মুহাম্মাদ। পিতা জুবায়র ইবন হিশাম আল-কূফী আল-আসাদী আল-ওয়ালিবী। বানূ ওয়ালিবার সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকা অথবা তাদের সাথে দাসত্বের সম্পর্ক থাকার কারণে তাঁকে আল-ওয়ালিবী বলা হতো।[১] যে সকল মহান তাবি'ঈ 'ইলম ও আমলের সমাবেশ স্থল বলে বিবেচিত ছিলেন তিনি তাঁদের একজন।

সা'ঈদের (রহ) জীবনের যাত্রা দাসত্বের মধ্য দিয়ে হলেও সীমাহীন সাধনা ও প্রতিভা বলে তাবি'ঈ 'আলিমকুলের শিরোমণিতে পরিণত হন। ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে একজন কারী, ফাকীহ্ ও শ্রেষ্ঠ 'আলিম বলে উল্লেখ করেছেন।[২] ইমাম নাবাবী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :[৩]

كان سعيد من كبار أئمة التابعين ومتقدميهم فى التفسير والحديث والفقه والعبادة والورع وغيرها من صفات أهل الخير.

– সা'ঈদ তাবি'ঈদের শ্রেষ্ঠ ইমামদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। তাফসীর, হাদীছ, ফিকাহ্, 'ইবাদাত, যুহ্দ ও তাকওয়া, তথা সৎ মানুষদের সকল উৎকর্ষতায় তাবি'ঈদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

আশ'আছ ইবন ইসহাক বলেন : সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে একজন মস্তবড় 'আলিম বলা হতো।[৪]

সা'ঈদের যখন বুদ্ধি হয় তখন শ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কিরামের বড় একটি সংখ্যা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তবুও সেই সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র একটি দল, যেমন : 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা), আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা), আবূ হুরাইরা (রা), 'আইশা সিদ্দীকা (রা), আনাস ইবন মালিক (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা), আবূ মাসউদ (রা), প্রমুখ 'আলিম সাহাবী তখনো জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁদের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করেন। বিশেষ করে হাবরুল উম্মাহ্ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাসের (রা) জ্ঞানের সাগর থেকে সর্বাধিক ফায়দা হাসিল করেন।[৫] একদল বিখ্যাত তাবি'ঈর নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন। যেমন : জা'ফার ইবন আবী মুগীরা, আবূ বিশর জা'ফার ইবন ইয়াস, আয়্যূব, আল-আ'মাশ, 'আতা' ইবন সায়িব ও আরো অনেকে।[৬]

---

[১] তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬

[২] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭২

[৩] তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬

[৪] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৬

[৫] তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৪/১১; ইবন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৭১

[৬] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৬

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবনুল 'আব্বাসের হালকায়ে দারসের পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল যে, সেখানে তাফসীর, হাদীছ, ফিকাহ্, ফারাইজ, সাহিত্য, রচনা, কাব্য ও কবিতা, মোটকথা সব ধরনের জ্ঞান ও শাস্ত্রের সাগর যেন উথলে উঠতো।[৭] সা'ঈদ ইবন জুবায়র এই সীমাহীন অথৈ সাগর থেকে সর্বাধিক পরিতৃপ্ত হন। অত্যন্ত নিয়মানুবর্তিতার সাথে এই হালকায়ে দারসে তিনি শরীক হতেন। সেখানে তাঁর জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি ছিল এ রকম যে, বাইরের প্রশ্নকারীরা ইবনুল 'আব্বাসকে (রা) যে সব প্রশ্ন করতো, যে সব মাসআলা জিজ্ঞেস করতো এবং ইবনুল 'আব্বাস যে সব জবাব দিতেন, সা'ঈদ চুপচাপ বসে তা শুনতেন। মাঝে মাঝে নিজেও কিছু প্রশ্ন করতেন। এসব প্রশ্নের মধ্যে হাদীছও থাকতো এবং ফিকাহ্র মাসাইলও থাকতো। কিন্তু তা লেখার ব্যাপারে ইবনুল 'আব্বাসের (রা) বারণ ছিল। এ কারণে কিছু দিন যাবত ইবন জুবায়র শুনে মুখস্থ করে রাখতেন। তবে মনে হয়, তিনি পরে লেখার অনুমতি লাভ করেন এবং লেখা আরম্ভ করেন। কোন কোন দিন এত বেশী মাসআলা উপস্থাপিত হতো যে, লিখতে লিখতে তাঁর কাগজ শেষ হয়ে যেত এবং কাপড় ও অস্ত্রশস্ত্রের উপর লেখার প্রয়োজন দেখা দিত। ঘটনাক্রমে এমনও কোন কোনদিন হতো যে, কোন প্রশ্নকারী এলো না, সেদিন একটি হাদীছও লেখার সুযোগ হতো না। সেদিন খালি হাতে ফিরে আসতেন।[৮]

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবনুল 'আব্বাসের (রা) পরে তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার (রা) থেকে সবচেয়ে বেশী ফায়দা হাসিল করেন। সা'ঈদ ইবন জুবায়রের কূফা অবস্থান কাল পর্যন্ত, যখন তিনি নিজেই মুফতীর স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছিলেন, ইবন 'উমার (রা) থেকে জ্ঞান অর্জন ও 'ইলমী ফায়দা হাসিলের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান ছিল। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, যখন কোন বিশেষ মাসআলায় কূফার 'আলিমগণের মতবিরোধ হতো, তখন আমি তা লিখে নিতাম এবং ইবন 'উমারের (রা) নিকট জিজ্ঞেস করতাম।[৯] এ সব মহান ব্যক্তির কল্যাণ ও বরকতে তিনি কুরআন, তাফসীর, হাদীছ, ফিকাহ্, ফারাইজ তথা সমস্ত দীনী 'ইলমের সাগরে পরিণত হন।[১০]

তিনি কুরআনের একজন ভালো কারী ছিলেন। তারজী'[১১]-এর সাথে কিরআত করতেন। কিন্তু গানের সুরে তিলাওয়াত করা তাঁর ভীষণ অপছন্দ ছিল।[১২] আবূ শিহাব বর্ণনা করেছেন। রমাদান মাসে সা'ঈদ ইবন জুবায়র আমাদের নামায পড়াতেন। তিনি 'তারজী'' করে কিরআত পড়তেন। মাঝে মাঝে একই আয়াত দুইবার করে পাঠ করতেন।[১৩] 'আতা' ইবন আস-সায়িব বলেন : একদিন সা'ঈদ ইবন জুবায়র এক

---

৭. আল-হাকিম ঃ আল-মুস্তাদরিক-৩/৫৩৮

৮. ইবন সা'দ ঃ আত-তাবাকাত-৬/২৫৭

৯. প্রাগুক্ত-৬/২৫৮

১০. তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬

১১. কণ্ঠের মধ্যে ধ্বনি ঘুরিয়ে সুমধুর সুরে আবৃত্তি করা।

১২. আত-তাবাকাত-৬/২৬

১৩. প্রাগুক্ত

ব্যক্তিকে বললেন : আমার পরে তোমরা এ কি নতুন জিনিস চালু করেছো? লোকটি বললো : আপনার পরে তো আমরা নতুন তেমন কিছু চালু করিনি। তিনি বললেন : এই অন্ধ লোকটি ও ইবনুস সায়কল তোমাদেরকে গানের সুরে কুরআন শেখায়।[14] সব মশহুর কিরআতের তিনি ছিলেন একজন 'আলিম। ইসমা'ঈল ইবন 'আবদিল মালিক বর্ণনা করেন, সা'ঈদ রমাদান মাসে আমাদের ইমামতি করতেন। নিয়ম ছিল এক রাতে 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের (রা) কিরআত অনুযায়ী কুরআন শোনাতেন, আরেক রাতে শোনাতেন যায়দ ইবন ছাবিতের (রা) কিরআত অনুযায়ী। এভাবে পালাক্রমে প্রতি রাতে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রসিদ্ধ কারীদের কিরআত শোনাতেন।[15]

কিরআত ও তাফসীর এ দুই শাস্ত্রের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন এ শাস্ত্রদ্বয়ের ইমাম হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট থেকে। আয়াতের শানে নুযূল এবং তার তাফসীর ও তাবীলের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। যখন তাঁর সামনে কোন আয়াত পাঠ করা হতো তিনি তার বিস্তারিত প্রেক্ষাপট ও ব্যাখ্যা বলে দিতেন। আবূ ইউনুস বর্ণনা করেন, একবার আমি সা'ঈদ ইবন জুবায়রের সামনে এ আয়াত ঃ

إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ[16]

পাঠ করলাম। তখন তিনি বললেন, এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা ছিলেন মক্কার কিছু মজলুম মানুষ। আমি বললাম, আমি এমন লোকদেরই (অর্থাৎ হাজ্জাজের জুলুমের শিকার) নিকট থেকে এসেছি। সা'ঈদ বললেন, ভাতিজা! আমরা তাদের বিরুদ্ধে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কি আর করা যাবে, আল্লাহর মর্জি তো এটাই।[17]
আ'মাশ বর্ণনা করেন, সা'ঈদ ইবন জুবায়র–

إِنَّ أَرْضِيْ وَاسِعَةً[18]–এ আয়াতের তাফসীরে বলতেন যে, এর অর্থ হলো, যখন কোথাও পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হয় তখন সেখান থেকে বের হয়ে যাও।

তিনি তাফসীরের দারসও দিতেন। ইবন ইয়াস বর্ণনা করেন, 'আযরাহ তাফসীরের বই (সম্ভবত হাতে লেখা কপি) এবং দোয়াত নিয়ে সা'ঈদ ইবন জুবায়রের নিকট যেতেন।[19] কিন্তু কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তিনি তাফসীর লিখে রাখা পছন্দ করতেন না। একবার এক ব্যক্তি তার নিজের জন্য তাফসীর লিখে রাখার অনুমতি দানের আবেদন জানান। তিনি বললেন, তাফসীর লিখে রাখার পরিবর্তে আমার এটাই পছন্দ যে, আমার একটি পাশ অবশ হয়ে যাক।[20]

---

১৪. প্রাগুক্ত
১৫. ইবন খাল্লিকান-২/৩৭১
১৬. সূরা আন-নিসা'-৯৮
১৭. আত-তাবাকাত-৬/২৬২
১৮. সূরা আল-আনকাবূত-৫৬
১৯. আত-তাবাকাত-৬/২৬৬
২০. ইবন খাল্লিকান-২/৩৭২; ড. হাসান ইবরাহীম হাসান ঃ তারীখ আল-ইসলাম-১/৫০৩

তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছ তাবি'ঈদের একজন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সাহাবীদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা), আনাস ইবন মালিক (রা), আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা), আবূ মাস'উদ আল-বাদরী (রা), 'আইশা সিদ্দীকা (রা), 'আদী ইবন হাতিম (রা) প্রমুখের নিকট হাদীছ শোনেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাসের (রা) হালকায়ে দারস থেকে বেশী উপকৃত হন। অন্যদের তুলনায় তাঁর মেধা ও ধারণ ক্ষমতা বেশী হবার কারণে হযরত ইবনুল 'আব্বাস (রা) তাঁকে বেশী স্নেহ করতেন এবং তাঁর শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা দূর করার উদ্দেশ্যে কখনো কখনো পরীক্ষামূলকভাবে তাঁর থেকে তিনি হাদীছ শুনতেন। মুজাহিদ বলেন, একবার ইবনুল 'আব্বাস (রা) ইবন জুবায়রকে বললেন, কিছু হাদীছ শোনাও। ইবন জুবায়র অতি বিনয়ের সাথে বললেন, আপনার উপস্থিতিতে আমি হাদীছ শুনাই কেমন করে। ইবনুল 'আব্বাস (রা) বললেন, এটাও আল্লাহর এক বিশেষ করুণা যে, তুমি আমার সামনে হাদীছ বর্ণনা করছো। যদি সঠিক বর্ণনা কর তাহলে ভালো। আর যদি ভুল কর তাহলে আমি ঠিক করে দিব।[২১]

বানূ বিদা'আর মুআয্যিন বর্ণনা করেন। আমি একবার হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাসের (রা) কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি রেশমের গদির উপর ঠেস দিয়ে বসে আছেন এবং সা'ঈদ ইবন জুবায়র তাঁর গায়ের কাছে বসা। ইবনুল 'আব্বাস (রা) তাঁকে বলছেন, তুমি আমার কাছ থেকে বহু হাদীছ মুখস্থ করেছো। আমি দেখবো, তুমি তা কিভাবে বর্ণনা কর।[২২]

ইবন জুবায়রের প্রতি হযরত ইবনুল 'আব্বাসের (রা) এমন মনোযোগী হবার কারণেই তিনি হাদীছের হাফিজদের ইমাম ও নেতায় পরিণত হন। তাঁর বর্ণিত হাদীছের একটি বড় অংশই ইবনুল 'আব্বাসের সূত্রে বর্ণিত। এর দ্বারাই হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর স্থান কোন পর্যায়ে তা অনুমান করা যায়।

ফকীহ্ গোষ্ঠীর মধ্যেও তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এ শাস্ত্রের জ্ঞানও তিনি অর্জন করেন হযরত ইবনুল 'আব্বাস (রা) থেকে। এ শাস্ত্রে তিনি এত পূর্ণতা অর্জন করেন যে, তৎকালীন ফিকাহ্‌র কেন্দ্র বলে পরিচিত কূফার তাবি'ঈ মুফতীদের এক অন্যতম ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।[২৩] কিছু দিন কূফার কাজীর পদও অলংকৃত করেন। পরে কূফার কাজী আবূ বুরদা ইবন আবী মূসা আশ'আরীর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন।[২৪] কিছু দিন 'আবদুল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাসঊদের সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন

---

[২১] আত-তাবাকাত-৬/২৫৬; তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬

[২২] আত-তাবাকাত-৬/২৫৭

[২৩] তাহ্‌যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬

[২৪] ইবন কুতায়বা ঃ আল-মা'আরিফ-১৯৭; ইবনুল জাওযীর সিফাতুস সাফওয়া-৩/৪৩; আ'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/২৮

করেন।[২৫] 'ইলম ও ইফতার কেন্দ্র ভূমি মক্কায় যখন আসতেন তখন সেখানেও ফাতওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকতেন।[২৬] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাসের (রা) ইবন জুবায়রের ফাতওয়ার উপর এত আস্থা ছিল যে, কূফার কোন লোক যদি তাঁর নিকট কোন ফাতওয়া চাইতে আসতো তাহলে তিনি তাকে বলতেন, তোমাদের ওখানে কি সা'ঈদ ইবন জুবায়র নেই?[২৭] তালাক সংক্রান্ত মাসআলায় তিনি একজন বড় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন :[২৮]

أعلم التابعين بالإطلاق سعيد بن جبير

–'তাবি'ঈদের মধ্যে তালাক বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জানা ব্যক্তি সা'ঈদ ইবন জুবায়র।'

অংকে তিনি বেশ পাকা ছিলেন। এ কারণে ফারায়িজ (দায়ভাগ) শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর সময়ের বড় বড় সাহাবী ফারায়িজ সম্পর্কে তাঁদের নিকট জানতে আসা লোকদেরকে ইবন জুবায়রের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। একবার হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট ফারায়িজ সম্পর্কে জানার জন্য এক ব্যক্তি এলো। তিনি সেই ব্যক্তিকে বলেন, তুমি ইবন জুবায়রের নিকট যাও। সে আমার চেয়ে বেশী হিসাব-নিকাশ জানে। সে তোমাকে তাই বলে দিবে যা নির্ধারিত আছে।[২৯] তিনি যখন মদীনায় যেতেন তখন সেখানকার 'আলিমরা তাঁর নিকট ফারায়িজ শিখতেন। 'আলী ইবন হুসায়ন বর্ণনা করেন, যখন সা'ঈদ ইবন যুবায়র আমাদের এখান দিয়ে যেতেন তখন আমরা তাঁর নিকট ফারায়িজ এবং এমন সব কথা জিজ্ঞেস করতম যা দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে বেশ উপকৃত করতেন।[৩০]

মোটকথা সা'ঈদ ইবন জুবায়রের ব্যক্তিসত্তাটি ছিল বহু জ্ঞান ও শাস্ত্রের সমাহার। যার কিছু কিছু করে সবটুকু ধারণ করতেন সেই যুগের বহু জ্ঞানী ব্যক্তি। কিন্তু ইবন জুবায়র এককভাবে তাঁদের সব জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। খসীফ বর্ণনা করেছেন, তালাকের মাসআলার সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব। হজ্জে ছিলেন 'আতা', হালাল-হারামে তাঊস, তাফসীর শাস্ত্রে মুজাহিদ এবং এসব জ্ঞানের সমাহার ছিল সা'ঈদ ইবন জুবায়রের একক ব্যক্তিসত্তা।[৩১]

তিনি জ্ঞানের এমন একটি উৎস ছিলেন যার প্রয়োজন অনুভব করতেন সেই যুগের সব শ্রেণীর 'আলিমগণ। মায়মুন ইবন মাহরান বর্ণনা করেছেন যে, সা'ঈদ ইবন যুবায়র যখন ইনতিকাল করেন তখন ধরাপৃষ্ঠে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যে তাঁর জ্ঞানের প্রয়োজন

---

[২৫] ইবন 'আবদি রাব্বিহি : আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/১৬৭, ১৬৯

[২৬] ইবন খাল্লিকান-১/২০৪

[২৭] আত-তাবাকাত-৬/২৫৭; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৭৬; তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬

[২৮] শাযারাতুয যাহাব-১/১০৮

[২৯] আত-তাবাকাত-৬/২৫৮; তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬

[৩০] আত-তাবাকাত-৬/২৫৮

[৩১] ইবন খাল্লিকান-১/২০৫

অনুভব করতো না।[৩২]

ইমাম বুখারী তাঁর তারীখে উল্লেখ করেছেন যে, সুফয়ান ছাওরী জ্ঞানের ক্ষেত্রে সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে ইবরাহীম আন-নাখা'ঈর উপর প্রাধান্য দিতেন।[৩৩] কূফাবাসীদের কেউ যখন হযরত ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট কোন মাসআ'লা জানতে আসতো তিনি তাকে বলতেন : কেন, তোমাদের মধ্যে কি সা'ঈদ ইবন জুবায়র নেই?[৩৪]

সা'ঈদ ইবন জুবায়র তাঁর এই বিশাল জ্ঞান ও বিভিন্ন শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য শুধু নিজের মধ্যে পুঞ্জিভূত করে রাখেননি, বরং যতটুকু সম্ভব অন্যদেরকেও তাদ্বারা উপকৃত হবার সুযোগ দিয়েছেন। হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর কিছু অদূরদর্শী সঙ্গী-সাথী তাঁকে তিরস্কার করতেন। জবাবে তিনি তাঁদেরকে বলতেন, এ জ্ঞান কবরে নিয়ে যাবার চেয়ে তোমাদের নিকট এবং তোমাদের সঙ্গী-সাথীদের নিকট বর্ণনা করা আমার বেশী পছন্দনীয়।[৩৫]

তাঁর ছাত্র-শাগরিদের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম : 'আবদুল মালিক, 'আবদুল্লাহ, ইয়া'লা ইবন হাকীম, ইয়া'লা ইবন মুসলিম, আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ, আবুয যুবায়র মাক্কী, আদাম ইবন সুলায়মান, আশ'আছ ইবন আবীশ শা'ছা', যার ইবন 'আবদিল্লাহ মুরাহহিবী, সালিম আল-আফতাস, সালামা ইবন কুহায়ল, তালহা ইবন মুসাররিফ, 'আতা' ইবন সাইব প্রমুখ।[৩৬]

জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে তাঁর এ উদারতা ঐসব লোকদের জন্য ছিল যাঁরা সেই জ্ঞানের মর্যাদা দিত। অন্যথায় অযোগ্য ব্যক্তিদের নিকট তিনি তাঁর জ্ঞানকে লুকিয়ে রাখতেন। মুহাম্মাদ ইবন হাবীব বর্ণনা করেছেন। সা'ঈদ ইবন জুবায়র ইসফাহানে অবস্থানকালে মানুষ যখন তাঁর নিকট হাদীছ সম্পর্কে জানতে চাইতো, বলতেন না। কিন্তু যখন কূফা আসলেন তখন তাঁর উদারতার স্রোত জারি হয়ে গেল। লোকেরা প্রশ্ন করলো, আবূ মুহাম্মাদ, কি ব্যাপার! আপনি ইসফাহানে হাদীছ বর্ণনা করতেন না, অথচ কূফায় এসে বর্ণনা করছেন? তিনি জবাব দিলেন, নিজের পণ্য সেখানেই উপস্থাপন কর যেখানে তার মর্যাদার সমঝদার লোক থাকে। মোটকথা, উলুবনে মুক্তো না ছড়ানোর যে কথাটি বলা হয় তিনি তাই বলতেন।

'ইবাদত, যুহ্দ ও তাকওয়ার তিনি ছিলেন বাস্তব নমুনা। এ ব্যাপারে তাবি'ঈদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। খাওফে খোদা বা আল্লাহভীতি তাঁর অন্তরে এত দৃঢ়মূল হয়েছিল যে, সবসময় তাঁর চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত থাকতো। রাতের অন্ধকারে যেটি ছিল

---

[৩২] আত-তাবাকাত-৬/২৬৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৭

[৩৩] তাহ্যীবুল আসমা' ১/২১৬

[৩৪] প্রাগুক্ত

[৩৫] আত-তাবাকাত-৬/২৫৮

[৩৬] তাহযীবুত তাহযীব-৪/১২; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৬

তাঁর ইবাদাত ও মা'শুকের সাথে একান্ত সংলাপের সময়, অস্থিরভাবে কাঁদতেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছিল এবং দু'চোখ বেয়ে সবসময় পানি ঝরতে থাকতো।[৩৭]

তাঁর নামায ছিল একাগ্রতা এবং খুশু-খুজুর বাস্তব রূপ। কখনো কখনো এক রাক'আতে পুরো কুরআন শেষ করতেন। ভয়ঙ্কর শাস্তি ও 'আযাবের আয়াতগুলো বারবার আওড়াতেন। সা'ঈদ ইবন 'উবায়দ বর্ণনা করেছেন। আমি সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে নামাযে ইমামতির অবস্থায় এ আয়াতটি–[৩৮]

إِذِ الْأَغْلَالُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُوْنَ فِيْ الْحَمِيْمِ.

বার বার আওড়াতে শুনেছি।[৩৯] কুসাম ইবন আয়্যূব বলেন, আমি তাঁকে এ আয়াত-[৪০] واتقوا يوما ترجعون فيه إلي الله. বিশ বারের অধিক আওড়াতে শুনেছি।[৪১] সুবহে সাদিক থেকে ফজরের নামায পর্যন্ত যিকরে মশগুল থাকতেন। এ সময় কেবল আল্লাহর যিকর ছাড়া কারো সাথে কোন কথা বলতেন না।[৪২]

রমজান মাসে তাঁর সব ধরনের 'ইবাদাতের মাত্রা বেড়ে যেত। মাগরিব থেকে 'ঈশা পর্যন্ত সময়টুকু সাধারণত রোযাদারদের একটু আরাম ও বিশ্রামের সময় বলে মনে করা হয়, তা তিনি কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন।[৪৩] রমজানে কখনো কখনো এক বৈঠকে পুরো কুরআন খতম করতেন।[৪৪] তিনি তাঁর গোত্রের মসজিদে ই'তিকাফ করতেন।[৪৫]

তিনি কতবার হজ্জ আদায় করেছিলেন তাঁর সঠিক সংখ্যা বলা যায় না। তবে বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা এতটুকু জানা যায় যে, তিনি অধিকাংশ হজ্জ আদায় করতেন এবং তীব্র আবেগ ও উৎসাহের কারণে কূফা থেকেই ইহরাম বেঁধে বের হতেন। মক্কায় অবস্থানকালে বেশী বেশী তাওয়াফ করতেন।[৪৬]

কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ ও আসক্তি। সাধারণত দুই রাতে কুরআন খতম করতেন। কেবল সফর এবং অসুস্থ অবস্থায় এই অভ্যাসের তারতম্য দেখা

---

৩৭. সিফাতুস সাফওয়া-১/১৫০; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৬
৩৮. সূরা আল-মু'মিন-৩৮
৩৯. আত-তাবাকাত-৬/২৬০
৪০. সূরা আল-বাকারা-৩৮
৪১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৬
৪২. সিফাতুস সাফওয়া-১/১৫১
৪৩. আত-তাবাকাত-৬/২৫৯
৪৪. ইবন খাল্লিকান-১/২০৫
৪৫. আত-তাবাকাত-৬/২৬০
৪৬. প্রাগুক্ত-৬/২৬৪

যেত। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি কা'বার অভ্যন্তরে এক রাক'আতে পূর্ণ কুরআন পাঠ করেছি।[৪৭]

তিনি নিজেকে অসম্ভব তুচ্ছ ও হেয় মনে করতেন। এ কারণে কোন পাপাচারীকে তার পাপ কাজের ব্যাপারে সতর্ক করতে লজ্জা বোধ করতেন। তিনি বলতেন, আমি কোন ব্যক্তিকে কোন পাপ কাজ করতে দেখি, কিন্তু আমার নিজের দৃষ্টিতে আমি এতই তুচ্ছ যে, অন্যকে সতর্ক করতে আমার দারুণ লজ্জা হয়।[৪৮]

কারো গীবাত করা এবং কারো গীবাত শোনা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। মুসলিম আল-বিত্তীন বলেন, সা'ঈদ তাঁর সামনে কাউকে কারো গীবাত করতে দিতেন না। গীবাতকারীকে বলতেন, যা কিছু তোমার বলার থাকে সেই ব্যক্তির মুখের উপর বলো।[৪৯]

তাঁর নিকট 'ইবাদাতের এক ভিন্ন অর্থ ছিল। শুধু নামায, রোযা ও তাসবীহ-তাহলীলকে তিনি 'ইবাদাত বলে জানতেন না। বরং তার একটি বিশেষ ও ব্যাপকতর অর্থ আছে। তিনি মনে করতেন, আনুগত্য হলো বড় ইবাদাত। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে, সেই যাকির। আর যে আল্লাহর অবাধ্যতা করে সে যাকির নয়। তা সে যতই তাসবীহ পাঠ বা কুরআন তিলাওয়াত করুক না কেন। কোন এক ব্যক্তি একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, সবচেয়ে বড় 'ইবাদাতকারী ব্যক্তি কে? বললেন, যে ব্যক্তি পাপ করার পর তাওবা করেছে এবং যখন তার পাপের কথা স্মরণ হয়েছে তখন তার বিপরীতে নিজের 'আমলকে অতি তুচ্ছ মনে করেছে।[৫০]

তিনি 'উলামায়ে সূ' বা অসৎ 'আলিমদেরকে মুসলিম উম্মার জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক বলে মনে করতেন। হিলাল ইবন জানাব একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, মানুষের ধ্বংস ও বিপর্যয় কোথা থেকে হবে? বলেন, তাদের 'আলিমদের থেকেই।[৫১]

সা'ঈদ ইবন জুবায়র জীবনের একটি দীর্ঘ সময় মদীনায় ছিলেন। তারপর সেখান থেকে অন্যত্র চলে যান। কিছু দিন ইরাকের বিভিন্ন শহরে ঘোরাফেরা করেন। পরে কূফায় বসতি স্থাপন করেন।[৫২] কূফায় অবস্থানকালে কিছু দিন তথাকার কাজী 'আবদুল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'উদ এবং কিছু দিন আবূ বুরদা ইবন আবূ মূসা আল-আশ'আরীর সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন।[৫৩]

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। তাঁর প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনও করতেন। তাঁকে কূফার জামে' মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করেন। কূফার কাজী হিসেবেও নিয়োগ দেন। কিন্তু কাজীকে অবশ্যই আরব বংশোদ্ভূত হতে হবে–

---

[৪৭] প্রাগুক্ত-৬/২৫৯
[৪৮] সিফাতুস সাফওয়া-১/১৫১
[৪৯] আত-তাবাকাত-৬/২৬৬; তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/৭৭
[৫০] সিফাতুস সাফওয়া-১/১৫১
[৫১] আত-তাবাকাত-৬/২৬২
[৫২] ইবন খাল্লিকান-১/২০৫
[৫৩] তাহযীবুত তাহযীব-৪/১৩

কূফাবাসীদের এমন দাবীর প্রেক্ষিতে তাঁকে সরিয়ে আবূ বুরদা ইবন আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে তাঁর স্থলে নিয়োগ দেন। তবে হাজ্জাজ আবূ বুরদাকে বলে দেন, তিনি যেন ইবন জুবায়রের সাথে পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ না করেন।[৫৪]

তাঁর সাথে হাজ্জাজের এত সদয় ব্যবহার সত্ত্বেও তিনি বিন্দুমাত্র তাঁর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। এ কারণে ইবনুল আশ'আছ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেন, ইবনু জুবায়র তাঁর সঙ্গী হয়ে যান।

খলীফা আবদুল মালিকের খিলাফতকালে সীসতানের শাসক রাতবীলের আচরণ বিদ্রোহের পর্যায়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে তিনি খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিতেন। এ কারণে হাজ্জাজ তাঁকে শায়েস্তা করার জন্য 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবী বাকরাকে নির্দেশ দেন। 'উবায়দুল্লাহ হিজরী ৯ সনে সীসতানে অভিযান পরিচালনা করে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু পেছনের নিরাপত্তা বিধানের কথা ভুলে যান। এ জন্য রাতবীল তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেন। ফলে মুসলিম বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তাদের জীবন ও অর্থের দারুণ ক্ষয়ক্ষতি হয়। তারা ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এ পরাজয় হাজ্জাজকে ভীষণ আহত করে। তিনি আবার মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রহমান ইবন আশ'আছকে চল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়ে অভিযানের নির্দেশ দেন। আর এ বাহিনীর বেতন-ভাতার অর্থ বন্টনের দায়িত্ব দেন সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে। ইবনুল আশ'আছ রাতবীল শাসিত অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তথাকার বহু এলাকা পদানত করেন এবং এক বছরের জন্য অগ্রাভিযান বন্ধ করে দিয়ে হাজ্জাজকে অবহিত করেন। হাজ্জাজ রাতবীলের উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিলেন। এ কারণে তিনি ইবনুল আশ'আছকে লিখলেন, এটা কোন আরাম-আয়েশের সময় নয়। আমার এ নির্দেশ পৌঁছার সাথে সাথে অভিযান শুরু করবে। আর তুমি যদি অপারগ হও তাহলে বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব তোমার ভাতিজা ইসহাকের হাতে অর্পণ করবে।

ইবনুল আশ'আছ মুসলিম বাহিনীর স্বার্থেই অগ্রাভিযান বন্ধ করেছিলেন। তাই তিনি হাজ্জাজের এমন কঠোর নির্দেশে ক্ষেপে যান। তিনি রাতবীলের সাথে সন্ধি করে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেন। তাঁর বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ছিল ইরাকের। তারা আগে থেকেই হাজ্জাজের জুলুম-অত্যাচারে ক্ষেপে ছিল। এখন সুযোগ পেয়ে তারাও ইবনুল আশ'আছের সহযোগী হয়ে গেল। ধীরে ধীরে হাজ্জাজের বিরোধিতা খলীফা আবদুল মালিকের বিরোধিতার রূপ নিলো। ইবন জুবায়রও ইবনুল আশ'আছের সহযোগী হলেন। ইবনুল আশ'আছ সীসতান থেকে ইরাকে পৌঁছলেন। তাঁকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে হাজ্জাজ সসৈন্যে বের হলেন। কয়েক মাস সংঘর্ষ চললো। ইবনুল আশ'আছ ইরাকের একটি বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে নেন। হাজ্জাজের সাথে এই

---

[৫৪] ইবন খাল্লিকান-১/২০৫

বিরোধিতায় কূফার বহু 'আলিম ও কারী ইবনুল আশ'আছকে সহযোগিতা করেন। ইবন জুবায়র ছিলেন এই দলটির নেতা। তিনি রণক্ষেত্রে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন। বানূ উমাইয়্যা ও হাজ্জাজের জুলুম-নির্যাতন মূলক শাসন, তাদের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড, আল্লাহর বান্দাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন, নামায আদায়ে বিলম্বকরণ এবং মুসলমানদেরকে হেয় ও অপমান করার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তাদেরকে আহ্বান জানাতেন।[৫৫]

হাজ্জাজবিরোধী এমন তীব্র আবেগ ও উত্তেজনার সময়ও তিনি সত্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুৎ হতেন না। যাবারকান আসাদী নামক একজন দাসের মনিব ছিল হাজ্জাজের পক্ষে। আর দাসটি ছিল হাজ্জাজের বিপক্ষে। দাসটি ইবন জুবায়রের নিকট জানতে চায় যে, এমতাবস্থায় সে যদি ইবনুল আশ'আছের পক্ষে যোগদান করে যুদ্ধে মারা যায় তাহলে আল্লাহর দরবারে এ জন্যে তাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে কিনা। ইবন জুবায়র তাকে জবাব দিলেন : তুমি যুদ্ধ করবে না। তোমার মনিব যদি উপস্থিত থাকতো তাহলে তাকে সংগে নিয়ে হাজ্জাজের পক্ষে যুদ্ধ করতে।[৫৬]

হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রথম দিকে ইবনুল আশ'আছের শক্তি ও ক্ষমতা দৃঢ় ছিল এবং ইরাকের একটি বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করতে সক্ষমও হন। কিন্তু তিনি হাজ্জাজের এই বিরোধিতায় রাষ্ট্রকেও জড়িয়ে ফেলেন। এ কারণে দীর্ঘদিন তাঁর মুকাবিলায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে 'দিয়ারে জামাজিম'[৫৭]-এর যুদ্ধে ইবনুল আশ'আছের শোচনীয় পরাজয় হয় এবং তাঁর শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। তিনি পালিয়ে সীসতানে চলে যান।

ইবনুল আশ'আছের পরাজয়ের পর ইবন জুবায়র মক্কায় চলে যান। মক্কার তৎকালীন ওয়ালী খালিদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল কাসরী তাঁকে গ্রেফতার করে হাজ্জাজের নিকট পাঠিয়ে দেন।

তাঁর গ্রেফতারের ঘটনাটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ইবনুল আশ'আছের বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবার পর সা'ঈদ (রহ) পালিয়ে মক্কায় চলে আসেন এবং সেখানে আত্মীয়-বন্ধুদের 'আশ্রয়ে অবস্থান করতে থাকেন। এ সময় বানু উমাইয়্যাদের পক্ষ থেকে খালিদ ইবন 'আবদুল্লাহ আল-কাসরী ওয়ালীর দায়িত্ব নিয়ে মক্কায় আসেন। তাঁর জুলুম-অত্যাচার ও দুষ্কর্মের কথা মানুষের জানা ছিল। এ কারণে সা'ঈদের বন্ধুরা তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁদের কেউ কেউ সা'ঈদের কাছে এসে বলেন ঃ খালিদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-কাসরী ওয়ালীর দায়িত্ব নিয়ে মক্কায় এসেছেন। তাঁর হাত থেকে আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। আমাদের অনুরোধ আপনি খুব তাড়াতাড়ি এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান। জবাবে তিনি বলেন : আল্লাহর

---

[৫৫] আত-তাবাকাত-৬/২৬৫

[৫৬] প্রাগুক্ত-৬/২৬৬

[৫৭] কূফা থেকে সাত ফারসাখ দূরে অবস্থিত একটি স্থান। (আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/১৭৬)

কসম! আমি একবার পালিয়ে আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয়েছি। এখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার এ স্থানেই আমি অবস্থান করবো। আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হোক।

মানুষের ধারণা সত্যে পরিণত হলো। খালিদ সা'ঈদ ইবন জুবায়রের অবস্থানের কথা জানতে পেয়ে তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য একটি বাহিনী পাঠান। তাঁরা সা'ঈদের বাড়ীতে যায় এবং তাঁকে গ্রেফতার করে সবার সামনে প্রকাশ্যে হাত-পায়ে লোহার বেড়ী পরায়। তারপর তারা তাঁকে হাজ্জাজের নিকট যেতে হবে বলে জানায়। তিনি স্থির ও প্রশান্ত চিত্তে সব কিছু মেনে নেন।

তারপর তিনি উপস্থিত আত্মীয়-বন্ধুদের লক্ষ্য করে বলেন : এই জালিমের হাতেই আমি নিহত হবো। একবার এক রাতে আমি ও আমার দু'বন্ধু 'ইবাদাত ও দু'আর মধ্যে ছিলাম। আমরা অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রতার সাথে এই দু'আ করেছিলাম ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে শাহাদাত দান করুন!' আমার সেই বন্ধুদ্বয়কে আল্লাহ এরই মধ্যে শাহাদাত দান করেছেন। একমাত্র আমি এখনো তার প্রতীক্ষায় আছি।

তাঁর এই কথার মাঝখানে তাঁর ছোট্ট মেয়েটি ছুটে এসে দেখতে পায়, পিতার হাতে-পায়ে বেড়ী বাঁধা এবং সৈন্যরা তাঁকে টানা-হেঁচড়া করছে। অবুঝ মেয়েটি তাঁর আব্বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ-মাউ করে কাঁদতে থাকে। তিনি অত্যন্ত দরদের সাথে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে বলেন ঃ আমার কলিজার টুকরো মেয়ে তোমার মাকে বলবে : ইনশা'আল্লাহ জান্নাতে তাঁর সাথে আমার আবার দেখা হবে। এরপর তিনি সৈনিকদের সাথে চলতে থাকেন।

হাজ্জাজের সামনে বন্দীদের উপস্থিত করা হলো। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন 'আমির আশ-শা'বী, মুতাররিফ ইবন 'আবদিল্লাহ আশ-শিখ্খীর ও সা'ঈদ ইবন জুবায়রের (রহ) মত প্রখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ। শা'বী ও মুতাররিফ ক্ষেত্র বিশেষে চাতুরি ও কৌশল অবলম্বনকে দোষের কিছু মনে করতেন না। কিন্তু সা'ঈদ ইবন জুবায়র (রহ) কোন অবস্থায়ই ছল-চাতুরি পছন্দ করতেন না। বন্দীদের পৌঁছার পূর্বেই হাজ্জাজের নিকট খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের এই মর্মে একটি চিঠি পৌঁছে যে, বন্দীদের মধ্যে যারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে 'কুফর' বলে স্বীকার করবে তাদেরকে মুক্তি দিবে। আর যারা মনে করবে যে, বিদ্রোহে অংশগ্রহণের পরেও তারা মু'মিন আছে তাদেরকে হত্যা করবে। শা'বী ও মুতাররিফকে হাজ্জাজের সামনে হাজির করা হলে তাঁরা দু'জন সরাসরি কুফরী কাজ করেছেন বলে স্বীকার না করলেও বাকচাতুরির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে হাজ্জাজের দাবীকে অনেকটা মেনে নেন। ফলে হাজ্জাজ তাদের দু'জনকে মুক্তি দেন। সবশেষে সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে হাজির করা হয়।[৫৮]

হাজ্জাজ সা'ঈদ ইবন জুবায়রের নিকট পর্যুদস্ত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁকে দেখা মাত্র তাঁর মাথায় রক্ত উঠে যায়। তখন দু'জনের মধ্যে নিম্নোক্ত ধরনের সংলাপ হয় :

---

৫৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/১৭৬, ৪৬৪; ৫/৫৪

হাজ্জাজ : আপনার নাম?

ইবন জুবায়র : সা'ঈদ ইবন জুবায়র। (উল্লেখ্য যে, সা'ঈদ অর্থ সৌভাগ্যবান, আর জুবায়র অর্থ ভাঙ্গা হাড় জোড়াদানকারী)

হাজ্জাজ : না, আপনার নাম বরং এর বিপরীত 'শাকী ইবন কুসায়র' হওয়া উচিত। (শাকী অর্থ হতভাগা, আর কুসায়র অর্থ হাড় ভঙ্গকারী)

ইবন জুবায়র : আমার মা আমার নামের ব্যাপারে আপনার চেয়েও বেশী জানতেন।

হাজ্জাজ : আপনার মা ছিলেন একজন হতভাগীনী এবং আপনিও একজন হতভাগা।

ইবন জুবায়র : অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল অন্য এক সত্তারই আছে।

হাজ্জাজ : আমি আপনার পার্থিব জীবনকে দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনে পরিণত করে দেব।

ইবন জুবায়র : আমার যদি এমন বিশ্বাস হতো যে, এটা আপনার ক্ষমতার আওতায় আছে তাহলে আমি আপনাকে আমার মা'বুদ (উপাস্য) বানিয়ে নিতাম।

হাজ্জাজ : মুহাম্মাদ (সা)-এর ব্যাপারে আপনার কিরূপ ধারণা?

ইবন জুবায়র : তিনি সঠিক পথের দিশারী নেতা এবং রহমতের নবী।

হাজ্জাজ : 'আলী ও 'উছমানের (রা) ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তাঁরা জান্নাতে আছেন না জাহান্নামে?

ইবন জুবায়র : সেখানে যদি আমার যাওয়া হতো এবং তাঁদেরকে স্বচক্ষে দেখতে পেতাম তাহলে তাঁদের সম্পর্কে বলতে পারতাম (অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর আমি কেমন করে দেব?)।

হাজ্জাজ : খলীফাদের ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

ইবন জুবায়র : আমি তাঁদের মুখপাত্র নই।

হাজ্জাজ : তাঁদের মধ্যে কাকে আপনি সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন?

ইবন জুবায়র : যিনি আমার স্রষ্টার নিকট বেশী পছন্দনীয়।

হাজ্জাজ : স্রষ্টার নিকট কে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয়?

ইবন জুবায়র : এ জ্ঞান তো কেবল সেই সত্তারই আছে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন।

হাজ্জাজ : 'আবদুল মালিকের ব্যাপারে আপনার রায় কি?

ইবন জুবায়র : আপনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে কি জিজ্ঞেস করছেন যার পাপসমূহের একটি পাপ হলো আপনার বিদ্যমানতা।

হাজ্জাজ : আপনি কি ইবনুল আশ'আছের সাথে বিদ্রোহে শরিক হওয়াকে কুফরী কাজ বলে বিশ্বাস করেন?

ইবন জুবায়র : আমি যেদিন থেকে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, সেদিন থেকে আর কখনো কুফরী কাজ করিনি।

হাজ্জাজ : আপনি হাসেন না কেন?

ইবন জুবায়র : সে কেমন করে হাসতে পারে যাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর সেই মাটিকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

হাজ্জাজ : তাহলে আমরা বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের সময় হাসি কেন?

ইবন জুবায়র : সবার অন্তর এক রকম হয় না।

হাজ্জাজ : আপনি কখনো বিনোদনের সাজ-সরঞ্জাম দেখেছেন?

এ প্রশ্নের পর হাজ্জাজ সেতার ও বাঁশি বাজানোর নির্দেশ দেন। সেই সুর শুনে ইবন জুবায়র কেঁদে ফেলেন। হাজ্জাজ বললেন : এখানে কান্নার এমন কি হলো। সুর তো চিত্তবিনোদনের জিনিস। ইবন জুবায়র বললেন : না, তা হবে কেন। এ তো বিষাদের করুণ অভিব্যক্তি। বাঁশির সুর আমাকে সেই মহা প্রলয়ের দিনটির কথা স্মরণ করে দিয়েছে যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। আর একথাও মনে করে দিয়েছে যে, এ বাঁশিটি কোন গাছের একটি টুকরো, যা হয়তো অন্যায়ভাবে কাটা হয়েছে। আর এর তারগুলিও কোন বকরী-পাঁঠার শিরা-উপশিরা, যেগুলিকে কিয়ামতের দিন আবার জীবিত করা হবে। একথা শুনে হাজ্জাজ বললেন : সা'ঈদ, তোমার অবস্থার জন্য আফসোস হয়। সা'ঈদ বললেন : এমন ব্যক্তি আফসোসের যোগ্য কেমন করে হতে পারেন যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে ঢুকানো হয়েছে? এরপর আবার নিম্নোক্ত সংলাপ শুরু হয় :

হাজ্জাজ : আমি কি আপনাকে কূফার ইমাম বানাইনি?

ইবন জুবায়র : হাঁ, বানিয়েছিলেন।

হাজ্জাজ : আমি কি আপনাকে কূফার কাজীর পদে নিয়োগ দিইনি? তারপর যখন কূফাবাসীরা এ নিয়োগের বিরোধিতা করে দাবী করলো যে, কূফার কাজীকে একজন আরব বংশোদ্ভূত ব্যক্তি হতে হবে, তখন আমি আবূ বুরদাকে কাজী নিয়োগ করি। তবে তাঁকে একথাও বলে দিই, তিনি যেন আপনার সাথে পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ না করেন।

ইবন জুবায়র : হাঁ, আপনার কথা ঠিক।

হাজ্জাজ : আমি কি আপনাকে আমার বিশেষ পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত করিনি? অথচ অন্যরা সবাই ছিল আরবের বিখ্যাত গোত্রপতি।

ইবন জুবায়র : হাঁ, একথাও ঠিক।

হাজ্জাজ : আমি কি আপনাকে এক লাখ নগদ অর্থ দরিদ্র লোকদের মধ্যে বণ্টনের জন্য দিইনি এবং তার কোন হিসাবও নিইনি?

ইবন জুবায়র : হাঁ, দিয়েছেন।

হাজ্জাজ : আমার এত অনুগ্রহের পরেও আমার বিরুদ্ধাচরণের জন্য আপনাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করলো?

ইবন জুবায়র : আমার গলায় ইবনুল আশ'আছের বাই'আতের বেড়ী ছিল।

হাজ্জাজ : আল্লাহর একজন দুশমনের বাই'আতের প্রতি এত আনুগত্য, আর আমীরুল মু'মিনীনের বাই'আত ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কথা ভুলে গেলেন? আল্লাহর কসম!

আমি আপনাকে হত্যা করে জাহান্নামে না পাঠিয়ে এ স্থান ত্যাগ করবো না। বলুন, আপনি কিভাবে মরতে ইচ্ছা করেন। জাল্লাদ আপনার সামনে উপস্থিত।

ইবন জুবায়র : আল্লাহর কসম! আপনি দুনিয়াতে আমাকে যেভাবে হত্যা করবেন, আল্লাহ আখিরাতে আপনাকে সেভাবে হত্যা করবেন। আপনিই বেছে নিন, আমাকে কিভাবে হত্যা করবেন।

হাজ্জাজ : আপনি কি চান, আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিই?

ইবন জুবায়র : যদি আপনি ক্ষমা করেন, তবে তা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকেই (সেটা আপনার কোন করুণা হবে না)।

হাজ্জাজ : আমি আপনাকে হত্যা করবো।

ইবন জুবায়র : আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। যদি আমার সে সময় এসে থাকে তা হলে তা তো একটি স্থিরকৃত বিষয়। তা থেকে পালানোর কোন উপায় নেই। আর যদি বেঁচে যাই তা হলে তাও আল্লাহর হাতে।

উপরোক্ত সংলাপের পর হাজ্জাজ জাল্লাদকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন কাঁদতে আরম্ভ করলেন। ইবন জুবায়র তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কাঁদছো কেন? লোকটি বললো : আপনার হত্যার নির্দেশ শুনে। বললেন: এজন্য কাঁদার কোন প্রয়োজন নেই। এ ঘটনা তো সেই অনাদি কাল থেকে আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তারপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :[৫৯]

مَاأَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيْٓ أَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ قَبْلَ أَنْ نَبْرَأَهَا.

– এমন কোন বিপদ নেই যা পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের নিজেদের উপর আপতিত হয়, আর আমরা তা সৃষ্টি করার পূর্বে একটি কিতাবে (অর্থাৎ ভাগ্যলিপিতে) লিখে রাখিনি।

বধ্যভূমিতে যাবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি ছেলেকে দেখার জন্য ডাকলেন। সে এসে কাঁদতে লাগলো। তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি কাঁদছো কেন? সাতান্ন বছরের বেশী তোমার পিতার জীবনই ছিল না। তাহলে কাঁদার কি কারণ থাকতে পারে।

অতঃপর তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে হাসতে হাসতে বধ্যভূমির দিকে চলতে থাকেন। হাজ্জাজকে বলা হলো যে, এ সময়ও ইবন জুবায়রের ঠোঁটে হাসি শোভা পাচ্ছে। হাজ্জাজ তাঁকে আবার ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি হাসছিলেন কেন? ইবন জুবায়র বললেন : আল্লাহর মুকাবিলায় আপনার দুঃসাহস এবং আপনার মুকাবিলায় তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখে।

তাঁর এ জবাব শুনে হাজ্জাজ নিজের সামনেই হত্যার চামড়া বিছানোর নির্দেশ দিলেন এবং হত্যারও ইঙ্গিত করলেন। ইবন জুবায়র বললেন : দু'রাক'আত নামায আদায়ের

---

[৫৯] সূরা আল-হাদীদ-২২

সুযোগ দিন। হাজ্জাজ বললেন : যদি পূর্ব দিকে মুখ করে পড়তে পারেন তাহলে দেওয়া যেতে পারে। বললেন : কোন পরোয়া নেই। তারপর পাঠ করেন এ আয়াত :

اَيْنَمَا تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ.

– যে দিকেই তোমরা তোমাদের মুখ ফেরাও সে দিকেই আল্লাহর মুখমণ্ডল বিদ্যমান।

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

– আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরালাম সেই সত্তার দিকে যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিক (অংশীবাদী)-দের অন্তর্ভুক্ত নই।[৬০]

তারপর হাজ্জাজ তাঁকে মাথা নিচু করার নির্দেশ দিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় ও আনুগত্যের সাথে মাথা নিচু করে পাঠ করলেন :

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰي.

– আমি এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আবার সেই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব। তারপর সেই মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করবো।

তারপর কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে দু'আ করেন : 'হে আল্লাহ! আমার হত্যার পর তাঁকে আর কাউকে হত্যার ক্ষমতা ও সুযোগ দেবেন না।'

জাল্লাদ কোষমুক্ত তরবারি হাতে প্রস্তুত ছিল। হাজ্জাজের নির্দেশের পর হঠাৎ তরবারি ঝলকে উঠলো এবং একজন সত্যের সৈনিকের মাথা মাটিতে তড়পাতে লাগলো। মাটিতে পড়ার পর তাঁর মুখের সর্বশেষ উচ্চারণ ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। এ হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয় হিজরী ৯৪ সনের শা'বান মাসে। তখন ইবন জুবায়রের বয়স হয়েছিল ৫৭, মতান্তরে ৪৯ বছর। অনেকে বলেছেন, ইবরাহীম আত-তায়মী, হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ, সা'ঈদ ইবন জুবায়র একই বছর মারা যান। আর সেটা ছিল হিজরী ৯৫ সন। ওয়াসিতে তাকে দাফন করা হয়। হাজ্জাজের দারোয়ান বলেছেন, আমি সা'ঈদ ইবন জুবায়রের মাথা কাটার পর মাটিতে পড়ে তড়পাতে তড়পাতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করতে দেখেছি।[৬১] ইমাম নাবাবী বলেছেন, হাজ্জাজ ঠাণ্ডা মাথায় এবং অন্যায়ভাবে সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে হত্যা করেন।[৬২]

সা'ঈদ ইবন জুবায়রের (রহ) ব্যক্তিত্ব এত বিশাল ছিল যে, তৎকালীন সকল বড় তাবি'ঈ

---

৬০. সূরা আল-আন'আম-৯

৬১. সা'ঈদ ইবন যুবায়রের সাথে হাজ্জাজের আচরণ ও তাঁর হত্যার ঘটনাটি রিজাল শাস্ত্রের প্রায় সকল গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর তা সাজালে আমাদের এ বর্ণনার রূপ লাভ করে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : ইবন খাল্লিকান, খ.২, পৃ. ৩৭২-৩৭৪; শাযারাতুয যাহাব-খ.১ পৃ. ১০৯-১১০; আত-তাবাকাত, খ. ৬, পৃ. ২৬৩-২৬৬; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ.৫, পৃ. ৫৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, খ.১, পৃ. ৭৬-৭৭. তাহ্যীবুল কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল, খ.২, পৃ-২৩২; আয-যাহাবী; তারীখ আল-ইসলাম, খ. ৩. পৃ. ৩২৮।

৬২. তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬

তাঁর শাহাদাতের ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। হযরত হাসান বাসরী (রহ) বলেন: 'হে আল্লাহ! আপনি ছাকীফ গোত্রের এ পাপাচারী (হাজ্জাজ) থেকে বদলা নিন। আল্লাহর কসম! ধরা পৃষ্ঠের সকল অধিবাসীও যদি তাঁর হত্যায় অংশগ্রহণ করতো তাহলেও আল্লাহ্ তাদের সকলকে নিম্নমুখী করে জাহান্নামে ফেলতেন।[৬৩]

সা'ঈদ ইবন জুবায়রের (রহ) গায়ের রং ছিল কালো। মাথার চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল। খিজাব লাগানো পছন্দ ছিল না। এক ব্যক্তি কালো খিজাব লাগানোর ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দার চেহারা নূর দ্বারা আলোকিত করেন, আর বান্দা তা কালো খিজাব দ্বারা অন্ধকার করে দেয়।[৬৪]

সা'ঈদ ইবন জুবায়রের (রহ) বদ-দু'আ ব্যর্থ হয়নি। অন্যায়ভাবে ঝরানো তাঁর রক্ত তৎপর হয়ে ওঠে। তাঁর নিহত হবার পরেই হাজ্জাজ মস্তিষ্কের কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে অচেতন হয়ে পড়তেন। তখন দেখতেন যে, ইবন জুবায়র (রহ) তাঁর কাপড় ধরে তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, 'ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই আমাকে কোন অপরাধে হত্যা করেছিস?' এ দুঃস্বপ্ন দেখে ভীত-চকিত অবস্থায় উঠে বসে পড়তেন। তারপর আপন মনে বলতে থাকতেন, সা'ঈদের সাথে আমার সম্পর্ক কি? এই মাথা খারাপ অবস্থায় হাজ্জাজ হিজরী ৯৫ সনে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে স্বৈরাচারী হাজ্জাজের জীবনের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে। ইবন জুবায়রের (রহ) হত্যার পর কোন মানুষের প্রাণনাশের সুযোগ আল্লাহ্ তাকে আর দেননি।[৬৫]

হাজ্জাজের মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে। সে হাজ্জাজকে জিজ্ঞেস করে : আল্লাহ্ তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করছেন? হাজ্জাজ বলেন : আমার নির্দেশে নিহত প্রত্যেক ব্যক্তির বদলায় আমাকে একবার করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু সা'ঈদ ইবন জুবায়রের (রহ) বদলায় হয়েছে সত্তুরবার।[৬৬]

তিনি আরো বলেন, আমি এখন অপেক্ষায় আছি, একজন একেশ্বরবাদী যা কিছুর অপেক্ষায় থাকে, তার।[৬৭]

'আবদুল্লাহ্, মুহাম্মাদ ও 'আবদুল মালিক– এ তিন ছেলে তিনি রেখে যান।[৬৮]

---

[৬৩] ৬৩. ইবন খাল্লিকান-২/৩৭৪

[৬৪] ৬৪. আত-তাবাকাত-৬/২৬৭

[৬৫] ৬৫. ইবন খাল্লিকান-২/৩৭৩

[৬৬] ৬৬. প্রাগুক্ত-২/৩৭৪

[৬৭] ৬৭. আল-'ইক্দ অল-ফারীদ-৫/৫৬

[৬৮] ৬৮. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৭

সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (রা)

সালিম একজন বিখ্যাত তাবি'ঈ। ডাক নাম আবূ 'উমার, 'উমায়র বা আবূ 'আবদিল্লাহ।[১] তাঁর পিতা হযরত ফারূকে আ'জাম 'উমার (রা)-এর সুযোগ্য সন্তান হযরত 'আবদুল্লাহ (রা)। পিতৃকুলের মত তাঁর মাতৃকুলও অত্যন্ত অভিজাত। খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে শাহেনশাহে ইরান ইয়াযদিগিরদের যে কন্যারা বন্দী হয়ে মদীনা এসেছিলেন তাঁদেরই একজনকে হযরত 'আবদুল্লাহকে দান করা হয়েছিল। তাঁরই গর্ভে সালিমের জন্ম হয়। এভাবে তাঁর ধমনীতে ইরানের শাহী খান্দানের রক্তও প্রবাহিত ছিল।[২] হযরত উছমানের (রা) খিলাফতকালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা একজন উম্মু ওলাদ।[৩]

উল্লেখ্য যে, শেষ পারস্য সম্রাট ইয়াযদিগিরদ-এর তিন কন্যা যুদ্ধবন্দী হিসেবে মদীনায় আসেন। সমতা ও সাম্যের প্রতীক খলীফা 'উমার (রা) নিয়ম অনুযায়ী তাঁদেরকে দাসী হিসেবে বিক্রীর উদ্যোগ নেন। দুঃখ ও হতাশায় তখন কন্যাদের দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। আর তা দেখে হযরত 'আলীর (রা) অন্তর বিগলিত হয়। তিনি শাহেনশাহে ইরানের কন্যাদেরকে যথাযথ মর্যাদা দানের জন্য তৎপর হন। তিনি খলীফা 'উমারকে (রা) বলেন, সাধারণ যুদ্ধবন্দী মহিলাদের মত এই তিন সম্রাট কন্যার সাথে একই আচরণ করা ঠিক হবে না। অতঃপর আলী (রা) ও অন্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শের পর কুরায়শ বংশের সম্মানীয় তিন যুবকের হাতে তিনজনকে তুলে দেওয়া হয়। সেই তিন যুবক হলেন : হুসায়ন ইবন 'আলী (রা), মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা) ও আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা)। পরবর্তীতে এই তিন বোন তিনজন বিখ্যাত সন্তানের গর্বিত মা হন। প্রথমজন হলেন 'আলী যয়নুল 'আবিদীনের গর্বিত মা। দ্বিতীয়জন জন্ম দেন কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরকে (রা)। এই কাসিম ছিলেন মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহ্র অন্যতম। আর তৃতীয়জন হলেন সালিম ইবন 'আবদিল্লাহর (রা) সম্মানিতা জননী।

সালিমের পিতা হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) ঐসব ব্যক্তিদের একজন যাঁরা ছিলেন 'ইলম ও 'আমল এবং যুহ্দ ও তাকওয়ার বাস্তব প্রতীক। তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সালিমও পিতার যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে গড়ে ওঠেন। সীরাত বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত যে, 'উমারের (রা) সাথে সাদৃশ্য ছিল 'আবদুল্লাহর। আর 'আবদুল্লাহর সন্তানদের মধ্যে তাঁর সাথে বেশী সাদৃশ্য ছিল সালিমের।[৪] এভাবে সালিম ছিলেন যেন তাঁর দাদা 'উমার ফারূকের (রা) বাস্তব প্রতিকৃতি।

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৮; তাবাকাত-৫/১৯৫

২. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৩/৪৩৮

৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৫৮। কোন দাসী সন্তানের মা হলে ইসলামের পরিভাষায় 'উম্মু ওলাদ' বলা হয়। এমন দাসীকে ক্রয়-বিক্রয়, দান বা এ জাতীয় কোনভাবে হস্তান্তর করা বৈধ নয়।

৪. তাবাকাত-৫/১৯৬; তারীখ ইবন আসাকির-৭/১৩

সালিম মদীনার ঐসব তাবি'ঈর অন্তর্ভুক্ত যাঁরা ছিলেন 'ইলম ও 'আমল উভয় ক্ষেত্রের অধিপতি। ইমাম আয-যাহাবী লিখেছেন, তিনি ছিলেন ফকীহ্, হুজ্জাত এবং ঐ সকল বিশেষ 'আলেমের অন্তর্গত যাঁদের সত্তায় 'ইলম ও 'আমলের সমাবেশ ঘটেছিল।[৫] তিনি তাঁকে একজন ইমাম, যাহিদ (দুনিয়া বিরাগী), হাফিজ, মদীনার মুফতী, কুরায়শ বংশীয় ইত্যাদি বলেও উল্লেখ করেছেন।[৬] ইমাম নাবাবী লিখেছেন, সালিমের ইমামত, মহত্ত্ব, বৈরাগ্য, আল্লাহভীতি ও অত্যুচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে সবাই একমত।[৭] ইবন খাল্লিকান তাঁকে মদীনার অন্যতম ফকীহ্ এবং তাবি'ঈ, 'আলিম ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের নেতা বলেছেন।[৮]

তাফসীর, হাদীছ, ফিকাহ্ তথা সব শাস্ত্রে তাঁর সমান দক্ষতা ও পারদর্শিতা ছিল, কিন্তু অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বনের কারণে কুরআন পাকের তাফসীর বর্ণনা করতেন না।[৯] আর এজন্য মুফাস্সির হিসেবে তিনি কোন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেননি।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) ছিলেন হাদীছের এক শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। সালিম বেশীর ভাগ হাদীছ তাঁর নিকট থেকেই শুনেছেন। ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ বলেন : আমি সালিমকে প্রশ্ন করলাম : আপনি কি আপনার পিতা 'আবদুল্লাহর নিকট থেকে কোন হাদীছ শুনেছেন? বললেন : একবার নয়। এক শো বারেরও বেশী শুনেছি।[১০] তাছাড়া আরো অনেক উঁচুস্তরের সাহাবী, যেমন : আবূ হুরাইরা (রা), আবূ আইউব আল-আনসারী (রা), উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা সিদ্দীকা (রা), যায়িদ ইবন খাত্তাব, আবূ লুবাবা, রাফি' ইবন খাদীজ সাফীনা, আবূ রাফি' (রা) প্রমুখ থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন।[১১] এসব মহান ব্যক্তিদের ফয়েজ ও বরকতে তাঁর জ্ঞানের পরিধি সীমাহীন বিস্তার লাভ করে। ইবন সা'দ লিখেছেন, সালিম ছিলেন নির্ভরযোগ্য, বহু হাদীছের ধারক এবং অত্যুচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি।[১২]

সালিমের নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন : 'আমর ইবন দীনার, ইমাম যুহ্রী, মূসা ইবন 'উকবা, হুমায়দ আত-তাবীল, সালিহ ইবন কাইসান, 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন হাফ্স, আবূ ওয়াকিদ আল লায়ছী, 'আসিম ইবন 'আবদিল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবন আবী বাক্র, হানজালা ইবন আবী সুফয়ান, আবূ কিলাবা জুরমী ও আরো অনেকে। এসব শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ মুহাদ্দিছ ছিলেন তাঁর ছাত্র।[১৩]

---

[৫] ৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৮
[৬] ৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৫৮
[৭] ৭. তাহযীবুল আসমা'-১/৩৭
[৮] ৮. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৪৯
[৯] ৯. তাবাকাত-৫/২০০
[১০] ১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৫৮, তারীখ ইবন 'আসাকির-৭/১৪
[১১] ১১. তাহযীবুত তাহযীব-৩/৪৩৭
[১২] ১২. তাবাকাত-৫/১৯৮
[১৩] ১৩. তাহযীবুত তাহযীব-৩/৪৩৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৫৯

হযরত সালিমের জ্ঞান চর্চার বিশেষ ক্ষেত্র ছিল ফিকাহ্ শাস্ত্র। এ শাস্ত্রে তিনি ইমামের মর্যাদা অর্জন করেন। কোন কোন ইমাম, যাঁদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ্ ইবন মুবারাকও আছেন, তাঁকে মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহ্র মধ্যে গণ্য করতেন।[১৪] সাতজন ফকীহ্র নির্ধারণে মতপার্থক্য আছে। বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ চিন্তা ও দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন জনের নাম বলেছেন। যাই হোক না কেন, এই তালিকার মধ্যে সালিমের নামটিও উচ্চারিত হয়েছে। ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর যোগ্যতা ও উৎকর্ষতার সবচেয়ে বড় সনদ এই যে, মদীনার ফাতওয়া দানকারী দলটির তিনিও একজন বিশেষ সদস্য ছিলেন।[১৫] তাঁদের মতামতের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে কোন কাজীই সিদ্ধান্ত দান করতেন না।[১৬]

হযরত সালিমের মধ্যে যে পরিমাণ জ্ঞান ছিল সেই পরিমাণ 'আমলও ছিল। ইমাম মালিক (রহ) বলতেন, সালিমের যুগে যুহ্দ ও তাকওয়ায় এবং মহত্ব ও মর্যাদায় তাঁর চেয়ে বেশী পূর্বসূরীদের সাথে সাদৃশ্যের অধিকারী কেউ ছিলেন না।[১৭] ইমাম নাবাবী, ইমাম আয-যাহাবীসহ অন্যান্য সীরাত বিশেষজ্ঞ তাঁর যুহ্দ ও তাকওয়া এবং ইল্ম ও 'আমলের ব্যাপারে একই রকম বর্ণনা দিয়েছেন।

'আকীদা-বিশ্বাসে তিনি সত্যনিষ্ঠ পূর্বসূরীদের সাদামাটা ও নির্ভেজাল বিশ্বাসের অনুসারী ছিলেন। সুতরাং পরবর্তীকালে 'আকীদার ব্যাপারে যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয় তিনি তা ভীষণ ঘৃণা করতেন। কাদরিয়া গোষ্ঠী, যারা তাকদীরের উপর ভিত্তি করে ভালো ও মন্দের বিশ্বাস করতো তাদের প্রতি তিনি অভিশাপ দিতেন।[১৮]

তিনি প্রতিটি ব্যাপার ও বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যে কথার মধ্যে মিথ্যার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকতো তা পছন্দ করতেন না। তাঁর সময়ে 'সাতগজী' বলে একটি কাপড় প্রসিদ্ধ ছিল। আসলে তা সাত গজের চেয়ে কিছু কম হতো। কিন্তু 'সাতগজী' বলেই তা প্রচলিত ছিল। মারওয়ান ইবন যুবায়র বর্ণনা করেছেন : একবার সালিম কাপড় কিনতে আসলেন। আমি তাঁর সামনে 'সাতগজী' মেলে দিলাম। সেটি সাত গজের চেয়ে একটু কম ছিল। তিনি বললেন, তুমি তো সাত গজ বলেছিলে। আমি বললাম, আমরা এটাকে 'সাতগজী' বলে থাকি। তিনি বললেন, মিথ্যা এভাবেই হয়ে থাকে।[১৯]

একজন মুসলমানের রক্ত হযরত সালিমের নিকট এত সম্মানের ছিল যে, কোন অপরাধী মুসলমানের উপরও তিনি হাত উঠাতেন না। একবার জালিম হাজ্জাজ তাঁকে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দেয়, যে হযরত উছমানের হত্যার অন্যতম সাহায্যকারী ছিল।

---

[১৪] তাহযীবুল আসমা'-১/২০৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬১

[১৫] আ'লাম আল মুওয়াক্কি'ঈন-১/২৫

[১৬] সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬১

[১৭] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৯

[১৮] তাবাকাত-৫/২০০

[১৯] প্রাগুক্ত-৫/১৯৯

তিনি তলোয়ার হাতে করে অপরাধীর দিকে এগিয়ে যান। নিকটে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি মুসলমান? সে উত্তর দেয়, হাঁ, আমি মুসলমান। কিন্তু আপনাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা পালন করুন। তিনি আবার তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি কি আজ সকালে ফজরের নামায আদায় করেছো? সে উত্তর দিল, হাঁ, আদায় করেছি। এ কথা শুনে সালিম ফিরে যান এবং হাজ্জাজের সামনে তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, এ ব্যক্তি মুসলমান। আজ সকাল পর্যন্ত সে নামায আদায় করেছে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে সকালের নামায আদায় করেছে সে আল্লাহর হিফাজত ও নিরাপত্তায় এসে গেছে। হাজ্জাজ বললো, আমরা তো তার সকালের নামাযের জন্য হত্যা করছিনে, বরং এ জন্য হত্যা করছি যে, সে 'উছমানের (রা) হত্যাকারীদের একজন সাহায্যকারী ছিল। সালিম বললেন, এ জন্য আরো মানুষ বর্তমান আছে যারা 'উছমানের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার আমাদের চেয়েও বেশী হকদার। সালিমের পিতা হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) এ ঘটনা শুনে মন্তব্য করেন, সালিম বুদ্ধিমানের কাজ করেছে।[২০]

তিনি এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট নিজের প্রয়োজনের কথা বলা পছন্দ করতেন না। খলীফা ও আমীর-উমারাদের ধন-দৌলত এবং তাঁদের দান-খয়রাতের ব্যাপারে এত উদাসীন ও বেপরোয়া ছিলেন যে, তাদের অনেকের আবেদন ও অনুরোধের পরেও কখনো কোন ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। খলীফা সুলায়মান মতান্তরে হিশাম ইবন 'আবদুল মালিক ছিলেন তাঁর একজন গুণমুগ্ধ ব্যক্তি। তিনি সালিমকে অতিরিক্ত সম্মান করতেন। তিনি মাঝে মধ্যে অতি সাধারণ মোটা ছেঁড়া কাপড় পরে নির্দ্বিধায় তাঁর দরবারে ঢুকে যেতেন। আর এ অবস্থায় খলীফা তাঁকে সংগে করে এক সাথে খলীফার আসনে গিয়ে বসতেন।[২১] একবার তিনি হজ্জে যান। কা'বার আঙ্গিনায় খলীফা হিশাম/সুলায়মানের সাথে দেখা হয়। খলীফা তাঁর নিকট আবেদন করেন, আপনার যা যা প্রয়োজন আমাকে বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহর ঘরের মধ্যে অন্য কারো কাছে কিছুই চাইবো না।[২২]

কা'বার আঙ্গিনা থেকে বের হওয়ার পর খলীফা তাঁকে বললেন, এবার আপনার প্রয়োজনের কথা একটু বলুন। বললেন : দুনিয়ার প্রয়োজন না আখিরাতের? খলীফা বললেন : দুনিয়ার প্রয়োজনের কথাই বলুন। বললেন : এই দুনিয়ার যিনি মালিক তাঁর কাছেই তো আমি কিছু চাইনি। আর যে এর কোন কিছুর মালিক নয় তার কাছে কি চাইবো?[২৩]

একবার 'আরাফার দিনে তিনি এক ব্যক্তিকে মানুষের নিকট সাহায্য চাইতে দেখে বললেন : ওরে নির্বোধ! আজকের দিনে তুই অল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে চাইছিস?[২৪]

---

২০. তাবাকাত-৫/১৯৫; তারীখ ইবন 'আসাকির-৭/১৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬৬

২১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮৯

২২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৫০; আল-বায়ান ওয়াত তাবঈন-৩/১২৭

২৩. সিফাতুস সাফওয়া-২/৫১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬৬

২৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/২৮০

আশ'আব বলেন : সালিম আমাকে বলেছেন, তুমি এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কিছু চাইবে না।[২৫]

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) যখন মদীনার ওয়ালী ছিলেন তখন হযরত সালিম (রহ) তাঁর দরবারে যাওয়া-আসা করতেন। সেখানে একবার তাঁর সাথে আরব কবি দুকায়ম ইবন আর-রাজা'র পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) খলীফা হওয়ার পর সালিম ও মুহাম্মাদ ইবন কা'বকে দরবারে ডেকে পাঠান। তাঁরা উপস্থিত হলে খলীফা বলেন : আপনারা আমাকে কিছু উপদেশ দিন। সালিম বললেন : আপনি মানুষকে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা জ্ঞান করবেন। তারপর পিতার সেবা ও ভ্রাতার নিরাপত্তা বিধান করবেন। আর পুত্রের প্রতি স্নেহপরায়ণ হবেন।[২৬]

হযরত সালিমের ওয়াজ-নসীহত ছিল খুবই চিত্তাকার্ষক ও প্রভাব সৃষ্টিকারী। একবার 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীয (রহ) তাঁকে লিখলেন, আপনি আমাকে 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) কিছু সিদ্ধান্ত লিখে পাঠান। জবাবে তিনি লিখে পাঠান, 'উমার, সেইসব বাদশাহকে স্মরণ করুন যাদের সেইসব চোখ অন্ধকার হয়ে গেছে যা কখনো দেখার স্বাদ থেকে তৃপ্ত হতো না। সেইসব পেট ফেটে গেছে যা প্রাসাদের অঢেল সম্পদ দ্বারা কখনো পরিতৃপ্ত হতো না। আজ তারা যমীনের টিলার নীচে মৃত পড়ে আছে। যদি তারা আমাদের জনপদের নিকটবর্তী হতো তাহলে তাদের সেই দেহের দুর্গন্ধ আমাদের বিরক্তি ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতো।[২৭]

হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর মহান পিতা হযরত 'উমার ফারূকের (রা) মত খুব কমই স্নেহ-মমতার আতিশয্য দেখাতেন। কিন্তু পুত্র সালিমের চারিত্রিক গুণাবলী ও উৎকর্ষতার কারণে তাঁর প্রতি আবেগের তীব্রতা ছিল একটু বাড়াবাড়ি রকমের। সালিমের বয়স যখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যায় তখনো 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁকে স্নেহ-মমতার প্রাবল্যে চুমা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা কি অবাক হও না এই দেখে যে, একজন বৃদ্ধ তাঁর প্রৌঢ় ছেলেকে চুমা দেয়? যাঁরা তাঁর এমন পক্ষপাতমূলক স্নেহ-মমতার সমালোচনা করতো তাদের জবাবে তিনি নিম্নের চরণটি আবৃত্তি করতেন।[২৮]

يَلُوْمُوْنَنِي فِيْ سَالِمٍ وَأَلُوْمُهُمْ # وَجِلْدَةُ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالأَنْفِ سَالِمُ

–মানুষ আমাকে সালিমের ব্যাপারে তিরস্কার করে এবং আমিও তাদের তিরস্কার করি। সালিম চোখ ও নাকের মধ্যবর্তী ত্বকের মত আমার প্রিয়।

সালিমের জীবন যাপন প্রণালী ছিল অতি সহজ ও সাধারণ। কৃত্রিম লৌকিকতা, ভনিতার লেশমাত্র তাতে ছিল না। ইমাম যাহাবী লিখেছেন, তাঁর জীবন ছিল শুষ্ক কাটখোট্টা ও

---

২৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬৩

২৬. আল-'ইকদ আল ফারীদ-১/৪০; ২/৮৫

২৭. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৫০

২৮. সিফাতুস সাফওয়া-২/৫০; তাবাকাত-৫/১৯৫; আল-'ইকদ আন-ফারীদ-২/৪৩৭; ৫/২৮৭

অতি সাদামাটা। বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের জন্য সব সময় মোটা পশমের পোশাক পরতেন। মাইমূন ইবন সাহ্‌রান বলেন, তিনি তাঁর পিতার মতই ছিলেন। বিলাসিতা ও সৌখিনতার লেশমাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ ও সচ্ছলতাও তাঁর ছিল না। বর্ণিত আছে, বাজারে কেনাবেচা করতেন। নিজ হাতে সব কাজও করতেন।[২৯] হানজালা বলেন, আমি সালিমকে বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করতে দেখেছি।[৩০] তাঁর সমসাময়িক অন্য একজন তাবি'ঈ আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ পরতেন রেশম ও পশম মিশ্রিত এক প্রকার পোশাক, আর তিনি পরতেন মোটা পশমী পোশাক; দু'জন মদীনার একই মজলিস ও মসজিদে বসতেন। কেউ কাউকে কোন ব্যাপারে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না।[৩১] তিনি কুরবানীর পশুর চামড়ার তৈরী পোশাকও পরতেন।[৩২] বাম হাতের আঙ্গুলে রূপোর আংটি ধারণ করতেন এবং তাতে তাঁর নামটি অংকিত থাকতো। জামা ও চাদর পরতেন। জামাটি পায়ের নলার মাঝ বরাবর লম্বা ছিল। টুপি ও পাগড়ী পরতেন। পাগড়ীর এক মাথা পিছন দিকে এক বিঘত বা তার কিছু বেশী ছেড়ে রাখতেন।[৩৩]

তিনি যে পোশাক পরতেন তার মূল্য হতো মাত্র দুই দিরহাম।[৩৪] শুকনো রুটি ও যয়তুনের তেল ছিল তাঁর প্রধান খাদ্য। তাঁর দাদা হযরত ফারূক আ'জমের (রা) জীবনও ছিল এমন। তিনি গোশত খুব কম খেতেন। মানুষকে গোশত বেশী খেতে নিষেধ করতেন। বলতেন, গোশত কম খাবে। কারণ, তার মধ্যে মদের মতই তেজী ভাব আছে।[৩৫]

এমন অতি সাধারণ খাবার খাওয়া সত্ত্বেও তাঁর শরীর ছিল খুবই পুষ্ট ও সজীব। একবার হজ্জের মওসুমে যখন দেহে শুধু ইহরামের পোশাক থাকে, তাঁর দেহের এমন সজীবতা দেখে খলীফা হিশাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কী খান? তিনি বলেন, রুটি ও যয়তুনের তেল। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, এ খাবার কিভাবে খাওয়া হয়? তিনি বলেন, এগুলো আমি ঢেকে রেখে দিই এবং ক্ষিদে অনুভব করলে তখন খেয়ে নিই। আর কখনো গোশত পেলে তাও খাই।[৩৬]

হযরত সালিম বৃদ্ধ বয়সে হিজরী ১০৬ মতান্তরে ১০৭ ও ১০৮ সনের জিলহজ্জ মাসে মদীনায় ইনতিকাল করেন।[৩৭] হিশাম ইবন 'আবদুল মালিক হজ্জ আদায় শেষে তখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন। তিনিই জানাযার নামায পড়ান। মানুষের এত ভিড় হয় যে, বাকী'র ময়দানে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়।[৩৮]

---

২৯. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/২৫০

৩০. সিফাতুস সাফওয়া-২/৫১

৩১. আল-'ইকদ আল ফারীদ-২/৩৭৩; ৬/২২৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৪৫৯

৩২. আল-'ইকদ আল ফারীদ-৬/২০১

৩৩. তাবাকাত-৫/১৯৬, ১৯৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬৪

৩৪. সিফাতুস সাফওয়া-২/৫১; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮৯

৩৫. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৪৯

৩৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬৩; তাবাকাত-৫/২০০; ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৪৯

৩৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮৯

৩৮. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৪৭; তাবাকাত-৫/১৯৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬৫

তিনি কয়েকজন সন্তান রেখে যান। তাঁরা হলেন : 'উমার, 'আবূ বাকর, 'আবদুল্লাহ, 'আসিম, জা'ফর, 'আবদুল 'আযীয, ফাতিমা, হাফসা ও 'আবাদা।[৩৯] শেষ বয়সে তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে যায়।

হযরত সালিম (রহ) যে বছর মারা যান খলীফা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক সে বছর হজ্জের সফরে মদীনায় যান। মদীনা পৌছে এক ব্যক্তিকে বললেন : দেখ তো মসজিদে কে আছে। সে বললো : একটি লম্বা কালো মানুষ আছে। হিশাম বললেন : তিনিই সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ। তাঁকে ডেকে আন। লোকটি সালিমের নিকট গিয়ে বললো : আমীরুল মু'মিনীন আপনাকে ডেকেছেন, চলুন। তবে আপনি ইচ্ছা করলে লোক পাঠিয়ে আপনার অন্য পরিধেয় বস্ত্র আনিয়ে নিতে পারেন। সালিম বললেন : আপনার অকল্যাণ হোক! আমি এক চাদর ও এক জামা পরে আল্লাহর যিয়ারতে এসেছি। এ অবস্থায় আমি যাব হিশামের কাছে? যাই হোক, তিনি হিশামের কাছে যান এবং হিশাম তাঁকে দশ হাজার মুদ্রা উপহার দেন। এরপর হিশাম মদীনা থেকে মক্কায় যান এবং হজ্জ আদায় করেন। হজ্জ শেষ করে তিনি আবার মদীনায় যান। সেখানে পৌছে জানতে পান যে, সালিম (রহ) কঠিন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করছেন। হিশাম তাঁকে দেখতে যান এবং তাঁর অবস্থা কেমন তা জিজ্ঞেস করেন, এরপর সালিম (রহ) মারা যান এবং হিশাম তাঁর জানাযার নামায পড়ান। নামাযের পর তিনি মন্তব্য করেন : আমার হজ্জ অথবা সালিমের জানাযার নামায পড়া এ দু'টির কোনটির জন্য আমি বেশী খুশী তা বলতে পারবো না।[৪০]

খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান একবার হজ্জের সময় হাজ্জাজকে লিখলেন : হজ্জের নিয়মাবলীর ব্যাপারে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারকে (রা) অনুসরণ করবে। আরাফার দিনের আগের রাতে হাজ্জাজ গেলেন 'আবদুল্লাহ (রা) ও তাঁর ছেলে সালিমের নিকট। সালিম তাঁকে বললেন : আজ যদি আপনি সুন্নাত অনুসরণ করতে চান তাহলে খুতবা সংক্ষেপ করে তাড়াতাড়ি নামায পড়বেন। কথাটি হাজ্জাজের মনোপূত হলো না, তিনি 'আবদুল্লাহর (রা) দিকে তাকালেন। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন : সে ঠিক বলেছে।[৪১]

ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেন : অধিকাংশ মদীনাবাসী দাসীদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো না। অথচ এই দাসীদের পেটেই জন্ম নিয়েছেন 'আলী ইবন আল-হুসাইন, আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ও সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ। আর তাঁরা ফিকাহ্, 'ইলম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সকল মদীনাবাসীকে অতিক্রম করে গেছেন। তারপর মানুষ দাসীদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।[৪২]

---

৩৯. তাবাকাত-৫/১৯৫

৪০. আল 'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৪৬-৪৪৭

৪১. প্রাগুক্ত-৫/৩৫

৪২. প্রাগুক্ত-৬/১২৮; তারীখ ইবন 'আসাকির-৭/১৪

তাঊস ইবন কায়সান (রহ)

আবূ 'আবদির রহমান তাঊস ইবন কায়সান ছিলেন বুহায়র ইবন রীসান-এর দাস। কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁর আসল নাম যাকওয়ান, আর তাঊস তাঁর উপাধি। তাঁর পিতা কায়সান ছিলেন অনারব বংশোদ্ভূত। তিনি আলে হামদান-এর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে ইয়ামনের 'জানাদ' শহরে বসতি স্থাপন করেন। তাঊস ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ।

'আল্লামা নাবাবী লিখেছেন, তাঊস ছিলেন জ্ঞানী, মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের অন্তর্ভুক্ত মানুষ। তাঁর মহাত্ম্য, মর্যাদা, পাণ্ডিত্য, যোগ্যতা ও স্মৃতি শক্তির ব্যাপারে সবাই একমত।[১] ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন :

তিনি ছিলেন একজন ইমাম এবং 'ইলম ও 'আমলের দিক দিয়ে ছিলেন খ্যাতিমান 'আলিমদের একজন।[২]

তিনি হাদীছের একজন বড় হাফেজ ছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে ধারণকৃত হাদীছ 'আলীমদের নিকট স্বীকৃত ছিল।[৩] তিনি পঞ্চাশ জন সাহাবীর দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র, যায়দ ইবন আরকাম, যায়দ ইবন ছাবিত, আবূ হুরায়রা, 'আয়িশা সিদ্দীকা, সুরাকা ইবন মালিক, সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, জাবির (রা) প্রমুখ সাহাবীর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণ করেন।[৪] হাবরুল উম্মাহ্ 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ থেকে বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জন করেন।

ফিকাহ্ শাস্ত্রে প্রচণ্ড দখল ছিল। ইবন খাল্লিকান লিখেছেন :[৫]

كان فقيهًا جليل القدر رفيع الذكر.

'তিনি ছিলেন সুমহান মর্যাদার ও সুউচ্চ খ্যাতির অধিকারী একজন ফকীহ্।' তাঁর শিষ্য-শাগরিদের গণ্ডি অনেক প্রশস্ত। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্রের নাম : ছেলে 'আবদুল্লাহ, ওয়াহাব ইবন মায়সারাহ্, হাবীব ইবন আবী ছাবিত, সাম ইবন 'উতায়বা, হাসান ইবন মুসলিম, সুলায়মান ইবন মুসা, 'আবদুল করীম জাযারী, আবদুল মালিক ইবন মায়সারা, 'আমর ইবন শু'আয়ব, 'আমর ইবন দীনার, 'আমর ইবন মুসলিম, কায়স ইবন সা'দ, মুজাহিদ, লায়ছ, আবূ সুলায়ম, হিশাম ও আরো অনেকে।[৬]

---

১. তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২৫১
২. শাযারাতুয যাহাব-১/১৩৩; সিফাতুস সাফওয়া-২/১৬০
৩. তাহ্যীবুল আসমা'-১/২৫১
৪. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৫/৯; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯০
৫. ওয়াফয়াতুল আ'য়ান-১/২৩৩
৬. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৫/৯; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯০

জ্ঞান-গরিমার দিক দিয়ে তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। ইবন 'উয়ায়না বর্ণনা করেছেন। আমি 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা যাঁদের সাথে ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট যেতেন তাঁরা কারা? বললেন : 'আতা ও তাঁর দলের সাথে। আমি বললাম : আর তাউস? বললেন : তিনি যেতেন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে।[৭]

তাঁর সমকালীন সকল 'আলিম তাঁর গভীর জ্ঞানের স্বীকৃতি দিতেন। 'আমর ইবন দীনার বলতেন, আমি তাউসের সমকক্ষ কোন ব্যক্তিকে দেখিনি।[৮] অনেকে বলতেন, তাউস হলেন ইয়ামনের ইবন সীরীন। সা'ঈদ ইবন আবী সীরীন বর্ণনা করেছেন কায়স ইবন সা'দ বলতেন, তাউস হলেন আমাদের এখানের ইবন সীরীন।[৯] কোন কোন 'আলিম তাঁকে হযরত সা'ঈদ ইবন জুবায়রের (রা) সমকক্ষ বলে মনে করতেন। 'উছমান দারিমী বর্ণনা করেছেন, আমি ইবন মু'ঈনকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তাউসকে বেশী পছন্দ করেন, না সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে? কিন্তু তিনি কাউকে প্রাধান্য দেননি।[১০]

হযরত তাউস যে পরিমাণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন ঠিক সেই পরিমাণ 'আমলও তাঁর মধ্যে ছিল। ইবন হিব্বান বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়ামনের বিখ্যাত 'আবিদ ব্যক্তিদের একজন ছিলেন।[১১] অতিরিক্ত ইবাদাতের কারণে কপালে সিজদার দাগ পড়ে গিয়েছিল। মৃত্যু শয্যায়ও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন।[১২] চল্লিশ বার হজ্জ আদায় করেন।[১৩] কা'বা তাওয়াফের সময় নীরব থাকতেন। কারো কোন কথার জবাব দিতেন না। বলতেনঃ তাওয়াফ হচ্ছে নামায।[১৪]

তিনি তাঁর সাধ্যমত আল্লাহর রাস্তায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতেন। একবার একজন শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির জরিমানার অর্থ পরিশোধ করে তাঁকে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করেন।

দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব ও তার চাওয়া-পাওয়ার বাসনা থেকে একেবারেই মুখপেক্ষীহীন ছিলেন। কখনো দুনিয়ার সুখ-সম্পদ প্রাপ্তির কামনা করেননি। সব সময় এই দু'আ করতেন : 'হে আল্লাহ! আমাকে তুমি অর্থ-বিত্ত ও সন্তান-সন্ততি থেকে বঞ্চিত রাখ এবং তার পরিবর্তে ঈমান ও 'আমলের ঐশ্বর্য দান কর।'[১৫] শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি এবং বিত্তশালীদেরকে তিনি সব সময় এড়িয়ে চলতেন। তাদেরকে কখনো ভালো মনে করতেন না। ইবন 'উয়ায়না বর্ণনা করেছেন। তিন ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা সরকার ও সরকারী

---

[৭] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৩৩

[৮] তাহ্যীবুল আসমা'-১/২৫১

[৯] তাবাকাত ইবন সা'দ-৫/৩৯৪

[১০] তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৫/৯

[১১] প্রাগুক্ত

[১২] তাবাকাত-৫/৩৯৩, ৩৯৫

[১৩] তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৫/৯

[১৪] তাবাকাত-৫/৩৯৩

[১৫] প্রাগুক্ত

কর্মকর্তাদের এড়িয়ে চলতেন। সাহাবী আবূ যার আল-গিফারী তাঁর যুগে এবং তাউস ও ছাওরী তাঁদের নিজ নিজ সময়ে।[১৬] তিনি বলতেন, বিত্তশালী অভিজাত শ্রেণী থেকে বেশী মন্দ আর কাউকে দেখিনি।[১৭]

তাউস ইবন কায়সানের জন্মভূমি ইয়ামনের ওয়ালী ছিলেন সে সময় স্বৈরাচারী হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের ভাই মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ হিজাযে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রকে (রা) হত্যার মাধ্যমে তাঁর আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দিয়ে নিজের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সুসংহত করে ইয়ামনে তাঁর ভাইকে ওয়ালীর দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। ভাই হাজ্জাজের বহু দোষ মুহাম্মাদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু তাঁর মধ্যে ভালো গুণও কিছু ছিল। একবার শীতকালের এক সকালে তাউস ইবন কায়সান গেলেন মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফের নিকট। সংগে ছিলেন ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্।[১৮] তাঁরা সবাই নিজ নিজ আসনে স্থির হয়ে বসার পর মুহাম্মাদকে লক্ষ্য করে তাউস ওয়া'আজ-নসীহত করতে শুরু করলেন। বহু মানুষ তাঁদের সামনে বসা ছিল। তখন বেশ ঠাণ্ডাও ছিল। মুহাম্মাদ তাঁর চাকরকে ডেকে বললেন : ওহে তুমি একটি 'তায়লাসান'[১৯] নিয়ে এসে এই তাউসের দু'কাঁধের উপর বিছিয়ে দাও। চাকরটি একটি অতি সুন্দর 'তায়লাসান' নিয়ে এসে তাউসের দু'কাঁধের উপর বিছিয়ে দেয়। তাউস ওয়া'আজ করা অবস্থায় কাঁধটি একটু দুলিয়ে আস্তে করে তায়লাসানটি ফেলে দেন। ওয়াহাব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু প্রত্যক্ষ করলেন। মুহাম্মাদ খুবই অপমান বোধ করলেন। রাগে-ক্ষোভে তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। তারপর তাউস ও তাঁর সঙ্গী-ওয়াহাব যখন মজলিস থেকে উঠে চলা শুরু করলেন তখন ওয়াহাব তাউসকে বললেন : আপনার তায়লাসানের প্রয়োজন না থাকলেও মানুষকে মুহাম্মাদের ক্রোধ থেকে বাঁচানোর জন্য তখন সেটি নিয়ে নেওয়া উচিৎ ছিল। আর খুব বেশী হলে আপনি সেটি বিক্রি করে তার মূল্য গরিব-মিসকীনদের মধ্যে বিলি করে দিতে পারতেন। তাউস বললেন : হাঁ, আপনি যা বলেছেন, তা ঠিক। তবে আমার যদি এমন আশঙ্কা না থাকতো যে, আমার পরে 'আলিমরা বলবে– আমরাও গ্রহণ করবো যেমন তাউস গ্রহণ করেছেন। তারপর তারা যা কিছু গ্রহণ করবে তা আপনার কথা মত দান করবে না। অর্থাৎ তারা আমার কাজকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে আমীর-উমারাদের নিকট থেকে হাদীয়া-তোহফা গ্রহণ করবে।[২০]

মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ এ অপমান ভুললেন না। তিনি তাউসকে উচিত শিক্ষা দিতে চাইলেন। তিনি একটি সূক্ষ্ম চাল চাললেন। সাতশো স্বর্ণমুদ্রা একটি থলেতে ভরলেন।

---

১৬. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৫/১০

১৭. তাবাকাত-৫/৩৯৩

১৮. ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্ পারশ্য বংশোদ্ভূত একজন বিখ্যাত তাবি'ঈ। প্রাচীন আরব ও আহলি কিতাবদের ইতিহাসে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন।

১৯. 'তায়লাসান' একপ্রকার অতি মূল্যবান সবুজ চাদরকে বলা হয়। সাধারণত: অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ব্যবহার করে থাকে।

২০. সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন, ২৮২-২৮৩

তারপর তাঁর অতি বিশ্বস্ত ও কাছের একজন চালাক-চতুর লোককে বললেন : তুমি এই থলেটি তাউসের নিকট নিয়ে যাবে এবং বিভিন্ন বাহানায় তাঁকে এটি গ্রহণ করতে রাজী করাবে। যদি তা পার তাহলে তুমি হবে আমার অতি কাছের লোক এবং তোমার বেতন-ভাতা আমি বাড়িয়ে দিব। থলেটি হাতে নিয়ে লোকটি বের হলো। সান'আ'র নিকটবর্তী 'আল-জানাদ' নামক যে পল্লীতে তাউস থাকতেন, লোকটি সেখানে উপস্থিত হলো। সালাম, কুশল বিনিময় ও আলাপচারিতার মাধ্যমে লোকটি তাউসের সাথে বেশ ভাব জমিয়ে ফেললো। এক পর্যায়ে সে বললো : জনাব, এই থলের এই জিনিসগুলো আমীর আপনার খরচের জন্য পাঠিয়েছেন। তাউস বললেন : এগুলো আমার প্রয়োজন নেই। লোকটি নানা কৌশলে তাঁকে রাজী করাতে চাইলো। বহু যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। লোকটি একটি সুযোগ খুঁজছিল। এক সময় সে তাউসের অমনোযোগিতার সুযোগে জানালার ফাঁক দিয়ে থলেটি ঘরের মধ্যে ছুড়ে মারে। তারপর সে ফিরে গিয়ে আমীরকে বলে : তাউস থলেটি গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মাদ তো মনে মনে দারুণ খুশী হলেন। কিন্তু তখন চুপ থাকলেন। কয়েক দিন কেটে গেল। তারপর একদিন তাঁর পারিষদবর্গের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তিকে তাউসের নিকট পাঠালেন। তাদের সাথে গেল আগের সেই লোকটি, যে থলে নিয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মাদ তাদেরকে নির্দেশ দিলেন : তোমরা তাঁকে একথা বলবে– আমীরের দূতটি সে দিন ভুল করে থলেটি আপনাকে দিয়ে গেছে। আসলে সেটি আরেকজনকে দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। আমরা সেটি ফেরত নিয়ে প্রকৃত মালিককে দেওয়ার জন্য এসেছি।

তাউস বললেন : ফেরত দিব কি? আমি তো আমীরের কোন অর্থই গ্রহণ করিনি। ঐ দু'ব্যক্তি জোর দিয়ে বললো : না, আপনি গ্রহণ করেছেন। তাউস তখন থলেটি যে নিয়ে এসেছিল তার দিকে ফিরে বললেন : আমি কি আপনার কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করেছিলাম? লোকটি ভয়ে কেঁপে উঠলো। বললো : না। আমি আপনার অমনোযোগিতার সুযোগে থলেটি জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ছুড়ে মেরেছিলাম। তাউস বললেন : এই সেই জানালা। আপনারা সেখানে দেখতে পারেন। লোক দু'টি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে থলেটি যেমন ছিল তেমনই পড়ে আছে। শুধু মাকড়সা তার উপর একটি জাল বুনেছে। তারা থলেটি নিয়ে আমীর মুহাম্মাদের কাছে ফিরে গেল।[২১]

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফের এই ধৃষ্টতার বদলা নেন অন্যভাবে। আর তা তাউসসহ বহু মানুষের সামনে। সেটা কিভাবে ঘটেছিল তা তাউসের জবানীতেই শোনা যাক :

তাউস বলেন, আমি যখন মক্কায় হজ্জের উদ্দেশ্যে কা'বার তাওয়াফ করছিলাম তখন হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ লোক মারফত আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি আমাকে 'মারহাবান, আহলান ওয়া সাহলান' বলে স্বাগতম জানিয়ে তাঁর

---

[২১] প্রাগুক্ত-২৮৩-২৮৫

কাছেই বসালেন। নিজ হাতে বালিশ এগিয়ে দিয়ে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসার জন্য বললেন। তারপর হজ্জের বিভিন্ন মাসয়ালা যা তাঁর জানা ছিল না, সে সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমরা যখন এই আলোচনার মধ্যে আছি, তখন কা'বা তাওয়াফরত এক ব্যক্তির 'তালবিয়া' পাঠের ধ্বনি হাজ্জাজের কানে গেল। লোকটি একটু উঁচুস্বরে তালবিয়া উচ্চারণ করছিল। সেই ধ্বনিতে ছিল অন্তরকে ধাক্কা দেয় এমন একটি সুরের ঝঙ্কার। হাজ্জাজ লোকটিকে ডেকে আনার জন্য বললেন। লোকটি আসার পরে তাঁদের মধ্যে নিম্নরূপ কথাবার্তা হয় :

হাজ্জাজ : আপনি কোন গোত্রের লোক?

লোকটি : মুসলমানদের একজন।

হাজ্জাজ : আমি এটা জানতে চাইনি। তোমার মাতৃভূমি কোনটি তা জানতে চেয়েছি।

লোকটি : ইয়ামানের অধিবাসী।

হাজ্জাজ : তোমাদের আমীরকে (মুহাম্মাদ) কেমন দেখে এসেছো?

লোকটি : আমি দেখে এসেছি, তিনি একজন বিশাল দেহের অধিকারী, সুন্দর পোশাক পরিধানকারী, দক্ষ অশ্বারোহী এবং অসংখ্য মানুষকে স্বাগতম জানাচ্ছেন ও বিদায় দিচ্ছেন।

হাজ্জাজ : আমি তোমার কাছে এসব জানতে চাইনি।

লোকটি : তাহলে আপনি কী জানতে চেয়েছেন?

হাজ্জাজ : আমি জানতে চেয়েছি, তোমাদের মধ্যে তার জীবনধারা কেমন?

লোকটি : আমি তাঁকে ছেড়ে এসেছি একজন ভীষণ অত্যাচারী, সৃষ্টির বাধ্য ও স্রষ্টার অবাধ্য মানুষ হিসেবে।

একথা শুনে পারিষদবর্গের সামনে লজ্জায় হাজ্জাজের মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি লোকটিকে বললেন : তুমি যা কিছু বললে তা বলতে কে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে? আমার কাছে তার স্থান কোন পর্যায়ের তা কি তুমি জান না?

লোকটি বললো : আপনার কাছে তাঁর যে স্থান, তার চেয়ে অধিক সম্মানীয় আল্লাহর কাছে আমার যে স্থান, তাকি আপনি দেখছেন না? আমি এসেছি আল্লাহর ঘরের আঙ্গিনায়, তাঁর নবীকে স্বীকার করি এবং তাঁর দীনের দাবীসমূহ পূরণ করি।

তারপর হাজ্জাজ চুপ হয়ে যান। কোন জবাব দানের আর চেষ্টা করলেন না।

তাউস বলেন : তারপর লোকটি দেরী না করে যাবার জন্য উঠে পড়লো এবং কোন রকম অনুমতি নেওয়া-দেওয়ার পরোয়া না করে দ্রুত চলে গেল। আমিও তার পিছনে পিছনে চললাম এবং মনে মনে বললাম : 'লোকটি নেককার, তাকে অনুসরণ কর। তাকে ধর।' আমি তাকে অনুসরণ করলাম। তাকে এ অবস্থায় পেলাম যে, সে কা'বার চত্বরে এসে কা'বার গিলাফ ধরে মুখটা কা'বার দেওয়ালে ঠেকিয়ে বলছে :

"হে আল্লাহ! আমি তোমার উপর অটল আছি এবং তোমার বাহুতলে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি তোমার দান-অনুগ্রহের উপর আমার নির্ভরতা দাও, তোমার তত্ত্বাবধানের প্রতি আমার সন্তুষ্টি দাও, নিকৃষ্ট ধরনের কৃপণদের কৃপণতা থেকে আমাকে মুক্তি দাও

এবং নিজেকে প্রাধান্য দানকারীদের কর্তৃত্বে যা কিছু তা থেকে মুখাপেক্ষীহীন কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটবর্তী প্রশস্ততা, তোমার অনাদি কাল ব্যাপী শুভ ও কল্যাণ এবং তোমার সুন্দরতম অভ্যাস কামনা করি। ইয়া রাব্বাল 'আলামীন!"

তারপর মানুষের একটি প্রবল ভীড়ের ধাক্কা তাকে সরিয়ে আমার দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। আমি ধরে নিলাম, আমি আর তার সাক্ষাৎ পাব না। কিন্তু 'আরাফা'র দিনের সন্ধ্যায় মানুষ যখন মুযদালাফার দিকে যাচ্ছে তখন আবার তার দেখা পেলাম। আমি তার কাছে এগিয়ে গিয়ে শুনলাম, সে বলছে :

"হে আল্লাহ! যদি তুমি আমার হজ্জ, আমার কষ্ট-ক্লান্তি, আমার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কবুল না কর, তাহলে আমার এসব কিছু কবুল না করার বিনিময়ে আমার উপর অপতিত বিপদ-মুসীবতের প্রতিদান থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।"

তারপর সে মানুষের ভীড়ের মধ্যে পড়ে যায় এবং অন্ধকারে আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। আমি যখন তাকে ফিরে পাওয়ার আশা ত্যাগ করলাম তখন আল্লাহর কাছে এই বলে দু'আ করলাম : হে আল্লাহ! তুমি তার ও আমার দু'আ কবুল কর, তার ও আমার আশা পূরণ কর এবং আমার ও তার পা সুদৃঢ় রাখ, সেই দিন, যে দিন সকল পা পিছলে যাবে। আর হাওজে কাওছারের পাশে তাকে ও আমাকে একত্র করো। ইয়া আকরামাল আকরামীন।[২২]

একবার মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ কিছু দিনের জন্য তাঊসকে তাহসীলদার হিসেবে নিয়োগ করেন। এই দায়িত্বের সাথে তাঁর মত ব্যক্তির কী-ই বা সম্পর্ক হতে পারে? এ দায়িত্ব তিনি যে ভাবে পালন করতেন তার একটি বর্ণনা তিনি নিজে দিয়েছেন। ইবরাহীম ইবন আয়সারা তাঁকে প্রশ্ন করলো : তাহসীলদারের দায়িত্ব পালনকালে আপনি কি করতেন? বললেন : খাজনা-ট্যাক্স যাদের বকেয়া পড়েছিল, তাদেরকে বলতাম : আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন! তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তা থেকে শরী'আতের হক আদায় করে তা পাক-সাফ করে ফেল। একথা বলার পর যদি তারা বকেয়া খাজনা দিয়ে দিত তাহলে তা নিয়ে নিতাম। অন্যথায় তাদেরকে আর ডাকতামও না।[২৩]

একবার খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলেন। একটা গভীর আবেগভরা অন্তর নিয়ে কা'বার আঙ্গিনায় বসে আছেন। হঠাৎ তাঁর দেহরক্ষীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন : আমাদেরকে দীনের তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারেন এবং মহান আল্লাহর এই মহান দিনে আমাদেরকে কিছু উপদেশ বাণী শোনাতে পারেন এমন একজন 'আলিমের খোঁজ কর।

রক্ষীটি হজ্জ উপলক্ষে আগত মানুষের ভীড়ের দিকে চলে গেল এবং তাদেরকে আমীরুল মু'মিনীনের উদ্দেশ্যের কথা বললো। তাকে এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হলো : এই যে, ইনি হলেন তাঊস ইবন কায়সান। তিনি এ যুগের ফকীহদের নেতা এবং

---

[২২] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/৪২৩-৪২৪; প্রাগুক্ত-২৮৫-২৮৮
[২৩] তাবাকাত-৫/৩৯৪

আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত সত্যভাষী। আপনি তাঁর কাছেই যান।

রক্ষীটি এক পা দু'পা করে তাউসের কাছে গেলেন। তাঁকে বললেন : ওহে শায়খ, আপনি আমীরুল মু'মিনীনের ডাকে একটু সাড়া দিন। তাউস কোন রকম ইতস্তত: ভাব না করে রাজী হলেন। কারণ, তিনি বুঝতেন, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের দা'ওয়াত দানের কোন সুযোগই হাতছাড়া করা উচিত নয়। সব সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করা উচিত। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন, শাসন কর্তৃত্বের ব্যক্তিদের ত্যাড়ামি ও বক্রতা সোজা করা, তাদেরকে জুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত রাখা এবং তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করার উদ্দেশ্যে যে কথা বলা হয়, তাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো কথা।

তাউস রক্ষীর সংগে চললেন। আমীরুল মু'মিনীনের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিলেন ও কুশল জিজ্ঞেস করলেন। খলীফা সুন্দরভাবে জবাব দিয়ে সম্মানের সাথে তাঁকে কাছে বসালেন। তারপর হজ্জের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে যা জানার প্রয়োজন মনে করলেন তা জিজ্ঞেস করলেন এবং অত্যন্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে কান লাগিয়ে সব কথা শুনলেন।

তাউস বলেন : আমি যখন বুঝতে পারলাম, আমীরুল মু'মিনীনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেছে এবং তাঁর আর প্রশ্ন করার কিছু নেই তখন আমি মনে মনে বললাম : ওহে তাউস! এ এমন একটা মজলিস, যে মজলিস সম্পর্কে আল্লাহ তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন। তারপর আমি আমীরুল মু'মিনীনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললাম : হে আমীরুল মু'মিনীন! জাহান্নামের অভ্যন্তরে একটি কূপের উপর থেকে একটি পাথর ফেলে দিলে সত্তর বছর গড়ানোর পর তার তলায় গিয়ে পৌঁছবে। হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি জানেন আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের কূপ কাদের জন্য তৈরী করেছেন? তিনি কোন রকম ভাবা-চিন্তা ছাড়াই বলে উঠলেন : না, আমার জানা নেই। আল্লাহ আপনার অকল্যাণ করুন! কাদের জন্য তৈরী করেছেন বলুন।

আমি তখন বললাম : কূপটি আল্লাহ তাদের জন্য তৈরী করেছেন যাদেরকে তিনি মানুষের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন, অতঃপর তারা জুলুম-অত্যাচার করেছে।

আমার এ কথা শোনার সাথে সাথে সুলায়মানের উপর যেন বজ্রপাত হলো। আমার মনে হলো তাঁর পাঁজর ভেদ করে প্রাণটি যেন বেরিয়ে যাবে। তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। সেই নিঃশব্দ কান্নায় তাঁর অন্তরের তন্ত্রীগুলো ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করবেন বলে আমার মনে হলো। এ অবস্থায় আমি তাঁকে রেখে চলে আসি। আমি যখন আসি তিনি তখন বার বার বলছিলেন : আল্লাহ আপনার ভালো প্রতিদান দিন।[২৪]

'উমার ইবন 'আবদিল আযীয খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে একবার তাউসকে বলেনঃ আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা আমীরুল মু'মিনীন সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিককে

---

[২৪] ২৪. সওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন-২৮৯-২৯১

বলুন। তিনি সোজা বলে দিলেন, আমার কোন প্রয়োজন নেই।[২৫]

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। একদিন লোক মারফত তাঊসকে বলে পাঠালেন : ওহে আবূ আবদির রহমান! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

তাঊস এক লাইনের একটি চিঠি লিখলেন।

লাইনটি হলো এই :

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَكُوْنَ عَمَلُكَ خَيْرًا كُلُّهُ، فَاسْتَعْمِلْ أَهْلَ الْخَيْرِ، وَالسَّلَامُ.

– যদি আপনি চান আপনার সব কাজ ভালো হোক, তাহলে ভালো লোকদেরকে নিয়োগ করুন। ওয়াস-সালাম!

চিঠিটি পড়ে 'উমার মন্তব্য করেন : উপদেশের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কথাটি দু'বার উচ্চারণ করেন।[২৬]

হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর তাঁর সাথে তাঊসের একটি ঘটনার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। ঘটনাটি বেশ প্রসিদ্ধ ও চমকপ্রদ। খলীফা হিশাম একবার হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসলেন। সেখানে অবস্থানকালে একদিন মক্কার অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে বললেন : তোমরা রাসূলুল্লাহর (সা) কোন সাহাবীকে খুঁজে বের করে আমার কাছে নিয়ে এসো তো। তারা বললো : আমীরুল মু'মিনীন! সাহাবীরা তো একের পর এক সবাই তাঁদের পরোয়ারদিগারের সান্নিধ্যে চলে গেছেন। তাঁদের আর কেউ এখন জীবিত নেই।

হিশাম বললেন : ঠিক আছে। তাহলে তাবি'ঈদের কাউকে নিয়ে এসো। তারা তাঊসকে নিয়ে হাজির করলো। তাঊস খলীফার ডাকার অপেক্ষা না করে সোজা তাঁর ঘরে ঢুকে বিছানার এক পাশে জুতোজোড়া খুলে রেখে তাঁকে সালাম করলেন। তারপর খলীফার কুনিয়াত বা ডাকনাম না ধরে তাঁর আসল নাম ধরে তাঁকে সম্বোধন করেন। তাছাড়া খলীফার অনুমতি ছাড়াই তাঁর বিছানায় গিয়ে বসে পড়েন।

তাঊসের এমন স্পর্ধা দেখে ক্রোধে, উত্তেজনায় খলীফার মাথায় যেন রক্ত উঠে গেল। তিনি তাঊসের এসব আচরণকে দুঃসাহস বলে ভাবলেন এবং তাঁর মজলিসের লোকজন ও পারিষদবর্গের সামনে তাঁকে হেয় ও অপমান করা হয়েছে বলে মনে করলেন। তবে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেন এই বলে যে, তিনি তো আল্লাহর 'হারাম'-এ অবস্থান করছেন। তারপর তিনি নিজের প্রতি মনোযোগী হন এবং তাঊসকে বলেন : তাঊস! আপনি যা করলেন, তা এমনটি করতে আপনাকে কিসে উৎসাহিত করেছে?

তাঊস : কী এমন কাজ আমি করেছি?

---

২৫. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৬৮

২৬. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৩৩

খলীফা আবার রেগে গেলেন। বললেন : আপনি জুতা খুলেছেন আমার বিছানার পাশে, খলীফাতুল মুসলিমীন বলে সম্বোধন করে আমাকে সালাম করেননি, আমার কুনিয়াত বা ডাকনাম না বলে নাম ধরে ডেকেছেন, তারপর আমার অনুমতি ছাড়াই আপনি বসে পড়েছেন।

অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে তাঊস বললেন : আপনার বিছানার পাশে আমার জুতো খোলার বিষয়টি– তা আমি তো প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহ্ রাব্বুল 'ইজ্জাতের সামনে খুলে রাখি। তিনি তো কখনো আমাকে তিরস্কার বা আমার উপর রাগ করেন না। আর আপনি যে বললেন, আমি আপনাকে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করে সালাম করিনি। তা মু'মিনদের সবাই তো আপনাকে আমীর বলে স্বীকার করে না। আমার ভয় হয়েছে, আমি আপনাকে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করলে মিথ্যাবাদী হয়ে যাই কিনা। আর আপনি যে বললেন, আমি আপনার কুনিয়াত (ডাকনাম) ধরে না ডেকে আসল নাম ধরে ডেকেছি। তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীদের নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। যেমন : ইয়া দাঊদ, ইয়া ইয়াহইয়া, ইয়া 'ঈসা ইত্যাদি। আর তাঁর শত্রুদের ডেকেছেন কুনিয়াত ধরে। যেমন :[২৭] تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ وَتَبَّ.

– আবূ লাহাবের হাত দু'টি ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে।

আর আপনি যে বলেছেন, আমি আপনার অনুমতি না নিয়েই বসে গেছি। কারণ, আমি আমীরুল মু'মিনীন 'আলী ইবন আবী তালিবকে (রা) বলতে শুনেছি :

'তুমি যদি একজন জাহান্নামী ব্যক্তিকে দেখতে চাও তাহলে এমন একজন বসা ব্যক্তিকে দেখ যার চার পাশে বহু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।' তাই আমি চাইনি, আপনি তেমন কোন ব্যক্তি হোন যাকে জাহান্নামীদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

হিশাম আর কোন কথা না বলে লজ্জায় মাথা নীচু করলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা উঁচু করে বললেন : ওহে আবূ 'আবদির রহমান, আমাকে কিছু উপদেশ বাণী শোনান। তাঊস বললেন : আমি 'আলী ইবন আবী তালিবের (রা) মুখে শুনেছি : জাহান্নামে কিছু সাপ আছে যা খুব শক্ত, লম্বা ও মোটা স্তম্ভের মত, আর কিছু বিচ্ছু আছে যা খচ্চরের মত। সেগুলো দংশন করবে এমন শাসকদেরকে যারা তাদের প্রজাদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে না। একথা বলে তাঊস আর অপেক্ষা করলেন না। উঠে চলে গেলেন।[২৮]

হযরত তাঊস (রহ) যেমন কোন কোন শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিকে উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দিতেন তেমনিভাবে কোন কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে উপেক্ষাও করতেন। তাঁর ছেলে বলেন :

---

২৭. সূরা লাহাব-১; রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা আবূ লাহাব মক্কার অংশীবাদীদের অন্যতম নেতা ছিল। সে এবং তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহকে (সা) ভীষণ কষ্ট দিয়েছে।

২৮. সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন-২৯৪

একবার আমরা আমার পিতার সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে ইয়ামন থেকে বের হলাম। পথে কোন একটি শহরে আমরা যাত্রাবিরতি করলাম। সেই শহরের শাসক ছিল ইবন নাজীহ নামে এক দুরাচারী। সে সত্য ও ন্যায়ের কোন পরোয়া করতো না এবং অন্যায় ও অপকর্মে ছিল ভীষণ পটু। আমরা নামায আদায় করতে মসজিদে গেলাম। সেখান থেকে ইবন নাজীহ আমার পিতার আগমনের কথা জেনে গেল। সে মসজিদে ছুটে এলো এবং আমার পিতার সামনে বিনীতভাবে বসে তাঁকে সালাম করলো। কিন্তু আমার পিতা তাঁর সালামের জবাব দিলেন না। তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে পিছন দিয়ে বসলেন। সে উঠে ডান দিকে এসে কথা বলতে চাইলো। কিন্তু তিনি মুখ ঘুরিয়ে বসলেন। সে বাম দিকে এসে কথা বলার চেষ্টা করলো। এবারও তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এ অবস্থা দেখে আমি উঠে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে সালাম করলাম। তাকে বললাম: আমার পিতা আপনাকে চেনেন না। তিনি বললেন, আমাকে চেনেন বলেই আমার সাথে এমন আচরণ করলেন। তারপর লোকটি আর কোন কথা না বলে উঠে চলে গেল।

আমরা ঘরে ফিরে এলাম। আমার পিতা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: ওরে নির্বোধ, তাদের অনুপস্থিতিতে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের নিন্দা করে থাক। আর যেই না তারা সামনে এলো অমনি কথার মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে ফেললে! নিফাক (কপটতা) কি এছাড়া অন্য কিছু?[২৯]

হযরত তাউস (রহ) কেবল খলীফা ও আমীরদেরকে উপদেশ বাণী শোনাতেন না, বরং উপদেশের প্রয়োজন আছে অথবা উপদেশ শোনার প্রতি আগ্রহ আছে বলে যাকে মনে করতেন, তাকে উপদেশ দান করতেন। এ ক্ষেত্রে 'আতা' ইবন আবী রাবাহ'র একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত। 'আতা' বলেন: তাউস ইবন কায়সান একবার আমাকে এমন এক অবস্থানে দেখলেন যা তাঁকে তুষ্ট করেনি। তিনি বললেন: 'আতা'! যে তোমার সামনে তার দ্বার রুদ্ধ করে দেয় এবং তোমার সামনে দ্বার রক্ষী দাঁড় করিয়ে দেয় তার কাছে তোমার প্রয়োজনের কথা বলা থেকে দূরে থেক। তার কাছেই তোমার প্রয়োজনের কথা বলো যে তোমার জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত রাখে, তোমার প্রয়োজনের কথা বলার জন্য তোমাকে আহ্বান জানায় এবং তা পূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়।[৩০]

তিনি ছেলেকে বলতেন: বেটা! তুমি জ্ঞানীদের সাহচর্যে থাকবে এবং তাদের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করবে- যদিও তুমি তাদের কেউ নও। আর মূর্খদের সাহচর্যে থাকবে না। কারণ, তুমি তাদের সাহচর্যে থাকলে তাদের প্রতি তোমাকে সম্পৃক্ত করা হবে- যদিও তুমি তাদের কেউ নও। জেনে রাখ, প্রত্যেক জিনিসেরই একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। আর একজন মানুষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো তার দীন ও নৈতিকতার পূর্ণতা।[৩১]

---

২৯. হিলয়াতুল আওলিয়া' লি আবীন'আয়ম-৪/১৬

৩০. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৬৭

৩১. হিলয়াতুল আওলিয়া-৪/১৩; সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন-২৯৬

হযরত তাউসের পুত্র 'আবদুল্লাহও ছিলেন পিতার মত। পিতা তাঁকে নিজের মত করে গড়ে তুলেছিলেন। তাই পিতার স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-আদর্শ তিনি লাভ করেছিলেন। একবার 'আব্বাসীয় খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূর 'আবদুল্লাহ ইবন তাউস ও মালিক ইবন আনাসকে দরবারে ডেকে পাঠান। তাঁরা দু'জন গেলেন। দরবারে ঢুকে আসন গ্রহণ করার পর খলীফা 'আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেন : আপনার পিতা আপনাকে যেসব হাদীছ শুনিয়েছেন তার থেকে একটি হাদীছ আমাকে শোনান। আবদুল্লাহ বললেন, 'আমার পিতা আমাকে বলেছেন : কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি সবচেয়ে কঠিন 'আযাব ভোগ করবে যাকে আল্লাহ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছেন, অতঃপর সে তাঁর শাসন-কর্তৃত্বে জুলুম-অত্যাচারের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে।' এই উপদেশমূলক হাদীছ শোনার পর খলীফা মানসূর কিছুক্ষণ একেবারে চুপ হয়ে বসে থাকেন। তারপর খলীফা 'আবদুল্লাহকে তিনবার দোয়াত-কলম হাতে নিতে বলেন। কিন্তু 'আবদুল্লাহ খলীফার আদেশ পালন করলেন না। অবশেষে খলীফা তাঁকে প্রশ্ন করেন : আপনি দোয়াত-কলম হাতে নিচ্ছেন না কেন? বললেন : আমি এজন্য নিচ্ছি না যে, যদি আপনি অন্যায় ও অবিচারমূলক সিদ্ধান্ত লেখান তাহলে তাতে আমারও অংশগ্রহণ হয়ে যাবে। তাঁর এমন কাটখোট্টা কথা শুনে খলীফা তাঁদের দু'জনকে দরবার থেকে উঠিয়ে দেন। মালিক ইবন আনাস বলেন : আমি 'আবদুল্লাহর কথা শুনছিলাম, আর ভয়ে আমার কাপড় গুটিয়ে নিচ্ছিলাম। এই জন্য যে কখন না জানি তার রক্তে আমার কাপড় ভিজে যায়। খলীফা যখন আমাদেরকে উঠিয়ে দিলেন তখন আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম : এটাই তো আমি চাচ্ছি। এরপর আবদুল্লাহ আমার একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হন।[৩২]

হযরত তাউস (রহ) একশো অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী বছর জীবন লাভ করেছিলেন। তবে তার বার্ধক্য তাঁর মেধার স্বচ্ছতা, চিন্তার সূক্ষ্মতা ও তাৎক্ষণিক জবাব দানের ক্ষমতার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি। 'আবদুল্লাহ আশ-শামী নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আমি তাউসের নিকট থেকে কিছু শেখার জন্য তাঁর গৃহে গেলাম। আমি তাঁকে চিনতাম না। দরজায় টোকা দিতে একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে বললাম : আপনিই কি তাউস ইবন কায়সান? বললেন : না, আমি তাঁর ছেলে। বললাম : আপনি যদি তাঁর ছেলে হন, তাহলে নিশ্চয় আপনার পিতা বার্ধক্যের ভারে একেবারে বোধসোধ হারিয়ে ফেলেছেন। আমি তাঁর জ্ঞান থেকে কিছু অর্জনের উদ্দেশ্যে বহু দূর থেকে এসেছি। বললেন : আল্লাহ আপনার অকল্যাণ করুন! আল্লাহর কিতাবের বাহকেরা কখনো বোধসোধ হারায় না। ভিতরে আসুন।

আমি ঘরে ঢুকে তাউসকে সালাম করলাম। তারপর বললাম : আপনার জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কিছু অর্জন এবং আপনার কিছু উপদেশ বাণী শোনার উদ্দেশ্যে আমি এসেছি। বললেন :

---

৩২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৩৩

প্রশ্ন করুন। তবে সংক্ষেপ করবেন। বললাম : আমার সাধ্য অনুযায়ী সংক্ষেপ করবো- ইনশাআল্লাহ। তিনি বললেন : আপনি কি তাওরাত, যাবূর, ইনজীল ও আল কুরআনের সার কথা শুনতে চান? বললাম : হাঁ, তা বলুন।

বললেন : আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করুন যে তার চেয়ে ভীতিপ্রদ অন্য কিছু আপনার কাছে থাকবে না। আর তাঁর প্রতি এমন আশাবাদী থাকবেন যে, তাঁকে আপনার ভয়ের চেয়েও সে আশা প্রবল হবে। মানুষের জন্য তাই পছন্দ করুন যা নিজের জন্য পছন্দ করেন।[৩৩]

হযরত তাউস আল্লাহর কালামের দ্বারা কোন রকম আর্থিক সুবিধা লাভ করাকে ভীষণ খারাপ এবং কুরআনের সম্মান পরিপন্থী কাজ বলে মনে করতেন।

একবার কিছু লোকের কুরআন মজীদের হাদীয়া গ্রহণ করতে শুনে তিনি 'ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করেন।[৩৪]

তিনি যুবকদের নিত্য-নতুন চাল-চলন ও রং-ঢং মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার কা'বার তাওয়াফের সময় কিছু কুরাইশ যুবকের স্বাচ্ছন্দময় নতুন স্টাইলের পোশাক দেখে তাদেরকে ভীষণ তিরস্কার করেন। তাদেরকে বলেন : তোমরা এমন পোশাক পরেছো যা তোমাদের বাপ-দাদারা কখনো পরেননি। আর এমন ভঙ্গিতে চলছো যে নর্তকীরাও তেমন চলতে পারে না।[৩৫]

তিনি 'ঈদের দিনে নির্মল আনন্দ-উল্লাস করা প্রয়োজন মনে করতেন। এ দিন বাড়ীর সব মহিলা, এমন কি দাসী-বাঁদীদের হাতে-পায়ে মেহেদী লাগানোর তাকিদ দিতেন। বলতেন : আজ 'ঈদের দিন। তোমরা এটা কর।[৩৬]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি প্রায় প্রতি বছর হজ্জ আদায় করতেন। শেষ বয়সেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ আবেগ-আগ্রহকে অতি সুন্দরভাবে কবুল করেছেন। হিজরী ১০৬ সনের জিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ সন্ধ্যায় তিনি তাঁর জীবনের ৪০তম হজ্জ আদায়কালে 'আরাফাত থেকে মুযদালিফায় রওয়ানা হন। মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও 'ঈশার নামায আদায়ের পর একটু বিশ্রামের জন্য মাটিতে একটু পাশ দেন। এ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এভাবে চিরদিনের জন্য তিনি পবিত্র ভূমিতে থেকে যান। সূর্যোদয়ের পর দাফনের উদ্যোগ নেওয়া হলো; কিন্তু মানুষের অসম্ভব ভীড়ের কারণে মরদেহ সরানো সম্ভব হলো না। অবশেষে মক্কার আমীর ইবরাহীম ইবন হিশাম আল-মাখযূমী কাফন-দাফনের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে পুলিশ পাঠান। জানাযায় অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়। ভীড়ের চোটে মানুষের কাপড়-চোপড় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

---

[৩৩] হিলয়াতুল আওলিয়া-৪/১১; সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন-২৯৮

[৩৪] তাবাকাত-৫/৩৯৫

[৩৫] প্রাগুক্ত

[৩৬] প্রাগুক্ত-৫/৩৯৩

অনেকের হাত-পা ভেঙ্গে যায়। জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তৎকালীন খলীফাতুল মুসলিমীন হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকও ছিলেন।[৩৭]

প্রখ্যাত তাবি'ঈ 'আতা' হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি মনে করি তাউস জান্নাতের অধিকারীদের একজন।[৩৮]

তাউস বলতেন : সত্যনিষ্ঠ কথা সাদাকা বা দানস্বরূপ।[৩৯] তিনি আরো বলতেন : চটকানো আটার জন্য যতটুকু লবণের প্রয়োজন হয়, দুনিয়ায় ততটুকুই যথেষ্ট।[৪০]

'আবদুল্লাহ বলতেন : আমার পিতা বাহনের পিঠে আরোহণ করার সময় পাঠ করতেন ঃ[৪১]

اللهم لك الحمد، هذا من فضلك، ونعمتك علينا فلك الحمد ربنا. سبحان الذى سخَّرلَنَا هذا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ.

হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার। এটা আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ ও দান। সুতরাং হে আমাদের প্রভু! সকল প্রশংসা আপনার। 'তিনি কতনা পবিত্র, যিনি এই বাহনকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না।'

তিনি বজ্রপাতের শব্দ শুনে বলতেন।[৪২] سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ.

তিনি কত না পবিত্র যাঁর তাসবীহ তুমি পাঠ করছো।

'আবদুল্লাহ বলেন, তিনি আরো বলতেন : একজন মানুষের অধিকারে যেসব ধন-সম্পদ থাকে তা ব্যয় করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করাকে বলে- اَلْبُخْلُ। আর কোন মানুষ যদি অন্যের ধন-সম্পদ অবৈধ পথে তার অধিকারে চলে আসার কামনা করে তাহলে তাকে বলে- اَلشُّحُّ।[৪৩]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের সময় যে দু'আটি পাঠ করতেন তাউস সেটি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দু'আটি এই:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ.

---

৩৭. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/৩৩৩; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯০

৩৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০

৩৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৫৮

৪০. প্রাগুক্ত-৩/২৮৯

৪১. হিলয়াতুল আওলিয়া-৪/৫

৪২. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৬৬

৪৩. হিলয়াতুল আওলিয়া-৪/৬

اَللُّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِي مَاقَدَّمْتُ وَتَأَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَمَاأَعْلَنْتُ،

أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ. (متفق عليه)

- হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা আপনার। আপনি সত্য, আপনার বাণী সত্য, আপনার অঙ্গীকার সত্য, আপনার সাক্ষাৎ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য, মুহাম্মাদ সত্য এবং সকল নবী সত্য।

হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনার উপর ভরসা করেছি, আপনার দিকে ফিরে এসেছি, আপনার সাথে বিবাদ করেছি এবং আপনার কাছে বিচার দিয়েছি। সুতরাং আপনি আমার আগে-পিছের গোপন ও প্রকাশ্য সকল পাপ ক্ষমা করে দিন।

আপনি প্রথম, আপনি শেষ, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনি ছাড়া কোন কৌশল, কোন শক্তি নেই।

'আতা' ইবন আবী রাবাহ্ (রহ)

বিখ্যাত মুহাদ্দিছ তাবি'ঈ হযরত 'আতা'র (রহ) পিতার নাম আবু রাবাহ্ আসলাম। ইয়ামানের জানাদ একটি রত্নগর্ভা স্থান বলে খ্যাত। হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকালের সূচনাপর্বে, মতান্তরে খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালের শেষের দিকে এই জানাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেন[১] এবং মক্কায় বেড়ে ওঠেন। আলে আবী মায়সারা ইবন খুছায়ম আল-ফিহ্রীর মাওলা বা আযাদকৃত দাস ছিলেন।[২] ডাকনাম ছিল আবূ মুহাম্মাদ। সীরাত বিশেষজ্ঞরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৩] তিনি ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ, শুদ্ধ ও মিষ্টভাষী এবং অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এক মনীষী।[৪]

'আতা তাঁর শৈশবকালেই রাত-দিনের সবটুকু সময়কে তিনভাগে ভাগ করে নেন। এক ভাগে স্বীয় মনিবের সেবা ও তার প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম সম্পাদন করতেন। আরেক ভাগ প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাতে ব্যয় করতেন। আরেক ভাগ জ্ঞান অর্জনের জন্য নির্ধারণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) যেসব 'আলিম সাহাবী সে সময় জীবিত ছিলেন, তিনি নিয়মিতভাবে তাঁদের নিকট যাতায়াত করতেন। জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর এমন প্রবল আগ্রহ দেখে মনিব তাঁর প্রতি সদয় হন। তিনি মনে করেন, তাঁকে সুযোগ দিলে ভবিষ্যতে তিনি একজন বড় 'আলিম হবেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে বিশেষ অবদান রাখতে পারবেন। এমন একটি মহৎ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি 'আতাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। আর তখন থেকেই মসজিদুল হারামকে তিনি আবাসস্থল বানিয়ে নেন। সেখানে বিশ্রাম নেন, সেখানের কোন দরসের হালকায় বসে জ্ঞান আহরণ করেন এবং সেখানেই আল্লাহর 'ইবাদাতে মগ্ন হয়ে পড়েন।[৫]

সুউচ্চ মর্যাদা, পার্থিব ভোগ-বিলাস বিমুখতা এবং আল্লাহর প্রতি শক্ত ঈমান ও ভীতির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন প্রথম স্তরের তাবি'ঈদের অন্যতম। ইবন হাজার 'আসকালানী বলেন, তিনি ফিকাহ্, অন্যান্য জ্ঞান, তাকওয়া-পরহিযগারী এবং মহত্ব ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের মধ্যে পরিগণিত। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম ও বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ ছিলেন।[৬] ইমাম নাওবী বলেন, তিনি মক্কার মুফতী এবং বিখ্যাত ইমামদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। অনেক বড় বড় ইমাম তাঁর অগাধ জ্ঞানের স্বীকৃতি দান করেছেন।[৭] ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, জ্ঞানের ভাণ্ডার আল্লাহ্ তাঁকে দান করেন যাঁকে তিনি ভালোবাসেন। জ্ঞান

---

১. তাবাকাত-৫/৪৬৭

২. ইবন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬১; সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৯

৩. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৩

৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮

৫. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবিঈন-১৩

৬. তাহযীবুত তাহযীব-৭/২০৩

৭ তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৩

যদি কারো সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হতো তাহলে উচ্চবংশ, মতান্তরে নবীর (সা) বংশই তার অগ্রাধিকারী হতো। কিন্তু 'আতা' ছিলেন হাবশী দাস, ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব ছিলেন নাওবী, আল-হাসান আল-বসরী ও ইবন সীরীন ছিলেন দাস।[৮] ইমাম যাহাবী তাকে মক্কার মুফতী, মুহাদ্দিছ ও নেতৃস্থানীয় 'আলিম বলে উল্লেখ করেছেন।[৯] ইবন আবী লায়লা তাঁকে মক্কার ফকীহ্ বলেছেন।[১০]

হযরত 'আতা' সম্পর্কে একবার মক্কাবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ তোমাদের মধ্যে 'আতগ্না' ইবন আবী রাবাহ কেমন ছিলেন? তারা বলেছিল ঃ তিনি ছিলেন সুস্থতার মত, না হারানো পর্যন্ত যার গুরুত্ব বুঝা যায় না।[১১] ইমাম আল-আওযা'ঈ বলতেন, 'আতা' যখন ইনতিকাল করেন তখন তিনি মানুষের নিকট ধরাপৃষ্ঠের সবচেয়ে বেশি প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।[১২] তিনি দুইশো সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন।[১৩] 'আবদুর রহমান ইবন মাহ্দী বলেন : আমি মক্কায় 'আতা' ইবন আবী রাবাহ্, ইরাকে মুহাম্মাদ ইবন সীরীন ও শামে রাজা' ইবন হায়ওয়া—এ তিনজনের মত আর কাউকে দেখিনি।[১৪] সালামা ইবন কুহায়ন বলতেন, আমি 'আতা', তাউস ও মুজাহিদ ছাড়া এমন কাউকে দেখিনি যে তাঁর জ্ঞানের দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করেছেন।[১৫] সা'ঈদ ইবন আবী 'আরূবা বলতেন ঃ[১৬]

إذا اجتمع أربعة لم أبال بمن خالفهم الحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم وعطاء، هؤلاء أئمة الأنصار.

'আল-হাসান আল-বসরী, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ, 'আতা' ইবন আবী-রাবাহ– এ চারজন যখন কোন বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন তখন কেউ তাঁদের বিরোধিতা করলে আমি তার পরোয়া করিনে। এঁরা হলেন আনসারদের ইমাম।'

কুরআন, হাদীছ, ফিকাহ্ তথা সকল ইসলামী জ্ঞানে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। হাদীছের বিখ্যাত হাফিজদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে প্রথম স্তরের হুফ্ফাজে হাদীছের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইবন সা'দ তাঁকে 'কাছীরুল হাদীছ' বা বহু হাদীছের ধারক বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি প্রায় দু'শো মহান সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন এবং তাঁদের অনেকের নিকট থেকে হাদীছ শুনার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। যে সকল মহান সাহাবীর নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন এবং যাঁদের সূত্রে হাদীছ

---

[৮] সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৯

[৯] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮

[১০] আল-ইক্দ আল-ফারীদ-৩/৪১৬

[১১] প্রাগুক্ত-২/২৩১, ৩/১৬৯

[১২] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮; তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৩

[১৩] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৫১, টীকা-২,

[১৪] আল-ইক্দ আল-ফারীদ-২/২৩১

[১৫] তাবাকাত-৫/৪৬৭

[১৬] তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৩

[১৭] তাবাকাত-৫.৪৫৭, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮

বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবায়র (রা), মু'আবিয়া (রা), উসামা ইবন যায়দ (রা), জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা), যায়দ ইবন আরকাম (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন সায়িব আল-মাখযূমী (রা), 'আকীল ইবন আবী তালিব (রা), 'আমর ইবন আবী সালামা (রা), রাফি' ইবন খাদীজ (রা), আবুদ দারদা' (রা), আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা), আবূ হুরাইরা (রা), উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) ও উম্মু হানী (রা)।[১৮]

অনেক তাবি'ঈর নিকট থেকেও তিনি হাদীছ শুনেন। আবূ সালিহ্ আস সাম্মান, সালিম ইবন শাওয়াল, সাফওয়ান ইবন ইয়া'লা ইবন উমাইয়্যা, 'উবায়দ ইবন 'উমায়র, 'উরওয়া ইবন যুবায়র, ইবন আবী মুলায়কা, 'ইমাদ ইবন আবী 'আম্মার, আবুয্ যুবায়র, মূসা ইবন আনাস, হাবীব ইবন আবী ছাবিত প্রমুখ তাবি'ঈ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেন এবং হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন তাঁদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। বিশেষ কয়েকজনের নাম এই : আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ, যুহ্রী, মুজাহিদ, আইউব আস-সিখতিয়ানী, আ'মাশ, আওয়াযা'ঈ, ইবন জুরায়জ, আবুয্ যুবায়র, হাকাম ইবন''উতবা, আবূ হানীফা, হুসায়ম আল-মু'আল্লিম, হাম্মাম ইবন ইয়াহইয়া, জারীর ইবন হাযিম, 'আমর ইবন দীনার, মালিক ইবন দীনার, কাতাদা ও আরো অনেকে।[১৯]

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছের এত সম্মান দিতেন যে, হাদীছ আলোচনার মাঝখানে কথা বলা দারুণ অপছন্দ করতেন। কেউ কথা বললে ভীষণ ক্ষুব্ধ হতেন। মু'আয ইবন সা'ঈদ আল-আ'ওয়ার বর্ণনা করেন। একদিন আমরা 'আতা'র নিকট বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি হাদীছ বর্ণনা করলো। অন্য এক ব্যক্তি মাঝখানে কিছু বলে উঠলো। 'আতা' ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন ঃ এটা কেমন নৈতিকতা, কেমন স্বভাব! আল্লাহর কসম! মানুষ এ জন্য হাদীছ বর্ণনা করে যেন তা দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হয়। যদি কেউ কোন হাদীছ বর্ণনা করে- যদিও সে হাদীছটি আমার কাছ থেকেই শুনেছে, আমি তা চুপচাপ এমনভাবে শুনে যাই যেন বর্ণনাকারী মনে করে এটি আমি এই প্রথম শুনছি। এর পূর্বে হাদীছটি আর কখনো শুনিনি। 'আমর ইবন 'আসিম বলেন, আমি 'আতা'র এ কথাটি 'আবদুল্লাহ ইবন মুবারাকের নিকট বর্ণনা করলে তিনি শুনে বললেন, আমি যতক্ষণ না নিজে গিয়ে এই মেহেদীর মুখ থেকে কথাটি নিজ কানে শুনবো, আমার পায়ের জুতো খুলবোনা।[২০] তিনি যেমন রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ বর্ণনা করতেন তেমনি হুবহু তা অনুসরণও করতেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহ) বলেছেন :[২১]

ليس فى التابعين أحد اكثر اتباعا للحديث من عطاء .

---

[১৮]. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬১; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮, তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৩

[১৯]. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬১; তাহযীবুত তাহযীব-৪/১৯৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/১২১; তাহ্যীবুল আসমা'

[২০]. তাবাকাত-৫/৪৬৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/১২১

[২১]. তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৩

- তাবি'ঈদের মধ্যে 'আতা'র চেয়ে বেশী হাদীছের অনুসরণকারী দ্বিতীয় কেউ নেই। ইমাম বাকির লোকদের বলতেন, যতটুকু সম্ভব তোমরা 'আতা' থেকে হাদীছ গ্রহণ কর।[২২]

অন্যান্য শাস্ত্রে বিচরণ থাকলেও তাঁর বিশেষ শাস্ত্র ছিল ফিকাহ্। তাঁর ফিকাহ্র জ্ঞানের ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিছ, ফকীহ্ ও ইমাম একমত। ইবন হাজার লিখেছেন, ফিকাহ্তে তিনি নেতৃস্থানীয় তাবি'ঈদের মধ্যে ছিলেন।[২৩] রাবী'আ, যিনি নিজেই একজন বড় ফকীহ্ ছিলেন, বলতেন, ফাতওয়ার ক্ষেত্রে 'আতা' ছিলেন সকল মক্কাবাসীর উপরে। মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ আদ দীবাজ বলতেন, আমি 'আতা'র চেয়ে কোন ভালো মুফতী দেখিনি।[২৪] তাঁর মজলিসে আল্লাহর যিক্র বন্ধ হতো না। কোন প্রশ্ন করা হলে সুন্দর জবাব দিতেন। ইমাম আবূ হানীফা বলতেন, আমি 'আতা'র চেয়ে ভালো আর কাউকে পাইনি।[২৫] অনেক বড় বড় সাহাবী পর্যন্ত তাঁর ফিকাহ্র জ্ঞানের স্বীকৃতি দান করেছেন। হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা) ও হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার (রা) যখন মক্কায় যেতেন এবং বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে জানার জন্য মানুষ তাঁদের নিকট ভিড় করতো তখন তাঁরা বলতেন : ওহে মক্কাবাসী! তোমাদের এখানে 'আতা' বর্তমান থাকতে তোমরা আমার কাছে ভিড় করেছো?[২৬] ইমাম আছ-ছাওরী বর্ণনা করেছেন। একবার 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার মক্কায় আসলেন। মানুষ বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য ভিড় করলো। তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন : তোমাদের মধ্যে 'আতা' থাকতে তোমরা আমার জন্য প্রশ্নসমূহ জমা করে রাখ?[২৭]

তাঁর সময়ে মক্কার ইফতার মসনদের অলঙ্কার হিসেবে মাত্র দুই ব্যক্তি গণ্য হতেন। একজন তিনি এবং অন্যজন মুজাহিদ। তবে দুইজনের মধ্যে প্রাধান্য ছিল তাঁর।[২৮] ইবন খাল্লিকান বলেছেন, সে যুগের মক্কার ফাতওয়া তাঁদের দুইজনের নিকট গিয়ে শেষ হয়েছে।[২৯] রাবী'আ বলেছেন, ফাতওয়ার ক্ষেত্রে 'আতা' মক্কাবাসীদের সকলকে ডিঙ্গিয়ে গেছেন।[৩০]

তাঁর এত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ফাতওয়া দানের ব্যাপারে দারুণ সতর্ক ছিলেন। কখনো কোন মাসআলায় নিজের মত প্রকাশ করতেন না। কোন মাসআলায় যদি কুরআন-হাদীছের কোন দলীল প্রমাণ তাঁর জানা না থাকতো তিনি সাফ বলে দিতেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। 'আবদুল 'আযীয ইবন রাফী' বলেন, একবার 'আতা'র নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাব দিলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। লোকেরা বললো, আপনার মতের ভিত্তিতেই জবাব দিন না কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর সামনে আমার লজ্জা হয় এই ভেবে যে, তাঁর যমীনে আমার সিদ্ধান্তের অনুসরণ করা হবে।[৩১]

---

২২. প্রাগুক্ত-১/৩৩৪
২৩. তাহযীবুত তাহযীব-৪/২০৩
২৪. প্রাগুক্ত-৭/২০১
২৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮
২৯. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬১
৩০. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৪
৩১. তাহযীবুত তাহযীব-৭/২০৩

তবে একজন ফকীহ্ ও মুফতীকে নিজস্ব মতামত ও সিদ্ধান্ত অবশ্যই দান করতে হয়। তিনি সবসময় নিজের মতামত ব্যক্ত করার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারেন না। এ কারণে 'আতা' যখন কিয়াস বা অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ফাতওয়া দিতেন তখন তা স্পষ্ট করে বলে দিতেন। ইবন জুরায়জ বলেন, 'আতা' যখন কোন বিষয় বর্ণনা করতেন তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম এটা 'ইলম না সিদ্ধান্ত? যদি তিনি হাদীছের ভিত্তিতে বলতেন তাহলে তা যেমন বলে দিতেন, তেমনিভাবে কিয়াস ও সিদ্ধান্ত হলে তাও উল্লেখ করতেন।[৩২]

হজ্জের আহকাম ও বিধি-বিধানের তিনি একজন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আল-বাকির বলতেন, হজ্জের বিষয়ে 'আতা'র চেয়ে বেশি জানা লোক কেউ আর বেঁচে নেই।[৩৩] উমাইয়্যা শাসনকালে হজ্জের সময় ঘোষণা দেওয়া হতো যে, হজ্জের মাসআলার ব্যাপারে 'আতা' ইবন আবী রাবাহ্ ছাড়া আর কেউ ফাতওয়া দিতে পারবে না।[৩৪] কাতাদা বলতেন, হজ্জের বিধি-বিধান 'আতা' সবচেয়ে বেশী জানেন।[৩৫] ইবনুল জাওযী বর্ণনা করেছেন ঃ উমাইয়্যা খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক একবার তাঁর দুই ছেলেকে সংগে নিয়ে 'আতা'র নিকট যান। তিনি তখন নামাযে দাঁড়িয়ে। তাঁরা পাশে বসলেন। নামায শেষ করে তিনি পাশে বসা খলীফার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। তাঁরা হজ্জের বিধি-বিধান ও রীতি পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। 'আতা' তাঁদের দিকে মুখ না ঘুরিয়ে পিছনে রেখেই সব প্রশ্নের জবাব দিলেন। প্রশ্নোত্তর শেষ হলে সুলায়মান তাঁর দুই ছেলেকে বললেন : ওঠো, আমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য এখানে এসেছি। এই কালো দাসের নিকট আমাদের এ অপমান আমি কখনো ভুলবো না।[৩৬]

এরপর খলীফা তাঁর পুত্রদ্বয়কে সংগে নিয়ে সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সা'ঈর উদ্দেশ্যে চললেন। চলার পথে তাঁরা শুনতে পেলেন, ঘোষকরা ঘোষণা করছে, 'ওহে মুসলিম জনগণ! হজ্জের মওসুমে এখানে একমাত্র 'আতা ইবন আবী রাবাহ্ ছাড়া আর কেউ জনগণের মধ্যে ফাতওয়া দিতে পারবে না। তাঁকে পাওয়া না গেলে 'আবদুল্লাহ্ ইবন আবী নাজীহ্ ফাতওয়া দিবেন।' এ ঘোষণা শুনে খলীফার এক পুত্র পিতার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীনের একজন ওয়ালী এ ঘোষণা কিভাবে দিতে পারেন যে, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ্ ছাড়া আর কেউ ফাতওয়া দিতে পারবে না? তা ছাড়া আমরা এমন লোকের নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞেস করতে কেনই বা গেলাম যিনি খলীফাকে কোন আমলই দিলেন না– যথাযথ সম্মান প্রদর্শন তো দূরের কথা।

খলীফা সুলায়মান তাঁর ছেলেকে বললেন : বেটা! এই যাঁকে তুমি দেখলে, যাঁর সামনে

---

৩২. তাবাকাত-৫/৩২৫

৩৩. প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮

৩৪. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৪

৩৫. তাবাকাত-৫/৪৬৭

৩৬. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৯

আমাদেরকে এমন অপদস্ত হতে হলো, তিনি 'আতা' ইবন আবী রাবাহ। মসজিদুল হারামের তিনি মুফতী। এই মর্যাদাপূর্ণ আসনে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) উত্তরাধিকারী। তারপর তিনি আরো বলেন : 'বেটা! জ্ঞান অর্জন কর। জ্ঞানের দ্বারাই নীচ লোকেরা সম্মানীয় হয়, উদাসীনরা সতর্ক হয় এবং দাসেরা রাজাদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়।' উল্লেখ্য যে, 'আতা ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ দাস।[৩৭]

অতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষ যাদের হজ্জের মওসুমে তাঁকে দেখার, তাঁর সাথে থাকার এবং তাঁর খিদমত করার সুযোগ ঘটতো তারাও হজ্জের মাসলা-মাসাইলে অভিজ্ঞ হয়ে যেত। এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা আছে। ইমাম আবু হানীফা বলতেন, হজ্জের সময় একজন নাপিত, যে 'আতা'-কে দেখেছিল, আমাকে পাঁচটি স্থানে হজ্জের বিধান শিখিয়েছেন। মাথার চুল মুড়ানোর আগে আমি দাম-দস্তুর ঠিক করতে চাইলাম। সে বললো, 'ইবাদাতে কোন শর্ত করা যায় না। বসে যান, হাজামত শেষ হোক। আমি সোজা কিবলার দিকে মুখ না করে একটু বেঁকে বসলাম। সে কিবলামুখী হয়ে বসতে ইঙ্গিত করলো। আমি বাম দিক থেকে মাথা মুড়াতে চাইলাম। সে বললো, ডান দিক ঘুরান। আমি ডান দিক ঘুরিয়ে দিলাম, সে মুড়াতে লাগলো। আমি চুপচাপ বসে থাকলাম। সে বললো, তাকবীর পাঠ করতে থাকুন। হাজামত শেষ হলে আমি যাবার জন্য উঠলাম। সে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছেন? আমি বললাম, আমার আবাসস্থলে। সে বললো, প্রথমে দুই রাকা'আত নামায আদায় করুন, তারপর যান। আমার ধারণা হলো, এই নাপিতের এ রকম মাসআলা জানার কথা নয়– যদি না সে অন্য কারো নিকট থেকে জেনে থাকে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমাকে যে কথাগুলি শিখালে, তা কোথা থেকে শিখেছো? সে বললো, আমি 'আতা' ইবন আবী রাবাহ্কে এমন করতে দেখেছি।[৩৮]

'আতা'র মধ্যে 'ইলমের সাথে সাথে 'আমলও ছিল। যুহ্দ ও তাকওয়ার দিক দিয়ে তাবি'ঈনের মধ্যে তিনি বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিলেন। ইবন হাজার লিখেছেন যে, 'ইলম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তাবি'ঈদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়।[৩৯] ইমাম আয-যাহাবী লিখেছেন, জ্ঞান, পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্যের প্রতি বৈরাগ্য ও আল্লাহর 'ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে 'আতা'র গুণ-বৈশিষ্ট্য অনেক।[৪০]

'আতা'র ঈমান ছিল অতি উঁচু স্তরের। এ সম্পর্কে 'আবদুর রহমান বলেন, গোটা মক্কাবাসীর ঈমান সম্মিলিতভাবে 'আতা'র ঈমানের সমান ছিল না।[৪১]

তাঁর 'ইবাদাত-বন্দেগীর অবস্থা ইবন জুরায়জের একটি মন্তব্য দ্বারা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, বিশ বছর মসজিদ ছিল 'আতা'র বিছানা।[৪২]

---

৩৭. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবিঈন, পৃ. ১১-১২

৩৮. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬১-২৬২

৩৯. তাহযীবুত তাহযীব-৭/২০৩

৪০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১৯৮

৪১. তাবাকাত-৫/৩৪৬

৪২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১৯৮; তাহযীবুত তাহযীব-৭/২০২

প্রতি রাতে তাহাজ্জুদে দুইশ' অথবা তার চেয়ে বেশী আয়াত তিলাওয়াত করতেন। বেশী 'ইবাদাতের কারণে কপালে সিজদার দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।[৪৩] কোন একটি মুহূর্ত তাঁর আল্লাহর স্মরণ ছাড়া কাটতো না। 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবন 'উছমান বর্ণনা করেছেন, আমি 'আতা'র চেয়ে ভালো কোন মুফতী দেখিনি। তাঁর মজলিসে সব সময় আল্লাহর স্মরণ চলতে থাকতো এবং লোকেরা জ্ঞানের আলোচনা ও তর্ক-বাহাছ করতো। 'আতা' যখন কিছু বলতেন অথবা কোন প্রশ্ন করা হতো, খুব সুন্দরভাবে জবাব দিতেন।[৪৪]

তিনি মক্কায় অবস্থান করতেন। এ কারণে কোন বছরই তাঁর হজ্জ বাদ পড়তো না। তিনি সত্তর বার হজ্জ আদায় করেছেন বলে জানা যায়।[৪৫] হাদীছ অনুসরণের ব্যাপারে অত্যধিক যত্নবান ছিলেন। ইমাম শাফি'ঈ বলেন, তাবি'ঈদের মধ্যে 'আতা'র চেয়ে বেশি হাদীছের অনুসারী কেউ ছিলেন না।

নির্জনবাসের প্রতি তাঁর স্বভাবগত ঝোঁক ছিল। মানুষের সাথে বেশী মেলামেশা পছন্দ করতেন না। দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতেন। যখন কেউ ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইতো, জিজ্ঞেস করতেন সে কি উদ্দেশ্যে এসেছে। আগন্তুক যদি বলতো, আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। জবাবে তিনি বলতেন, আমার মত মানুষের সাথে সাক্ষাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তারপর বলতেন, এ যুগটা কেমন নোংরা হয়ে গেছে যে, আমার মত মানুষের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসা হয়। কিন্তু আল্লাহর যিক্‌র হয় এমন ভালো মজলিস তাঁর প্রিয় ছিল। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিসে বসে যেখানে আল্লাহর যিক্‌র হয়, আল্লাহ্ এই মজলিসকে তাঁর দশটি বাতিল মজলিসের কাফ্‌ফারা বানিয়ে দেন।[৪৬]
যখন কোন মজলিসে বসতেন তখন বেশীরভাগ সময় চুপচাপ থাকতেন। ইসমা'ঈল ইবন উমাইয়্যা বলেন, 'আতা' সাধারণতঃ চুপচাপ থাকতেন। যখন কোন কিছু বলতেন তখন আমাদের মনে হতো তাঁর উপর কোন ইলহাম হচ্ছে।[৪৭]
হযরত 'আতা' (রহ) বলতেন : তোমাদের পূর্ববর্তীরা অহেতুক কথা পছন্দ করতেন না। আল্লাহর কিতাব থেকে যা কিছু পাঠ করা হয়, আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার এবং জীবন জীবিকার প্রয়োজনে যেসব কথা বলা হয়, তা ছাড়া আর সবই তাঁরা অহেতুক কথা বলে মনে করেছেন। তোমাদের ডান ও বাম পাশে যে দুইজন কাতিব ফিরিশতা তোমাদের মুখ থেকে বের হওয়া সব কথা লিখে রাখছেন তা কি তোমরা অস্বীকার কর? তোমাদের কি শরম হয় না, তাতে এমন সব কথা লেখা থাকবে যা তোমাদের দীন ও দুনিয়ার সাথে কোনভাবে সম্পৃক্ত নয়, আর সেই দফতর তোমাদের সামনে মেলে ধরা হবে?[৪৮]

---

[৪৩] তাবাকাত-৫/৩৪৬
[৪৪] প্রাগুক্ত-৫/৩৪৫
[৪৫] তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৩; ওয়াফাযাতুল আ'য়ান-৩/২৬৩
[৪৬] মুখতাসার সিফাতুস সাফওয়া-১৮৫
[৪৭] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯৮; তাহযীবুল আসমা'-১/৩৩৪
[৪৮] সিফাতুস সাফওয়া-২/১২০

'উছমান ইবন 'আতা আল-খুরাসানী বর্ণনা করেছেন। একবার আমি আমার পিতার সাথে খলীফা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা যখন দিমাশ্কের কাছাকাছি তখন একটি কালো গাধার উপর আরোহী এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলাম। তাঁর গায়ে মোটা কাপড়ের জীর্ণশীর্ণ একটি জোব্বা, মাথার সাথে লেপ্টে থাকা একটি টুপি মাথায় এবং তার জিনের পা দানি দু'টি কাঠের। তাঁর এমন বিচিত্র অবস্থা দেখে আমার হাসি পেল। আমি পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম : এই বৃদ্ধ কে? তিনি ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে বললেন : চুপ কর। ইনি হিজাযের ফকীহ্দের নেতা 'আতা' ইবন আবী রাবাহ্। তিনি যখন আমাদের কাছাকাছি এলেন তখন আমার পিতা তাঁর খচ্চরের পিঠ থেকে এবং তিনি তাঁর গাধার পিঠ থেকে নামলেন। তারপর উভয়ে কোলাকুলি ও কুশল বিনিময় করলেন। তারপর দু'জন নিজ নিজ বাহনের পিঠে উঠলেন এবং দিমাশ্কে হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকের প্রাসাদের দরজায় উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁরা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পেলেন। তাঁরা বের হয়ে আসার পর আমি আমার পিতার নিকট ভিতরের ঘটনাবলী জানতে চাইলাম। তিনি বললেন : হিশাম যখন জানতে পেলেন, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ্ দরজায় অপেক্ষা করছেন তখন খুব তাড়াতাড়ি তাঁকে ভিতরে ঢোকার অনুমতি দিলেন। আল্লাহর কসম! আমি তাঁরই কল্যাণে ভিতরে ঢোকার সুযোগ লাভ করেছি। হিশাম 'আতা'কে দেখেই বলতে লাগলেন :

মারহাবান, মারহাবান– এখানে, এখানে আসুন! এখানে, এখানে বসুন! তারপর তাঁকে ধরে নিজের আসনে এমনভাবে বসালেন যে, হিশাম ও 'আতা'র হাঁটু দু'টি একটি অপরটিকে স্পর্শ করছিল। সেই মজলিসে তখন খিলাফতের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কোন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তাঁরা সবাই 'আতা'র উপস্থিতিতে চুপ হয়ে গেলেন।

একটু স্থির হয়ে বসার পর হিশাম 'আতা'কে লক্ষ্য করে বললেন : আবূ মুহাম্মাদ! আপনার প্রয়োজনের কথা একটু বলুন!

'আতা' : হে আমীরুল মু'মিনীন! হারামায়নের (মক্কা-মদীনা) আধাবাসীরা হলো আল্লাহর আহ্ল ও তাঁর রাসূলের প্রতিবেশী। তাঁদের বেতন-ভাতা আপনি বণ্টন করুন! হিশাম বললেন : হাঁ। তারপর তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে মক্কা-মদীনার অধিবাসীদের ভাতা বণ্টনের বিষয়টি নোট করে নিতে আদেশ করেন। তারপর তিনি 'আতা'কে লক্ষ্য করে আবার বলেন : আবূ মুহাম্মাদ! আর কোন প্রয়োজন আছে কি?

'আতা' : আমীরুল মু'মিনীন! হিজায ও নাজদের অধিবাসীরা হলো আরবের মূল, ইসলামের নেতা ও পরিচালক। বায়তুল মালে জমা হওয়া তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ তাদের মধ্যে বণ্টন করা হোক। হিশাম এ প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাঁর সেক্রেটারীকে নোট করে নিতে বললেন। তারপর আবার বললেন : আবূ মুহাম্মাদ! আপনার আর কোন কথা আছে কি?

'আতা' : হাঁ, আছে! আমাদের সীমান্ত রক্ষীরা শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে। তারা সেখান থেকে সরে এলে অথবা ধ্বংস হলে শত্রুরা মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করবে। সুতরাং আপনি তাদের বেতন-ভাতা তাদের নিকট পৌঁছে দিবেন।

খলীফা তাঁর প্রস্তাব মেনে নিয়ে সেক্রেটারীকে বিষয়টি লিখে রাখার নির্দেশ দেন। তারপর খলীফা আবার জানতে চান : আবূ মুহাম্মাদ! আর কোন প্রয়োজনীয় কথা আছে কি?

'আতা' : হাঁ, আছে। আপনার খিলাফতের যিম্মীদের উপর তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাবেন না। তাদের নিকট থেকে যে জিযিয়া আদায় করা হয়, তাই হচ্ছে আপনাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা। খলীফা তাঁর সেক্রেটারীকে বললেন : লিখ, যিম্মীদের উপর তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপানো যাবে না।

খলীফা আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবূ মুহাম্মাদ! আপনার আর কোন কথা আছে কি?

বললেন : হাঁ, আছে। হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার নিজের ব্যাপারে আপনি আল্লাহকে ভয় করুন! জেনে রাখুন, আপনাকে একাকী সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনি একাকী মৃত্যুবরণ করবেন। আপনাকে একাকী উঠানো হবে এবং এককভাবে আপনার হিসাব নেওয়া হবে। আল্লাহর কসম! আপনার প্রিয়জনদের কেউ আপনার সাথে থাকবে না।– একথা শোনার পর হিশাম ডুকরে কেঁদে উঠে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যান।

'আতা' আল-খুরাসানী বলেন : হিশামকে সেই অবস্থায় রেখে 'আতা ইবন আবী রাবাহ্ উঠে পড়েন এবং আমিও তাঁর সাথে উঠি। যখন আমরা সদর দরজার কাছাকাছি ঠিক সেই সময় একটি লোক একটি থলে হাতে করে পিছন দিক থেকে আমাদের কাছে ছুটে আসে। আমি জানিনে তার মধ্যে কি আছে। লোকটি 'আতা' ইবন আবী রাবাহ্কে বলে: আমীরুল মু'মিনীন এই থলেটি আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।

তিনি বলেন : অসম্ভব। তারপর এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنَّ أَجْرِىَ الاَّ عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

- আমি তোমদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাইনা। আমার প্রতিদান দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের।

আল্লাহর কসম! তিনি খলীফার নিকট প্রবেশ করে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে কোন কিছু পানাহার তো দূরের কথা এক ফোঁটা পানিও পান করেননি।[৪৯]

একদিন আল-হাসান আল-বসরী (রহ) তাঁর এক মজলিসে বললেন : মুনাফিকের ব্যাপারে তিনটি জিনিস জেনে নাও। ১. যদি কথা বলে, মিথ্যা বলে। ২. তাঁর নিকট কোন কিছু গচ্ছিত রাখলে আস্থা ভঙ্গ করে। ৩. অঙ্গীকার করলে পালন করে না। একথা হযরত 'আতা'র (রহ) কানে গেলে বললেন : য়া'কূবের (আ) ছেলেদের মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তারা তাঁকে মিথ্যা বলেছে, আমানাতে খিয়ানাত করেছে এবং তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে নুবুওয়াত দিয়েছেন। হযরত আল-হাসান একথা শুনে উচ্চারণ করেন :[৫০]

---

৪৯. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবিঈন-১৮-২১; আল-'ইকদ আছ-ছামীন ফী তারীখ আল- বালাদ আল-আমীন-৬/৮৯-৯০

৫০. সূরা ইউসুফ-৭৬

فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ .

প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপর রয়েছে এক জ্ঞানীজন।[৫১]

ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেন : 'আতা' (রহ) তাঁর দু'আর মধ্যে বলতেন : হে আল্লাহ দুনিয়াতে আমার অজানা অচেনা স্থানে মরণকালে আমার কষ্টের সময় এবং কবরে আমার একাকীত্বের সময় আমার প্রতি দয়া ও করুণা করুন।[৫২]

হযরত 'আতা' (রহ) ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ, এক চক্ষুহীন, শ্বাসকষ্টের রোগী, পক্ষাঘাতগ্রস্ত এক ল্যাংড়া মানুষ। পরবর্তীকালে তিনি একেবারেই অন্ধ হয়ে যান। সুলায়মান ইবন রাফী' বলেন : আমি একবার মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম মানুষ এক ব্যক্তিকে ঘিরে জড়ো হয়ে আছে। পরে দেখতে পেলাম 'আতা' ইবন আবী রাবাহ বসে আছেন। একটি কালো কাকের মত তাঁকে দেখাচ্ছে।[৫৩] তাঁর মা বারাকাও ছিলেন একজন কৃষ্ণাঙ্গী।[৫৪]

ইমাম আয-যাহাবী বলেছেন, সঠিক বর্ণনা মতে হিজরী ১১৪ সনের রমাদান মাসে তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করেন। অনেকে হিজরী ১১৫ সনের কথাও বলেছেন।[৫৫] তিনি একশো বছর জীবন লাভ করেন– একথা ইবন আবী লায়লা বলেছেন। তবে ৮৮ বছরের কথাও বলা হয়েছে।[৫৬]

---

[৫১] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬২

[৫২] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/২২১

[৫৩] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬২

[৫৪] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/২৩১; ৩/১৬৯

[৫৫] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮

[৫৬] সিফাতুস সাফওয়া-২/১২১; ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬২

ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রী (রহ)

ইতিহাসে তিনি ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রী বা ইমাম যুহ্‌রী নামে খ্যাত। তিনি হিজরী ৫০ সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পরিচয় এ রকম : আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন 'আবদিল্লাহ্ ইবন শিহাব ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন হারিছ ইবন যুহ্‌রাহ্ ইবন কিলাব ইবন মুর্‌রাহ্ আল-কুরাশী। তাঁর আসল নাম মুহাম্মাদ, ডাক নাম আবূ বকর এবং পিতার নাম মুসলিম ছিল। তবে তিনি তাঁর পিতামহ ইবন শিহাব ও গোত্র বানূ যুহ্‌রার প্রতি আরোপিত হয়ে ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রী নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। পিতামহ 'আবদুল্লাহ ইবন শিহাব ইসলামের সূচনা পর্বে অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মত হযরত রাসূলে কারীমের কট্টর দুশমন ছিলেন। ঐতিহাসিক বদর ও উহুদ যুদ্ধে মক্কার পৌত্তলিক বাহিনীর সাথে তিনিও ইসলামকে সমূলে উৎপাটনের উদ্দেশ্যে যোগদান করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধের সেই সব অত্যুৎসাহী পৌত্তলিক সৈনিকদের একজন ছিলেন যারা রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যা করার অথবা নিজেরা যুদ্ধ করে নিহত হওয়ার অঙ্গীকার করেছিল।[২] পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তৃতীয় খলীফা হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে মক্কায় ইনতিকাল করেন। যুহ্‌রীর পিতা মুসলিম ছিলেন একজন সংগ্রামী মুসলমান। তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) বায়'আত করেন এবং বানূ উমাইয়্যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন।[৩]

ইসলামের এমন কট্টর দুশমনের বংশে মুহাম্মাদ ইবন মুসলিমের জন্ম হয়। ইসলামের জন্য তাঁর যে অবদান ইতিহাস তা কোনদিন ভুলতে পারবে না। তিনি ছিলেন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম পর্বের গুটি কয়েক মনীষীর একজন যাঁরা ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সূচনা করেন। আর যার আলোতে পরবর্তীকালে গোটা মুসলিম জাহান আলোকিত হয়ে ওঠে।

জ্ঞানগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে ইবন শিহাবের সমকালীন অন্য কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তাঁর মধ্যে জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা ছিল স্বভাবগত। তাঁর মেধা, ধীশক্তি ও মুখস্থ শক্তি ছিল অতুলনীয়। এত প্রখর মেধাবী ছিলেন যে, কোন মাসআলা দু'বার বুঝার প্রয়োজন পড়তো না। আর মুখস্থ শক্তি এত প্রবল ছিল যে, একবার যে কথা শুনতেন তা অন্তরে খোদাই হয়ে যেত। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন হতো না।[৪] তাঁর মুখস্থ শক্তির একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত হলো, মাত্র আশি দিনে পুরো কুরআন মুখস্থ করেন।[৫] সারা জীবনে মাত্র একবার একটি হাদীছের ব্যাপারে একটু সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৮

২. ওফায়াতুল আ'য়ান-১/৪৫১

৩. 'আসরুত তাবি'ঈন-১২০; আল-ইসাবা-২/৩২৫

৪. তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব-৯/৪৪৮

৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৮

জিজ্ঞেস করার পর বুঝলেন, যেভাবে সেটি তাঁর মুখস্থ ছিল, তা তেমনই। তিনি নিজেই বলতেন, আমি আমার অন্তর মাঝে কখনো কোন কিছু গচ্ছিত রাখলে তা আর কখনো ভুলিনি।[৬]

এমন অতুলনীয় মেধা ও মুখস্থ ক্ষমতার সাথে তাঁর আগ্রহ, সন্ধান ও জিজ্ঞাসার অবস্থা এমন ছিল যে, জ্ঞান ও শাস্ত্রের এমন কোন খামার ছিল না যার শস্য তিনি আহরণ করেননি। আট বছর যাবত মদীনার ইমাম সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের (রহ) সান্নিধ্যে ছিলেন। এ সময়ে মদীনার প্রতিটি অলি-গলি ছিল জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও শাস্ত্রের কেন্দ্র স্বরূপ। এখানকার প্রত্যেক নারী-পুরুষ ও শিশু-যুবক-বৃদ্ধ ছিল এককেটি স্বতন্ত্র শিক্ষা কেন্দ্র। ইবন শিহাব মদীনার প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে সবার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন। আবুয যানাদ বর্ণনা করেছেন। আমরা যুহ্রীর সাথে 'আলিমদের বাড়ী বাড়ী চক্কর মারতাম। যুহ্রীর সাথে থাকতো লেখার উপকরণ। তিনি যা কিছু শুনতেন সাথে সাথে লিখে ফেলতেন।[৭] তাঁর এমন কর্মকাণ্ডে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে নিয়ে হাসা-হাসি ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। তিনি তা মোটেই আমলে আনতেন না। ফলে তিনি হিজরী প্রথম শতক শেষ হওয়ার আগেই পূর্বসূরীদের সুন্নাহ্র সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিতে পরিণত হন। তাই বলা হয়েছে, তিনি না জন্মালে সুন্নাহ্র অনেক কিছুই হারিয়ে যেত। তিনি সাহ্ল ইবন সা'দ (রা), আনাস ইবন মালিক (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) মুখ থেকে হাদীছ শুনেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) সূত্রে তিনটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। মক্কায় 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) যখন মারা যান তখন ইবন শিহাবের বয়স মাত্র সতেরো বছর। জ্ঞানের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসার কারণে তিনি তাঁর উস্তাদ ও শায়খদেরকে সীমাহীন ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। মদীনার সাত ফকীহ্র অন্যতম 'উরওয়া ইবন যুবায়র ছিলেন তাঁর একজন শিক্ষক। তাঁর সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন: 'আমি 'উরওয়ার বাড়ীর দরজায় এসে বসে থাকতাম। অপেক্ষা করে আবার ফিরে যেতাম। বাড়ীর ভিতরে ঢুকতাম না। আমি ইচ্ছা করলে ঢুকতে পারতাম। তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার কারণে ঢুকিনি। তাঁর আরেকজন শিক্ষক 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ– যিনি মদীনার সাত ফকীহ্র অন্যতম, তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁর খাদিম হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বলতেন: আমি 'উবাইদুল্লাহ্ ইবন 'আবদিল্লাহ্র সেবা করেছি। আমি তাঁর জন্য মিষ্টি পানি আনতাম। আমি তাঁর দরজায় এসে সংকেত দিলে তিনি দাসীকে জিজ্ঞেস করতেন: দেখ তো দরজায় কে? সে তাঁকে বলতো: আপনার দাস আল-আ'মাশ। দাসী আমাকে তাঁর একজন দাস মনে করতো।[৮]

জ্ঞান চর্চার মজলিসসমূহে তিনি সবার আগে যেতেন। কোন বাছ-বিচার না করে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন। মসজিদের নির্ধারিত মজলিস থেকে বের হওয়ার পর মদীনার অলি-গলিতে ঘুরে ঘুরে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার কাছে

---

[৬] সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৩৩

[৭] প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৮

[৮] 'আসরুত তাবি'ঈন-১২৪

যা কিছু শুনতেন, লিখে নিতেন। সা'দ ইবন ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, যুহ্‌রী বিদ্যায় আপনাদের সবাইকে ডিঙ্গিয়ে গেলেন কিভাবে? জবাবে তিনি বললেন, জ্ঞান চর্চার মজলিসসমূহে তিনি সবার আগে আসতেন। তারপর সেখান থেকে উঠে আনসারদের বাড়ী বাড়ী যেতেন। শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ-নারী ও পুরুষ এমন কেউ বাকী থাকতো না যাদের কাছে থেকে কিছু না কিছু তিনি অর্জন করতেন না। এমনকি পর্দানশীন মহিলাদের নিকটও যেতেন।[৯]

কখনো কোন বিদুষী মহিলার সন্ধান পেলে মোটেই দেরী না করে তাঁর কাছে পৌঁছে যেতেন। তিনি নিজেই একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন। একবার কাসিম ইবন মুহাম্মাদ আমাকে বললেন, তোমার তো জ্ঞানের প্রতি ভীষণ লোভ আছে। তাই আমি তোমাকে জ্ঞানের একটি ভাণ্ডারের ঠিকানা বলে দিচ্ছি। আমি বললাম, অবশ্যই বলুন। কাসিম বললেন, 'আবদুর রহমানের মেয়ের কাছে যাও। তিনি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়েছেন। অতঃপর আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং সত্যিই তাঁকে জ্ঞানের সাগর দেখতে পেলাম।[১০]

তাঁর জ্ঞানের আগ্রহ ও রুচি ছিল ব্যাপক। বিশেষ কোন জ্ঞান ও শাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তিনি সব ধরনের জ্ঞান সমান আগ্রহ নিয়ে অর্জন করতেন। আর যা কিছু শুনতেন, লিখে রাখতেন। আবুয যানাদ বলেছেন, আমরা শুধু হারাম-হালালের মাসআলাসমূহ লিখতাম, আর তিনি যা কিছু শুনতেন, লিখে নিতেন। পরবর্তী জীবনে যখন প্রয়োজন অনুভব করেছি তখন বুঝেছি, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 'আলিম।[১১]

জ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও রুচির এমন ব্যাপকতার কারণে তিনি সকল প্রকার জ্ঞানে সমান পারদর্শিতা অর্জন করেন। যে শাস্ত্রের উপর তিনি আলোচনা করতেন, মনে হতো এটাই তার বিশেষ শাস্ত্র। লায়ছ বর্ণনা করেছেন। আমি যুহ্‌রীর চেয়ে বেশী ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিত্বকে দেখিনি। যখন তিনি 'তারগীব' তথা উৎসাহ-উদ্দীপনা বিষয়ের আলোচনা করতেন তখন মনে হতো তিনি এই বিষয়ের বড় 'আলিম। যখন আরব জাতি ও আরবদের বংশ বিদ্যা বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিতেন তখন মনে হতো এটাই তাঁর বিশেষ বিষয়। আর যখন কুরআন ও সুন্নাতের উপর আলোচনা করতেন তখন মনে হতো এটাই তাঁর বিশেষ শাস্ত্র।[১২] মা'মার বলেছেন, যে যে শাস্ত্র তিনি পড়াশুনা করেছেন তাতে অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ হওয়ার সুযোগ রাখেননি।[১৩]

---

[৯] তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব-৯/৪৪৯

[১০] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৯

[১১] তাহযীবুত তাহযীব-৯/৪৪৮; সিয়ারু আ'লাম আল-নুবালা'-৫/৩৩

[১২] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৮

[১৩] তাহ্‌যীবুত তাহযীব-৯/৪৪৯

তিনি কুরআনের একজন বড় হাফেজ ছিলেন এবং এই কুরআন হিফজ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও জানার পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে, মনে হতো 'কালামুল্লাহ' বা আল্লাহর কালাম যেন তাঁর বিশেষভাবে অধীত বিষয়। নাফি'– যিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন, তিনিও যুহ্রীকে কুরআন শুনিয়েছিলেন।[১৪]

সকল বিষয় ও শাস্ত্রে যদিও তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল, তবে তাঁর বিশেষ অধীত বিষয় ছিল হাদীছ ও সুন্নাহ্। এ ক্ষেত্রে তাঁর যে প্রবল আগ্রহ ও বিশেষ রুচি ছিল এবং যে পরিমাণ চেষ্টা ও সাধনা তিনি করেছেন তার কিছু বর্ণনা পূর্বে এসে গেছে। তিনি তাঁর যুগের সকল ইমাম ও বড় 'আলিমের সব জ্ঞান আত্মস্থ করে ফেলেন। ইবন মাদীনী বলেছেন, হিজাযে সকল বিশ্বস্ত ব্যক্তির সব জ্ঞান যুহ্রী ও 'আমর ইবন দীনারে মধ্যে বিভক্ত ছিল।[১৫] তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা দু'হাজার দু' শো পর্যন্ত পৌছেছে।[১৬] আবূ দাউদ বলেছেন, তাঁর হাদীছের সংখ্যা দু'হাজার দু' শো পঞ্চাশ।[১৭]

সুনানে রাসূল ও সুনানে সাহাবার প্রতি তাঁর অতিরিক্ত আগ্রহ ছিল। মদীনার সকল সুনান তিনি লিখে ফেলেন। সালিহ ইবন কায়সান বলেন, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি যুহ্রীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমাদের সকল সুনান লিখে নেওয়া উচিত। অতএব, আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সকল সুনান লিখে ফেললাম। 'সুনানে রাসূল' লেখার পর তিনি বললেন, এবার সাহাবীদের 'সুনান' লেখা উচিত। কিন্তু সাহাবীদের 'সুনান' আমরা লিখলাম না, আর তিনি লিখে ফেললেন। ফলে তিনি সফলকাম হলেন, আর আমরা সুযোগ নষ্ট করলাম।[১৮] উল্লেখ্য যে, 'সুনান' অর্থ প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, পথ-পন্থা ইত্যাদি।

মদীনার সুনানে রাসূল ও সুনানে সাহাবা ইমাম যুহ্রীর কল্যাণেই সংরক্ষিত হয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (রহ) বলতেন, যদি যুহ্রী না থাকতেন তাহলে মদীনার যাবতীয় সুনান হারিয়ে যেত।[১৯] তিনি তাঁর যুগে সুনানের সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন– এ ব্যাপারে সবাই একমত। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বলতেন, এখন ইবন শিহাবের চেয়ে বেশী অতীতের 'সুন্নাহ্' জানা ব্যক্তি দ্বিতীয় কেউ নেই।[২০]

তিনি এমন মেধা লাভ করেছিলেন যে, যা কিছু অর্জন করেছিলেন সবই সংরক্ষিত ছিল। তিনি নিজে বলতেন, আমি আমার সিনায় যে জ্ঞানই আমানত রেখেছি সেটা ভোলেনি।[২১]

---

[১৪] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৯

[১৫] প্রাগুক্ত-১/১১০

[১৬] তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৯/৪৪৭

[১৭] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১১

[১৮] তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৯/৪৪৮

[১৯] তাহ্যীবুল আসমা'-১/৯১

[২০] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৮

[২১] তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৯/৪৪৮

আর স্মৃতি শক্তির এমন অবস্থা ছিল যে, একবারেই শত শত হাদীছ শুনাতেন। তারপর যদি পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন পড়তো, একটি হরফেরও পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতো না।

একবার খলীফা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক তাঁর কোন এক ছেলের দ্বারা যুহ্রীর নিকট থেকে হাদীছ লিখে নেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। যুহ্রী রাজী হন এবং তাঁর ছেলেকে চার শো হাদীছ লিখিয়ে দেন। এক মাস পরে হিশাম পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বললেন, আমার সেই সংগ্রহের কপিটি হারিয়ে গেছে। তিনি আবার লিখিয়ে দেন। পরে দু'টি কপি মিলিয়ে দেখা হয় এবং তাতে একটি হরফেরও গরমিল ছিল না। ঐ হাদীছ ও সুনান ছাড়াও যা কিছু তাঁর সিনায় রক্ষিত থেকে যায় তার সংখ্যাও দু' হাজারের উপরে ছিল।[২২] মোটকথা, হাদীছে তাঁর স্থান ছিল অতি উচ্চে। ইমাম নাওবী লিখেছেন, তাঁর কৃতিত্ব, গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষতা এত যে তা গণনার বাইরে।[২৩]

তিনি খুব বেশী পরিমাণে হাদীছ স্মৃতিতে ধারণ, সংরক্ষণ ও বর্ণনা করেছেন, এটাই সবটুকু নয়; বরং সে সব হাদীছের ধরন, অবস্থা ও গ্রহণের মাপকাঠি ইত্যাদি দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী উৎকর্ষমণ্ডিত ছিল। যুহ্রীর বর্ণনার স্থান ও মর্যাদা সে যুগের বহু রাবীর কথায় অনুমান করা যায়। 'আমর ইবন দীনার, যিনি নিজেই একজন বড় মুহাদ্দিছ ছিলেন, বলতেন, আমি যুহ্রীর চেয়ে ভালো কোন মুহাদ্দিছ দেখিনি।[২৪] ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল এবং ইসহাক ইবন রাহবীয়ার এ রকম মত ছিল যে, যে হাদীছগুলো তিনি সালিম- 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার- রাসূলুল্লাহ (সা)- এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ।[২৫]

ইমাম যুহ্রী যেহেতু ব্যাপকভাবে হাদীছ শুনেছেন এবং সংগ্রহ করেছেন, এজন্য তাঁর শায়খ বা শিক্ষকমণ্ডলীর গণ্ডি অত্যন্ত প্রশস্ত। তাঁদের মধ্যে বহু বিদুষী মহিলাও ছিলেন। তাঁর সময়ের সাহাবীগণ এবং বড় তাবি'ঈদের এমন কেউ ছিলেন না যাঁদের নিকট থেকে তিনি জ্ঞান আহরণ করেননি। সাহাবীদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার (রা), রাবী'আ ইবন 'আব্বাদ (রা), মাসউদ ইবন মাখরামা (রা), আনাস ইবন মালিক (রা), সাহ্ল ইবন সা'দ (রা), সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা), শাবীব (রা), আবূ জামীলা 'আবদুর রহমান ইবন আযহার (রা), মাহমূদ ইবন রাবী' (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন ছা'লাবা (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন রাবী'আ (রা), আবূ উমামা (রা), সা'দ ইবন সাহ্ল (রা), আবুত তুফায়লরা প্রমুখ এবং উঁচু স্তরের তাবি'ঈদের মধ্যে সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহ্ ও আরো অনেকে। যাঁদের তালিকা অনেক দীর্ঘ।[২৬]

---

[২২] ২২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৮

[২৩] ২৩. তাহ্যীবুল আসমা'-১/৯১

[২৪] ২৪. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৯/৪৪৮

[২৫] ২৫. তাহ্যীবুল আসমা'-১/৯১

[২৬] ২৬. প্রাগুক্ত; তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৯/৪৪৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৯

যুহ্রীর ব্যক্তিসত্তাটি ছিল জ্ঞান পিপাসুদের কেন্দ্র স্বরূপ। তাঁর হালকায়ে দারসে শত মানুষের ভীড় জমতো। এ কারণে তাঁর ছাত্রসংখ্যা হিসাবের উর্ধ্বে। হাদীছের কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্র হলেন : 'আতা' ইবন আবী রাবাহ্, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, 'আমর ইবন দীনার, সালিহ ইবন কায়সান, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আনসারী, আইউব সুখতিয়ানী, 'আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম যুহ্রী, ইমাম আওযা'ঈ, ইবন জুরায়জ, মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন হুসায়ন, মুহাম্মাদ ইবন মুনকাদির, মানসূর ইবন মু'তামির, মূসা ইবন 'উকবা, হিশাম ইবন 'উরওয়া, ইমাম মালিক, মু'আম্মার আয-যুবায়দী, ইবন আবী যী'ব, লায়ছ, ইসহাক ইবন ইয়াহইয়া কালবী, বাকর ইবন ওয়ায়িল ও আরো অনেকে।[২৭]

ফিকাহ্ বিষয়েও তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। মদীনার বিখ্যাত সাত ফকীহ্র সকল জ্ঞান তাঁর সিনায় সংরক্ষিত ছিল।[২৮] এই সাত ফকীহ্ হলেন : সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, 'উরওয়া ইবন যুবায়র, আবূ বকর ইবন 'আবদির রহ্মান ইবন আল-হারিছ, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ, খারিজা ইবন যায়িদ ইবন ছাবিত, সুলায়মান ইবন ইয়াসার ও আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ।[২৯] তাছাড়া এ সময়ের সকল ফকীহ্র সকল জ্ঞানের উত্তরাধিকারীও ছিলেন। জা'ফার ইবন রাবী'আ বর্ণনা করেছেন। আমি 'আররাক ইবন মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, মদীনায় সবচেয়ে বড় ফকীহ্ কে? তিনি বললেন : সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, 'উরওয়া ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ। এ নামগুলো উচ্চারণ করার পর বললেন : আমার মতে যুহ্রী তাঁদের সবার চেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন। একথা এজন্য বলছি যে, তিনি তাঁদের সবার জ্ঞান নিজের জ্ঞানের সাথে যোগ করেছিলেন।[৩০]

যুহ্রী ফিকাহ্ বিষয়ে জ্ঞান লাভের ব্যাপারে বলেছেন, 'ছোট বেলায় আমি এমনভাবে বেড়ে উঠি যে, আমার কোন অর্থ-সম্পদ ছিল না এবং আমি কোন দিওয়ানেও ছিলাম না। আমি আমার গোত্রের বংশবিদ্যা শিখতাম 'আবদুল্লাহ্ ইবন ছা'লাবা ইবন সু'আয়র-এর নিকট। তিনি ছিলেন এ বিষয়ের বড় 'আলিম ও আমার গোত্রের ভাগিনা। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে তালাক সম্পর্কিত একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করে। তিনি অজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁকে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের নিকট যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করেন। আমি মনে মনে বললাম, আমি এই বৃদ্ধের সাথে আর থাকবো না যে কিনা বলে-রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মাথা 'মাসেহ' করেছেন, অথচ সেটা কি তা তিনি জানেন না? অতঃপর আমি প্রশ্নকারীর সাথে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের নিকট গেলাম। ইবন ছা'লাবাকে ছেড়ে দিলাম। তারপর আমি বসেছি 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র, 'উবায়দুল্লাহ ও আবূ বকর আবদুর রহ্মান প্রমুখের নিকট। তার পরেই না আমি ফকীহ্ হয়েছি।[৩১]

---

[২৭] তাহ্যীবুল আসমা'-১/৯১

[২৮] ওয়াফাতুল আ'য়ান-১/৪৫১

[২৯] 'আসরুত তাবি'ঈন-১২১

[৩০] তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৯/৪৪৮

[৩১] সিয়ারু আ'লাম আন-নুবাসা-৫/৩৩০

ইসলামী ফিকাহ্ শাস্ত্রের ইতিহাস অত্যন্ত গর্বের সাথে যুহ্‌রীর নামটি স্মরণ করে। হিজরী দ্বিতীয় শতকের অনেক প্রতিভাবান ফকীহ্‌র জন্ম হয় তাঁরই হাতে। যাঁরা জ্ঞানের প্রসার ঘটান, ইফতার মসনদে আসীন হন এবং অনেক ফিকাহ্ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেন। তাঁর এসব ছাত্র যাঁরা মুসলিম উম্মাহ্‌র ফকীহ্ হিসেবে পরবর্তীকালে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খ্যাতিমান হলেন : মালিক ইবন আনাস, আন-নু'মান ইবন ছাবিত, 'আবদুর রহমান ইবন 'আমর আল-আওযা'ঈ, আল-লাইছ ইবন সা'দ, 'আবদুল মালিক ইবন জুরায়জ ও সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না।[৩২]

ফিকাহ্ বিষয়ে তাঁর এই সীমাহীন যোগ্যতার কারণে তিনি মদীনার ইফতার মসনদেও সমাসীন হন। তাঁর ফাতওয়ার সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, মুহাম্মাদ ইবন নূহ্ তা ফিক্হী তারতীব অনুসারে বিশাল তিন খণ্ডে সাজান।[৩৩]

আর মাগাযী শাস্ত্রের তো তিনি ইমাম ছিলেন। তাঁর পূর্বে আর কেউ মাগাযীর প্রতি তেমন বিশেষ গুরুত্ব দেননি। ইসলামের ইতিহাসে তিনি প্রথম ব্যক্তি, যিনি মাগাযীর উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম সুহায়লীর বর্ণনা অনুযায়ী এটা ছিল এই শাস্ত্রের উপর লেখা প্রথম গ্রন্থ। তাঁর দ্বারাই মাগাযী ও সীরাতের প্রতি মানুষের একটা বিশেষ আগ্রহ ও রুচির সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইয়া'কূব ইবন ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইবন সালিহ, 'আবদুর রহমান ইবন 'আবদিল 'আযীয, মূসা ইবন 'উকবা এবং মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক এই শাস্ত্রকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছেন। বিশেষ করে শেষের দু'জন এ শাস্ত্রে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করে অমর হয়ে আছেন।

সে যুগের সকল জ্ঞানী, গুণী ও বিজ্ঞজনদের নিকট ইবন শিহাব যুহ্‌রীর একটা স্বীকৃতি, সম্মান ও মর্যাদা ছিল। আইউব সিখতিয়ানী বলতেন, আমি যুহ্‌রীর চেয়ে বড় 'আলিম দেখিনি। একজন প্রশ্ন করলো, হাসান বসরীকেও না? তিনি সেই একই কথা আবার বললেন : আমি যুহ্‌রীর চেয়ে বড় কাউকে পাইনি।[৩৪] জ্ঞান অর্জনের জন্য মাকহূল গোটা মুসলিম জাহান চষে বেড়িয়েছিলেন এবং ইসলামী খিলাফতের প্রতিটি অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন। তাঁকে একবার একজন প্রশ্ন করলো : আপনি সবচেয়ে বড় কোন 'আলিমের সান্নিধ্য পেয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন : ইবন শিহাব যুহ্‌রী। ইমাম মালিক বলতেন, পৃথিবীতে যুহ্‌রীর কোন দৃষ্টান্ত ছিল না।[৩৫]

সা'দ ইবরাহীম তো এতখানি বাড়িয়ে বলতেন যে, আমার তো মনে হয় রাসূলুল্লাহর (সা) পরে যুহ্‌রীর মত এত জ্ঞান আর কারো মধ্যে ছিল না।[৩৬] পরবর্তীকালে তিনি যখন মদীনায় আসতেন তখন তথাকার মুহাদ্দিছগণ হাদীছ বর্ণনা এবং মুফতীগণ ফাতওয়া দান

---

৩২. 'আসরুত তাবি'ঈন-১৩৩

৩৩. আ'লাম আল-মুওয়াক্কা'ঈন-১/২৬

৩৪. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/৯১

৩৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৯

৩৬. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/৯২

সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতেন। তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁরা এ কাজ করতেন। তাঁদের অনেকে তাঁর মজলিসে গিয়ে বসতেন এবং তাঁর বয়ান শুনতেন।[৩৭]

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যুহ্‌রীকে যে দয়া ও মহানুভবতার সাথে জ্ঞান দান করেছিলেন, তিনিও তেমনি মহানুভবতার সাথে সেই জ্ঞান বণ্টন এবং প্রচার-প্রসারে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি বলতেন, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কেউ আমার মত এত কষ্ট স্বীকার করেনি, ঠিক তেমনি তার প্রচার-প্রসারেও।[৩৮] তাঁর শিষ্য-শাগরিদদের দীর্ঘ তালিকা দেখলে জ্ঞানের সেবায় তাঁর অবদান কিছুমাত্র অনুমান করা যায়।

তাঁর সারাটি জীবন জ্ঞানের সাগরে নিমজ্জিত ছিল। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ ছাড়া তাঁর আর কোন ধ্যান ও ধান্দা ছিল না। জ্ঞান চর্চায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকায় দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস, এমনকি স্ত্রী থেকেও উদাসীন হয়ে যেতেন। যখন ঘরে ফিরতেন তখনও পুস্তক ও কাগজ-পত্রের স্তূপে হারিয়ে যেতেন। একদিন তাঁর স্ত্রী তো বিরক্ত হয়ে বলেই ফেললেন: আল্লাহর কসম! এসব বই পুস্তক আমার জন্য তিন সতীনের চেয়েও বেশী পীড়াদায়ক।[৩৯]

'আবদুল মালিক, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সহ যে ছয়জন উমাইয়্যা খলীফার যুগ তিনি লাভ করেন তাঁদের সকলের সাথে গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাঁর জীবনের শুরু হয় খলীফা 'আবদুল মালিকের সময়। 'আবদুল মালিক প্রথম সাক্ষাতে যুহ্‌রীকে 'উরওয়া ইবন যুবায়রের সাহচর্য অবলম্বনের প্রতি ইঙ্গিত দেন। আর সেখান থেকে তিনি 'উরওয়ার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেননি।[৪০] 'আবদুল মালিক নিজেই একজন বড় জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। প্রকৃত জ্ঞানীর মর্যাদাও দিতেন। যদি খিলাফতের মসনদ তাঁর জীবন ধারাকে পাল্টে না দিত তাহলে তিনিও একজন অতি মর্যাদাবান 'আলিম তাবি'ঈ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতেন। ইমাম শা'বী খলীফা 'আবদুল মালিকের জ্ঞান-গরিমার প্রতি এতখানি মুগ্ধ ছিলেন যে, তাঁকে বলতে শোনা যেত : আমি যত লোকের সংগে মিশেছি একমাত্র 'আবদুল মালিক ছাড়া সবার চেয়ে নিজেকে উত্তম পেয়েছি। 'আবদুল মালিকের উপস্থিতিতে যখনই আমি কোন হাদীছ বর্ণনা অথবা কবিতা আবৃত্তি করতাম, তিনি তাতে আরো কিছু যোগ করে দিতেন।[৪১]

যুহ্‌রী সর্ব প্রথম ৮০ হিজরীতে তিরিশ বছর বয়সে দিমাশকে 'আবদুল মালিকের নিকট যান।[৪২] 'আবদুল মালিক যুহ্‌রীর জ্ঞান-গরিমা দ্বারা দারুণভাবে মুগ্ধ হন। যুহ্‌রী ঋণগ্রস্ত

---

[৩৭] 'আসরুত তাবি'ঈন-১২৭, ১২৯

[৩৮] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৯

[৩৯] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/৪৫১

[৪০] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/১৪৩

[৪১] তারীক আল-খুলাফা'লিস সুয়ূতী-২১৬

[৪২] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/৩৮৫-৩৮৭

ছিলেন। 'আবদুল মালিক তাঁর সকল ঋণ পরিশোধ করে দেন।[৪৩] এই ঋণ পরিশোধ ছাড়াও তাঁর প্রতি আরো বহু ভালো আচরণ করেন। যুহ্রীকে তিনি দিমাশকের কাজী হিসেবে নিয়োগ দেন।[৪৪] এই সম্পর্কের মাধ্যমে যুহ্রী দিমাশকে স্থায়ীভাবে থেকে যান এবং 'আবদুল মালিকের সাথেই থাকতেন। 'উমাইয়্যা খলীফাদের মধ্যে 'আবদুল মালিকের পরে 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীয আরেকজন জ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞানীদের সত্যিকার মর্যাদা দানকারী। তিনি যুহ্রীকে খুবই সম্মান করতেন এবং যুহ্রীর বিশ্বাস ও মতের সাথে একমত ছিলেন। তিনি খিলাফতের প্রতিটি অঞ্চলে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, সবাই যেন ইবন শিহাবের অনুসরণ করে। কারণ, অতীত সুন্নাহ্ তথা প্রাচীন রীতি-নীতি ও পন্থা-পদ্ধতি তাঁর চেয়ে বেশী জানা লোক আর কাউকে পাওয়া সম্ভব নয়।[৪৫]

'আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর যুহরী তাঁর ছেলে হিশামের সাথে থাকেন। পরে হিশামের ছেলের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। হিশামের উপরও তাঁর দারুণ প্রভাব ছিল। হিশাম তাঁকে খুব মানতেনও। তিনি যুহ্রীর হাজার হাজার দিরহাম ঋণ পরিশোধ করে দেন।[৪৬] হিশামের সাথে তাঁর অনেক দরবারি কথাবার্তা ও তাৎক্ষণিক উত্তর দানের অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

একদিন আবুয যানাদ ও যুহ্রী হিশামের দরবারে বসে আছেন। হিশাম যুহ্রীকে প্রশ্ন করলেন, মদীনাবাসীদের ভাতা কোন মাসে বন্টন করা হতো? যুহ্রী জানেন না বলে অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। হিশাম এবার আবুয যানাদকে প্রশ্নটি করলেন। আবুয যানাদ বললেন : মুহাররাম মাসে। তাঁর এ জবাব শুনে হিশাম যুহ্রীকে লক্ষ্য করে বললেন : এই জ্ঞান আপনার আজ অর্জিত হলো। যুহ্রী তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, আমীরুল মু'মিনীনের মজলিস এমনই যে, তার থেকে জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ লাভ করা যায়।[৪৭]

উদারতা ও মহানুভবতা যুহ্রীর চরিত্রের এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ছিল। বিত্ত-বৈভবের কোন মূল্য তাঁর কাছে ছিল না। 'আমর ইবন দীনার বলেছেন, যুহ্রীর দৃষ্টিতে দিরহাম ও দীনার যতখানি গুরুত্বহীন ছিল ততখানি আর কারো দৃষ্টিতে ছিল না। তিনি দিরহাম-দীনারকে উটের লেদার চেয়ে বেশী কিছু মনে করতেন না। অর্থ-সম্পদের প্রতি তাঁর এমন মানসিকতার কারণে দু'হাতে তা বিলাতেন এবং বার বার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। খলীফা 'আবদুল মালিক ও খলীফা হিশাম বারবার তাঁর ঋণ পরিশোধ করেছেন। কিন্তু তাঁর মাত্রা ছাড়া দানশীলতা তাঁকে সব সময় ঋণগ্রস্ত করে রেখেছে। ওয়ালীদ ইবন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, আমি একবার যুহ্রীকে বললাম, আবূ বকর! আপনার মধ্যে ঋণ গ্রহণ করার শুধু একটি দোষ। তিনি জবাব দিলেন, আমার ঋণই বা এমন কি! সব মিলে মোট চল্লিশ

---

[৪৩] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ১/১০৯

[৪৪] ওয়াফায়াতুর আ'য়ান-১/৪৫২

[৪৫] প্রাগুক্ত-১/৪৫১

[৪৬] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৯

[৪৭] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/৪৫১

হাজার দিরহামের মত হবে। আমার চারটি দাস আছে, তাদের প্রত্যেকে চল্লিশ হাজারের চেয়ে উত্তম। আর আমার উত্তরাধিকারী আছে শুধু আমার এক পৌত্র। আমার ইচ্ছা তো এই যে, আমার মীরাছ বা উত্তরাধিকারই কিছু না থাকুক।[৪৮]

তাঁর ছাত্র লাইছ ইবন সা'দ বলতেন : 'আমি যাঁদেরকে দেখেছি তাদের মধ্যে ইবন শিহাব সবচেয়ে বেশী দানশীল ব্যক্তি। যে কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি কিছু না কিছু তাকে দিতেন। আর কোন কিছুই দেওয়ার মত না থাকলে চাকর-বাকরদের নিকট থেকে ধার নিতেন। আর এটাকে খারাপ কিছু মনে করতেন না।' লাইছ আরো বলেছেন, দেওয়ার মত কিছু না থাকলে তাঁর চেহারার রং পাল্টে যেত। তিনি সাহায্য প্রার্থীকে বলতেন, 'তোমার জন্য সুসংবাদ! খুব শিগগির আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করবেন।' তিনি মানুষকে আহার ও পান করিয়ে আনন্দ পেতেন। তাঁর রাতের হালকাতে যারা বসতো তাদেরকে তিনি মধুর শরবত পান করাতেন। মধুর শরবত পান চলতো, আর হাদীছ ও মাগাযী শোনা ও বর্ণনা অব্যাহত থাকতো। যখন তিনি দেখতেন, তাঁর মজলিসের কেউ ঘুমাচ্ছে, তাকে বলতেন, তুমি তো কুরাইশদের গল্প বলিয়ে লোকদের মত হতে পারবে না, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন : [৪৯] سَامِرًا تَهْجُرُوْنَ - অহংকার করে এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করে যেতে।[৫০]

তিনি নিজের পোশাক-আশাক ও খাদ্য-খাবারের প্রতি যত্নবান থাকতেন। উঁচু মুকুট সদৃশ হলুদ রংয়ের টুপি মাথায় পরতেন এবং হলুদ রংয়ের একটি উন্নত মানের চাদর গায়ে দিতেন। নরম এবং চমৎকার একটি গদি ও বালিশ ব্যবহার করতেন।[৫১]

শামের তৎকালীন বিখ্যাত ফকীহ্ রাজা' ইবন হায়ওয়া তাঁর এভাবে ঋণ করে দান করা ও মানুষকে খাওয়ানোর ব্যাপারে প্রায়ই বকাবকি করতেন। একবার ইবন শিহাব তাঁর কাছে এমনটি আর করবেন না বলে অঙ্গীকার করেন। একদিন রাজা' ইবন হায়ওয়া তাঁর বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। দেখেন, মানুষের জন্য খাবার তৈরী করা হয়েছে এবং দস্তর খাওয়ানে মধুর ভাণ্ডও রাখা হয়েছে। রাজা তিরস্কারের সুরে বললেন : আমরা কি এর উপর একমত হয়েছিলাম? ইবন শিহাব হাসতে হাসতে বললেন : আসুন, দানশীল ব্যক্তিকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আদব শেখাতে পারে না। তাঁর সঙ্গী-সাথী ও ছাত্র-শিষ্যদের কেউ যদি তাঁর খাবার খেতে অস্বীকার করতো তাহলে তিনি দশ দিন তাঁকে কোন হাদীছ শোনাতেন না। কেউ তাঁর এমন দানশীলতা ও অতিথি সেবার সমালোচনা করলে বলতেন : যে কল্যাণ তালাশ করে সে অকল্যাণ থেকে দূরে থাকে। তিনি তাঁর শিষ্য-শাগরিদ ও আত্মীয়-বন্ধুদেরকে এমন ব্যক্তিত্ব অর্জনের উপদেশ দিতেন যাতে দানশীলতা ও মহানুভবতা বিদ্যমান থাকে। তিনি বলতেন : মানুষের তালাশকৃত জিনিসের মধ্যে

---

[৪৮] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১১

[৪৯] সূরা আল-মু'মিনূন-৬৭

[৫০] 'আসরুত তাবি'ঈন-১২৮

[৫১] প্রাগুক্ত

ব্যক্তিত্বের চেয়ে ভালো কিছু নেই। সে সাহচর্যের মধ্যে ভালো কিছু নেই এবং বুদ্ধি-বিবেকও কোন কিছু লাভ করে না তা পরিহার করা ব্যক্তিত্বেরই অংশ। তার সাথে কথা বলার চেয়ে তাকে পরিহার করাই ভালো।[৫২]

ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রীর অন্যতম ছাত্র ইমাম মালিক। তিনি তাঁর শায়খ ও উস্তাদ সম্পর্কে অনেক কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : এই জ্ঞান হলো দীন, সুতরাং এ দীন কার নিকট থেকে গ্রহণ করছো তা লক্ষ্য রাখবে। আমি মসজিদে (মসজিদে নবাবী) সত্তর (৭০) জন এমন লোক পেয়েছি যাঁরা 'কালা রাসূলুল্লাহ (সা)' বলে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁদের যে কোন একজনকে যদি কোন কোষাগারের দায়িত্ব দেওয়া হতো, তাঁরা বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতেন। আমি তাঁদের থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করিনি। কারণ, তাঁদের থেকে জ্ঞান অর্জনের মত লোক তারা নন। কিন্তু যুহ্‌রী আমাদের এখানে আসতেন এবং তিনি একজন যুবক, তা সত্ত্বেও তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁর দরজায় মানুষের প্রবল ভীড় জমে যেত।[৫৩]

লাইছ ইবন সা'দও তাঁর একজন ছাত্র। তিনি বলেছেন ঃ আমি একবার এক সফরে ইবন শিহাব যুহ্‌রীর সঙ্গে ছিলাম। তিনি 'আশূরার দিন রোযা রাখলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলোঃ আপনি সফরে রামাদান মাসে রোযা ভেঙ্গে ফেলেন, কিন্তু আশূরার দিন রোযা রাখলেন কেন? তিনি বললেন : রামাদান মাসে সফরে ভেঙ্গে ফেলা রোযা অন্য সময় আদায় করার বিধান আছে। কিন্তু আশূরার রোযার তা নেই। এ দিনে না রাখলে তা ছুটে যাবে।

তিনি জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি দারুণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধও ছিল প্রখর। একবার মদীনার বিখ্যাত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিছ রাবীআ'তুর রায় মদীনার মসজিদে হাদীছ ও ফিকাহ্‌র দারস দিচ্ছেন। এমন সময় কেউ একজন খবর দিল : ইবন শিহাব যুহ্‌রী এই মাত্র শাম থেকে মদীনায় পৌঁছেছেন। রাবী'আ সঙ্গে সঙ্গে দারসের মজলিস ভেঙ্গে দিয়ে যুহ্‌রীর কাছে ছুটে গেলেন এবং তাঁর হাত মুঠ করে ধরে 'মারহাবান, আহ্‌লান ওয়া সাহ্‌লান' বলে তাঁকে মদীনার অতিথিখানায় নিয়ে গেলেন। তারপর দু'জনের মধ্যে 'আসর পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হলো। 'আসরের সময় তাঁরা যখন বের হবেন তখন একজন আরেকজনের প্রতি যে মন্তব্য করেন তা নিম্নরূপ :

রাবী'আ বলেন : ইবন শিহাব, আমার ধারণা আপনি জ্ঞানের যে স্তরে পৌঁছেছেন সেখানে আর কেউ পৌঁছুতে পারেনি। উত্তরে ইবন শিহাব বললেন : মদীনায় আপনার মত লোক আছে আমি ধারণা করিনি।[৫৪]

যুহ্‌রীর মজলিসের অসাধারণ ছাত্ররাও তাঁদের ভুল ও অমনোযোগিতার জন্য অনেক সময় উস্তাদ যুহ্‌রীর তিরস্কার লাভ করতেন। সে তিরস্কার হতো এ ধরনের 'তোমরা জ্ঞান চর্চা

---

৫২. প্রাগুক্ত-১৩১

৫৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'৫/৩৪৩

৫৪. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৩৪৪

ছেড়ে দিয়ে ফুটো মশকের মত হয়ে গেছো। অর্জন কর, কিন্তু ধরে রাখতে পার না। আল্লাহর কসম! তোমরা কখনো কল্যাণের নাগাল পাবে না।'[৫৫] উস্তাদের এমন তিরস্কারে ছাত্রদের মধ্যে অনেক সময় হাসির রোল পড়ে যেত। উস্তাদও ছাত্রদের বিরক্তি ও অন্যমনস্কতা দূর করার জন্য একটু সহজ ভঙ্গিতে বলতেন : এসো আমরা কিছু কবিতা আবৃত্তি করি ও অন্য কথা বলি। কারণ, কানেরও ক্লান্তি দূর করা উচিত।[৫৬]

'ইল্‌ম, সুন্নাহ্ ও মাগাযীতে পরিপূর্ণ দীর্ঘ জীবন লাভের পর এই মহান জ্ঞান সাধক হিজরী ১২৪ সনে ইহলোক ত্যাগ করে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর (৭০) বছরের উপরে। শাম ও ফিলিস্তীনের সীমান্তবর্তী 'শাগাব' নামক গ্রামে তাঁর মৃত্যু হয়। মানুষ যাতে চলাচলের পথে তাঁর জন্য দু'আ করতে পারে সে জন্য একটি প্রধান সড়কের পাশে দাফন করার জন্য আত্মীয়-বন্ধুদের বলে যান। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

যুহরী থেকে এ রকম একটা কথা বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি কোন বিদেশ-বিভুঁইয়ে যায় এবং সেখানের কিছু মাটি সেখানের পানিতে গুলিয়ে পান করে তাহলে সে তথাকার মহামারী রোগ থেকে সুস্থ থাকবে।[৫৭]

---

৫৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৩৪৪

৫৬. 'আসরুত তাবি'ঈন-১৩৩

৫৭. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৬/২৫১

'আমির ইবন শুরাহীল আশ-শা'বী (রহ)

'আমির-এর ডাক নাম আবূ 'উমার। আর পিতার নাম কোন কোন গ্রন্থে 'শুরাহীল', আবার কিছু গ্রন্থে 'শুরাহাবীল' লেখা হয়েছে। গোত্রের প্রতি সম্পৃক্ত করার জন্য আশ-শা'বী বলা হয়েছে। এ নামে ব্যাপকভাবে পরিচিতির কারণে এটা তাঁর 'লকব' বা উপাধির রূপ ধারণ করেছে। তিনি ইয়ামানের প্রাচীন গোত্র হিময়ার শাখার সন্তান। এই খান্দানে হাস্সান ইবন 'আমর নামে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইয়ামানের 'যূ আশ-শা'বায়ন' নামক একটি পাহাড়ী উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর পর তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। এ কারণে তিনি নিজে 'যূ আশ-শা'বায়ন' নামে প্রসিদ্ধ হন। তার পর থেকে তাঁর বংশধারার মধ্যে যে শাখাটি কূফায় আবাসন গড়ে তোলে তাদেরকে বলা হয় শা'বী। 'আমির ছিলেন এই শাখার সন্তান। যে শাখাটি শামে বসতি স্থাপন করে তারা 'শা'বানী' নামে পরিচিত লাভ করে। যে শাখাটি ইয়ামানে থেকে যায় তাদেরকে বলা হয় 'যী শা'বায়ন'। আর যে শাখাটি পশ্চিম আফ্রিকায় চলে যায় তাদেরকে 'আল-উশা'উব' বলা হয়। এই সবগুলো শাখার উর্ধ্বতন পুরুষ হলেন হাস্সান ইবন 'আমর।[১]

'আমির আশ-শা'বীর জন্মসন সম্পর্কে একটু মতপার্থক্য আছে। তিনি নিজে দাবী করেছেন যে, তাঁর জন্ম জালূলা' যুদ্ধের বছর। অর্থাৎ হিজরী ১৭ সন।[২] আরেকটি বর্ণনা এ রকম আছে যে, জালূলা' যুদ্ধে তাঁর মা যুদ্ধবন্দী হিসেবে মুসলমানদের অধিকারে আসেন এবং ভাগে তাঁর পিতা শুরাহীলের অংশে পড়েন। এই হিসেবে হিজরী ১৯ সনে তাঁর জন্ম। তখন হযরত 'উমারের খিলাফতের ষষ্ঠ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।[৩]

অতি দুর্বল ও ক্ষুদ্রাকৃতি নিয়ে যমজ সন্তান হিসেবে তাঁর জন্ম। তিনি বলতেন, 'আমি মায়ের পেটেই ঠেলা-ধাক্কার মধ্যে পড়েছি।[৪] এ কারণে স্বাভাবিক বৃদ্ধির সুযোগ পাননি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে বিদ্যা-বুদ্ধি, ধৈর্য, বিচক্ষণতা, স্মৃতিশক্তি, বোধশক্তি ও অন্যান্য প্রতিভায় না তাঁর সেই যমজ ভাই, আর না অন্য কেউ ঠেলা-ধাক্কায় তাঁর সামনে টিকতে পেরেছে। তিনি হন তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ব্যক্তি।

শা'বী কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। তবে তাঁর অন্তরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ও বেশী ভালোবাসা ছিল মদীনা মুনাওয়ারার প্রতি। তাই তিনি সময় ও সুযোগ পেলেই সেখানে অবস্থানকারী রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের সাক্ষাৎ ও তাঁদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সেখানে ছুটে যেতেন। আর সাহাবায়ে কিরামও তখন কূফায় যেতেন। কারণ, তখন কূফা ছিল জিহাদে গমন ও প্রত্যাগমনের কেন্দ্রস্থল স্বরূপ। কূফাতেও তখন বহু সাহাবী বসবাস করতেন। তাই রাসূলুল্লাহর (সা) পাঁচশো

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮০; সিয়ারুত তাবি'ঈন-২১০

২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৪; তাবাকাত-৬/১৮২

৩. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৭২

৪. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/২৩১; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮০

মহান সাহাবীকে দেখার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে আটচল্লিশ জনের নিকট থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জনের সুযোগ লাভ করেন।[৫] 'হাবরুল উম্মাত' (উম্মাতের মহাপণ্ডিত) খ্যাত হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) সান্নিধ্যে একধারে আট-দশ মাস অবস্থান করে তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করেন।[৬] এসব মহান ব্যক্তিদের উদারতায় তিনি তাঁর যুগের ইমামের মর্যাদা লাভ করেন।

বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর এত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল যে তাঁর যুগের মানুষ তাঁকে ইমামের মর্যাদা দান করে। ইমাম যাহ্বী তাঁকে ইমাম, হাফেজে হাদীছ, ফকীহ্ ও আস্থাভাজন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ গ্রন্থের শিরোনাম দিয়েছেন– الشعبى علامة التـــابعين – শা'বী তাবি'ঈদের মহাজ্ঞানী বলে।[৭] ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী তাঁকে 'الإِمَامُ الْحَبْرُ الْعَلاَّمَـــةُ' - ইমাম, মহাপণ্ডিত, মহাজ্ঞানী, বলেছেন।[৮] সেকালে প্রচলিত সকল শাস্ত্রে তাঁর সমান দখল ছিল। আবূ ইসহাক আল-হিবাল বলেছেন, শা'বী সকল শাস্ত্রের জ্ঞানে তাঁর যুগে একক ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[৯] কুরআন, হাদীছ, ফিকাহ, মাগাযী, অংকশাস্ত্র, সাহিত্য ও কবিতা, মোটকথা প্রতিটি অঙ্গনে তাঁর সমান দখল ও বিচরণ ছিল।

আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠ কারী (পাঠক) ছিলেন। তাঁকে কারীদের নেতা বলা হতো।[১০] তাফসীরেও তাঁর পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের কারণে মুফাস্সির (কুরআন-ভাষ্যকার) হিসেবে তেমন খ্যাতি লাভ করেননি। তাফসীরুল কুরআনের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। সবার জন্য একাজ বৈধ মনে করতেন না। যাকারিয়া ইবন আবী যায়দ বর্ণনা করেছেন যে, শা'বী যখন আবূ সালিহ-এর নিকট যেতেন তখন তাঁর কান ধরে বলতেন, তুমি কুরআন পড়না, আর তার তাফসীর করে থাক?[১১] তিনি তাঁর যুগের একজন বড় মুফাস্সির সুদ্দী-এর ভীষণ সমালোচনা করতেন। একবার তাঁকে বলা হলো, সুদ্দীতো কুরআন বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞানে বেশ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। তিনি বললেন : না, বরং সে কুরআন বিষয়ক মূর্খতার বেশ কিছু অংশ অর্জন করেছে।[১২]

তিনি হাদীছের অত্যুচ্চ সম্মানের অধিকারী হাফেজ ছিলেন। শুধু তাই না, সে যুগের হাদীছ শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরাম ও উঁচু স্তরের তাবি'ঈদের বড়রকম একটি সংখ্যার নিকট থেকে হাদীছ শুনেছিলেন। যে সকল সাহাবীর নিকট হাদীছ শুনেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া হলো :

---

[৫] তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৬৭
[৬] তাবাকাত-৬/১৭২
[৭] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৯
[৮] শাজারাত আয-যাহাব-১/১২৬
[৯] তাহযীব আত-তাহ্যীব-৫/৬৯
[১০] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৫
[১১] প্রাগুক্ত-১/৮৩
[১২] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/২১৯

হযরত 'আলী (রা), সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা), সা'ঈদ ইবন যায়দ (রা), যায়দ ইবন ছাবিত (রা), কায়স ইবন 'উবাদা (রা), কারাজ ইবন কা'ব (রা), 'উবাদা ইবন সামিত (রা), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা), আবূ মাস'উদ আনসারী (রা), আবূ হুরাইরা (রা), মুগীরা ইবন শু'বা (রা), নু'মান ইবন বাশীর (রা), আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা), জারীর ইবন 'আবদিল্লাহ আল-বাজালী (রা), বুরাইদা ইবন হাসীব (রা), বারা' ইবন 'আযিব (রা), মু'আবিয়া (রা), জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ্ (রা), জাবির ইবন সামুরা (রা), হারিছ ইবন মালিক (রা), হাবশী ইবন জানাদা (রা), হুসাইন ইবন 'আলী (রা), যায়দ ইবন আরকাম (রা), দাহ্হাক ইবন কায়স (রা), সামুরা ইবন জুনদুব (রা), 'আমির ইবন শাহ্র (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা), 'আবদুল্লাহ্ ইবন মূতী' (রা), 'আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা), 'আদী ইবন হাতিম (রা), 'উরওয়া ইবন জা'দ আল-জারিকী (রা), 'উরওয়া ইবন মুদাররাস (রা), 'আমর ইবন উমাইয়্যা (রা), 'আমর ইবন হুরায়ছ (রা), 'ইমরান ইবন হুসাইন (রা), 'আওফ ইবন মালিক (রা), 'আয়্যাদ আল-আশ'আরী (রা), কা'ব ইবন 'আজরাহ্ (রা), মুহাম্মাদ ইবন সায়ফী (রা), মিকদাম ইবন মা'দিকারিব (রা), ওয়াবিসা ইবন মা'বাদ (রা), আবূ জুবায়র ইবন দাহ্হাক (রা), আবূ সুরায়হা গিফারী (রা), আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা) এবং মহিলা সাহাবীদের মধ্যে উম্মু সালামা (রা), মাইমূনা বিন্ত হারিছ (রা), আসমা' বিন্ত উনাইস (রা), ফাতিমা বিন্ত কাইস (রা), উম্মু হানী (রা), 'আয়িশা (রা) প্রমুখের নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন। এসব সাহাবী থেকে তাঁর বর্ণিত অনেক হাদীছ 'মুরসাল'। অর্থাৎ সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।[১৩]

হাদীছের প্রতি তাঁর এক বিশেষ আগ্রহ ও রুচি ছিল। হাদীছের জ্ঞান অর্জনের জন্য ভীষণ কষ্ট স্বীকার করেছেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে জানতে চাইলো, আচ্ছা, এত জ্ঞান আপনি কোথা থেকে কিভাবে অর্জন করলেন? জবাব দি: আত্মনির্ভরতা দূর করে, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে, জড়বস্তুর ধৈর্যের মত ধৈর্যধারণ করে এবং কাকের মত প্রত্যূষে উঠে।[১৪]

শা'বী ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, সজাগ অন্তকরণ এবং সূক্ষ্ম বোধশক্তির অধিকারী মানুষ। স্মৃতিতে ধারণ ক্ষমতা ও মুখস্থ শক্তিতে তিনি ছিলেন একজন কিংবদন্তীর মানুষ। স্মরণ শক্তি এত প্রখর ছিল যে, কখনো কাগজ, কলম ও দোয়াতের প্রয়োজন হতো না। একবার যে হাদীছ শুনতেন তা বুকের মাঝে সংরক্ষিত হয়ে যেত। তিনি নিজেই দাবী করতেন যে, আমি কখনো সাদা কাগজ লিখে কালো করিনি। অর্থাৎ কখনো লিখিনি। কেউ কোন হাদীছ বর্ণনা করলে আমার স্মৃতিতে তা গেঁথে যায়। কারো

---

১৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৬৬

১৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১

কোন কথা একবার শুনলে তার পুনরাবৃত্তি আমি মোটেই পছন্দ করিনে।[১৫] শা'বী ও যুহ্‌রী বলতেন : আমরা কোন হাদীছ একবার শোনার পর কখনো তা দ্বিতীয়বার বলার জন্য অনুরোধ জানাইনি।[১৬]

তিনি জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানচর্চার প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য সবকিছু উজাড় করে দিতে এবং সব বাধা অতিক্রম করতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। তিনি বলতেন : যদি কেউ শামের এক প্রান্ত থেকে ইয়ামানের অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করে, তারপর তার ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে আসবে এমন একটি মাত্র কথা মুখস্থ করে, তাহলে আমি মনে করি তার এ ভ্রমণ ব্যর্থ হয়নি। তিনি আরো বলতেন, আমি যখনই আমার মত কোন ব্যক্তিকে দেখেছি এবং আমার চেয়ে বেশী জানা কোন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছি, তখনই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছি।[১৭]

তবে অন্যদের থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে বড় সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কেবল তাঁদের নিকট থেকেই হাদীছ গ্রহণ করতেন যাঁরা জ্ঞানের সাথে সাথে বুদ্ধি ও খোদাভীতির অলঙ্কারে সজ্জিত হতেন। এ ব্যাপারে তাঁর নীতি হলো, জ্ঞান সেই ব্যক্তির থেকে অর্জন করা উচিত যার মধ্যে যুহ্‌দ ও 'ইবাদাত এবং বুদ্ধি ও জ্ঞান দু'টোই বিদ্যমান থাকে। শুধু বুদ্ধি অথবা শুধু 'ইবাদাত যার মধ্যে আছে তিনি জ্ঞানের স্বরূপ ও প্রকৃতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। তিনি বলতেন, আজকাল আমি এমন সব লোকের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করতে দেখি যাদের না বুদ্ধি আছে, আর না আছে 'ইবাদাত।[১৮]

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের পরিধি অতি বিস্তৃত ছিল। তিনি তাঁর জীবনের এক পর্যায়ে বলতেন, আমি বিশ বছরের মধ্যে কারো মুখে এমন কোন নতুন হাদীছ শুনিনি যে সম্পর্কে আমি বর্ণনাকারী অপেক্ষা বেশী জ্ঞান রাখিনে।[১৯] হিজায, বসরা ও কূফা ছিল সে সময় হাদীছ চর্চার কেন্দ্রস্থল। 'আসিম আল-আহ্ওয়াল বলেন : আমি কূফা, বসরা ও হিজাযের মুহাদ্দিছদের বর্ণিত হাদীছের শা'বীর চেয়ে বড় কোন হাফিজ কাউকে দেখিনি।[২০] সুনান-এরও তিনি একজন বড় 'আলিম ছিলেন। মাকহূল বলেছেন, আমি শা'বীর চেয়ে সুনান-এর বড় কোন 'আলিম দেখিনি।[২১] ইবন আবী লায়লা বলতেন : শা'বী ছিলেন হাদীছের এবং ইবরাহীম ছিলেন কিয়াসের ধারক-বাহক।[২২]

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর এত ব্যাপক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। বেশী হাদীছ বর্ণনা করা মোটেই পছন্দ করতেন না। বলতেন, আমাদের সত্যনিষ্ঠ পূর্বসূরীরা হাদীছ বর্ণনা করা খারাপ মনে করতেন। যদি একথা

---

[১৫] প্রাগুক্ত-১/৮৩
[১৬] আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/২২২
[১৭] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৪২
[১৮] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮২
[১৯] প্রাগুক্ত-১/৮৮
[২০] প্রাগুক্ত-১/৮৫
[২১] তাবাকাত-৬/১৭৭
[২২] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮২

আমার আগে জানা থাকতো, যা আমি পরে জেনেছি, তাহলে আমি শুধু মুহাদ্দিছদের সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত হাদীছগুলো বর্ণনা করতাম।[২৩]

তবে তিনি 'রিওয়ায়াত বিল মা'না' (অর্থ ও ভাব বর্ণনা)-কে এ সতর্কতার পরিপন্থী বলে মনে করতেন না। অন্য কথায়, হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে হুবহু শ্রুত শব্দে বর্ণনা করতে হবে, তিনি এমনটি মনে করতেন না। ইবন 'আওন বর্ণনা করেছেন, শা'বী হাদীছ 'রিওয়ায়াত বিল মা'না' করতেন।[২৪]

'মাগাযী' শব্দটি 'গাযওয়া' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ যুদ্ধ-বিগ্রহ। মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিশেষতঃ ইসলামের প্রথম পর্বের যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ক জ্ঞানকে 'মাগাযী' বলে। পরবর্তীকালে এটি একটি বিশেষ শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইমাম শা'বী এ শাস্ত্রেরও একজন শীর্ষ স্থানীয় 'আলিম ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর মক্কা, মদীনা, বসরা, কূফাসহ ইসলামী খিলাফতের কেন্দ্রসমূহে 'মাগাযী' চর্চার বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠান ছিল মসজিদ ভিত্তিক কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্র করে। কূফার জামে' মসজিদে শা'বীকে কেন্দ্র করে 'মাগাযী' চর্চার একটি 'হালকা' বা বেষ্টনী গড়ে ওঠে। মানুষ তাঁকে ঘিরে বসে যেত এবং তিনি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের (রা) যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলী শুনাতেন। বহু সাহাবী তখন জীবিত ছিলেন। এই 'হালকা'র পাশ দিয়ে তাঁরা আসা-যাওয়াও করতেন। এমনকি অনেক সাহাবী এমন ছিলেন যাঁরা এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও তাঁর অনুপম বর্ণনা শুনে তাঁর জ্ঞান ও বর্ণনার তারীফ করতেন। একদিন তিনি 'মাগাযী' বর্ণনা করছেন। এমন সময় হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শা'বীর বর্ণনা শুনে মুগ্ধ হন এবং মন্তব্য করেন : সে যেসব মাগাযী'র কথা বর্ণনা করছে তার অনেকগুলোতে আমি অংশগ্রহণ করে নিজ চোখে দেখেছি, নিজ কানে শুনেছি, তা সত্ত্বেও সে আমার চেয়ে ভালো বর্ণনাকারী।[২৫]

শা'বী ছিলেন জাহিলী ও ইসলামী যুগের আরবের বিভিন্ন ঘটনা ও ইতিহাসের একজন পারদর্শী। তাঁর পারদর্শিতার বহু কথা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। একটি ঘটনার কথা তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

একবার দু'জন লোক পরস্পর গর্ব ও গৌরবের দাবী করতে করতে আমার নিকট আসে। তাদের একজন বানু 'আমির ও অন্যজন বানু আসাদ গোত্রের লোক। 'আমির গোত্রের লোকটি তার প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে ফেলে এবং তার কাপড় ধরে টানতে টানতে আমার দিকে নিয়ে আসে। আসাদ গোত্রের লোকটি তখন হেয় ও অপমানিত অবস্থায় অনুনয়-বিনয় করে বলতে থাকে : আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও।

---

২৩. প্রাগুক্ত-১/৮৩

২৪. তাবাকাত-৬/১৭৪

২৫. তাহযীব আত-তাহযীব-৫/৬৬; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৭৪

জবাবে 'আমির গোত্রের লোকটি বলছিল : আল্লাহর কসম! শা'বী আমাদের দু'জনের মধ্যে ফায়সালা না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়বো না। আমি 'আমির গোত্রের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললাম : তুমি তোমার প্রতিপক্ষকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের দু'জনের মধ্যে ফায়সালা করছি। এরপর আমি আসাদ গোত্রের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললাম : কি ব্যাপার, তার সামনে তোমাকে এত দুর্বল ও পরাভূত দেখছি কেন? অথচ তোমাদের রয়েছে এমন ছয়টি গর্ব ও গৌরবের বিষয় যা আরবের আর কোন গোত্রের নেই। যেমন :

১. তোমাদের মধ্যে এমন এক মহিয়ষী মহিলা ছিলেন যাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান সেরা মানব মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ (সা) এবং আল্লাহ তা'আলা সপ্তম আকাশের উপর থেকে তাঁদের দু'জনকে বিয়ে দেন। আর তাঁদের মধ্যে দূত হিসেবে কাজ করেন জিবরীল (আ)। সেই মহিলা হলেন উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিন্ত জাহ্শ (রা)। এই সম্মান ও গৌরব কেবল তোমার গোত্রের আছে। আরবের অন্য কোন গোত্রের নেই।

২. তোমাদের মধ্যে জান্নাতের অধিবাসী এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি এই মাটির পৃথিবীতে চলাফেরা করতেন। তিনি "উকাশা ইবন মিহ্সান'।[২৬] এটাও তোমাদের একটা গৌরবের বিষয়– যা আর কোন মানবগোষ্ঠীর নেই।

৩. ইসলামের প্রথম পতাকা তোমাদের এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যক্তিটি হলেন 'আবদুল্লাহ ইবন জাহ্শ (রা)।[২৭]

৪. ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বন্টনকৃত গণীমতের মাল ছিল 'আবদুল্লাহ ইবন জাহ্শ কর্তৃক দখলকৃত গণীমত।

৫. 'বাই'আতুর রিদওয়ান'[২৮]– এ প্রথম বাই'আতকারী ব্যক্তিটি ছিলেন তোমাদেরই এক ব্যক্তি। তোমাদের গোত্রের আবূ সিনান ইবন ওয়াহাব (রা) সেদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাতটি একটু বাড়িয়ে দিন বাই'আত করবো। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রশ্ন করলেন : কিসের উপর? তিনি জবাব দিলেন : আপনার মধ্যে যা আছে। রাসূল (সা) আবার প্রশ্ন করলেন : আমার মধ্যে কি আছে? বললেন : বিজয় অথবা শাহাদাত। রাসূল (সা) বললেন : হাঁ, ঠিক বলেছো। তারপর তাঁর বাই'আত গ্রহণ করেন। তারপর লোকেরা আবূ সিনানের (রা) বাই'আতের উপর বাই'আত করতে আরম্ভ করে।

৬. বদরের দিন মুহাজির যোদ্ধাদের এক সপ্তমাংশ ছিল তোমার গোত্র বানূ আসাদের লোক।

---

[২৬] 'উকাশা ইবন মিহ্সান (রা) একজন বিশিষ্ট সাহাবী। যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রথম খলীফার সময়কালে সংঘটিত রিদ্দার যুদ্ধে শহীদ হন। (আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮)

[২৭] 'আবদুল্লাহ ইবন জাহ্শ (রা) সামরিক অভিযানে নেতৃত্বদানকারী একজন সাহাবী। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্ত জাহশের (রা) ভাই।

[২৮] হিজরী ৬ষ্ঠ সনে হুদায়বিয়াতে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পূর্বে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে এ বাই'আত অনুষ্ঠিত হয়।

এসব কথা শুনে 'আমির গোত্রের লোকটি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ক্ষেত্রে শা'বীর উদ্দেশ্য ছিল একজন দুর্বল পরাভূত ব্যক্তিকে শক্তিমান বিজয়ীর বিরুদ্ধে সাহায্য করা। সেদিন 'আমির গোত্রের লোকটিকে পরাভূত ও লাঞ্ছিত দেখলে তার গোত্রেরও অনেক গৌরব গাঁথা তিনি শুনাতে পারতেন।[২৯]

সেকালে প্রচলিত সকল প্রকার জ্ঞান ও শাস্ত্রে তাঁর সমান অধিকার থাকলেও ফিকাহ্ ছিল তাঁর বিশেষভাবে অধিত বিষয়। এ শাস্ত্রে তাঁর স্থান এত উঁচুতে ছিল যে, সে যুগে তাঁকে সবচেয়ে বড় ফকীহ্ বলে গণ্য করা হতো। আবূ হুসাইন বলতেন : আমি শা'বীর চেয়ে বড় ফকীহ্ কাউকে দেখিনি। কোন কোন 'আলিম তো তাঁকে তাঁর যুগের সকল ইমামের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করতেন। আবূ মিজলায বলতেন, আমি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, তাউস, 'আতা', হাসান আল-বসরী, ইবন সীরীন- এঁদের কাউকে শা'বীর চেয়ে উঁচু স্তরের ফকীহ্ দেখিনি।[৩০]

ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ, যিনি নিজে একজন খুব বড় ফকীহ্, শা'বীর ফিকাহ্র জ্ঞানের প্রতি এত আস্থাশীল ছিলেন যে, কোন মাসআলার সমাধান তাঁর জানা না থাকলে প্রশ্নকারীকে শা'বীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। তিনি অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। এমন সময় নিকটেই শা'বীকে যেতে দেখলেন। তিনি প্রশ্নকারীকে বললেন, এই যে শায়খ যাচ্ছেন তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। আর তিনি যে জবাব দেন তা আমাকে একটু জানিয়ে যাবে। প্রশ্নকারী লোকটি শা'বীকে মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলো। তিনিও অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। আন-নাখা'ঈ শা'বীর এ জবাব শুনে মন্তব্য করেন, আল্লাহর কসম! এই হচ্ছে ফিক্হ। একেই বলে 'আলিম।[৩১]

ফিকাহ্ শাস্ত্রে শা'বীর পরিপূর্ণতা এতখানি ছিল যে, সাহাবায়ে কিরাম, যাঁরা ছিলেন নবীর (সা) 'ইল্ম ও মা'রিফাতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তাঁদের বর্তমানে তিনি ইফতার মত গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হন। আবূ বকর আল-হুযালী বলেন। ইবন সীরীন আমাকে বললেন, তুমি শা'বীর সাহচর্য অবলম্বন করবে। কারণ, সাহাবীদের বিরাট একটি সংখ্যার বর্তমানে আমি তাঁকে ফাতওয়া দিতে দেখেছি।[৩২]

হাদীছের মত ফিকাহ্তেও তিনি ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আর এ কারণে, সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। সাল্ত ইবন বাহরাম বলেন, জ্ঞানে শা'বীর সমকক্ষ এমন কোন ব্যক্তিকে আমি শা'বীর চেয়ে- 'আমি জানিনে'- কথাটি বেশী বলতে দেখিনি।[৩৩] ইবন 'আওন বলেন, শা'বীর নিকট যখন

---

[২৯] সওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৭৪-১৭৬

[৩০] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১, ৮৭

[৩১] তাবাকাত-৬/১৭৪; আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/২১৭

[৩২] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১

[৩৩] তাবাকাত-৬/১৭৪;

কোন মাসআলা আসতো, তিনি যথাসম্ভব উত্তর এড়িয়ে যেতেন। আর ইবরাহীম উত্তর দিয়েই চলতেন। তিনি আরো বলেন, শা'বী ছিলেন স্বভাবগতভাবে বহির্মুখী, আর ইবরাহীম ছিলেন অন্তর্মুখী। কিন্তু যখন দু'জনের সামনে কোন ফাতওয়ার বিষয় এসে যেত তখন উভয়ের স্বভাব পাল্টে যেত। শা'বী সংযত হয়ে যেতেন, আর ইবরাহীমের মুখ খুলে যেত।[৩৪]

যাই হোক না কেন, তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট 'আলিম এবং উঁচু স্তরের একজন ফকীহ্। কূফার ইফতা'র পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। অসংখ্য মানুষের কেন্দ্রবিন্দুও ছিলেন তিনি। তাই সব সময় 'জানিনে' বলে পার পেতেন না। অনেক মাসআলার জবাব দিতেই হতো। তবে এতটুকু সতর্কতা সব সময় অবলম্বন করতেন যে, তাঁর জবাবের ভিত্তি হতো কুরআন ও হাদীছ। নিজের মতামতের কোন গুরুত্বই দিতেন না। একবার তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো। আর সেই ব্যাপারে তাঁর কোন হাদীছ জানা ছিল না। তাই জবাব দানে অপারগতা প্রকাশ করলেন। এক ব্যক্তি বললো, আপনি আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। বললেন, আমার মতামত দিয়ে কি করবে? তার উপর প্রস্রাব কর।[৩৫]

তিনি বলতেন, আমরা ফকীহ্ নই। তবে আমরা হাদীছ শুনেছি, তাই বর্ণনা করে থাকি। প্রকৃত ফকীহ্ তো তাঁরা, যাঁরা যাকিছু জানে তা আমল করে।[৩৬] একবার কোন এক ব্যক্তি তাঁকে সম্বোধন করে এভাবে : ওহে ফকীহ্ 'আলিম, আমার প্রশ্নের জবাব দিন। তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়। আমি যা নই তা বলে আমাকে ফুলিও না। ফকীহ্ তো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর হারামকৃত বস্তু থেকে দূরে থাকে, আর 'আলিম সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভয় করে। আমি এর কোনটিতে পড়ি?[৩৭]

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। তিনি জবাব দিলেন এভাবে : এ মাসআলায় 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এরকম বলেছেন, 'আলী (রা) এরকম বলেছেন। প্রশ্নকারী বললো : আবূ 'আমর! আপনি কি বলেন? তিনি একটু লাজুকভাবে হেসে দিয়ে বলেন : 'উমার ও 'আলীর (রা) কথা শোনার পর আমার কথা দিয়ে তুমি কী করবে?

শরী'আতের বিষয়সমূহে তিনি মাযহাব ও 'আকীদাগত দিক দিয়েই শুধু কিয়াসকে খারাপ জানতেন না, বরং বুদ্ধি ও যুক্তির ভিত্তিতেও সে কথা বলতেন।

একবার তিনি আবূ বকর আল-হুযালীকে এর রহস্য বুঝানোর জন্য তাঁকে প্রশ্ন করেন : আচ্ছা, যদি আহনাফ ইবন কায়স এবং তাঁর সাথে একটি শিশুকে হত্যা করা হয় তাহলে দু'জনের দিয়াত (রক্তমূল্য) কি সমান হবে, না আহনাফের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য তাঁর দিয়াত বেশী হবে? আবূ বকর জবাব দিলেন : সমান হবে। শা'বী বললেন : তাহলে

---

[৩৪] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৫

[৩৫] তাবাকাত-৬/১৭৪

[৩৬] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৫

[৩৭] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/২২০

কিয়াসের কোন ভিত্তি নেই। কারণ, কিয়াসের দাবী এটাই ছিল যে, আহনাফের দিয়াত বেশী হোক। উল্লেখ্য যে, আহনাফ একজন সর্বগুণে গুণান্বিত অতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান তাবি'ঈ ছিলেন।

এত বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দায়িত্ব অনুভূতি এত প্রবল ছিল যে, তিনি আফসোসের সুরে বলতেন : হায়! যদি আমাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হতো, আমাকে যদি আমার 'ইলমের জবাবদিহী করতে না হতো এবং আমাকে যদি এর কোন বিনিময়ও দেওয়া না হতো![৩৮] দাউদ ইবন ইয়াযীদ বলেন, আমি শা'বীকে বলতে শুনেছি : যদি আমি নিরানব্বইটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিই, আর একটি মাত্র জবাবে ভুল করি, তাহলে মানুষ আমাকে সেই একটিতেই ধরে বসবে।[৩৯]

দীনী-'ইলমের অধিকারী 'আলিমরা সাধারণত অংক শাস্ত্রের মত জ্ঞানের প্রতি তেমন আগ্রহী হননা। তবে শা'বী এ শাস্ত্রেরও একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। এ শাস্ত্রের জ্ঞান তিনি হারিছ আল-আ'ওয়ারের নিকট থেকে অর্জন করেন।[৪০]

অংকে দক্ষতার কারণে ফারায়েজ শাস্ত্রেও তার পূর্ণ অধিকার ছিল। এ শাস্ত্রটি তিনি সম্ভবত 'আলীর (রা) নিকট থেকে শিখেছিলেন। অনেকে মনে করেন, 'আলীর (রা) থেকে সরাসরি নয়, বরং তাঁর বাণী থেকে তিনি এটা বের করেন।[৪১]

শা'বীর মধ্যে কাব্যরুচিও ছিল। প্রাচীন আরবের কবিদের কবিতার হাজার হাজার শ্লোক তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি দাবী করতেন, আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে একাধারে একমাস পর্যন্ত কবিতা শুনাতে পারি এবং কোন কবিতার পুনরাবৃত্তি হবে না। তিনি নিজেও কবিতা রচনা করতেন। কাব্যশাস্ত্রে তাঁর এত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বলতেন, আমি যেসব জ্ঞান অর্জন করেছি, তার মধ্যে কবিতার জ্ঞানই সবচেয়ে কম।[৪২] তিনি মসজিদে কবিতা পাঠের আসর বসাতেন। ইবন আবী লায়লা বলেন : আমি শা'বীকে লাল চাদর ও হলুদ পায়জামা পরে মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে দেখেছি।[৪৩]

সাহাবায়ে, কিরামের বর্তমানেই 'হালকায়ে দারস' চালু হয়ে গিয়েছিল। ইবন সীরীন বর্ণনা করেছেন, আমি যখন কূফায় আসি তখন শা'বীর 'হালকায়ে দারস' চালু ছিল এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের বিশাল একটি সংখ্যা তখনও বর্তমান ছিলেন। তাঁর হালকায়ে দারসে বেশী লোকের উপস্থিতি পছন্দ করতেন না। বলতেন : হালকা বেশী বড় হয়ে গেলে কোলাহলের স্থানে পরিণত হয়।

যে সকল মসজিদের হালকায়ে দারসে শোরগোল হতো সেগুলো ছেড়ে দিতেন। সালিহ ইবন কাইসান বলেন, একবার আমি ও শা'বী দু'জন হাত ধরাধরি করে হেলতে দুলতে

---

[৩৮] তাবাকাত-৬/১৭৪

[৩৯] তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/৮২

[৪০] তাবাকাত-৬/১৭৩

[৪১] তাহযীবুত তাহযীব-৫/৬৭

[৪২] আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৫/২৭৫; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৭৩

[৪৩] তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/৮৮

মসজিদে পৌছলাম। সেখানে হাম্মাদের (রহ) মাজমা' ছিল এবং শোরগোল হচ্ছিল। শা'বী সেই শোরগোল শুনে বললেন, আল্লাহর কসম! এই হাট্টুরে লোকেরা এই মসজিদটিকে বিরক্তিকর করে তুলেছে। একথা বলে তিনি ফিরে চললেন।[৪৪]

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের পরিধি ছিল অনেক বিস্তৃত। যেহেতু তিনি ছিলেন বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী, তাই সকল শাস্ত্রে তাঁর শিষ্য-শাগরিদের সংখ্যাও অনেক। এখানে কেবল হাদীছ শাস্ত্রের কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ, সা'ঈদ ইবন 'আমর ইবন আশওয়া', ইসমা'ঈল ইবন আবী খালিদ, বায়ান ইবন বিশর, হুসাইন ইবন 'আবদির রহমান, দাউদ ইবন আবী হিন্দা, যুবায়দ আল-ইয়ামানী, যাকারিয়া ইবন আবী যায়িদা, সা'ঈদ ইবন মাসরূক, সালামা ইবন কুহায়ল, আবূ ইসহাক শাইবানী, আ'মাশ, মানসূর, মুগীরা, সাম্মাক ইবন হারব, আসিম আল-আহওয়াল, আবুয যানাদ, ইবন 'আওন, 'আবদুল মালিক ইবন সা'ঈদ, 'আওন ইবন 'আবদিল্লাহ, কাতাদা, মুজালিদ ইবন সা'ঈদ, মাতরাব ইবন তুরায়ফ, আবূ হায়্যান আত-তায়মী ও আরো অনেকে।[৪৫]

সে যুগের সকল বড় 'আলিম ও ইমামের নিকট তাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকৃত ছিল। সবাই তাঁকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। হাসান আল-বসরী তাঁকে বহু জ্ঞানের আধার বলতেন।[৪৬] সে যুগের বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী চারজনের একজন ছিলেন তিনি। ইমাম যুহ্‌রী বলতেন: 'আলিম চারজন। মদীনায় সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, কূফায় 'আমির আশ-শা'বী, বসরায় হাসান আল-বসরী এবং শামে মাকহূল। ইবন 'উয়াইনা বলেন, লোকেরা বলতো, ইবন 'আব্বাস, শা'বী ও ছাওরী– এ তিনজনের প্রত্যেকেই তাঁদের আপন আপন যুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'আলিম ছিলেন।[৪৭] আল-জাহিজ শা'বীর নামটি মু'আল্লিমদের (শিক্ষক) নামের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[৪৮]

জীবনের প্রথম দিকে তিনি শি'আ মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাদের কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা এবং তাদের ভারসাম্যহীন কথাবার্তা দেখে-শুনে তাদের মতবাদ থেকে তাওবা করেন। তাদের নিন্দা-মন্দও করতে থাকেন। তবে আহলি সুন্নাতের 'আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করার পরেও সাধারণ মযহাব পরিবর্তনকারীদের মত মধ্যপন্থার বাইরে যাননি। তিনি বলতেন, সত্যনিষ্ঠ মু'মিন এবং সত্যনিষ্ঠ বানূ হাশিমকে বন্ধু বানাবে। তবে শী'আ হবে না। আর যে জিনিস তোমাদের জ্ঞানের মধ্যে নেই, সে ক্ষেত্রে ভালোর আশা রেখ। তবে মুরজিয়া হয়োনা। এই বিশ্বাস রেখ যে, তোমাদের সব ভালো কাজ আল্লাহর পক্ষ

---

[৪৪] তাবাকাত-৬/১৭৫, ১৭৭; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮২

[৪৫] তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব-৫/৬৬

[৪৬] প্রাগুক্ত-৫/৬৭

[৪৭] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৪২; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮২

[৪৮] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৫১

থেকে হয়, আর সব খারাপ কাজ তোমাদের কু-প্রবৃত্তি থেকে হয়। তবে কখনো কাদরিয়া হবে না। যাকেই তোমরা ভালো কাজ করতে দেখবে তাকে বন্ধু ভাববে।[৪৯]

ইমাম শা'বীর যুগে কট্টরপন্থী শি'আ রাফিজী[৫০] গ্রুপের উৎপাত ও দৌরাত্ম্য দারুণ বেড়ে গিয়েছিল। তারা আবূ বকর ও 'উমারের (রা) খিলাফত সঠিক নয় বলে তা প্রত্যাখ্যান করতো এবং 'আলীকে (রা) 'উছমানের (রা) উপর প্রাধান্য দিত। শি'আদের অন্যান্য দল ও গোষ্ঠী এই রাফিজীদের মত এত চরমপন্থী ছিল না। ইমাম শা'বী রাফিজীদেরকে ভীষণ ঘৃণা করতেন এবং প্রকাশ্যে তাদের মত ও বিশ্বাসের কঠোর সমালোচনা করতেন। মালিক ইবন মু'আবিয়া বলেন, একবার আমি ও শা'বী রাফিজী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বলেন : হে মালিক! আমি যদি চাই যে, রাফিজীদের সকল সদস্য আমার দাসে পরিণত হোক এবং তারা আমার ঘর-বাড়ী সোনা দিয়ে ভরে দিক, আর তার বিনিময়ে আমি তাদের পক্ষে 'আলীর (রা) প্রতি ছোট্ট একটি মিথ্যা আরোপ করি, তাহলে তারা তাতে রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু আমি, আল্লাহর কসম! কখনো 'আলীর (রা) প্রতি কোন মিথ্যা আরোপ করবো না। মালিক! আমি প্রবৃত্তির অনুসারী সব দল-গোষ্ঠীর চিন্তা-বিশ্বাস অধ্যয়ন করেছি, কিন্তু রাফিজীদের মত নির্বোধ কোন সম্প্রদায়কে দেখিনি। তারা জন্তু-জানোয়ার হলে গাধা হতো, আর পাখী হলে হতো মর্দা শকুন। আমি তোমাকে প্রবৃত্তির অনুসারী সকল পথভ্রষ্টদের থেকে সতর্ক থাকতে বলি। আর এদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে রাফিজী। তারা এই উম্মাতের ইয়াহূদী। তারা ইসলামকে হিংসা করে যেমন ইয়াহূদীরা করে খ্রীষ্ট ধর্মকে। তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অথবা আল্লাহর ভয়ে ইসলামে ঢোকেনি। বরং মুসলমানদের প্রতি ক্রোধ ও শত্রুতাবশত ইসলামে ঢুকেছে। 'আলী ইবন আবী তালিব (রা) তাদের অনেককে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছেন এবং অনেককে বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে তাড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন : 'আবদুল্লাহ ইবন সাবাকে সাবাতে, 'আবদুল্লাহ ইবন সাবাবকে আল-জাযুরে এবং আবুল কারাওয়াসকে অন্যত্র তাড়িয়ে দেন। কারণ, রাফিজীদের কর্মকাণ্ড ইয়াহূদীদের কর্মকাণ্ডের মতই। ইয়াহূদীরা বলে থাকে, রাজত্ব কেবল দাউদের বংশধারার মধ্যেই থাকবে। আর রাফিজীরা বলে, খিলাফত কেবল 'আলী ইবন আবী তালিবের (রা) বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ইয়াহূদীরা বলে, প্রতীক্ষিত আল-মাসীহর আবির্ভাব পর্যন্ত কোন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ নেই। তখন আসমান থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে। আর রাফিজীরা বলে : ইমাম আল-মাহদীর আগমনের আগ পর্যন্ত কোন জিহাদ নেই। তখনো আসমান থেকে ঘোষণা দেওয়া হবে। ইয়াহূদীরা আকাশের তারকারাজি স্পষ্টভাবে দেখা না যাওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামায দেরী করে। রাফিজীরাও তাই করে। ইয়াহূদীরা তিন তালাককে কিছুই মনে করে না, রাফিজীরাও তাই করে। ইয়াহূদীরা

---

[৪৯] তাবাকাত-৬/১৭৩

[৫০] 'রাফিজী' শব্দটি আরবী "رفض" শব্দ থেকে নির্গত, যার অর্থ পরিত্যাগ করা, প্রত্যাখ্যান করা। যেহেতু এই দলের লোকেরা আবূ বাক্‌র (রা) ও 'উমারকে (রা) এবং তাঁদের দু'জনের খিলাফতকে যাঁরা সঠিক বলে মানেন, তাঁদের সকলকে পরিত্যাগ ও প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাই তাদেরকে রাফিজী বলা হয়। (আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/৪০৪)

মহিলাদের জন্য ইদ্দাতের প্রয়োজন মনে করে না। রাফিজীরাও তাদের মত একই রকম বিশ্বাস করে। ইয়াহূদীরা প্রতিটি মুসলমানের রক্ত ঝরানো বৈধ মনে করে। রাফিজীরাও তাই করে। ইয়াহূদীরা তাওরাত জ্বালিয়ে দিয়েছে। রাফিজীরাও কুরআন জ্বালিয়েছে। ইয়াহূদীরা জিবরীলকে (আ) ঘৃণা করে এবং বলে, সে ফিরিশতাদের মধ্যে আমাদের একমাত্র শত্রু। তেমনিভাবে রাফিজীরা বলে : জিবরীল ওহী আলীর নিকট না পৌছিয়ে ভুল করে মুহাম্মাদের নিকট পৌছিয়েছে। ইয়াহূদীরা উটের গোশত খায়না, রাফিজীরাও খায় না। দু'টি বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ইয়াহূদী ও নাসারাদের শ্রেষ্ঠত্ব আছে রাফিজীদের উপর। যেমন ঃ কোন ইয়াহূদীকে যদি প্রশ্ন করা হয় তোমাদের মিল্লাতের সবচেয়ে ভালো মানুষ কারা? উত্তর দিবে : মূসার (আ) সঙ্গী-সাথীরা। আর একই প্রশ্ন কোন নাসারাকে করলে বলবে : 'ঈসার (আ) সঙ্গী-সাথীরা। আর যদি রাফিজীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় : তোমাদের মিল্লাতের সবচেয়ে খারাপ মানুষ কারা? বলবে : মুহাম্মাদের (সা) সাহাবীরা। আল্লাহ তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনার আদেশ করেছেন, আর এই রাফিজীরা তাঁদেরকে গালি দেয়। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মাথার উপর তরবারি খোলা থাকবে। তাদের পা কখনো দৃঢ় হবে না, তাদের পতাকাও কোন দিন উড়বে না, তারা কখনো ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না, এবং তারা সব সময় বিভেদ-বিভক্তিতে লিপ্ত থাকবে। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিবে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দিবেন।[৫১]

তিনি সে যুগের জটিল রাজনৈতিক বিতর্ক, যথা : 'উছমানের (রা) হত্যাকাণ্ড, 'আলী-মু'আবিয়ার (রা) দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং 'আলীর (রা) হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা থেকে বিরত থাকতেন। একবার তাঁর এক সঙ্গী তাঁকে প্রশ্ন করলেন : আবূ 'আমর! এই দু' ব্যক্তির বিষয় নিয়ে মানুষ যেসব কথা বলে সে ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

তিনি প্রশ্ন করলেন : আপনি কোন দু'ব্যক্তির কথা বলছেন? সঙ্গীটি বললেন : 'উছমান ও 'আলী (রা)।

তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! কিয়ামতের দিন আমি 'উছমান অথবা 'আলীর (রা) বিতর্কে জড়াতে চাইনে।

শা'বী এত বড় জ্ঞানী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও অতি সাধারণ কোন মানুষের নিকটে শিক্ষণীয় কিছু থাকলে কখনো উপেক্ষা করতেন না। একজন মরুচারী বেদুঈন নিয়মিতভাবে তাঁর মজলিসে উপস্থিত থাকতো। কিন্তু সে কোন কথা বলতো না। চুপ করে শা'বী ও অন্যদের কথা শুনতো। একদিন শা'বী তাঁকে প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা, তুমি কোন কথা বল না কেন? লোকটি বললো : আমি চুপ থাকি নিরাপদ থাকার জন্য, আর শুনি জানার জন্য।[৫২] একজন মানুষের কানের অংশটি তার নিজের দিকে ফিরে আসে, আর তার জিহ্বার অংশটি অন্যের দিকে চলে যায়। বেদুঈন লোকটির এই উক্তিটি তিনি সারা জীবন আওড়িয়ে গেছেন।[৫৩]

---

[৫১] প্রাগুক্ত-২/৪০৯-৪১০

[৫২] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৯৪

[৫৩] সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৮১

শা'বী ছিলেন স্বভাবগতভাবে কোমল প্রকৃতির এবং ধৈর্যশীল। হাসান আল-বসরী (রহ) বলতেন, আল্লাহর কসম! শা'বী ছিলেন একজন জ্ঞানী ও ধৈর্যশীল প্রকৃতির মানুষ।[৫৪] তিনি নিজের তিনটি গুণের কথা এভাবে বলেছেন : 'আমি কখনো এমন কোন জিনিস লাভের জন্য নিজের স্থান থেকে উঠিনি যার দিকে মানুষ তাকায়। আমার নিজের কোন দাস বা চাকর-বাকরকে কখনো মারিনি। আমার যে কোন আত্মীয়-বন্ধু ঋণ অবস্থায় মারা গেছে, আমি তার ঋণ পরিশোধ করেছি।[৫৫]

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে খুব খারাপ ও অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে। তিনি কোন প্রত্যুত্তর না করে শুধু এতটুকু বলেন! তোমার কথায় যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন। আর যদি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন।[৫৬] একবার কূফার আমীর 'উমার ইবন হুবাইরা একদল লোককে গ্রেফতার করেন। তিনি নিজে আমীরের সাথে দেখা করে বলেন : আপনি যদি অন্যায় ও অসত্যের ভিত্তিতে তাদেরকে গ্রেফতার করে থাকেন তাহলে সত্য তাদেরকে বের করে আনবে। আর যদি সত্যের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে থাকেন তাহলে আপনার ক্ষমা তাদেরকে বেষ্টন করবে। তাঁর এমন চমৎকার উপস্থাপনায় আমীর দারুণ খুশী হন এবং তাঁর সম্মানে গ্রেফতারকৃত সকলকে মুক্তি দেন।[৫৭]

জ্ঞানের সাগর হওয়া সত্ত্বেও তিনি একজন হাসি-খুশী স্বভাবের দারুণ রসিক ও কৌতুকপ্রিয় মানুষ ছিলেন। ইবন খাল্লিকান তাঁকে 'মায্যাহ' বা অতিরিক্ত কৌতুককারী বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৮] হাস্য-রসিকতার উপাদান তাঁর স্বভাবে এত পরিমাণে ছিল যে, কথায় কথায় হাস্য-রসের সৃষ্টি করে মানুষকে হাসাতেন। তাঁর হাস্য-রসের অনেক কথা বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো : আচ্ছা, ইবলীসের স্ত্রীর নাম কি? জবাবে তিনি বললেন, তার বিয়ের অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম না। তাই আমার জানা নেই।[৫৯] একবার এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করলো, ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তান কি তিনজনের মধ্যে (পিতা, মাতা ও সন্তান) সবচেয়ে বেশী খারাপ? জবাবে তিনি বললেন : যদি তাই হতো তাহলে ঐ সন্তান পেটে থাকতেই তার মাকে সংগেসার (প্রস্তারাঘাতে হত্যা) করা হতো। উল্লেখ্য যে, ব্যভিচারিণীর পেটে সন্তান থাকলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তার সকল শাস্তি স্থগিত রাখার বিধান রয়েছে।[৬০] একবার তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে

---

[৫৪] তাহ্যীবুত তাহযীব-৫/৬৭

[৫৫] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১

[৫৬] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/২৭৬; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৭৮; 'উয়ূন আল-আখবার-১/৩২৬

[৫৭] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/১৮৮

[৫৮] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৪৪

[৫৯] 'উয়ূন আল-আখবার-১/৩৬৫; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৭

[৬০] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১

বসে কথা বলছেন। এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি সেখানে এসে প্রশ্ন করলো : আপনাদের দু'জনের মধ্যে শা'বী কে? তিনি স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করেন।[৬১]

'আমর ইবন সা'ঈদ বর্ণনা করেছেন। আমি একবার শা'বীকে বললাম, আপনি আমার নিকট একটি হাদীছ বর্ণনা করেছিলেন। আমি সেটি এখন ভুলতে বসেছি। তিনি বললেন : কিছু অংশ বললে আমি বুঝতে পারবো সেটি কোন হাদীছ। আমি বললাম, কিছুই মনে নেই। শা'বী একটি হাদীছ শুনিয়ে বললেন, এটা না তো? বললাম ঃ না। তিনি আরেকটি হাদীছ শুনিয়ে বললেন, সম্ভবত এটা হবে। আমি বললাম, এটাও না। অবশেষে তিনি একটি প্রেম সংগীতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করে বলেন : সম্ভবত এটা হবে।[৬২]

একবার ইরাকের আমীর হাজ্জাজ শা'বীকে প্রশ্ন করলেন : كم عطاءك في السنة- বছরে আপনার ভাতা কত? এখানে মূলতঃ في السنة – কথাটি বলা ঠিক নয়। এ কারণে শা'বীও ভুল উত্তর দেন এবং ألفين – বলেন। অর্থাৎ দু'হাজার। অথচ الفين এর স্থলে الفان বলা উচিত ছিল। তাঁর উত্তর শুনে হাজ্জাজ নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং কথাটি ঠিক করে বলেন : كم عطاؤك؟। এবার শা'বী الفان – বলেন। এবার হাজ্জাজ শা'বীকে বলেন, আপনি প্রথমে ভুল আরবীতে উত্তর দিলেন কেন? জবাবে তিনি বলেন, আমীর ভুল করেছিলেন। যখন আমীর ঠিক করে বলেন, তখন আমিও ঠিক করে বলেছি। আমীর ভুল বলবেন আর আমি শুদ্ধ বলবো, এমনটি হওয়ার তো সুযোগ ছিল না। হাজ্জাজ তাঁর কথায় দারুণ খুশী হন এবং তাঁকে পুরস্কৃত করেন।[৬৩]

একবার শা'বী তাঁর মজলিসে বসে শিষ্য-শাগরিদ ও বন্ধুদের সাথে ফিকাহ্ বিষয়ে আলোচনা করছেন। এক বৃদ্ধ শা'বীর পাশে অনেকক্ষণ বসে আছেন। এক সময় একটু ফাঁক পেয়ে শা'বীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন : আমি আমার নিতম্বে একটা ফোঁড়া হয়েছে বলে মনে করছি। এটাতে শিঙ্গা লাগানোর ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন? সাথে সাথে শা'বী বলে ওঠেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ حَوَّلَنَا مِنَ الْفِقْهِ إِلى الْحِجَامَةِ.

– সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে ফিকাহ্ থেকে শিঙ্গার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।[৬৪]

একবার তিনি এক দর্জিকে কৌতুক করে বলেন, আমার কাছে ভাঙ্গা প্রেম-প্রীতি আছে আপনি কি সেটা সেলাই করতে পারেন? দর্জিও ছিল তাৎক্ষণিক জবাব দানে পারঙ্গম। সে বলে, যদি আপনার কাছে বাতাসের সূতা থাকে তাহলে সেলাই করা যাবে।[৬৫]

---

[৬১] 'উয়ূন আল-আখবার-১৩৬৪

[৬২] তাবাকাত-৬/১৭৪

[৬৩] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৪৪; আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/১২৫

[৬৪] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৩২২

[৬৫] 'উয়ূন আল-আখবার-১/৩৬৪; শাযারাত আয-যাহাব-১/১২৭

একবার তিনি এক খ্রীস্টানকে ইসলামী কায়দায় السلام عليكم ورحمة الله - বলে সালাম দেন। এক ব্যক্তি তাঁর এমন কাজের প্রতিবাদ জানায়। তিনি জবাব দেন এই বলে : যদি তার উপর আল্লাহর রহমত না হতো তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যেত। তাহলে আমার رحمة الله বলাতে ভুল কোথায়?

তাঁর সমকালীনদের মধ্যে যাঁদের সাথে বেশী খোলামেলা ও অন্তরঙ্গতা ছিল হাস্য-রসিকতা করে তাদেরকে অস্থির করে তুলতেন। এ কারণে বন্ধুদের অনেকে তাঁর কাছে যেতেই ভয় করতেন। হাফস ইবন গিয়াছ একবার একটি মাসআলায় নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারে আল-আ'মাশকে বললেন, আপনি শা'বীর নিকট যাচ্ছেন না কেন? বললেন, আমি তাঁর কাছে কিভাবে যাব। তিনি আমাকে দেখা মাত্র ঠাট্টা করা আরম্ভ করেন। আমাকে বলবেন, তোমার যে চেহারা, এ কি কোন 'আলিমের চেহারা? এতো কোন তাঁতীর চেহারা, কিন্তু আমি যদি ইবরাহীমের নিকট যাই, তিনি আমাকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করেন।[৬৬]

উমাইয়্যা শাসনকালে শা'বীকে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত এবং জাতীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেবায় নিয়োজিত দেখা যায়। হাজ্জাজ তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। তাঁর বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করেন, তাঁকে তাঁর গোত্রের নেতা বানান এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে খলীফা আবদুল মালিকের দরবারে পাঠান। একবার সিজিস্তানের ওয়ালী রাতবীলের নিকট দূত হিসেবে পাঠান। সেখানে তিনি প্রচুর সম্মান ও উপহার-উপঢৌকন লাভ করেন।[৬৭]

'আবদুল মলিক ইবন মারওয়ান মুসলিম খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফকে লিখলেন : 'দীন ও দুনিয়ার জন্য উপযুক্ত এমন একজন লোক আমার কাছে পাঠান যাকে আমি আমার সঙ্গী ও কথা বলার লোক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।' হাজ্জাজ শা'বীকে পাঠালেন। আস্তে আস্তে তিনি খলীফার ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে পরিগণিত হন। জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে খলীফা তাঁর জ্ঞান ও মতামত থেকে উপকৃত হতে থাকেন। বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাদের নিকট তাঁর দূত হিসেবেও পাঠাতে থাকেন। একবার খলীফা তাঁকে দূত হিসেবে রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ানের নিকট পাঠান। তিনি রোমান সম্রাটের দরবারে পৌঁছে খলীফার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সম্রাট তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তা দেখে অভিভূত হন এবং তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতা, জোরালো বাকপটুতা ও তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর ক্ষমতা তাঁকে বিস্মিত করে। শা'বীর দূতিয়ালী শেষ হওয়ার পর সম্রাট বিদেশী দূতদের সাথে তাঁর স্বাভাবিক আচরণের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তাঁকে আরো কিছু দিন নিজের কাছে রেখে দেন। কিছু দিন সম্রাটের সাথে কাটানোর পর তিনি দিমাশকে ফেরার অনুমতি দানের জন্য সম্রাটকে বার বার অনুরোধ জানাতে থাকেন। একদিন রোমান সম্রাট তাঁকে প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি

---

[৬৬] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮২

[৬৭] তাবাকাত-৬/১৭৩

আপনাদের দেশের রাজপরিবারের একজন সদস্য? জবাবে তিনি বললেন : না। আমি আমার দেশের সাধারণ মুসলমান নাগরিকদের একজন। একদিন সম্রাট তাঁকে দেশে ফেরার অনুমতি দিলেন। যাত্রাকালে তাঁকে বললেন : দেশে ফিরে আপনি যখন আপনার বন্ধুকে (আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান) আপনার দূতিয়ালীর সব কথা জানাবেন তখন তাঁকে এই চিঠিটি দিবেন।

শা'বী দিমাশ্‌কে ফিরে এসে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং জাস্টিনিয়ানের দরবারে যা কিছু শুনেছেন ও দেখেছেন তার বর্ণনা দিলেন। খলীফা তাঁকে যেসব প্রশ্ন করলেন তারও জবাব দিলেন। তারপর উঠার সময় খলীফাকে বললেন : আমীরুল মু'মিনীন, রোমান সম্রাট আপনাকে এই চিঠিটি দিয়েছেন। একথা বলে চিঠিটি খলীফার হাতে দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

খলীফা চিঠিটি পড়ার পর চাকরদের বললেন : শা'বীকে ফিরিয়ে আন। তারা তাঁকে ফিরিয়ে খলীফার কাছে নিয়ে গেল। তিনি শা'বীকে বললেন : আচ্ছা, এই চিঠির বিষয়বস্তু কি আপনার জানা আছে? শা'বী বললেন : আমীরুল মু'মিনীন, আমার জানা নেই। খলীফা বললেন : রোমান সম্রাট আমাকে লিখেছেন : আমি আরবদের ব্যাপারে বিস্মিত হয়েছি যে, তারা এই যুবক ছাড়া অন্য এক ব্যক্তিকে তাদের রাজা বানালো কিভাবে?

শা'বী খুব দ্রুত বললেন : আপনাকে দেখেননি, তাই একথা বলেছেন। দেখলে আর এমন কথা বলতেন না। আর আমি এই চিঠির মর্ম আগে জানতে পারলে নিয়ে আসতাম না। খলীফা শা'বীকে লক্ষ্য করে বললেন : রোমান সম্রাট চিঠিতে একথা লিখলেন কেন, তাকি জানেন? শা'বী জবাব দিলেন, আমীরুল মু'মিনীন, আমি জানিনে। খলীফা বললেন : তিনি এই লেখার দ্বারা আপনার প্রতি আমাকে ঈর্ষান্বিত করে তুলতে চেয়েছেন। ফলে আমি আপনাকে হত্যা করে আপনার থেকে মুক্ত হই, তাই বুঝাতে চেয়েছেন। একথা রোমান সম্রাটের কাছে পৌঁছলে তিনি মন্তব্য করেন : তাঁর পিতার সর্বনাশ হোক! আমি এছাড়া আর কিছুই বুঝাতে চাইনি।[৬৮]

উমাইয়্যা শাসকদের সাথে তাঁর এ সম্পর্ক বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। হাজ্জাজ ও 'আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে ইবনুল আশ'আছের বিদ্রোহের সময় তিনি ইবনুল আশ'আছকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেন। এই ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন যে, হাজ্জাজ আমাকে আমার গোত্রের, তথা গোটা হামাদান এলাকার দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন। আমার বেতনও নির্ধারণ করে দেন। ইবনুল আশ'আছের বিদ্রোহ ও সংঘাত-সংঘর্ষ পর্যন্ত তাঁর নিকট আমার একটা স্থান ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল। ইবনুল আশ'আছের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের এক পর্যায়ে কূফার কারীদের (কুরআনের পাঠ বিশেষজ্ঞ) পক্ষ থেকে কিছু লোক আমার কাছে এসে বলেন : আপনি হলেন কারীদের নেতা। আপনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁরা এত পীড়াপীড়ি করলেন যে, আমি তাঁদের পাশে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম।

---

[৬৮] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৪৪; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮৫

রণক্ষেত্রে সৈন্যদের সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে হাজ্জাজের দোষ-ক্রটি ও অপকর্মের বর্ণনা করে সৈন্যদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ক্ষেপিয়ে তুলতাম।[৬৯]

'দিয়ারে জামাজিম' যুদ্ধে ইবনুল আশ'আছের শোচনীয় পরাজয় হয় এবং তাঁর বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এ সময় শা'বী আত্মগোপন করেন। একটি বর্ণনা এমন আছে যে, তিনি হাজ্জাজের ঘাতক বাহিনীর ভয়ে একাধারে নয় মাস ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন। নয় মাস পরে কুতাইবা ইবন মুসলিম খুরাসানে সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন এবং মানুষকে তাঁর বাহিনীতে যোগদানে উৎসাহিত করার জন্য ঘোষণা দেন যে, কোন্ ব্যক্তি এই বাহিনীতে ভর্তি হলে তার অতীতের সকল অপরাধ ক্ষমা করা হবে। এই ঘোষণার পর শা'বী কুতাইবার এই বাহিনীতে যোগ দেন। তিনি ফারগানা পৌছলেন। কুতাইবা তাঁকে চিনতেন না। একদিন কুতাইবা সৈনিকদের একটি সাধারণ মজলিসে বসে আছেন। তখন শা'বী তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে জ্ঞান চর্চার সাথে নিজের সম্পৃক্ততার কথা জানিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে আমি আপনার সেবায় লাগতে পারি। কুতাইবা প্রশ্ন করলেন, আপনি কে? কুতাইবা শা'বীকে চাক্ষুস না দেখলেও নামে চিনতেন। এ কারণে, শা'বী তাঁর প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান। কুতাইবাও আর তা জানার জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না। তাঁর অগ্রাভিযানের বিস্তারিত খবর মাঝে মাঝে লিখে হাজ্জাজকে জানাতে হতো। তখন তিনি শা'বীকে তার একটা খসড়া তৈরীর নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, খসড়া তৈরীর প্রয়োজন নেই। তিনি সেখানে বসেই মৌখিক ডিকটেশন দিয়ে সুন্দর একটা রিপোর্ট লিখিয়ে দেন। এই রিপোর্ট কুতাইবার খুব পছন্দ হয়। বিনিময়ে তিনি শা'বীকে একটি খচ্চর ও দামী চাদর উপহার দেন। এরপর থেকে খুব সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাঁর দিনগুলো কাটতে থাকে। কুতাইবা তাঁকে সাথে নিয়ে একই দস্তরখানায় বসে রাতের খাবার খেতেন।

শা'বীর রচনা-রীতির সাথে হাজ্জাজ পরিচিত ছিলেন। কুতাইবার পাঠানো রিপোর্টটি দেখে তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন যে, এর লেখক শা'বী ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। তাই তিনি সেই মুহূর্তে কুতাইবাকে লিখলেন যে, তোমার এই রিপোর্টের লেখক শা'বী। তাঁকে এখনই গ্রেফতার কর। যদি তিনি পালিয়ে যান তাহলে তোমাকে পদচ্যুত করে তোমার হাত-পা বিচ্ছিন্ন করে দিব। হাজ্জাজের এ আদেশ পাঠ করে কুতাইবা শা'বীকে বললেন, আপনি এখনো আমার কাছে অপরিচিত। আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আপনি যেখানে যেতে চান, চলে যান। আমি হাজ্জাজের সামনে যত রকমের কসম খাওয়ার প্রয়োজন হয়, কসম খাব। শা'বী বললেন, আমি যেখানেই চলে যাই না কেন, আমার মত মানুষ গোপন থাকতে পারে না। কুতাইবা বললেন, কি করলে ভালো হবে সেটা আপনিই ভালো বুঝবেন। মোটকথা, শা'বীর আত্মগোপনের অস্বীকৃতির প্রেক্ষিতে কুতাইবা তাঁকে হাজ্জাজের নিকট পাঠিয়ে দেন। ওয়াসিত নগরের কাছাকাছি পৌছে তাঁর হাত-পায়ে বেড়ী

---

৬৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪

লাগানো হয়। কূফা পৌঁছার পর ইয়াযীদ ইবন আবূ মুসলিম তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি তাঁকে বলেন, আবূ 'আমর! যখন আপনাকে হাজ্জাজের সামনে উপস্থাপন করা হবে তখন আপনি তাঁর সাথে এভাবে আচরণ করবেন এবং এই এই কথা বলবেন আশা করা যায় আপনার জীবন বেঁচে যাবে। অতঃপর বেড়ী বাঁধা অবস্থায় তাঁকে হাজ্জাজের সামনে হাজির করা হয়।[৭০]

অপর একটি বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে এসেছে : 'দিয়ারে জামাজিম' যুদ্ধের পর শা'বী দীর্ঘদিন যাবত আত্মগোপন করে থাকেন। এ অবস্থায় তিনি ইয়াযীদ ইবন আবূ মুসলিমকে লেখেন যে, আপনি হাজ্জাজের সাথে আমার একটা আপোসরফার ব্যবস্থা করুন। জবাবে তিনি বলেন, আমার এত দুঃসাহস নেই। আমার পরামর্শ হলো, আপনি নিজেই চলে আসুন এবং সাধারণ মানুষের সাথে বৈঠকের সময় হঠাৎ আমীরের সামনে উপস্থিত হয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আমি এতটুকু অঙ্গীকার করছি যে, আপনি যে কোন বিষয় ও ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী মানলে আপনাকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য দিব।

শা'বী এই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। একদিন হঠাৎ হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত হন। হাজ্জাজ দেখেই বলে ওঠেন- ভাই শা'বী যে! তারপর হাজ্জাজ তাঁর সামনে তাঁর প্রতি কৃত অতীতের সকল অনুগ্রহ ও অনুকম্পার কথা একটি একটি করে শুনতে থাকেন। আর শা'বীও সব কথা স্বীকার করে চলেন। শেষে হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করেন, আপনি 'আদুওউর রহমান অর্থাৎ রহমানের শত্রু (আবদুর রহমান ইবন আশ'আছ)-এর সংগে গেলেন কেন? শা'বী নিজের ভুল স্বীকার করে অনুশোচনা প্রকাশ করেন। হাজ্জাজ তাঁকে ক্ষমা করে দেন।[৭১]

হযরত 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীযের (রা) খিলাফতকালে কূফার ওয়ালী ইবন হুবাইরা শা'বীকে কাজী নিয়োগ করেন। ইবন হুবাইরা তাঁকে নৈশ আলাপের সঙ্গী করতে চান। শা'বী বলেন : আমাকে হয় বিচার কাজ অথবা নৈশ আলাপ- যে কোন একটির দায়িত্ব দিন।[৭২]

হিজরী ১০৩, মতান্তরে ১০৪ সনে তিনি আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। অনেকের মতে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাত্তর (৭৭) বছর। তবে সাতাত্তর বছরের এ মতটি সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ, তিনি নিজেই বলতেন, আমি হিজরী ১৭ সনে সংঘটিত জালূলা' যুদ্ধের বছর জন্মগ্রহণ করি।[৭৩] হিজরী ১০৩ অথবা ১০৪ সনে মৃত্যুবরণ করলে তিনি আশি বছরের উর্ধ্বে জীবন লাভ করেছিলেন। আর একথাই বলেছেন, ডক্টর আবদুর

---

[৭০] প্রাগুক্ত-১/৮৪-৮৫

[৭১] আল-'ইকদ আল ফারীদ-২/১৭৭, ৫/৩২, ৫৫; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/৩৪৪

[৭২] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৮

[৭৩] প্রাগুক্ত-১/৮৪

রহমান রা'ফাত আল-বাশা।[৭৪] তাঁর মৃত্যুর খবর হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) নিকট পৌঁছলে তিনি মন্তব্য করেন : 'আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন! তিনি ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী এবং সীমাহীন ধৈর্যশীল এক মানুষ ছিলেন। তিনি ইসলামের এক বিশেষ মর্যাদার স্থানে অবস্থান করছেন।

শা'বী যখন কাজী তখন একদিন তাঁর দরবারে একজন পুরুষ ও তার স্ত্রী তাদের ঝগড়া-কলহের নিষ্পত্তির জন্য এলো। স্ত্রী ছিল পরমা সুন্দরী। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলো। স্ত্রী তার বক্তব্যের সপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করলো। শা'বী স্বামীকে বললেন : তোমার স্ত্রীর যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডন করার মত তোমার কোন কিছু আছে কি? লোকটি তখন নিম্নের শ্লোকগুলো আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলো :[৭৫]

فُتِنَ الشَّعْبِىُّ لَمَّا   رَفَعَ الطَّرْفَ إِلَيْهَا
فَتَنَتْهُ بِدَلاَلٍ   بِخَطَّىْ حَاجِبَيْهَا
قَالَ لِلْجِلْوَازِ قَرِّبْ   بِهَا وَاحْضُرْ شَاهِدَيْهَا
فَقَضَى جَوْرًا على الخصم   وَلم يَقْضِ عَلَيْهَا
كَيْفَ لَو أَبْصَرَ مِنْهَا   نَحْرَهَا أَوْسَاعِدَيْهَا
لَصَبَا حَتى تَرَاهُ   سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهَا.

– শা'বী যখন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে, মুগ্ধ হয়ে গেছে।
– সে তাকে আকৃষ্ট করেছে তার দু'ভুরুর দু'টি রেখার মন-ভোলানো সঞ্চালন দ্বারা।
– তিনি পুলিশকে বলেন, মহিলাকে নিকটে নিয়ে এসো এবং তার দু' সাক্ষীকে উপস্থিত কর।
– তিনি মহিলার বিরুদ্ধে রায় না দিয়ে তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিলেন।
– তিনি যদি তার বুক ও বাহু দু'খানি দেখতেন তাহলে কি করতেন?
– তিনি তার প্রতি এত প্রেমাসক্ত হয়ে পড়তেন যে, তুমি তাঁকে মহিলার সামনে সিজদাবনত অবস্থায় দেখতে পেতে।

শা'বী বলেছেন, এ ঘটনার পর একবার আমি খলীফা আবদুল মালিকের নিকট গেলাম। তিনি আমাকে দেখা মাত্র একটু হেসে দিয়ে এই কবিতার প্রথম শ্লোকটি আবৃত্তি করে আমাকে প্রশ্ন করেন : এই শ্লোকগুলোর আবৃত্তিকারীর সাথে আপনি কেমন আচরণ করেছিলেন। আমি বললাম : হে আমীরুল মু'মিনীন! এজলাসের মধ্যে আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন

---

[৭৪] সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৮২

[৭৫] ইমাম আছ-ছা'আলিবী এই ঘটনাটি তাঁর 'আত-তামছীল ওয়াল মুহাদারা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং কবিতাটি আল-মুতাওয়াককিল আল-লায়ছীর প্রতি আরোপ করেছেন। (আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-১/৯১, টীকা-৯)

করা এবং আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কারণে আমি তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়েছি। খলীফা মন্তব্য করলেন : আপনি ঠিক কাজটি করেছেন।[৭৬]

শা'বীর বহু উপদেশমূলক বাণী বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে থাকতে দেয়া যায়। যেমন তিনি বলতেন : দুনিয়াও আমাদের দৃষ্টান্ত আমি এই ছাড়া আর কিছু দেখি না, যেমন কবি কুছায়্যির ইবন 'আয্যাহ্ বলেছেন :

أَسِيْئِ بِنَا أَو أَحْسِنِى لاَمَلُوْمَةً + لَدَيْنَا وَلاَمَقْلِيَّةً إِنْ تَقَلَّتِ.

– আমাদের সাথে খারাপ অথবা ভালো আচরণ যাই কর না কেন, আমরা তিরস্কার করবো না। আর তুমি ঘৃণা করলেও আমরা ঘৃণা করবো না।[৭৭]

তিনি বলতেন, সত্য ও সততাকে সব সময় ধারণ করবে। যেখানে দেখবে এতে তোমার ক্ষতি হচ্ছে, আসলে তাতে তোমার লাভ হবে। আর মিথ্যাকে সব সময় পরিহার করবে। কোথাও হয়তো দেখবে মিথ্যা বলাতে তোমার লাভ হচ্ছে, আসলে তা তোমার ক্ষতি করবে।[৭৮]

আশ-শা'বী অনেক উপদেশমূলক প্রতীকী গল্প-কাহিনীও বলতেন। ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেন : শা'বী বলতেন, বনী ইসরাইলে একজন মূর্খ 'আবিদ ব্যক্তি ছিল। সে দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে একটি গির্জায় বৈরাগ্য জীবন যাপন করতো। তার একটি গাধা ছিল। গাধাটি গির্জার চত্বরে চরতো, আর সে গির্জায় বসে বসে পাহারা দিত। একদিন দেখে গাধাটি চরছে, তখন সে আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বলতে থাকে : হে আমার প্রতিপালক! তোমার যদি একটা গাধা থাকতো তাহলে আমি আমার গাধার সাথে সেটি চরাতে পারতাম। তাতে আমার কোন কষ্ট হতোনা। একথা সে যুগে তাদের সম্প্রদায়ে যে নবী ছিলেন তাঁর কানে গেল। তিনি 'আবিদের প্রতি খুব বিরক্ত হলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন নবীকে ওহীর মাধ্যমে বললেন, তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। প্রত্যেকটি মানুষকে তার বুদ্ধি অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে।[৭৯]

---

৭৬. প্রাগুক্ত-১/৯১-৯২

৭৭. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৭৬; 'উয়ূন আল-আখবার-২/৭০৪

৭৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/১৯৯

৭৯. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৬/১৬৪

কাজী শুরায়হ ইবন আল-হারিছ (রহ)

আবূ উমাইয়্যা শুরায়হ-এর পিতার নাম আল-হারিছ ইবন কায়স। তাঁর বংশের উর্ধ্বতন পুরুষ মারতা' ইবন কিন্দাহ্। তাই তিনি কিন্দী হিসেবে পরিচিত। তবে তাঁর নসবনামার উপরের দিকের কিছু নামের ব্যাপারে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। একটি বর্ণনা এমনও আছে যে, শুরায়হ আরব বংশজাত ছিলেন না। বরং তিনি ঐসব অনারব খান্দানের লোক ছিলেন যারা কিন্দাহ্র সাথে মৈত্রীচুক্তি করে ইয়ামনে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে।[১]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় হযরত শুরায়হ-এর জন্ম হয়। কোন কোন বর্ণনা মতে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কিন্তু এসব বর্ণনা সঠিক নয়। সেই সময়ে তিনি মুসলমান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তবে হযরত রাসূলে পাকের দীদার লাভের পরম সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত থেকে যান। আল্লামা ইবন হাজার আল-'আসকালানী একথাই বলেছেন। তিনি লিখেছেন, চার খলীফার যুগে শুরায়হ-এর জীবনের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কোন ঘটনা দেখা যায় না যা দ্বারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়।[২] ইবন সা'দ, ইবন 'আবদিল বার্র সহ আরো অনেক সীরাত বিশেষজ্ঞ এমন কথাই বলেছেন। তাঁরা শুরায়হকে তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য করেছেন। তবে তাবি'ঈদের মধ্যে তিনি ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে একজন বিখ্যাত কাজী।

হযরত শুরায়হ (রহ) রাসূলুল্লাহর (সা) বহু সাহাবীর সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভ করেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন স্বভাবগতভাবে তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।[৩] এ কারণে জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি তাঁর সমকালীনদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার স্থান লাভ করেন। ইমাম নাওবী বলেন : শুরায়হর মেধা, বিশ্বস্ততা, দীনদারী, মহত্ত্ব ও মর্যাদা এবং তাঁর বর্ণনাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে সবাই একমত।[৪] হাফেজ সাফি'উদ্দীন খাযরাজী লিখেছেন যে, তিনি ছিলেন অতি মর্যাদাবান ও তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন 'আলিমদের একজন।[৫]

সেকালে বসরায় বহু খ্যাতিমান হাফেজে হাদীছ ছিলেন। তিনিও ছিলেন তাঁদের একজন। হযরত 'উমার, 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, যায়দ ইবন ছাবিত (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। ইমাম শা'বী, আবূ ওয়ায়িল কায়স

---

[১] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৬১, টীকা-১; সিফাতুস সাফওয়া-৩/২০

[২] আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা-২/২০২

[৩] আল-ইসতী'আব-২/৬৭

[৪] তাহ্যীব আল-আসমা'-১/২৪৪

[৫] তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-৬/৬৫

ইবন আবী হাযিম, ইবন সীরীন, 'আবদুল 'আযীয ইবন রাফী', মুজাহিদ ইবন জুবায়র, 'আতা' ইবন সায়িব, আনাস ইবন সীরীন, ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ (রহ)-এর মত ইমামগণ ছিলেন তাঁর হাদীছের ছাত্র।[৬]

হযরত শুরায়হ যদিও হাদীছের হাফেজ ছিলেন তথাপি তাঁর পঠন-পাঠনের বিশেষ শাস্ত্র ছিল ফিকাহ্। ইমাম যাহাবী, ইবন হাজার ও অন্যরা ফিকাহ্কে তাঁর বিশেষ শাস্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর নামের সাথে 'ফকীহ্' উপাধিটি লিখেছেন।[৭] তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রের কেন্দ্রস্থল কূফার ইফতা পরিষদের সদস্য ছিলেন।[৮]

হাদীছ ও ফিকাহ্ শাস্ত্র ছাড়াও তৎকালীন আরবে বহুল প্রচলিত ইলমে কিয়াফা (হস্তরেখা বিদ্যা) ও কাব্য শাস্ত্রে তাঁর বুৎপত্তি ছিল।[৯] কাব্য শাস্ত্রে তাঁর বুৎপত্তি এত পরিমাণ ছিল যে, একবার তিনি তাঁর একটি বিচারের রায় কবিতায় দান করেন। ঘটনাটি এই রকম। এক মহিলার স্বামী একটি পুত্র সন্তান রেখে মারা যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর সে দ্বিতীয় বিয়ে করে। সে ছেলেকে নিজের কাছে আটকে রাখে এবং তার অভিভাবকত্বের দাবীতে অটল থাকে। আর মহিলার শ্বাশুড়ী অর্থাৎ ছেলেটির দাদীর দাবী ছিল, যেহেতু ছেলের মা দ্বিতীয় বিয়ে করেছে, তাই ছেলের অভিভাবকত্ব সে পেতে পারে না। দাদী তার দাবী একটি কবিতায় এভাবে উপস্থাপন করে :

يا أبا أمية أتيناك   وأنت المرأ نأتيه
اتاك ابنى وأماه   وكلتا نا نفديه
تزوجت فها تيه   ولايذهب بك التيه
فلو كنت تايمت   مما نازعتنى فيه
ألا يا ايها القاضى   هذه قصتى فيه

– আবূ উমাইয়্যা! আমরা ন্যায়বিচার লাভের উদ্দেশ্যে আপনার নিকট এসেছি। আপনি এমন এক ব্যক্তি যাঁর নিকট আমরা এসে থাকি।

– আমার পুত্র (পৌত্র) ও তার মা আপনার নিকট এসেছে এবং আমরা উভয়ে তার জন্য উৎসর্গকৃত।

– (পুত্রবধূকে লক্ষ্য করে) যখন তুমি দ্বিতীয় বিয়ে করেছো তখন ছেলেকে আমার নিকট দিয়ে দাও। বাড়াবাড়ি করো না।

– দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের পর তুমি তার ব্যাপারে আমার সাথে বিবাদ করছো কেন?

– (কাজী সাহেবকে লক্ষ্য করে) ওহে কাজী, ছেলের ব্যাপারে আমাদের দুইজনের কাহিনী এটাই।

---

৬. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/২৪৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৯

৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫১

৮. আ'লাম আল-মুওয়াক্কা'ঈন-১/২৭

৯. তাবাকাত-৬/৯০; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১৫

পুত্রবধূ শ্বাশুড়ীর দাবীর প্রেক্ষিতে নিম্নের এ জবাব দেয় :

يا ايها القاضى قد قالت لك الجده
وقولا فاسمتع منى ولاتبطرنى رده
اعزى لنفسى عن ابنى وكبدى حملت كبده
فلما كان فى حجرى يتيما ضائعًا وحده
تزوجت رجاء والخير من يكفينى فقده
ومن يظهرلى وده ومن يكفل لى رفده.

– ওহে কাজী! দাদী অর্থাৎ আমার শ্বাশুড়ী আপনাকে তাঁর কথা বলেছেন। এখন আমার কিছু কথাও আপনি শুনুন এবং তা প্রত্যাখ্যান করবেন না। আমি আমার ছেলের দ্বারা নিজের অন্তরকে সান্ত্বনা দেই। আমি সব সময় তার কলিজার সাথে আমার কলিজা লাগিয়ে রাখি। বৈধব্য জীবনে আমার কোলে একাকীত্বের কারণে তার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল, এ কারণে তার কল্যাণ এবং তার তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে আমি এমন এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেছি যে তাকে ধ্বংস হতে দেবে না এবং তার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

যেহেতু শ্বাশুড়ী ও পুত্রবধূ দু'জনই কবিতায় তাদের দাবী ও বক্তব্য উপস্থাপন করে। এ কারণে কাজী শুরায়হও কবিতায় তাঁর রায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন :

قد فهم القاضى ما قلتما وقضى بينكما ثم فصل
بقضاء بين بينكما وعلى القاضى جهد أن عقل
قال لجده بينى بالصبى وخذى ابنك من ذات العلل
انها لوصبرت كان لها قبل دعواها تبغيها البدل

– তোমরা দু'জন যা কিছু বলেছো কাজী তা বুঝতে পেরেছেন এবং তোমাদের দু'জনের মধ্যে একটি স্পষ্ট ফায়সালা দান করেছেন। যদি কাজী বুদ্ধিমান হন তাহলে সত্য উদঘাটনের জন্য তাঁর চেষ্টা করা ফরজ। তিনি দাদীকে বলছেন, ছেলেকে এই বাহানার আশ্রয় গ্রহণকারী মার নিকট থেকে নিয়ে পৃথক হয়ে যাও। যদি সে দ্বিতীয় বিয়ে না করতো, ছেলে তার কাছেই থাকতো।[১০]

বর্ণিত হয়েছে, কাজী শুরায়হর দশ বছর বয়সী একটি ছেলে খেলাধুলার প্রতি ভীষণ আসক্ত ছিল। ফলে পড়া-লেখার প্রতি ছিল দারুণ অমনোযোগী। একদিন সে স্কুল থেকে পালিয়ে কুকুর নিয়ে খেলতে শুরু করে। বাড়ীতে ফিরে এলে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কি

---

১০. তাবাকাত-৬/৯৪

নামায পড়েছো? সে জবাব দেয় : না। তখন কাজী সাহেব কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসে যান। ছেলেকে কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে সে কথা কবিতায় সুন্দর করে তুলে ধরেন।[১১]

একজন কাজীর জন্য যেসব গুণ ও যোগ্যতার প্রয়োজন হয় তার সবই শুরায়হর সত্তায় পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী, বিচক্ষণ, চালাক ও ভীষণ সমঝ-বুঝের অধিকারী মানুষ।[১২] জটিল থেকে জটিলতর এবং মারাত্মক প্রতারণামূলক বিষয়েরও একেবারে গভীরে গিয়ে সত্য বের করে আনতেন। এসব গুণ তাঁর মধ্যে বিচার-ফায়সালার চূড়ান্ত যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যে 'আলীর (রা) প্রশংসায় বলেছেন : اَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ – তাদের মধ্যে 'আলী সবচেয়ে বড় কাজী। সেই 'আলী (রা) শুরায়হর সম্পর্কে বলেছেন– أَقْضَى الْقَرَبِ – তিনি আরবের সবচেয়ে বড় কাজী।[১৩]

কাজী হিসেবে নিয়োগ লাভের পূর্বেই তিনি বিচার কার্যের যোগ্যতা ও দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করে ফেলেছিলেন। মানুষ তাদের বিভিন্ন বিবদমান বিষয়ে তাকে সালিশ নিয়োগ করতো। আর এরই প্রেক্ষিতে হযরত 'উমার (রা) তাঁর রায় দেখে তাঁকে কূফার কাজী নিয়োগ করেন। ঘটনাটি এ রকম : হযরত 'উমার (রা) এক ব্যক্তির নিকট থেকে এই শর্তে একটি ঘোড়া ক্রয় করলেন যে, ঘোড়ার চলন ও আচরণ পরীক্ষা করে পছন্দ হলে নিবেন, অন্যথায় ফেরত দিবেন। তারপর পরীক্ষার জন্য তিনি ঘোড়াটিকে একজন দক্ষ সোয়ারীর হাতে দেন। সোয়ারী চালানোর সময় হোঁচট খেয়ে ঘোড়াটি দাগী হয়ে যায়। হযরত 'উমার (রা) ঘোড়াটি ফেরত দিতে চান, কিন্তু ঘোড়ার মালিক তা ফেরত নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে উভয়ের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। অবশেষে শুরায়হকে সালিশ মানা হয়। তিনি এই রায় দেন যে, যদি ঘোড়ার মালিকের অনুমতি নিয়ে সোয়ারী করা হয়ে থাকে তাহলে ঘোড়া ফেরত দেওয়া যেতে পারে, অন্যথায় নয়।[১৪]

অপর একটি বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে এসেছে যে, পরীক্ষামূলক চালনার সময় ঘোড়াটি মারা যায়। এ অবস্থায় হযরত 'উমার (রা) মৃত ঘোড়টি মালিককে ফেরত দিতে চান। এতে বিবাদ দেখা দেয়। মীমাংসার জন্য শুরায়হ সালিশ মনোনীত হন। তিনি রায় দেন এভাবে : যা ক্রয় করা হয়েছে তা নিতে হবে, অথবা যে অবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে সেই অবস্থায় ফেরত দিতে হবে। এই রায়ের পর 'উমার (রা) মন্তব্য করেন : 'বিচার তো একেই বলে। সঠিক সিদ্ধান্ত, যার মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তি নেই।' এই বিচারের পর হযরত 'উমার (রা) তাঁকে কূফার কাজী নিয়োগ করেন।[১৫]

---

[১১] সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১২১-১২২
[১২] আল-ইসতী'আব-২/৬৭
[১৩] তাহ্যীব আল-আসমা'-১/২৪৩
[১৪] কিতাব আওয়ায়িল, আল-বাব আস-সাবি'–যিক্‌রুল কুজাত।
[১৫] তাবাকাত-৬/৯১; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১১২

ইমাম শা'বী বলেন : 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) নিয়োগকৃত ইরাকের প্রথম কাজী ছিলেন সালমান ইবন রাব'আ আল-বাহিলী। তিনি কাদিসিয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং তথাকার কাজী হন। তারপর তাঁকে মাদায়েনের কাজী নিয়োগ করা হয়। কিছু দিন পর 'উমার (রা) তাঁকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে আবূ কুররা আল-কিন্দীকে নিয়োগ করেন। তারপর কূফা শহরের পত্তন হলে আবূ কুররা হন তথাকার কাজী। তারপর 'উমার (রা) শুরায়হ ইবন আল-হারিছ আল-কিন্দীকে আবূ কুররার স্থলে কাজী হিসেবে নিয়োগ দেন। তারপর ষাট বছর যাবত সেখানে তিনি কাজীর দায়িত্ব পালন করেন। মাখঝানে এক বছরের জন্য যিয়াদ তাঁকে বসরায় পাঠান এবং তাঁর স্থলে মাসরূক ইবন আল-আজদা' কাজীর দায়িত্ব পালন করেন। শুরায়হ ফিরে এলে আবার তাঁকে কূফার কাজী নিয়োগ করা হয় এবং 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) সংঘাত-সংঘর্ষ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কূফা আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার সময় তিনি স্বেচ্ছায় কাজীর দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) অন্য এক ব্যক্তিকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করেন এবং তিনি তিন বছর কূফার বিচার কাজ পরিচালনা করেন। ইবন যুবায়র (রা) নিহত হওয়ার পর শুরায়হ আবার কূফার কাজী হন। তিনি কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এ সময় একদিন এক ব্যক্তি পথে কাজী শুরায়হর সঙ্গে দেখা করে বললো : আল্লাহর কসম! আবূ উমাইয়্যা, আপনি অন্যায়ভাবে বিচার করছেন। তিনি জানতে চাইলেন : কিভাবে? লোকটি বললো : আপনার বয়স অনেক হয়েছে, আপনার বুদ্ধি-জ্ঞানে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে এবং আপনার ছেলে ঘুষ খায়। সুরায়হ বললেন : ঠিক আছে, তোমার পরে আমাকে আর কেউ একথা বলতে পারবে না। এপর হাজ্জাজের নিকট আসেন এবং বলেন : আল্লাহর কসম! আমি আর বিচারকের দায়িত্ব পালন করবো না। হাজ্জাজ বললেন : আপনার স্থলে অন্য এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করে না দেওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে অব্যাহতি দেব না। শুরায়হ বললেন : আপনি আবূ বুরদা ইবন আবী মূসাকে নিয়োগ করুন। তিনি একজন ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন মানুষ। হাজ্জাজ তাঁকে শুরায়হর স্থলে নিয়োগ করেন এবং তাঁর সহযোগী ও সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োগ করেন সা'ঈদ ইবন যুবায়রকে।'[১৬]

কাজী শুরায়হ এমন যোগ্যতা, দক্ষতা, চমৎকার পদ্ধতি ও আমানতাদীর সাথে তাঁর এ দায়িত্ব পালন করেন যে, হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকাল থেকে নিয়ে উমাইয়্যা খলীফা 'আবদুল মালিকের সময়কাল পর্যন্ত একাধারে প্রায় ষাট বছর যাবত কাজীর পদে বহাল থাকেন। এ দীর্ঘ সময়ে অনেক বড় বড় বিপ্লব ও ঘটনাবলী সংঘটিত হয়, খিলাফতে রাশেদার সোনালী যুগের সমাপ্তির পর উমাইয়্যা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, উমাইয়্যা শাসক ও 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। মোটকথা, গোটা ইসলামী দুনিয়ায় এক বিপ্লব ঘটে যায়। এত কিছু সত্ত্বেও শুরায়হ যথারীতি কাজীর পদে বহাল থাকেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) ও 'আবদুল

---

১৬. 'উয়ূন আল-আখবার-১/১০১

মালিকের মধ্যে যুদ্ধের সময় মাত্র কয়েকটি বছরের জন্য নিজেকে বিচার কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।[১৭]

খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি কাজী শুরায়হকে একটি দিকনির্দেশনামূলক চিঠি লেখেন। তাতে তিনি বলেন : 'বিচার কাজ চলাকালে কারো প্রতি ইঙ্গিত করবে না, কারো প্রতি ভ্রুকুটি করবে না, কারো ক্ষতি করবে না, কোন কিছু ক্রয়-বিক্রয় করবে না, এবং উত্তেজিত অবস্থায় বিচার কাজে বসবে না।[১৮]

একজন কাজীর সবচেয়ে বড় কর্তব্য এবং সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি বিচারের ক্ষেত্রে বাইরের ও ভিতরের কোন প্রকার প্রভাবে প্রভাবিত হবেন না এবং কোন অবস্থাতেই সত্য ও ন্যায় বিচার থেকে দূরে ছিটকে পড়বেন না। শুরায়হর মধ্যে এ গুণ এত পরিমাণ ছিল যে, তিনি আইন, সত্য ও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কারো পরোয়া করতেন না- তা সে যত বড় ক্ষমতাধর ব্যক্তিই হোক না কেন। একজন অতি সাধারণ মানুষের সাথে আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) বিবাদে তিনি যে ঐতিহাসিক রায়টি দান করেছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তাঁর ছেলেও আইনের আওতায় পড়ে যেত, তাকেও কোন রকম রেহাই দিতেন না। একবার তাঁর এক ছেলে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিনদার হয়। উক্ত ব্যক্তি জামিন পেয়ে ফেরার হয়ে যায়। কাজী শুরায়হ তার জামিনদার নিজের ছেলেকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেন। একবার তাঁর আর্দালী এক ব্যক্তিকে চাবুক মারে। বিচারে তিনি প্রহৃত ব্যক্তির দ্বারা তাকে সমপরিমাণ চাবুক মারান।[১৯]

একবার তাঁর খান্দানের এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির উপর একটু নির্যাতন চালায়। তিনি তাঁকে গ্রেফতার করে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন। যখন তিনি বিচার কাজ শেষ করে উঠতে যাচ্ছেন তখন সেই অভিযুক্ত লোকটি তাঁকে কিছু কথা বলতে চায়। জবাবে তিনি বলেন, আমাকে কিছু বলার এবং তোমার কথা শোনার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, আমি তোমাকে গ্রেফতার করিনি, বরং সত্য ও ন্যায়বিচার তোমাকে গ্রেফতার করেছে।[২০]

হযরত শুরায়হ-এর এই 'আদল ও ইনসাফ কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। তাঁর জীবনের এমন বহু ঘটনা আছে যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। তাঁর এক ছেলে এবং অন্য এক ব্যক্তির মধ্যে কোন একটি অধিকারের ব্যাপারে বিবাদ ছিল। ছেলে পিতাকে বিষয়টি অবহিত করে বলে, আপনি যদি মনে করেন রায় আমার পক্ষে আসবে তাহলে আমি মামলা দায়ের করি, অন্যথায় চুপ থাকি। শুরায়হ মামলাটির গুণগত দিক নিয়ে গভীরভাবে ভাবার পর ছেলেকে মামলা দায়েবের পরামর্শ দেন। কিন্তু তাঁর এজলাসে

---

[১৭] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২২৪

[১৮] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/১৫০

[১৯] তাবাকাত-৬/৯২, ৯৫

[২০] প্রাগুক্ত-৬/৯৩

যখন মামলাটি উঠেলো, তিনি ছেলের বিপক্ষে রায় দিলেন। আদালত থেকে ঘরে ফেরার পর ছেলে পিতাকে বললো, যদি আমি পূর্বেই আপনার সাথে পরামর্শ না করতাম তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ থাকতো না। কিন্তু মামলা দায়েরের পরামর্শ দিয়ে আপনি আমাকে অপমান করেছেন। শুরায়হ বললেন, আমার ছেলে! দুনিয়ার সব মানুষের চেয়ে তুমি আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয়। কিন্তু তোমার চেয়ে মহান আল্লাহ্ আমার অধিক প্রিয়। যখন তুমি আমার সাথে পরামর্শ করলে তখন মামলার ধরন দেখে বুঝলাম রায় তোমার বিপক্ষে যাবে। যদি আমি তখন তা তোমার কাছে প্রকাশ করে দিতাম তাহলে তুমি তাদের সাথে আপোষ-মীমাংসা করে নিতে। আর এতে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হতো।[২১]

তিনি বাদী-বিবাদীকে একই দৃষ্টিতে দেখতেন। কাউকে কারো উপর কোন রকম প্রাধান্য দিতেন না। একবার আল-আশ'আছ ইবন কায়স গেলেন কাজী শুরায়হ-এর এজলাসে। কাজী সাহেব তাঁকে আমাদের শায়খ, আমাদের দীক্ষাগুরু, আমাদের নেতা ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে মারহাবান, আহ্লান ও সাহ্লান বলে অত্যন্ত তা'জীমের সাথে ডেকে নিজের পাশে বসালেন। তাঁরা দু'জন পাশাপাশি বসে কথা বলছেন, এমন সময় একজন সাধারণ মানুষ উপস্থিত হলো এবং আল-আশ'আছের বিরুদ্ধে তার উপর অত্যাচারের অভিযোগ এনে কাজীর নিকট বিচার চাইলো। কাজী সাহেব একটু আগেই যাঁকে পরম সম্মানের সাথে কাছে বসিয়ে হাসি মুখে আলাপ করছিলেন, তিনি এখন ভিন্ন রূপ ধারণ করলেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আল-আশ'আছকে নির্দেশ দিলেন : এখান থেকে উঠুন। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর আসনের পাশাপাশি বসুন এবং তাঁর সাথে কথা বলুন। আল-আশ'আছ বললেন : আমি বরং এখানে বসেই তার সাথে কথা বলি। এবার কাজী সাহেব আরো কঠিন হলেন। বললেন : আপনি অবশ্যই উঠবেন, নয়তো আপনাকে উঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিব। আল-আশ'আছ বললেন : আপনি নিজেকে যে পরিমাণ বড় মনে করছেন তা খুব দুঃখজনক। শুরায়হ বললেন : সেটাকে কি আপনি আপনার সতীন বলে ভাবছেন? আল-আশ'আছ : না। শুরায়হ : আমি দেখছি, আপনি অন্যের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে দেখতে পান, কিন্তু আপনার নিজের প্রতি তাঁর অনুগ্রহকে দেখতে পান না।[২২]

মানব ইতিহাসের কোন যুগেই মিথ্যা সাক্ষ্যদান সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। আর বন্ধ হওয়া সম্ভবও নয়। তবে কাজী শুরায়হ মানুষকে নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করে মিথ্যা সাক্ষ্যদান বন্ধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। সাক্ষীদেরকে বুঝিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যদান থেকে বিরত রাখতেন। যদি বুঝাতে ব্যর্থ হতেন তাহলে মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রায় দিতেন। কারণ, সাক্ষ্যের বিপরীতে কাজীর ব্যক্তিগত জানার কোন গুরুত্ব নেই।

---

২১. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১১৭/১১৮

২২. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-১/৯০; ৪/২৬, ৪৮

ইবন সীরীন বর্ণনা করেছেন। ঘটনার সাক্ষীর ব্যাপারে যখন শুরায়হ-এর সন্দেহ হতো, কিন্তু তার বাহ্যিক সত্যবাদিতার ব্যাপারে কোন রকম প্রশ্ন তোলা যেতনা, তখন তিনি প্রথমে সাক্ষীদেরকে বলতেন, আমি তোমাদেরকে ডেকে আনিনি। তোমরা ইচ্ছা করলে ফিরে যেতে পার। আমি বাধা দিব না। তোমাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই এই মামলার রায় হবে। তোমাদের সাক্ষ্যের দরুন আমি দায়মুক্ত হয়ে যাই। তবে তোমরাও নিজেদেরকে বাঁচাও। কিন্তু বুঝানোর পরেও যদি সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্যদানে বিরত না হতো তাহলে তিনি তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দিতেন। কারণ, কোন কাজী কোন সাক্ষীকে সাক্ষ্যদানে বিরত রাখতে পারেন না। তবে তিনি বিবাদী পক্ষকে বলে দিতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই বিবদমান বিষয় বা ঘটনায় তোমরা হচ্ছো উৎপীড়ক। কিন্তু আমি আমার বিশ্বাস ও ধারণার উপর ভিত্তি করে বিচার-ফায়সালা করতে পারিনে। বরং সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমি ফায়সালা করতে বাধ্য। তবে এ সত্য অটুট থাকবে যে, যে জিনিস আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, আমার ফায়সালা তা হালাল করতে পারে না।[২৩]

হাদীছে নিকট আত্মীয়ের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে কোন রকম নিষেধাজ্ঞা নেই। এ কারণে আত্মীয়ের মোকাদ্দামায় অন্য কোন বিশ্বস্ত আত্মীয়ের সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে কোন আইনগত বাধা নেই। ইবন আবী শায়বা বলেন, কাজী শুরায়হ কোন ব্যক্তির জন্য তার নিকট আত্মীয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে ঘোষণা দেন। তিনি এ আইন তৈরী করেন যে, পিতার জন্যে পুত্রের, পুত্রের জন্য পিতার, স্বামীর জন্য স্ত্রীর, স্ত্রীর জন্য স্বামীর, দাসের জন্য মনিবের, মনিবের জন্য দাসের এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগকৃত ব্যক্তির সাক্ষ্য নিয়োগকারীর জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই মৌল নীতির উপর তিনি এত অটল ছিলেন যে, একটি মামলায় তিনি হযরত 'আলীর (রা) পক্ষে হযরত ইমাম হাসানের সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যান করেন। একবার হযরত 'আলীর (রা) একটি ঢাল কোথাও হারিয়ে যায় এবং একজন জিম্মী তা খুঁজে পায়। হযরত 'আলী (রা) শুরায়হ-এর আদালতে মামলা দায়ের করেন। কাজী সাহেব জিম্মীকে বললেন, ঢালটির ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি? সে বললো, ঢালটি যে আমার তার প্রমাণ এই যে, সেটি আমার হাতে বিদ্যমান। কাজী শুরায়হ 'আলীকে (রা) বললেন, ঢালটি যে পড়ে গিয়েছিল তার কোন সাক্ষী কি আছে? তিনি সাক্ষী হিসেবে পুত্র হাসান (রা) ও দাস কানবারকে উপস্থাপন করেন। শুরায়হ বললেন, কানবারের সাক্ষ্য তো আমি গ্রহণ করছি, তবে হাসানের (রা) সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করছি। হযরত 'আলী (রা) তখন বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী শোনেননি :

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

– আল-হাসান ও আল-হুসায়ন জান্নাতের অধিবাসী যুবকদের নেতা।

---

[২৩] সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১১৯

শুরায়হ বললেন : শুনেছি। তবে পিতার জন্য পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য মনে করিনে। এই রায়কে 'আলী (রা) মেনে নেন। ঢালটি ইয়াহুদী জিম্মীকে দেওয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত ইয়াহুদীকে এত মুগ্ধ করে যে, সে নিজেই স্বীকার করে ঢালটি 'আলীর (রা)। সে আরো বলে, আপনাদের দীন সত্য। মুসলমানদের কাজী তাদের আমীরুল মু'মিনীনের বিরুদ্ধে রায় দেন, আর তিনি বিনাবাক্যে মাথা নত করে তা মেনে নেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর সত্য রাসূল ছিলেন। ইয়াহুদীর এভাবে ইসলাম গ্রহণে হযরত 'আলী (রা) এত খুশী হন যে, ঢালটি তাকে উপহার স্বরূপ দান করেন।[২৪] এর কিছুদিন পরেই খারিজীদের সাথে হযরত 'আলীর (রা) যুদ্ধ হয়। নাহ্‌রাওয়ানের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধে এই নওমুসলিম লোকটি 'আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন।[২৫]

কাজী শুরায়হ-এর পূর্বে ইসলামী 'আদালতে গোপন তদন্তের রীতি চালু ছিল না। তিনিই সর্বপ্রথম তা চালু করেন। যেহেতু এটা ছিল একটি নতুন পদ্ধতি, এ কারণে লোকেরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলে, আপনি এ বিদ'আত চালু করলেন কেন? অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বাকর ও 'উমারের (রা) খিলাফতকালে যা চালু ছিল না, এমন নতুন জিনিস চালু করলেন কেন? জবাবে তিনি বললেন : মানুষ যখন নতুন নতুন কথা চালু করেছে তখন আমিও নতুন রীতি চালু করেছি। অর্থাৎ যখন নতুন অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, তখন আমাকেও নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে।

কাজী শুরায়হ্ প্রমাণকে শপথের চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। শুধু শপথকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। বরং সাক্ষ্য-প্রমাণের সাথে সাথে শপথও নিতেন। একটি মোকাদ্দামায় একজন বাদী তার প্রতিপক্ষের শপথ নেওয়ায়, তারপর তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে। শুরায়হ বললেন, ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী মিথ্যা শপথের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।[২৬]

বাদীকে প্রমাণ উপস্থাপনের এবং বিবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান করা প্রতিটি আদালতের অপরিহার্য কর্তব্য। কাজী শুরায়হ এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি এত বেশী যত্নবান ছিলেন যে, মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণার পরও যদি উভয় পক্ষ কিছু বলতে চাইতো, তিনি তাদের বলার সুযোগ দিতেন। আহ্‌নাফ ইবন কায়স বলেন, একবার আমি শুরায়হ-এর 'আদালতে যাই। দেখলাম, তিনি এক ব্যক্তির বিপক্ষে রায় ঘোষণা করলেন। সাথে সাথে সে বলে উঠলো, এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিবেন না। আমার আরো কিছু বক্তব্য আছে। শুরায়হ তাকে বলার সুযোগ দিলেন। তার বক্তব্য শেষ হলে তিনি বললেন, তুমি অনেক অহেতুক কথা বলেছো। তুমি যা কিছু বলেছো তার সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন কর।

---

[২৪] শাযারাত আয-যাহাব-১/৮৫

[২৫] সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১১৪-১১৭

[২৬] তাবাকাত-৬/৯৪

তিনি নিজের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শোনার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তিনি বলতেন, কেউ আমার কোন রায়ের বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন করলে, আমার সে রায় ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকবে যতক্ষণ না সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে। মোটকথা, সত্য আমার সিদ্ধান্তের বিপরীতে হলেও সেটাই সত্য।

অত্যন্ত নির্ভীকভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করতেন। বাদী-বিবাদী কোন পক্ষকেই কিছুমাত্র প্রাধান্য দিতেন না। কোন পক্ষকেই প্রশ্নবানে ক্ষত-বিক্ষত করতে মোটেই কার্পণ্য করতেন না এবং কোন পক্ষকেই বিশেষ কোন পয়েন্ট স্মরণ করিয়ে দিতেন না।

বিচার কাজে তিনি দারুণ গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন। কোন কার্য-বিবরণী কারো কাছে প্রকাশ করতেন না। একবার তার ছেলে তার একটি মামলার ব্যাপারে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করে। জবাবে তিনি বলেন, তুমি কি চাও, আমি তোমাকে তোমার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলি?

বিচার কাজে বংশীয় প্রথা-পদ্ধতির কোন গুরুত্ব দিতেন না। একবার একটি মোকাদ্দামায় এক পক্ষ বললো যে, আমাদের বংশীয় রীতি এটা। তিনি বললেন, তোমাদের বংশীয় রীতি-পদ্ধতি তোমাদের বাড়ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। মোকাদ্দমায় দালাল নিয়োগের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এমন দালালদের তিনি 'আদালত থেকে বের করে দিতেন। মানুষকে তাদের থেকে দূরে থাকার জন্য পরামর্শ দিতেন।

সভ্য যুগে ঘুষ উপহার-উপঢৌকনের রূপ ধারণ করে থাকে। আর এর থেকে মুক্ত থাকা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। এ কারণে, শুরায়হ উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করলেও ঘুষ থেকে মুক্ত থাকার জন্য সাথে সাথে পাল্টা উপহারও দিয়ে দিতেন।

ঘর থেকে 'আদালতে যাওয়ার সময় এই কথাগুলো উচ্চারণ করতেন: 'অতি শীঘ্র অত্যাচারী সেই অংশকে জেনে যাবে যা সে কম করেছে। অত্যাচারীর শাস্তির এবং অত্যাচারিতের সাহায্যের প্রতীক্ষা করা উচিত।' ক্ষুধা ও রাগের অবস্থায় বিচার কাজ পরিচালনা করতেন না। এমন অবস্থায় এজলাস থেকে উঠে যেতেন।

সাধারণতঃ 'আদালতের বিচারকগণ সব মানুষকে খুশী রাখতে পারেন না। সাধারণভাবে তাদের রায়ের বিরুদ্ধে কোন না কোন পক্ষের অভিযোগ অবশ্যই থাকে। কিন্তু কাজী শুরায়হ-এর বিচার-ফায়সালায় জনগণ নিশ্চিন্ত থাকতো। জাবির ইবন যিয়াদ বর্ণনা করেছেন, শুরায়হ আমাদের এখানে বসরায় প্রায় এক বছর কাজী ছিলেন। এই অল্প সময়ে তিনি এমন তুলনাহীন বিচার-ফায়সালা করেন যে, তাঁর পূর্বের ও পরের ইতিহাসে যার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

তাঁর সকল বিচার-ফায়সালা এত জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হতো যে, তাঁর 'আদালত ফকীহ্‌দের দারসগাহ্ বা শিক্ষায়তনে পরিণত হয়। অনেক বড় বড় 'আলিম ফিকাহ্ বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর ফায়সালা শোনা ও দেখার জন্য 'আদালতে আসতেন। সেকালে মাকহূল (রহ) ছিলেন একজন অতি বড় 'আলিম। তিনি

বলেছেন, আমি ছয় মাস যাবত শুরায়হ-এর 'আদালতে গিয়েছি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে। তাঁর কাছে অনেক প্রশ্ন করতাম। তাঁর বিচার-ফায়সালা আমার জন্য অনেক শিক্ষণীয় হতো।[২৭]

যেহেতু তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও মেধাবী, তাই বাদী-বিবাদীর বাহ্যিক অবস্থা দেখে ধোঁকায় পড়তেন না। একবার একজন মহিলা তাঁর এজলাসে একজন পুরুষের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করলো। 'আদালতে সে গলা সপ্তমে চড়িয়ে কান্না শুরু করে দেয়। ইমাম শা'বীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শুরায়হকে লক্ষ্য করে বলেন, মনে হচ্ছে, মহিলাটি অত্যাচারিত। শুরায়হ বললেন, কান্না অত্যাচারিত হওয়ার প্রমাণ নয়। ইউসুফ (আ)-এর ভায়েরাও কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এসেছিলেন।[২৮]

জ্ঞানগত পূর্ণতার সাথে সাথে তিনি উন্নতমানের নৈতিক গুণাবলীতে বিভূষিত ছিলেন। বড় দীনদার এবং 'আবিদ ব্যক্তি ছিলেন।[২৯] বিচার-ফায়সালার কঠিন দায়িত্ব ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও যথেষ্ট সময় তাঁর 'ইবাদাতে অতিবাহিত হতো। তাঁর দাস আবূ তালহা বর্ণনা করেছেন, সকালে ফজরের নামায পড়ে ঘরে ফেরার পর দরজা বন্ধ করে প্রায় অর্ধেক দিন নফল 'ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন।

তিনি ছিলেন খুব হাসিখুশী মেজাজের ও বিনীত স্বভাবের। সবাইকে তিনি প্রথমে সালাম দিতেন। কাসিম বর্ণনা করেছেন, সালাম দানের ব্যাপারে কেউ শুরায়হ-এর অগ্রগামী হতে পারেনি। 'ঈসা ইবন হারিছ বলেন, আমি সবসময় তাঁর আগেই সালাম দেওয়ার চেষ্টা করতাম, কিন্তু কখনো কামিয়াব হতে পারিনি। অধিকাংশ সময় পথে আমরা মুখোমুখি হতাম। আমি অপেক্ষায় থাকতাম, এখনই সালাম করবো, কিন্তু আমার আগেই তিনি 'আস-সালামু 'আলাইকুম' বলে দিতেন।

তিনি ফিতনা-ফাসাদ ও ঝগড়া-বিবাদ মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর জীবনে অনেক বড় বড় রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, বছরের পর বছর 'আবদুল মালিক ও 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাঁর সামনেই বিদ্যমান ছিল– যার শিখা থেকে খুব কম মানুষই নিরাপদ থাকতে পেরেছে, কিন্তু তিনি এর সবকিছু থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হন। এই বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার সময় কয়েক বছরের জন্য কাজীর পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। এতে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে তিনি এতখানি সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, এই বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামার অবস্থা সম্পর্কে কারো কাছে কিছু জানতেও চাইতেন না। মানুষও এসব বিষয়ের প্রতি তাঁর অনীহার ভাব দেখে তাঁর সাথে এ নিয়ে কোন রকম আলোচনাও করতো না।[৩০]

---

[২৭] প্রাগুক্ত-৬/৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৭

[২৮] আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-১/৮৯; 'উয়ূন আল-আখবার-১/৬৬

[২৯] তাহযীব আল-আসমা'-১/২২৪

[৩০] তাবাকাত-৬/৯৭, ৯৮; ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২২৪

তিনি সবসময় অন্যের আরাম ও সুখ-শান্তির প্রতি যত্নবান থাকতেন। নিজের জন্য অন্য কাউকে সামান্য কষ্ট দেওয়াও পছন্দ করতেন না। নিজের বাড়ীর সব নর্দমা ও পয়ঃপ্রণালী বাড়ীর সীমানার ভিতর দিয়েই দিতেন, যাতে তাঁর পানিতে অন্যের কষ্ট না হয়। অন্যের আরাম-আয়েশের প্রতি এত বাড়াবাড়ি রকমের সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, তাঁর বাড়ীর কোন সদস্যের মৃত্যু হলেও অন্যের শান্তি ভঙ্গ হতে পারে এই ধারণায় কাউকে কোন খবর না দিয়েই রাতের মধ্যে দাফন করে দিতেন। নিজের এক সন্তানের মৃত্যুর পর কাউকে না জানিয়ে দাফন করে দেন।[৩১]

তিনি ছিলেন একজন কৌতুকপ্রিয় ও প্রফুল্লচিত্তের মানুষ।[৩২] মাঝে মধ্যে গুরুগম্ভীর পরিবেশেও তাঁর কৌতুক ও রসিকতার ফল্গুধারা বয়ে যেত। একবার 'আদী ইবন আরতাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁর নিকট আসলেন। উভয়ের মধ্যে যে সংলাপটি হয় তা নিম্নরূপ :

'আদী- আমি আপনার সামনে কিছু কথা উপস্থাপন করতে চাই।

শুরায়হ- বলুন, আমি শোনার জন্য প্রস্তুত।

'আদী- আমি শামে অবস্থানকারী।

শুরায়হ- এত দূরের মানুষ!

'আদী- আমি আপনাদের এখানে বিয়ে করেছি।

শুরায়হ- আপনার বিয়ে কল্যাণময় হোক!

'আদী- আমি আমার স্ত্রীকে সংগে নিয়ে যেতে চাই।

শুরায়হ- স্বামী তাঁর স্ত্রীর অধিকারী এবং তাঁর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে স্বাধীন।

'আদী- কিন্তু সে তার নিজের বাড়ীতে থাকার শর্ত করেছিল।

শুরায়হ- তাহলে শর্ত পূরণ করা উচিত।

'আদী- আপনি আমাদের এ সমস্যার একটা ফায়সালা করে দিন।

শুরায়হ- ফায়সালা করে দিয়েছি।

'আদী- কার বিরুদ্ধে?

শুরায়হ- তোমার মার ছেলের বিপক্ষে (অর্থাৎ তোমার)।

'আদী- কার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে?

শুরায়হ- তোমার মামার বোনের ছেলের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে (অর্থাৎ তোমার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে)। কারণ, 'আদী তো নিজেই স্বীকার করেছিল যে, স্ত্রীর সাথে তার বাড়ীতেই বসবাস করার শর্তে বিয়ে করেছে।[৩৩]

একবার এক বেদুঈন তাঁকে প্রশ্ন করলো : আপনি কোন খান্দানের লোক? জবাবে তিনি

---

৩১. 'উয়ূন আল-আখবার-২/৫৯৭

৩২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫৯

৩৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৪/৯৮; আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-১/৯০; ৩/১০; 'উয়ূন আল-আখবার-১/৩৬৬

বললেন : আমি সেই সব লোকদের একজন, আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে ইসলামের পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। এ জবাব শোনার পর বেদুঈন তাঁর নিকট থেকে উঠে চলে গেল এবং লোকদের বলতে লাগলো যে, তোমাদের এ কাজী তাঁর নিজের খান্দানের নামটি পর্যন্ত বলতে পারেন না। অন্য একটি বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, বেদুঈন লোকদের বলতে লাগলো, তোমরা তো আমাকে একজন দাসের নিকট পাঠিয়েছিলে। সাধারণতঃ দাস শ্রেণী ও তাদের মত যাদের উল্লেখ করার মত বংশ-গৌরব নেই তারা ইসলামের প্রতি নিজেদেরকে সম্বন্ধ ও সম্পৃক্ত করতো।

কাজী শুরায়হ ও ইবন যিয়াদের মধ্যে দারুণ মত বিরোধ ছিল। ইবন যিয়াদ একবার 'তা'উন' রোগে আক্রান্ত হন। ডান হাতে রোগটির প্রকোপ বেশী দেখা দেয় এবং পচন ধরে। চিকিৎসকগণ তাঁর হাতটি কেটে ফেলার পরামর্শ দেয়। তিনি শুরায়হ্-এর সাথে পরামর্শ করলেন। শুরায়হ্ চিকিৎসকদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে হাত কাটতে নিষেধ করলেন। যাই হোক, কিছুটা তাঁর পরামর্শে এবং কিছুটা ভয়ে হাত কাটা থেকে বিরত থাকলেন। ফলে তার বিষক্রিয়া সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি মারা যান। লোকে কাজী শুরায়হকে এই বলে তিরস্কার করতে লাগে যে, তাঁর সাথে আপনার দুশমনীর কারণেই আপনি তাঁর হাতটি কাটতে বারণ করেন। আর এ কারণেই তিনি মারা গেলেন। তিনি তাদেরকে জবাব দিলেন এই বলে : একজন পরামর্শক সব সময় আস্থাভাজনই হয়ে থাকেন। আমি যদি তাঁর কল্যাণকামী না হতাম তাহলে এটাই চাইতাম যে, একদিন তাঁর হাত কাটা যাক, একদিন পা কাটা যাক। এভাবে প্রতিদিন তাঁর দেহের একটি না একটি অঙ্গ কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হতো।[৩৪]

যিয়াদ ইবন আবীহ্ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কাজী শুরায়হ তাঁকে দেখতে গেলেন। ফিরে এলে মাসরূক ইবন আল-আজদা' তাঁর কাছে একটি লোক পাঠালেন যিয়াদের অবস্থা জানার জন্য। লোকটি জিজ্ঞেস করলো : আপনি আমীরকে কেমন দেখে এলেন? শুরায়হ বললেন : দেখে এলাম, তিনি আদেশ করছেন ও নিষেধ করছেন। মাসরূক একথা শুনে বললেন : শুরায়হ্ সব সময় বাঁকা কথা বলেন। তিনি আবারও লোকদের তাঁর কাছে পাঠালেন। তখন শুরায়হ্ বললেন : আমি দেখে এলাম, তিনি অন্তিম উপদেশ লেখার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং কাঁদতে নিষেধ করছেন।[৩৫]

সুফইয়ান আছ-ছাওরী বলেন : এক ব্যক্তি একবার কাজী শুরায়হ্-র এজলাসে এসে একটি বিড়ালের মালিকানার ব্যাপারে ফায়সালা চাইলো। বিড়ালটি যে তার সে ব্যাপারে কাজী প্রমাণ পেশ করতে বললেন। লোকটি বললো : যে বিড়ালটি আমার বাড়ীতে জন্মেছে তার কোন প্রমাণ আমি দিতে পারবো না। কাজী বললেন : বেশ তাহলে তুমি বিড়ালটি নিয়ে তার মার কাছে ছেড়ে দাও। যদি সেটা সেখানে থাকে এবং তার মা দুধ পান করায় তাহলে তোমার বিড়াল। আর যদি সেটা জোরে ডাকতে থাকে, লোম

---

[৩৪] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২২৪

[৩৫] আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/৪৬৭; 'উয়ূন আল-আখবার-২/৫৯৭

ফোলাতে থাকে তাহলে সেটা তোমার বিড়াল নয়।[৩৬]

তাকদীরে তাঁর ছিল প্রবল বিশ্বাস। একবার কূফায় 'তা'উন'-এর মহামারি দেখা দেয়। তাঁর বন্ধু ভয়ে কূফা ছেড়ে নাজফে চলে যান। শুরায়হ্ তাকে লেখেন : যে স্থান আপনি ছেড়ে গেছেন তা আপনার মৃত্যুকে নিকটবর্তী করতো না এবং আপনার জীবনের দিনগুলিও ছিনিয়ে নিত না। আর যে স্থানে আপনি আশ্রয় নিয়েছেন তা এমন এক সত্তার মুঠোর মধ্যে রয়েছে যাঁকে কোন কামনা-বাসনা অক্ষম ও অপারগ করতে পারে না এবং কোন পলায়নই তার থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয় না। আপনি ও আমরা সবাই একই বাদশার বিছানায় অবস্থান করছি। নাজফও এক মহাক্ষমতাশালীর অধিকারে আছে যা খুব শীঘ্র প্রকাশ পাবে।[৩৭]

তিনি সবসময় মানুষকে সৎ উপদেশ দিতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর কাছে ছোট-বড় ও আপন-পর কোন ভেদাভেদ ছিল না। জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, একদিন শুরায়হ্ আমার কিছু দুঃখের কথা আমার এক বন্ধুর নিকট বর্ণনা করতে শুনতে পেলেন। তিনি আমার একটি হাত ধরে এক পাশে নিয়ে গেলেন এবং বললেন : ভাতিজা, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে নিজের দুঃখের কথা বলবে না। কারণ, তুমি যার কাছে তোমার দুঃখ-কষ্টের কথা বলছো সে হয় তোমার বন্ধু হবে, না হয় শত্রু। বন্ধু হলে সে তোমার দুঃখের কথা শুনে ব্যথিত হবে, আর শত্রু হলে উৎফুল্ল হবে। তারপর বললেন : তুমি আমার এই চোখটির দিকে তাকাও। আঙ্গুল দিয়ে তাঁর একটি চোখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : আল্লাহর কসম, পনেরো বছর যাবত আমি এ চোখটি দ্বারা না কোন মানুষকে দেখতে পাই, আর না কোন পথ-ঘাট। কিন্তু এই মুহূর্তে কেবল তুমি ছাড়া এ পর্যন্ত আর কাউকে এ কথাটি বলিনি। তুমি কি আল্লাহর সেই সত্যনিষ্ঠ বান্দাটির কথা শোননি :

إنما أشكو بثي وحزني إلى الله[৩৮]

– আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সামনেই পেশ করছি। সুতরাং একমাত্র আল্লাহকেই তুমি তোমার যাবতীয় শেকায়েত ও অভিযোগের কেন্দ্র বানাও।[৩৯]

একবার তাঁর 'আদালতে এক ব্যক্তি এক সাক্ষীকে ডাক দেয়– যার নাম ছিল রাবী'আ। সে উত্তর দিল না। লোকটি উত্তেজিত হয়ে জোরগলায় তাকে কাফির' বলে ডাক দিল। এবার সে সাড়া দিল। কাজী শুরায়হ্ দৃশ্যটি উপভোগ করছিলেন। তিনি এবার কৌতুক করে সাক্ষীর প্রতি এই দোষ আরোপ করলেন যে, তুমি নিজেই 'কুফর' (আল্লাহকে না মানা) স্বীকার করে নিয়েছো। এ কারণে তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না।

শেষ জীবনে বার্ধক্যের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েন এবং কাজীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ

---

[৩৬] আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-১/৯১

[৩৭] প্রাগুক্ত-৩/১৯৩; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/২০৩

[৩৮] সূরা ইউসুফ-৮৬

[৩৯] সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১১৯-১২০

করেন। অবসর গ্রহণের অল্প কিছুদিন পর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। বাঁচার আর আশা থাকলো না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আত্মীয়-পরিজনদেরকে এই অসীয়াতগুলো করেন :

১. ঝুলন্ত কবর খুঁড়বে। ২. মৃত্যু ও জানাযার খবর কাউকে দিবে না। ৩. বিলাপ করবে না। ৪. লাশ ধীরে ধীরে বহন করবে। ৫. কবর চাদর দিয়ে ঢাকবে না। এ কথাগুলো বলার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স এক শো বছর অতিক্রম করেছিল। মৃত্যু সন নিয়ে মতপার্থক্য আছে। হিজরী ৭৬ সন থেকে ৭৯ সনের মধ্যে তাঁর ইনতিকাল হয়।[৪০]

তিনি মাকৃন্দা ছিলেন। পাঁচ শো দিরহাম মাসিক ভাতা পেতেন।[৪১]

ইমাম আয-যাহাবীর মতে তিনি এক শো বিশ বছর জীবিত ছিলেন এবং হিজরী ৭৮, মতান্তরে ৮০ সনে মৃত্যুবরণ করেন।[৪২]

কাজী শুরায়হ-এর আংটিতে (সীল) খোদাই করা ছিল এই কথাটি- 'الخاتم خير من الظن' - সীল-মোহর সন্দেহের চেয়ে ভালো।[৪৩]

---

[৪০] তাবাকাত-৬/৯৯

[৪১] প্রাগুক্ত-৬/৯৫; ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২২৪

[৪২] তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/৫৯

[৪৩] 'উয়ূন আল-আখবার-১/৩৪৯

'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ (রহ)

'আমির ইবন 'আবদিল্লাহর দু'টি ডাক নাম পাওয়া যায়। আবূ 'আবদিল্লাহ ও 'আবূ 'আমর। আরবের বিখ্যাত বানূ তামীম গোত্রের সন্তান। বসরার অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন অতি বিশ্বস্ত 'আবিদ তাবি'ঈ। কা'ব আল-আহবার তাঁকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন : ইনি এই উম্মাতের রাহিব বা সন্যাসী।[1] তৎকালীন আরবের একজন বিখ্যাত কারী। মানুষকে কুরআন পাঠ শিক্ষা দিতেন। তাঁর পিতার নাম 'আবদুল্লাহ। কোন কোন বর্ণনায় 'আবদু কায়সও এসেছে।

তিনি বসরায় বেড়ে ওঠেন। বসরা ছিল একটি নতুন অভিজাত শহর। বিত্ত-বৈভবে যেমন শহরটি ঝলমল করতো তেমনি জ্ঞানী-গুণীদের পদচারণায় মুখর থাকতো। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ছিলেন তখন বসরার ওয়ালী, ইমাম ও সেনাধ্যক্ষ। এই আবূ মূসার (রা) কাছেই 'আমির শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছায়ার মত আবূ মূসাকে (রা) অনুসরণ করেন। তাঁর নিকট থেকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা) সুন্নাহ্র জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর সূত্রে হাদীছও বর্ণনা করেন। হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরীর (রা) কল্যাণে তিনি ফকীহ্র মর্যাদা লাভ করেন।

মহান তাবি'ঈদের উজ্জ্বল ও সাধারণ গুণ-বৈশিষ্ট্য বলতে যা বুঝায় তাহলো তাঁদের 'ইলম ও 'আমল এবং খিদমতে 'ইলম ও দীন। অন্য কথায়, গোটা তাবি'ঈ প্রজন্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞান অর্জন করা, অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করা, জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটানো এবং স্বধর্মের সেবা করা। এসব গুণ তাবি'ঈদের প্রত্যেকের মধ্যে কমবেশী দেখা যায়। তবে তাঁদের মধ্যে ছোট্ট একটি দল এমনও ছিলেন যাঁরা কেবল দুনিয়ার যাবতীয় ঝক্কি-ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকেননি, বরং জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার পর শুধু 'ইবাদাত-বন্দেগী ও তাযকিয়ায়ে রূহ বা আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধিকে নিজেদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নেন। 'আমিরও এই পবিত্র দলটির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। এ রূপটি তাঁর মধ্যে এত প্রবল ছিল যে, তাঁর প্রতিটি কর্ম ও আচরণে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর কোন কর্মই এই চেতনা থেকে মুক্ত ছিল না। তাঁর জীবনের অন্যান্য অবস্থাকে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ও নির্লোভ ভাব ও খোদাভীতি থেকে পৃথক করে দেখানো খুবই কঠিন। বলা হয়েছে যে, তিনি নিজের উপর প্রত্যেকটি দিন ও রাতে এক হাজার রাক'আত নামায ফরজ করে নিয়েছিলেন।[2]

আল-জাহিজ তাপস ও পার্থিব ভোগ-বিলাস বিমুখ মানুষদের যে তালিকা দিয়েছেন তার প্রথমে এই 'আমিরের নামটি স্থান পেয়েছে।[3]

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/১০৫; আল ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাবারা-৩/৮৫

২. আল-ইসাবা-৩/৮৫

৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৬৩, ৩/১৯৪

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত 'উমার ফারূকের (রা) পরামর্শ ও নির্দেশে মহান সাহাবায়ে কিরাম ও উঁচু স্তরের তাবি'ঈগণ হিজরী ১৪ সনে 'বসরা' নগরী পত্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই নতুন শহরে তাঁরা পার্শ্ববর্তী পারস্যে যুদ্ধ-বিজয়ী মুসলিম সৈনিকদের জন্য সেনানিবাস, দা'ওয়াত ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে আহ্বান) ও আল্লাহর বাণীকে পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। নতুন শহরের পত্তন হলো। আরব উপ-দ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল– নাজ্‌দ, হিজায, ইয়ামন থেকে মানুষ এই শহরে এসে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করলো, যাতে এটি মুসলমানদের অন্যতম দুর্গে পরিণত হতে পারে। নাজদের বানূ তামীমের যুবক 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ আত-তামীমী আল-আনসারীও সেই বসতি স্থাপনকারীদের একজন। 'আমির তখন একজন প্রাণ-চঞ্চল, পরিচ্ছন্ন অন্তঃকরণ ও দীপ্তিমান মুখমণ্ডলের এক নব্য যুবক। বসরা একটি নতুন শহর হলেও মুসলমানদের অন্যান্য শহরের তুলনায় বেশী অর্থ-বিত্তের ছড়াছড়ি ছিল। কারণ, বিজয়ী সৈন্যদের মাধ্যমে এখানে প্রচুর গনীমতের মাল ও স্বর্ণ-রৌপ্যের সরবরাহ হতো।

কিন্তু তামীম গোত্রের এই যুবক 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এসব কিছু ছিল না। মানুষের হাতে যা কিছু আছে তার প্রতি তিনি নির্মোহ ও নিস্কাম স্বভাবের এবং আল্লাহর হাতে যা কিছু আছে তা পেতে দারুণ আগ্রহী। দুনিয়া ও তার চাকচিক্য ও জৌলুসের প্রতি একেবারেই উদাসীন এবং আল্লাহ ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের প্রতি সীমাহীন প্রত্যাশী।

এ সময় বসরার প্রধান পুরুষ ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) অন্যতম মহান সাহাবী হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)। তিনি এই শহর ও এই অঞ্চলের ওয়ালী, এখান থেকে বিভিন্ন দিকে প্রেরিত মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি, শহরবাসীর ইমাম, শিক্ষক এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী প্রধান দা'ঈ। 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ আবূ মূসা আল-আশ'আরীর (রা) যুদ্ধ ও শান্তি এবং ভ্রমণ ও বাড়ীতে অবস্থান সর্ব অবস্থায় তাঁর সুহবত বা সাহচর্য অবলম্বন করেন। তিনি তাঁর নিকট কিতাবুল্লাহর পাঠ ও জ্ঞান তেমনভাবে লাভ করেন যেমন নবী মুহাম্মাদের (সা) উপর নাযিল হয়েছিল। তাঁর নিকট থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) বহু হাদীছ লাভ করেন এবং যা তিনি তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছেই তিনি আল্লাহর দীনের গভীর তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করে ফকীহ্‌র মর্যাদা অর্জন করেন। যতটুকু সম্ভব জ্ঞান অর্জনের দ্বারা নিজেকে উৎকর্ষমণ্ডিত করার পর তিনি তাঁর জীবনকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন : ১. একাংশ শিক্ষা মজলিসে অতিবাহিত করতেন। তাতে তিনি বসরার জামে' মসজিদে মানুষকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। ২. একটি অংশ জিহাদের ময়দানে কাটাতেন। প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিজয়ীদের বেশে গাজী হিসেবে ফিরে এসেছেন। ৩. আরেকটি অংশ তিনি কাটিয়েছেন লোক-চক্ষুর অন্তরালে 'ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে। নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা দু'টি ফুলে গেছে। এ তিনটি বিষয় ছাড়া আর কোন কিছু তাঁর জীবনকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। তাই মানুষ তাঁকে বলতো 'বসরার 'আবিদ ও জাহিদ' অর্থাৎ বসরার তাপস ও সন্ন্যাসী।

বসরার জনৈক ব্যক্তি 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহর জীবনের একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন। একবার আমি একটি কাফেলার সাথে, যার মধ্যে 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ্ও ছিলেন, ভ্রমণ করছিলাম। সারা দিন চলার পর যখন রাত হয়ে গেল তখন একটি জলাশয়ের পাশে জঙ্গলের মধ্যে যাত্রাবিরতি করলাম। 'আমির তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘোড়াটিকে লম্বা করে একটি গাছে বাঁধলেন। তারপর ঘোড়াটার পেট ভরার মত কিছু ঘাস ও লতাপাতা ছিঁড়ে-কেটে এনে তার সামনে ছড়িয়ে দিলেন। তারপর সবার দৃষ্টির আড়ালে গভীর জঙ্গলে চলে গেলেন। আমি মনে মনে বললাম : আল্লাহর কসম! আমাকে অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করতে হবে এবং দেখতে হবে এই রাতের অন্ধকারে গভীর জঙ্গলে তিনি কি করেন। যেতে যেতে তিনি মানুষের দৃষ্টির আড়ালে বৃক্ষ-বেষ্টিত একটি টিলায় গিয়ে থামলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি আমার জীবনে এত সুন্দর, পরিপূর্ণ ও বিনীত ভাবের নামায আর দেখিনি। আল্লাহ যতক্ষণ চাইলেন, তিনি নামায পড়লেন। তারপর একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দরবারে দু'আ ও মুনাজাত করতে লাগলেন। সেই মুনাজাতে তিনি যেসব কথা বলেছিলেন তার কিছু এ রকম : 'ইয়া ইলাহী! আপনি আপনার আদেশ দ্বারা আমাকে সৃষ্টি করেছেন, এই পৃথিবীর বিপদ-মুসীবতে আপনার ইচ্ছায় আমাকে রেখে দিয়েছেন। তারপর আমাকে বলেছেন : নিজেকে শক্ত রাখ। হে মহাশক্তিশালী! আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে শক্ত না করেন, আমি শক্ত হবো কি করে? ইয়া ইলাহী! আপনি জানেন, যাবতীয় সুখ-ঐশ্বর্যসহ যদি গোটা দুনিয়া আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়, তারপর আপনার সন্তুষ্টির বিনিময়ে কেউ যদি তা চায়, আমি তাকে তা দিয়ে দিব।

ইয়া ইলাহী আমি আপনাকে এত গভীরভাবে ভালোবাসি যা আমার উপর আপতিত বালা-মুসীবতকে সহজ করে দিয়েছে এবং আমার জন্য যা আপনি নির্ধারণ করেছেন তাই আমাকে সন্তুষ্টি দান করেছে। আপনার প্রতি আমার এ ভালোবাসা বিদ্যমান থাকলে আমার সকাল-সন্ধ্যা কেমন কাটলো তাতে আমার কোন পরোয়া নেই।'

বসরার লোকটি বলেছেন : তারপর আমার একটু তন্দ্রা ভাব এলো এবং এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর আমি জাগলাম। দেখলাম, 'আমির সেই একই অবস্থায় নামায, দু'আ ও মুনাজাতের মধ্যে আছেন। এভাবে সুবহে সাদিক হয়ে গেল। ফজরের ফরজ নামায আদায় করলেন। তারপর এভাবে দু'আ করতে লাগলেন : 'হে আল্লাহ! এখন প্রভাত হয়েছে। মানুষের চলাচল শুরু হবে, তারা আপনার অনুগ্রহ ও রুযি-রেযেকের সন্ধান করবে। তাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু প্রয়োজন আছে। আপনার নিকট 'আমিরের প্রয়োজন হলো, আপনি তার যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দিন। ইয়া আকরামাল আকরামীন! আপনি আমার ও তাদের সবার প্রয়োজনসমূহ পূরণ করে দিন। হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমি তিনটি জিনিস চেয়েছি। দু'টি দিয়েছেন, একটি দেননি। হে আল্লাহ! আপনি সেটা আমাকে দিন। যাতে আমি আপনার 'ইবাদাত করতে পারি, যেমন আমি ভালোবাসি ও আমি চাই।'

তারপর তিনি বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ান এবং আমার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে। তিনি বুঝতে পারেন, আমি সারা রাত বসে বসে তাকে পর্যবেক্ষণ করেছি। তিনি ভীষণ ভীত-কম্পিত হয়ে পড়লেন। অত্যন্ত দু:খ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন : ওহে বসরী ভাই! মনে হচ্ছে আপনি সারা রাত আমাকে পাহারা দিয়েছেন।

বললাম : হাঁ।

বললেন : আপনি আমার যা কিছু দেখেছেন, গোপন রাখুন, আল্লাহ্ আপনার কাজ ও কথা গোপন রাখবেন।

আমি বললাম : আপনি যে তিনটি জিনিস আপনার পরোয়ারদিগারের নিকট চেয়েছিলেন, সেই তিনটি জিনিস কি, তা হয় আপনি আমাকে বলবেন, নয়তো আমি আপনার যে আমল প্রত্যক্ষ করেছি তা মানুষের মধ্যে প্রচার করে দিব।

বললেন : আল্লাহ্ আপনার প্রতি করুণা করুন! আপনি একাজ করবেন না।

বললাম : আমি আপনাকে যা বলেছি, যদি তা করেন তাহ্লে বলবো না।

আমার অনমনীয়তা দেখে তিনি বললেন : যদি আপনি আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে এই অঙ্গীকার করেন যে, অন্য কারো নিকট আপনি প্রকাশ করবেন না তাহ্লে আমি আপনাকে বলতে পারি।

বললাম : আমি আল্লাহর নামে দৃঢ় অঙ্গীকার করছি যে, আপনার জীবদ্দশায় কারো কাছে আপনার এ গোপন কথা প্রকাশ করবো না।

তিনি বললেন : আমার দীনের ব্যাপারে নারীর চেয়ে বেশী ভীতি ও আশঙ্কাজনক আমার কাছে আর কিছু নেই। তাই আমি আমার পরোয়ারদিগারের নিকট প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন আমার অন্তর থেকে নারীর প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা দূর করে দেন। তিনি আমার এ দু'আ কবুল করেছেন। ফলে আমি এখন এমন হয়ে গেছি যে, কোন নারীকে দেখলাম না কোন প্রাচীর, তাতে আমার কোন পরোয়া নেই।

বললাম : এতো একটি গেল। দ্বিতীয়টি কি?

বললেন : দ্বিতীয়টি হলো, আমি আমার পরোয়ারদিগারের নিকট চেয়েছি যে, আমি যেন একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কাকেও ভয় না করি। আমার এ চাওয়া আল্লাহ্ কবুল করেছেন। এখন আমি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আসমান-যমীনের আর কোন কিছুকেই ভয় করিনে।

বললাম : তৃতীয়টি কি?

বললেন : আমার পরোয়ারদিগারের নিকট আমার তৃতীয় চাওয়া ছিল, তিনি যেন আমার চোখের ঘুম দূর করে দেন। তাহলে আমি রাত-দিন আমার ইচ্ছা মত তাঁর 'ইবাদাত করতে পারবো। কিন্তু তিনি আমার এ চাওয়া পূরণ করেননি।

তাঁর একথা শুনে আমি বললাম : আপনার নিজের প্রতি একটু দয়া করুন। আপনার রাত কাটে নামাযে দাঁড়িয়ে আর দিন কাটে রোযা রেখে। আপনি যা করছেন তার থেকে

অনেক কম করেও জান্নাত পাওয়া যাবে। আর আপনি যতখানি সতর্কতা অবলম্বন করছেন তার থেকে অনেক কম সতর্ক হয়েও জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে।

আমার একথা শুনে বললেন : আমার ভয় হয়, আমি সেখানে লজ্জিত হই কিনা। যেখানে লজ্জা ও অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই 'ইবাদাতের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবো। যদি আমি নাজাত ও মুক্তি পাই, তাহলে সেটা হবে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে। আর যদি আমি জাহান্নামে যাই, তাহলে সেটা হবে আমারই ত্রুটির কারণে।

তারপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। লোকটি বললো : হে আমার ইসলামী ভাই! আপনি কাঁদছেন কেন? বললেন : আমি তোমাদের দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণের কারণে কাঁদছিনে। আমি কাঁদছি, প্রচণ্ড গরমের দিনে দুপুরের পিপাসা ও শীতের রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার স্বল্পতার জন্য।[৪]

এ ঘটনার পর 'আমির তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন। একদিন ভাতা বণ্টন ও বাইতুল মাল দফতরের একজন কর্মচারী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। 'আমিরের জন্য নির্ধারিত সরকারী ভাতা ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র 'উলামা ও ফকীহ্দের যে ভাতা দিত, এ ছিল সেই ভাতা। সরকারী কর্মচারীটি বললো : ওহে 'আমির, আপনি দফতরে চলুন এবং ভাতা গ্রহণ করুন। 'আমির গেলেন এবং ভাতার অর্থ গ্রহণ করে তাঁর গায়ের চাদরের এক কোণে ঢেলে বাড়ীর পথে বের হলেন। পথে গরিব, মিসকীন, অভাবী, সায়িল যাকেই পেলেন কাপড়ের মধ্যে হাত দিয়ে মুঠ ভরে উঠিয়ে তাকে দিলেন। এভাবে দিতে দিতে বাড়ী পৌঁছলেন। পরিবারের লোকদের সামনে সব মুদ্রা ঢেলে দিলেন। তাঁরা একটি একটি করে গুণে দেখলেন, ভাতা দফতর থেকে যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করেছিলেন তা ঠিকই আছে। একটি মুদ্রাও কম নেই।[৫]

'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ কেবল একজন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ এবং রাতের অন্ধকারে নির্জনে-নিরিবিলিতে আল্লাহর 'ইবাদাতকারী ব্যক্তিই ছিলেন না, বরং দিনের বেলায় একজন দক্ষ অশ্বারোহী যোদ্ধাও ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় যখনই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ডাক দেওয়া হয়েছে, সেই ডাকে প্রথম সাড়া দানকারী সব সময় তিনি থেকেছেন। তিনি যখন কোন মুজাহিদ বাহিনীর সাথে জিহাদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন তখন ব্যতিক্রমধর্মী একটি কাজ করতেন। মুজাহিদদের মধ্য থেকে বেছে বেছে একটি দলকে নির্বাচন করতেন নিজের সহযোদ্ধা হিসেবে। তারপর তাঁরা যখন একসঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য একমত হতেন তখন তিনি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন : ওহে ভায়েরা আমার! আমি আপনাদের সঙ্গী হতে ইচ্ছুক, যদি আপনারা আমাকে তিনটি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁরা জানতে চাইতেন, সেই তিনটি বিষয় কি কি? তিনি বলতেন :

---

[৪] তাবাকাত-৭/৭৫; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-২৪-২৮

[৫] তারীখু ইবন 'আসাকির-৩/২০৭; 'আসরুত তাবি'ঈন-২২৬

প্রথমতঃ আমি হবো আপনাদের সেবক। এই সেবার কাজে আপনাদের কেউ কখনো আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবেন না।

দ্বিতীয়তঃ আমি হবো আপনাদের মুআয্যিন। এ ব্যাপারে কেউ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবেন না।

তৃতীয়তঃ আমার সাধ্যমত আপনাদের জন্য আমাকে খরচ করার অধিকার দিতে হবে।

যদি তাঁরা তাঁকে এ তিনটি ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতেন তাহলে তিনি তাঁদের দলে থাকতেন। কেউ দ্বিমত পোষণ করলে তিনি অন্য দল খুঁজে তাদের সাথে বের হতেন।[৬]

'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ্‌র জিহাদ ছিল নির্ভেজাল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আসমা' ইবন 'উবায়দ বর্ণনা করেছেন। 'আমির একবার একটি যুদ্ধে গেলেন। সেই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের এক বড় নেতার একটি মেয়ে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হলো। তখনকার রীতি অনুযায়ী শত্রু পক্ষের বন্দী মেয়েদেরকে বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হতো। সৈনিক 'আমিরকে এই বন্দী মেয়েটিকে দেওয়ার জন্য তার একটি বর্ণনা তাঁর কাছে দেওয়া হলো। 'আমির সেই বর্ণনা শুনে বললেন, আমিও তো একজন পুরুষ, এ মেয়েটি আমাকে দেওয়া হোক। তাঁর এমন অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে বাহিনীর সদস্যরা সানন্দে দাসীটিকে তাঁর হাতে অর্পণ করলো। তিনি যখন মেয়েটির মনিব হয়ে গেলেন তখন তাকে বললেন : আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাকে এ বন্দী দশা ও দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলাম। তুমি এখন মুক্ত, স্বাধীন। তাঁর সঙ্গী-সাথীরা বললেন, আপনি তাকে মুক্ত না করে অন্য কোন দাসীকে মুক্তি দিতে পারতেন। বললেন : আমি আমার পরোয়ারদিগারের নিকট ভালো প্রতিদান চাই। 'আমিরের অভ্যাস ছিল, জিহাদের পথে চলাকালে পালাক্রমে অন্য মুজাহিদদেরকে নিজের বাহনের পিঠে চড়ানো।[৭]

'আমির ছিলেন সেই সব মুজাহিদের একজন যাঁরা যুদ্ধের ভীতিপ্রদ মারাত্মক পর্যায়ে দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন এবং লোভ-লালসার পর্যায়ে নিজেদেরকে একেবারে গুটিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান। অন্য কথায়, তিনি নির্ভিকভাবে নিজের জীবনের পরোয়া না করে শত্রু-সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন; কিন্তু গনীমত সংগ্রহ, বণ্টন ও গ্রহণের ব্যাপারে একেবারেই নিস্পৃহ ও উদাসীন থাকেন, যা তাঁর সঙ্গীদের অনেকেই পারেন না। সেনাপতি সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) ঐতিহাসিক কাদেসিয়া যুদ্ধের পর মাদায়েন দখল করে শাহান শাহ্ ইরানের প্রাসাদে প্রবেশ করেন। তিনি 'আমর ইবন মুকাররিনকে (রা) নির্দেশ দেন গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ শত্রু-সম্পদ একত্র করার জন্য। যাতে তার এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে পাঠিয়ে অবশিষ্টগুলো মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করতে পারেন। নির্দেশ মত জমা করা হলো অঢেল সম্পদ এবং এতসব মূল্যবান জিনিসপত্র যার বর্ণনা দুঃসাধ্য। এখানে অসংখ্য ঝুড়ি ভর্তি পারস্য সম্রাটদের ব্যবহার্য সোনা-রূপোর থালা-

---

[৬] তাবাকাত-৭/৭৮

[৭] প্রাগুক্ত

বাসন, ওখানে মূল্যবান কাঠের অসংখ্য বাক্স ভর্তি রাজ-পরিবারের সদস্যদের কাপড়-চোপড় এবং সোনা ও মণি-মুক্তার অলঙ্কারাদি। আবার এখানে রয়েছে মহিলাদের সাজ-সজ্জার জিনিস ও মূল্যবান সুগন্ধিতে ভরা অসংখ্য পাত্র, আবার ওদিকে আছে অসংখ্য বাক্স ভর্তি পারস্য সম্রাট, তাঁদের বীর যোদ্ধা ও সৈনিকদের ব্যবহার্য অগণিত মূল্যবান যুদ্ধাস্ত্র।

সেনাপতি সা'দ (রা) নির্বাচিত সৈনিকরা যখন উন্মুক্ত স্থানে সকল সৈনিকের সামনে এসব গনীমতের মাল বিভিন্নভাবে হিসাব-নিকাশ করছেন ঠিক সে সময় উস্কে-খুসকো ও ধুলিমলিন চেহারার একটি লোক খুব বড় আকারের ও ভারী ওজনের একটি পাত্র দু'হাতে উঁচু করে এনে হাজির করলো। সবাই সেটা নেড়ে চেড়ে ভালো করে দেখলো। তারা বুঝলো এমন পাত্র তারা আর পায়নি। খোলার পর দেখতে পেল সেটি মণি-মুক্তা ও হীরা-জহরতে ঠাসা। উপস্থিত সবাই এবার লোকটিকে প্রশ্ন করলো : এই মহা মূল্যবান সম্পদ তুমি কোথায় পেলে? লোকটি বললো : অমুক যুদ্ধে অমুক স্থানে। তারা আবার প্রশ্ন করলো : এর থেকে কি কিছু নিয়েছো? সে বললো : আল্লাহ্ আপনাদেরকে হিদায়াত করুন। আল্লাহর কসম! এই পাত্রটি এবং এর ভিতরের যা কিছু পারস্য সম্রাটদের, সবই আমার নিকট আমার একটি নখের আগার সমমানের নয়। এটি যদি মুসলমানদের বাইয়তুল মালে জমা না হতো তাহলে আমি এটি মাটি থেকে উঠিয়ে এভাবে আপনাদের কাছে আসতাম না।

এবার লোকেরা প্রশ্ন করলো : আল্লাহ্ আপনাকে সম্মানিত করুন! আপনি কে? লোকটি বললো : আল্লাহর কসম! আমি আপনাদের বা অন্য কারো নিকট আমার পরিচয় দিব না। যাতে আপনারা বা অন্য কেউ আমার কোন রকম প্রশংসা করতে না পারেন। একথা বলে লোকটি চলে গেল। তখন সেখানে উপস্থিত লোকেরা তাদের একজনকে বললো তাকে অনুসরণ করে তথ্য নিয়ে আসার জন্য। এই লোকটি তার অজান্তে অনুসরণ করে তার অন্য সাথীদের নিকট উপস্থিত হলো এবং তাদের নিকট এর পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। তারা বললো : তুমি চেন না? ইনি তো বসরার 'আবিদ 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ্।[৮]

খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে সর্বপ্রথম তাঁকে মাদায়িন অভিযানে দেখা যায়। অন্য কোন অভিযানে তাঁর অংশগ্রহণের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি অধিকাংশ অভিযানে অংশগ্রহণ করতেন। কাতাদা বলেছেন, 'আমির যখন যুদ্ধে যেতেন এবং পথে কোন জঙ্গল পড়তো, আর তাঁকে যদি বলা হতো এখানে বাঘের ভয় আছে, জবাবে তিনি বলতেন, আল্লাহকে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা হয় যে, আমি তাঁকে ছাড়াও অন্য কাউকে ভয় করি।[৯]

খলীফা হযরত 'উছমানের (রা) বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তার বড় কেন্দ্র

---

৮. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-২৮/৩১

৯. আল-কামিল ফিত-তারীখ-৪/১১৭; আল-ইসাবা-৩/৮৬

ছিল তিনটি– বসরা, কূফা ও মিসর। এই বিপ্লব-বিদ্রোহের অগ্নিশিখার বেষ্টনীতে কিছু উঁচু স্তরের সাহাবীও এসে যান। 'আমিরের আবাসস্থল ছিল বসরা। এই ফিতনা-ফাসাদে তিনি যুক্ত না থাকলেও নিজেকে তিনি এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে পারেননি। এক পর্যায়ে তিনি 'উছমান (রা) বিরোধীদের ফাঁদে আটকে যান এবং তাদের সঙ্গী হয়ে পড়েন। একবার বসরাবাসীরা তাদের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হিসেবে তাঁকে খলীফা 'উছমানের (রা) নিকট পাঠায়। তিনি মদীনায় যেয়ে খলীফার সামনে খোলামেলাভাবে নিজের চিন্তা-ভাবনার কথা প্রকাশ করেন। যেমন তিনি বলেন, 'মুসলমানদের একটি দল আপনার কর্মচারীদের পর্যবেক্ষণ করেছে। তারা জেনেছে, করণীয় নয় এমন কিছু কাজ আপনার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। এ কারণে আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং ভবিষ্যতের জন্য তাওবা করুন।' সে সময় পর্যন্ত হযরত 'উছমান (রা) 'আমিরের প্রকৃত অবস্থা ও পরিচয় জ্ঞাত ছিলেন না।

এ কারণে তিনি তাঁর কথা শুনে বলেন, 'ওহে লোকেরা! তোমরা এ লোকটিকে দেখ। অতি সামান্য বিষয়ে কথা বলার জন্য তিনি এসেছেন। লোকেরা তাঁকে একজন 'কারী' (কুরআন পাঠক) মনে করে। অথচ তিনি জানেন না যে, আল্লাহ কোথায়?' 'আমির খলীফার এ কথা শুনে কুরআনের এ আয়াতটি উচ্চারণ করেন : إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، – নিশ্চয় তোমার পরোয়ারদিগার অপেক্ষায় আছেন।' তারপর বলেন, আল্লাহর কসম! আমি ভালো করেই জানি, তিনি অবাধ্যদের অপেক্ষায় আছেন।[১০] খলীফার সাথে এ উত্তপ্ত সংলাপের পর 'আমির বসরায় ফিরে আসেন।

তৎকালীন খলীফার সাথে 'আমিরের এই রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছাড়াও কিছু দীনী অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে ছিল। অথবা বলা চলে, তাঁর প্রতি আরোপ করা হতো। যেমন : তিনি বিয়ে করেন না, গোশ্‌ত খান না, নিজকে হযরত ইবরাহীমের (আ) চেয়ে ভালো অথবা সমান মনে করেন, ওয়ালী বা শাসনকর্তার বাড়ীর দরজা মাড়ান না ইত্যাদি। সরকারের সাথে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধ আগেই হয়েছিল। এ কারণে তাঁর কিছু বিরোধী লোক তাঁর এ সব আচরণ বসরার তৎকালীন ওয়ালীর গোচরীভূত করে। তিনি আবার বিষয়টি হযরত 'উছমানকে (রা) অবহিত করেন। খলীফার দফতর থেকে তদন্তের নির্দেশ আসে এবং সত্য প্রমাণিত হলে তাঁকে শামে পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ দেয়।

খলীফার দফতর থেকে এ নির্দেশ আসার পর বসরার ওয়ালী 'আমিরকে ডেকে পাঠান। তিনি উপস্থিত হলে ওয়ালী তাঁকে বলেন, আপনার প্রতি যেসব অভিযোগ আরোপ করা হয়, তা তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন আমীরুল মু'মিনীন 'উছমান (রা)।

'আমির বললেন : আমার প্রতি কি কি অভিযোগ আরোপ করা হয়?

ওয়ালী তাঁকে অভিযোগগুলো শোনান। 'আমির তখন একটি একটি করে জবাব দিতে

---

১০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৩৬-২৩৭; ৩/১৪২-১৪৩

থাকেন। তিনি বলেন, আমি বিয়ে এ জন্য করিনে যে, স্ত্রী হলে সন্তান হবে। আর তাতে দুনিয়া আমার অন্তরে গেড়ে বসবে। আর তা আল্লাহর যিক্‌র থেকে আমাকে বিরত রাখবে। তবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই। আর গোশ্‌ত এজন্য খাই না যে, আমি যে এলাকায় বসবাস করি সেখানে মাজূসীদের (আগুন ও সূর্যের উপাসক) বাস। বাজারে যে গোশ্‌ত বিক্রি হয় তা আল্লাহর নামে যবেহ হয় কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারিনে। তাই গোশ্‌ত খাইনে। তবে হালাল গোশ্‌ত পেলে খাই। আর হযরত ইবরাহীমের (আ) চেয়ে ভালো বলে মনে করার যে অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে, তার জবাব এই ছাড়া আর কিছু দেব না যে, আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি যদি তাঁর পায়ের ধুলো হতে পারতাম, আর পায়ের সাথে লেগে জান্নাতে চলে যেতাম! আর ওয়ালী ও শাসন কর্তৃত্বের অধিকারীদের বাড়ীর দরজা মাড়াই না বলে যে অভিযোগ, তার জবাব এই যে, তাঁদের দরজায় সব সময় অভাবী ও সাহায্য প্রার্থীদের ভীড় থাকে। আমি তাদের কেউ নই। তাই আমি তাঁদের সুযোগ নষ্ট করতে চাইনে। আপনারা তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনুন এবং তা পূরণ করুন। আর আপনাদের নিকট যাদের কোন প্রয়োজন নেই তাদেরকে তাদের অবস্থায় থাকতে দিন।[১১]

'আমিরের বক্তব্য খলীফা হযরত 'উছমানকে (রা) জানানো হলো। তিনি তাতে আনুগত্যের পরিপন্থী, অথবা সুন্নাহ্ ও ঐক্য বিরোধী কোন কিছু পেলেন না। কিন্তু প্রচারকারীদের অপপ্রচার এতে থামলো না। তারা 'আমিরকে ঘিরে অনেক কথা প্রচার ও বলাবলি করতে লাগলো। ফলে তাঁর সমর্থক ও বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের উপক্রম হলো। ফলে 'উছমান (রা) তাঁকে শামে পাঠিয়ে দেওয়ার এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার আদেশ দেন। অন্যদিকে তথাকার ওয়ালী মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ানকে (রা) নির্দেশ দেন তাঁকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করার ও তাঁর প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হওয়ার জন্য। পরবর্তীকালে 'উছমানের (রা) হত্যাকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করে তার মধ্যে বসরা থেকে 'আমিরের বহিষ্কারের অভিযোগটিও ছিল।[১২]

যে দিন 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ বসরা ত্যাগ করে শামের দিকে যাত্রার জন্য ঘর থেকে বের হলেন সেদিন তাঁর অসংখ্য ছাত্র, আত্মীয়-বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তি তাঁকে বিদায় দেওয়ার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে আসে। তারা তাঁকে বসরার উপকণ্ঠে 'মিবরাদ' পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। তাদের থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বক্ষণে 'আমির বলেন : আমি হাত তুলে দু'আ করছি, আপনারা আমার দু'আর উপর আমীন বলবেন।

উপস্থিত সবাই ঘাড় উঁচু করে তাঁকে দেখতে লাগলো। সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। তিনি দু'হাত উঠিয়ে নিম্নের দু'আটি করেন।[১৩]

---

[১১] তাবাকাত-৭/১০৩-১০৭; তারীখুল ইবন 'আসাকির-৩/৩৬৮-৩৭০

[১২] আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৪/২৮৩

[১৩] তারীখু ইবন 'আসাকির-৩/৩৬৮-৩৬৯; সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা'-৪/১৮-১৯

اَللّٰهُمَّ مَنْ وَشٰى بِىْ، وَكَذَّبَ عَلَىَّ وَأَخْرَجَنِىْ مِنْ مِصْرِىْ (بَلَدِىْ) وَمَزَّقَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ إِخْوَانِىْ، فَأَكْثِرْ مَالَهُ، وَأَصِحَّ جِسْمَهُ وَأَطِلْ عُمْرَهُ.

– 'হে আল্লাহ! যে আমার নামে কুৎসা রটনা করেছে, আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, আমাকে আমার শহর থেকে বের করে দিয়েছে এবং আমাকে ও আমার আত্মীয়-বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছে, তুমি তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও, তার শরীর সুস্থ করে দাও এবং তার জীবনকাল দীর্ঘ করে দাও।' এ দু'আ পাঠের পর তিনি বাহনের মুখ শামের দিক করে চালিত করেন। শামে পৌঁছার পর হযরত মু'আবিয়া (রা) অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে গ্রহণ করেন এবং তাঁর থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করেন। সেবার জন্য একজন দাসী নিয়োগ করে তাকে নির্দেশ দেন, তাঁর রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টার অবস্থা ও ব্যস্ততা সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। শামে আসার পরও 'আমিরের অভ্যাস ও কাজের কোন পরিবর্তন হলো না। তিনি নিয়মিতভাবে প্রতিদিন প্রত্যুষে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন এবং ফিরতেন রাতের অন্ধকারে। আমীর মু'আবিয়া তাঁর জন্য খাবার পাঠাতেন, কিন্তু তিনি তা স্পর্শও করতেন না। কোথা থেকে রুটির একটি টুকরো নিয়ে আসতেন। তাই কিছু পানিতে গুলিয়ে উপর থেকে সেই পানি পান করে 'ইবাদাতে নিমগ্ন হয়ে যেতেন।[১৪] সারাটি রাত 'ইবাদাতে কাটিয়ে দিতেন। দাসী আমীর মু'আবিয়াকে (রা) সবকথা জানালেন। আর তিনি খলীফা 'উছমানকে (রা) সবকথা লিখে পাঠালেন। খলীফা 'আমিরের আসল রূপ অবগত হয়ে তাঁর সাথে সম্পর্ক ভালো করার এবং দশটি দাস ও দশটি বাহনের পশু দেওয়ার জন্য আমীর মু'আবিয়াকে (রা) নির্দেশ দিলেন। আমীর মু'আবিয়া (রা) খলীফার নির্দেশের কথা 'আমিরকে জানালেন। জবাবে 'আমির বললেন : এক শয়তান আগে থেকেই ঘাড়ে চেপে বসে আছে। তার বোঝা এত কম নয় যে দশটি দাসের বোঝা বহন করবো। একটি খচ্চর আমার আছে, বাহনের জন্য তাই যথেষ্ট। অতিরিক্ত বাহনের জন্য কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয় করি। আর আমীরের সম্মান ও নৈকট্য লাভ, তা এতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।[১৫]

'আমিরের প্রকৃত অবস্থা জানার পর হযরত মু'আবিয়া (রা) একদিন তাঁকে বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে বসরায় ফিরে যেতে পারেন। তিনি বললেন, আমি এমন শহরে আর ফিরে যাব না যার অধিবাসীরা আমার সাথে এমন আচরণ করেছে। 'আমির শামে থেকে যান এবং বাকী জীবন সেখানে কাটিয়ে দেন। তবে তাঁর গতিবিধির উপর থেকে সরকারি বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করা হলে তিনি উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে চলে যান। মাঝে মাঝে হযরত মু'আবিয়ার (রা) সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্য আসতেন। হযরত মু'আবিয়া (রা)

---

[১৪] আল-ইসাবা-৩/৮৫

[১৫] তাবাকাত-৭/৭৭-৭৮

সব সময় তাঁর প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করতেন, আর তিনি জবাব দিতেন, আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। তবে হযরত মু'আবিয়া (রা) যখন বেশী পীড়াপীড়ি শুরু করলেন তখন তিনি আবদারের সুরে বললেন : শামের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে রোযার তীব্রতা ও পিপাসার মাধুর্য যেতে বসেছে। আপনি পারলে এই স্থানকে বসরার মত গরম করে দিন।[১৬]

'আমিরের মত মুক্ত, স্বাধীন ও বেপরোয়া মানুষের জন্য স্বদেশ ও বিদেশ সবই সমান। স্বদেশ বসরার জন্য তাঁর বিশেষ কোন টান ও বন্ধন ছিল না। তারপর শামের মত পবিত্র ও নবী-রাসূলদের বিচরণভূমি তিনি লাভ করেন। এ কারণে স্বদেশের সাথে যতটুকু সম্পর্ক ছিল তাও ছিন্ন করে ফেলেন। প্রথমে যখন শামে যান তখন বসরা ও তথাকার জ্ঞানী-গুণী ও 'ইলমী-মজলিসের প্রতি একটা টান অনুভব করতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, আপনি তো বসরায় ফিরে যেতে পারেন। বললেন : আল্লাহর কসম! সেটা আমার শহর। সেই শহর যেখানে আমি হিজরাত করেছিলাম, সেখানে আমি কুরআন শিখেছিলাম।[১৭] কিন্তু পরবর্তীকালে বসরা ও বসরার অধিবাসী, সব পিছুটান ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একাগ্রচিত্তে 'ইবাদাতে নিমগ্ন হয়ে যান। বসরা থেকে কোন ব্যক্তি শামে এলে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি খুব একটা উৎফুল্ল হতেন না। কাজী 'উবায়দুল্লাহ ইবন হাসান বর্ণনা করেছেন। একবার আমি শামে গেলাম। 'আমিরের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর খোঁজ করলাম। জানতে পেলাম যে, তিনি এক বৃদ্ধার সাথে দেখা করার জন্য মাঝে মাঝে তার ওখানে আসেন। আমি সেই বৃদ্ধার কাছে গেলাম। তিনি একটি পাহাড় দেখিয়ে বললেন, 'আমির এই পাহাড়ের নীচে রাত-দিন নামায-রোযায় মশগুল থাকেন। তুমি দেখা করতে চাইলে ইফতারের সময় যেও। তখন তিনি দেখা দেবেন। বৃদ্ধার কথা মত আমি ইফতারের সময় সেই পাহাড়ের নীচে গেলাম। 'আমির সেখানে ছিলেন। আমি সালাম করলাম। তিনি শুধু এমন এক ব্যক্তির কথা জিজ্ঞেস করলেন যার সাথে মাত্র একদিন আগে এই শামে আমার দেখা হয়েছে। নিজের দেশ ও দেশের কোন মানুষের কথা কিছুই জানতে চাইলেন না। এটাও জানতে চাইলেন না যে, কে বেঁচে আছে, আর কে মারা গেছে? তাঁর সাথে কিছু খেতে বলার সৌজন্যও দেখালেন না। এমন অপ্রত্যাশিত আচরণ দেখে আমি তাঁকে বললাম : আপনার মধ্যে অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করছি। বললেন : কি? বললাম : দীর্ঘদিন হলো আপনি আমাদের থেকে দূরে আছেন। কিন্তু আপনি আমাদের কারো সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলেন না। আর যাও জানতে চাইলেন, তা এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে যার সাথে মাত্র একদিন আগে আমার দেখা হয়েছে। বললেন : আমি তোমাকে সুস্থ দেখেছি। তাই তোমার সম্পর্কে প্রশ্ন করা প্রয়োজন মনে করিনি। বললাম : আমি সদ্য দেশ থেকে এসেছি। আপনি একথা জানতে চাননি, কে মারা গেছে, আর কে বেঁচে আছে?

---

[১৬] আন-কামিল ফিত-তারীখ-৪/১১৫

[১৭] 'আসরুত তাবি'ঈন-২৩২

বললেন : এমন লোকের সম্পর্কে কী জিজ্ঞেস করবো যারা মারা গেছে। তারা শেষ হয়ে গেছে। আর যারা মারা যায়নি তারা খুব শিগগিরই মারা যাবে। বললাম : আপনি আমাকে আপনার সাথে খেতে বলার সৌজন্যও দেখালেন না। বললেন : আমি জানতাম, তুমি খুব ভালো খাবার খেয়ে থাক। এ কারণে, এই শুকনো রুটি তোমাকে কিভাবে খেতে বলি?[১৮]

'আমির 'ইবাদাত, আধ্যাত্মিক সাধনা, দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা, খোদাভীতি এবং প্রবৃত্তি দমনের সাধনায় এমন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন যেখানে পার্থিব মন-ভোলানো এবং আরাম-আয়েশের কোন কিছুর অবকাশ ছিল না। তিনি প্রবৃত্তির দমন ও আধ্যাত্মিক সাধনাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন। এক সময় তিনি বলতেন, যদি সম্ভব হয় তাহলে আমি জীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবো। তিনি তাঁর এই ইচ্ছাকে এমন সফলভাবে পূর্ণ করেন যে দুনিয়ার যাবতীয় সুখ-সম্পদ ও আনন্দ-ফূর্তি যা তাঁর এই ইচ্ছা পূরণে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারতো, সবই পরিহার করেন। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন, 'আমার অন্তর থেকে নারীর ইচ্ছা ও লোভ দূর করে দিন। এ জিনিস আমার জীবনের জন্য সবচেয়ে বেশী মারাত্মক। একমাত্র আপনার ভয় ছাড়া আর কারো ভয়-ভীতি থেকে আমার অন্তরকে পরিষ্কার করে দিন। আমার চোখ থেকে ঘুম দূর করে দিন, যাতে রাত-দিন সব সময় আমার ইচ্ছা মত আপনার 'ইবাদাত করতে পারি।' আল্লাহ তাঁর প্রথম দু'টি দু'আ কবুল করেন কিন্তু দীর্ঘ দিন যাবত ঘুমকে আয়ত্তে আনতে পারেননি।[১৯]

তিনি ঘুম ও ক্ষুধাকে আয়ত্তে আনতে না পারলেও আজীবন এ দু'টিকে পরাভূত করে রাখার জন্য চেষ্টা করে গেছেন। তিনি ঘুম দূর করার এবং ক্ষুধা ভুলে থাকার এই পন্থা বের করেন যে, রাত জেগে আল্লাহর 'ইবাদাত করতেন, আর দিনে রোযা রেখে ঘুমোতেন। শামে অবস্থানকালে সারা দিন রোযা রেখে এবং সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন। আহার ছিল শুকনো রুটি যা পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিতেন।[২০] এই চূড়ান্ত রকমের চেষ্টা-সাধনা ও অনুশীলন তাঁর দেহকে এত ক্ষীণ ও দুর্বল করে ফেলেছিল যে, তাঁকে দেখে মানুষের দয়া হতো।

এভাবে তাঁর প্রবৃত্তি দমনের চূড়ান্ত সীমা 'রাহ্বানিয়াত' বা বৈরাগ্যবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়। তাঁর যুগের লোকেরাও তাঁর এসব কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছিল। সরকারী তদন্তের মুখোমুখিও তাঁকে হতে হয়েছিল। তখন তিনি যেসব উত্তর দিয়েছিলেন তা দ্বারা তাঁর প্রতি মানুষের যেসব সন্দেহ-সংশয় দেখা দিয়েছিল তা অনেকখানি দূর হয়ে যায়। একবার এক ব্যক্তি তাঁর এমন কৌমার্য ব্রতের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে তাঁকে এ আয়াতটি শোনান :

---

১৮. তাবাকাত-৭/৭৮-৭৯

১৯. প্রাগুক্ত-৭/৭৫-৭৬

২০. প্রাগুক্ত-৭/৭৭, ৮০

قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.[২১]

– 'আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করেছি।'

অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ, যাঁরা ছিলেন আল্লাহ্র সবচেয়ে বেশী 'ইবাদাতকারী বান্দা-তাঁরা যদি স্ত্রী ও সন্তান পরিহার না করে থাকেন তাহ্লে একজন সাধারণ মানুষের জন্য তা কিভাবে বৈধ হতে পারে? 'আমির কুরআনের নিম্নের আয়াতটি দ্বারাই তার জবাব দেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ.[২২]

– 'আমি মানুষ ও জিনকে কেবল আমার 'ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।'

আরেকবার এক ব্যক্তি তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করলো : আপনি বিয়ে-শাদী করেন না কেন? তিনি এর একটা মনস্তাত্ত্বিক জবাব দেন। বলেন : আমার মধ্যে না কামাগ্নি ও ভোগ স্পৃহা আছে, আর না আছে আমার ধন-সম্পদ। এমতাবস্থায় আমি কেন একজন মুসলিম মহিলাকে ধোঁকা দিব?[২৩]

একবার বসরার আমীর 'আমিরকে বললেন, আমীরুল মু'মিনীন 'উছমান (রা) আমাকে বলেছেন, আমি যেন আপনাকে বিয়ে করতে বলি, আর আপনি বিয়ে করলে বাইতুল মাল থেকে আপনার মাহ্র আদায় করে দিই। অতএব, আপনি আপনার পছন্দমত কাউকে বিয়ে করুন। 'বাইতুল মাল' থেকে মাহ্র আদায় করা হবে।

'আমির একটু হেসে বললেন : আমি পয়গাম দিয়েই রেখেছি। ওয়ালী বললেন : কাকে? 'আমির বললেন : যে আমার সামান্য ছেঁড়া-ফাটা কাপড় ও সামান্য শুকনো খেজুর গ্রহণ করতে রাজী হয়। তারপর তিনি পাশে বসা লোকদের দিকে ফিরে বলেন : আমি আপনাদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করছি, আপনারা উত্তর দিন। আপনাদের প্রত্যেকের অন্তরে তার পরিবারের জন্য একটি অংশ আছে না? তারা বললেন : হাঁ, আছে। তিনি প্রশ্ন করলেন : সন্তানদের জন্য ভালোবাসা আছে না? তাঁরা বললেন : হাঁ, আছে। এবার 'আমির বললেন : যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! পরিবার ও সন্তান আমাকে আল্লাহ্র যিক্র থেকে বিরত রাখুক, তার চেয়ে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে আমার পাঁজর ক্ষত-বিক্ষত করা হোক, আমার বেশী পছন্দনীয়। আল্লাহ্র কসম! আমি আমার জীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য রাখবো।[২৪]

'আমিরের বসরায় অবস্থানকালে তাঁর অত্যধিক ও অস্বাভাবিক 'ইবাদাত-বন্দেগীর অবস্থা দেখে একদিন কিছু লোক তাঁকে বললো : আপনার দেহেরও আপনার উপর হক বা অধিকার আছে। একথা শুনে 'আমির নিজের 'নফ্স'-কে সম্বোধন করে বলেন : আল্লাহ্র

---

২১. সূরা আর-রা'দু-৩৮

২২. সূরা আয-যারিয়াত-৫২

২৩. তাবাকাত-৭/৭৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/১৭

২৪. 'আসরুত তাবি'ঈন-২৩২

কসম! 'তোমাকে শুধু আল্লাহর 'ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি তোমার দ্বারা এত বেশী 'আমল করাবো যে শয্যার আরাম তোমাকে স্পর্শ করার সুযোগ পাবে না।' তারপর তিনি শহর থেকে বেরিয়ে 'ওয়াদী আস-সিবা' (হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের উপত্যকা) চলে যান। সেখানে তিনি 'হামামা' নামক একজন হাবশী 'আবিদকে দেখতে পেলেন। এখানে উপত্যকার একটি স্থানে তিনি নামায পড়তেন, আর অন্য প্রান্তে 'ইবাদাতে মশগুল থাকতেন হামামা। একাধারে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত পূর্ণ হওয়ার আগে কেউ তাঁর নিজের স্থান থেকে সরতেন না। চল্লিশ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর 'আমির গেলেন হামামার কাছে। তাঁকে প্রশ্ন করলেন : আল্লাহ্ আপনার প্রতি দয়া করুন! আপনি কে?

হামামা : আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দিন।

'আমিরের বার বার পীড়াপীড়িতে তিনি বলেন : আমি হামামা। 'আমির বললেন : যে হামামার কথা আমি শুনেছি, তিনি যদি আপনি হন তাহলে এ পৃথিবীতে এখন আপনার চেয়ে বড় 'ইবাদাতকারী দ্বিতীয় কেউ নেই। আচ্ছা, আমাকে একটু বলুন তো সবচেয়ে ভালো অভ্যাস কি?

হামামা : আমার 'আমল খুবই সীমিত। যদি না ফরজ নামায থাকতো– যাতে কিয়াম ও সিজদা আছে, তাহলে আমি আমার গোটা জীবনই রুকুতে এবং চেহারা মাটিতে ঠেকিয়ে কাটিয়ে দিতাম।

হামামা এবার জানতে চাইলেন : তা ভাই আপনার পরিচয়টা কি?

'আমির : আমি 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ।

হামামা : আপনি যদি সেই 'আমির হন যার কথা আমাকে বলা হয়েছে, তাহলে আপনি ধরাপৃষ্ঠে সবচেয়ে বেশী 'ইবাদাতকারী ব্যক্তি। আচ্ছা, আপনি বলুন সবচেয়ে ভালো অভ্যাস কি?

'আমির বললেন : আমার 'আমলও সীমিত এবং ক্রটিপূর্ণ। তবে একটি জিনিস আমার অন্তরে আল্লাহর ভীতিকে বড় করে দিয়েছে। ফলে আমি এখন তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করিনে।

হামামা : সেই জিনিসটা কি?

'আমির তখন এ আয়াতটি পাঠ করেন :

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ.[২৫]

– 'তা এমন এক দিন, যেদিন সব মানুষই সমবেত হবে এবং সে দিনটি যে হাজিরার দিন।'

এ সময় হঠাৎ একটি হিংস্র জন্তু তাদেরকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে খেয়ে ফেলার উপক্রম করলো।

---

[২৫] ২৫. সূরা হূদ-১০৩

'আমির জন্তুর তর্জন-গর্জনকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে উপরোক্ত আয়াতটি বার বার আওড়াতে লাগলেন। হামামা বললেন : ওহে 'আমির! এই মারাত্মক বিপদ কি আপনি লক্ষ্য করছেন না?

'আমির : মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনকে ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় করতে আমার লজ্জা হয়। আমি আল্লাহকে এত গভীরভাবে ভালোবাসি যে তা আমার সব বালা-মুসীবতকে সহজ করে দিয়েছে। আমার মধ্যে তাঁর ভালোবাসা থাকতে আমার সকাল-সন্ধ্যা কেমন কাটলো সে ব্যাপারে আমার কোন পরোয়া নেই।[২৬]

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার বা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে তাঁর জিহ্বার তরবারি সব সময় কোষমুক্ত থাকতো। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধি-বিধান লংঘিত হতে দেখলে তিনি ক্রোধে, উত্তেজনায় ফেটে পড়তেন। একবার তিনি আল্লাহর তাসবীহ্ ও তাহমীদ পাঠ ও শুকরিয়া আদায় করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলছেন। এমন সময় দেখতে পেলেন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একজন সদস্য পুলিশ অন্য এক ব্যক্তির গলা এমনভাবে চেপে ধরে রেখেছে যে, লোকটির দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এর মধ্যে আরেকজন পুলিশ তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। দু'জনে মিলে জোর-জবরদস্তী লোকটিকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। 'আমির লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে শুনতে পেল, সে চিৎকার করে বলছে : ওহে মুসলিমগণ, আমাকে বাঁচান! আমি একজন অমুসলিম যিম্মী, আমাকে বাঁচান! 'আমির তাঁর কাছে গিয়ে বললেন : ওহে, আপনার কাছে কি জিযিয়া পাওনা আছে? লোকটি বললো : না। আমি সব পরিশোধ করেছি। আপনি আমাকে এই পুলিশের হাত থেকে বাঁচান। এবার 'আমির পুলিশের প্রতি তাকিয়ে বললেন : তাকে ছেড়ে দিন। পুলিশ তাঁর কথায় কান না দিয়ে বললো : আমরা তাকে ছাড়বো না। তাকে বসরায় পুলিশ বাহিনীর প্রধানের উদ্যানে যেতে হবে এবং পরিচ্ছন্ন করতে হবে। 'আমির যিম্মী লোকটিকে বললেন : তুমি তাদের সাথে গিয়ে তারা যা বলছে তা শুনছো না কেন? লোকটি বললো : আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার কাঁধে অনেকগুলো শিশু সন্তানের দায়িত্ব রয়েছে। তাদের জীবিকার জন্য আমাকে কাজ করতে হয়। এ কাজ করলে আমি আমার সন্তানদের জীবিকার জন্য কাজ করতে পারিনে। কারণ, এদের কাজে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এবার 'আমির পুলিশের লোকটিকে নির্দেশ দিলেন : তাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু পুলিশ সে নির্দেশ মানলো না। 'আমির এবার পুলিশকে লক্ষ্য করে বললেন : ওহে, তুমি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের (সা) অঙ্গীকার ভঙ্গ করছো? আল্লাহর কসম! আমি জীবিত থাকতে তুমি মুহাম্মাদের (সা) অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারবে না। তারপর 'আমির পুলিশটির হাত থেকে জোর করে লোকটি ছিনিয়ে নেন এবং তাকে ছেড়ে দিয়ে বলেন : তোমার পরিবারের লোকদের জীবিকার অন্বেষণে চলে যাও।[২৭]

---

২৬. হিলয়াতুল আওলিয়া-২/৮৯; 'আসরুত তাবি'ঈন-২২৩-২২৪

২৭. তাবাকাত-৭/৭৪; তারীখু ইবন 'আসাকির-৩/৩৬৮-৩৭১

বসরার ওয়ালী, যিনি পুলিশ বাহিনীর প্রধান ছিলেন, তাঁর কাছে এ সংবাদ পৌছানো হয়। 'আমিরের একাজকে সরকার-বিরোধী কর্মতৎপরতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

আমীর-উমারা ও রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর উদাসীন ও বেপরোয়া ভাব অসন্তুষ্টির পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। তিনি ঐসব লোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলামেশাও পছন্দ করতেন না। তাঁর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছিল তার মধ্যে আমীর-উমারা ও শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা না করার অভিযোগও ছিল। তার জবাবে তিনি একথা বলেছিলেন যে, আপনাদের কাছে সব সময় অভাবী ও প্রয়োজনীয় কাজের লোকদের ভীড় জমে থাকে। আপনারা তাদের প্রয়োজন পূরণ করুন। আর আপনাদের কাছে যাদের কোন প্রয়োজন নেই তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থায় থাকতে দিন।[২৮] তিনি খলীফা ও আমীর-উমারা কাউকে ভয় ও পরোয়া করতেন না।

হযরত 'উছমানের (রা) সামনে তিনি যে সাহস ও নির্ভিকতার সাথে অকপটে নিজের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার কথা প্রকাশ করেন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালে বসরার কারীদের একটি প্রতিনিধিদল শামে পাঠানো হয়। তাতে 'আমিরও ছিলেন। মুদারিব ইবন হায্ন, যিনি প্রতিনিধিদলটি পাঠিয়েছিলেন, একদিন আমীর মু'আবিয়াকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন : আমরা কারীদের যে দলটি পাঠিয়েছিলাম তাদের কেমন দেখলেন? তিনি জবাব দিলেন : একজন ছাড়া বাকী সবাই মিথ্যা প্রশংসা করে ও বেশী কথা বলে। মিথ্যা নিয়ে আসে এবং আস্থাহীনতা নিয়ে ফিরে যায়। শুধু এক ব্যক্তি স্বাভাবিক মানুষ ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আমীরুল মু'মিনীন! সেই লোকটি কে? বললেন : 'আমির।[২৯]

যদি কোন আমীর অথবা সরকারী পদস্থ কর্মকর্তা কখনো নিজেই তাঁর কাছে আসতেন তখন তাঁর সাথেও তিনি একই রকম আচরণ করতেন। একবার কোন এক যুদ্ধে গেছেন। পথে যাত্রাবিরতি দেওয়া হয়। 'আমির একটি গীর্জার সীমানায় ঢুকে পড়েন এবং একজন লোককে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নির্দেশ দেন, কেউ যেন ভিতরে প্রবেশ না করে। কিছুক্ষণ পর সেই লোকটি এসে বলেন, আমীর ভিতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। আমীরকে তিনি ভিতরে ডেকে নেন এবং তাঁকে বলেন : আমি আপনাকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে দুনিয়ার প্রতি প্রলুব্ধ করবেন না এবং আখিরাতকে অমার কাছে ছোট করে দেখাবেন না।[৩০]

প্রকৃত বাস্তবতা এই যে, 'আমিরের অবস্থান যে জগতে ছিল সেখানে পার্থিব কোন প্রকার বন্ধন, সম্পর্ক ও রীতি-পদ্ধতির কোন বালাই ছিল না। এ কারণে, শুধু আমীর-উমারা কেন কারো সাথে কোন রকম বন্ধন ও সম্পর্ক তাঁর ছিল না। দুনিয়ায় তাঁর কেবল

---

[২৮] ২৮. তাবাকাত-৭/৭৪
[২৯] ২৯. প্রাগুক্ত-৭/৭৮
[৩০] ৩০. প্রাগুক্ত-৭/৭৭

মুতাররিফ বসরীর সাথে অন্তরের সম্পর্ক ছিল। আর মহিলাদের মধ্যে একজন অতি সাধারণ ছাগলের রাখাল মহিলার প্রতি তাঁর অন্তরে দয়া ও সমবেদনার উদ্রেক হয়। কিন্তু তাঁর সাথে কোন রকম সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই মহিলাটি মারা যায়। মুতাররিফের সাথে তাঁর অপ্রকৃতিস্থ বা দিওয়ানা ধরনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তাই তিনি বসরা ত্যাগের সময় তাঁর নিকট থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য এক রাতে কয়েকবার মুতাররিফের গৃহে যান। প্রত্যেক বারই তিনি মুতাররিফকে বলেন : 'আমার বাবা-মা তোমার জন্য কোরবান হোক! আল্লাহর কসম! তোমার ভালোবাসা আমাকে বার বার তোমার কাছে নিয়ে আসছে।[৩১]

আর মহিলাটির ঘটনা এই রকম। একজন অতি গরিব ও 'আবিদা মহিলা কয়েকজন বেদুইন লোকের ছাগল চরাতো। সে তাদের সব রকমের নির্যাতন সহ্য করতো। 'আমিরের সাথে তাঁর গুণের দিক দিয়ে অনেক মিল থাকায় লোকেরা 'আমিরকে বলতো, অমুক মহিলা আপনার স্ত্রী এবং সে একজন জান্নাতী মহিলা। 'আমির তার সন্ধানে বের হলেন। সে মহিলার জীবন ছিল এই রকম যে, সারাদিন অসভ্য ও বর্বর বেদুইনদের ছাগল চরাতো। দিন শেষে যখন ছাগলের পাল নিয়ে বাড়ী ফিরতো তখন বেদুইনরা গালাগালির মাধ্যমে তাকে স্বাগতম জানাতো। আর সামনে শুকনো রুটির দু'টি টুকরো ছুড়ে মারতো। সে তা কুড়িয়ে নিয়ে একটি টুকরো বাড়ীর লোকদের দিত। সারাদিন সে রোযা রাখতো। তাই দ্বিতীয় টুকরোটি দিয়ে সে সন্ধ্যায় ইফতার করতো। 'আমির তাকে খুঁজে বের করেন। যখন সে ছাগল চরানোর জন্য বেরিয়ে যায় তখন 'আমিরও সংগে যান। এক স্থানে পৌছে সেই মহিলা ছাগলগুলো ছেড়ে দিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। 'আমির তাকে বললেন, তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে বলতে পার। সে বললো : আমার কোন প্রয়োজনই নেই। 'আমির যখন বেশী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন তখন সে বললো, আমার শুধু এতটুকু ইচ্ছা যে, আমি যদি দুই টুকরো সাদা কাপড় পেতাম যা আমার কাফনের কাজে আসতো। 'আমির তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই বেদুইনরা তোমাকে গালি দেয় কেন? সে উত্তর দিল : এতে আমি আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করি। এই সংলাপের পর 'আমির তার মনিবদের নিকট যান এবং তাদেরকে প্রশ্ন করেন : তোমরা এই মহিলাকে গালি দাও কেন? তারা উত্তর দিল : আমরা যদি এমনটি না করি তাহলে সে আমাদের কাজের উপযুক্ত থাকবে না। 'আমির বললেন : তোমরা ওকে আমাদের কাছে বিক্রী করে দাও। তারা বললো : যত মূল্যই দাও না কেন আমরা তাকে আমাদের থেকে পৃথক করবো না। এ উত্তর শুনে 'আমির ফিরে যান এবং মহিলার ইচ্ছা অনুযায়ী দুই প্রস্থ কাপড় সংগ্রহ করে তার কাছে যান। কিন্তু কী অবাক ব্যাপার! সেই মহিলা তখন এই দুনিয়া ছেড়ে পরলোকে যাত্রা করেছে। 'আমির তার মনিবদের অনুমতি নিয়ে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেন।[৩২] এভাবে এ

---

৩১. প্রাগুক্ত-৭/৮০

৩২. প্রাগুক্ত-৭/৭৪

দুনিয়ায় 'আমিরের একজন মহিলার সাথে সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তা শেষ হয়।

'আমির একজন বড় মাপের দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। মুজাহিদদেরকে আর্থিক সাহায্য দানের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। দু'হাজার দিরহাম ভাতা পেতেন। সেই ভাতা যখনই পেতেন তখন গরিব-মিসকীন যাকে পথে পেতেন তাদের মধ্যে বিলাতে বিলাতে ঘরে ফিরতেন।

বসরা ত্যাগের পর 'আমির আর কোন দিন বসরায় ফিরে আসেননি। মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের প্রথম কিবলা 'বাইতুল মাকদিস'কে কেন্দ্র করে তার আশে-পাশে বসবাস করতে থাকেন। আমীর মু'আবিয়া (রা), যিনি ছিলেন তৎকালীন শামের ওয়ালী এবং পরবর্তীকালে মুসলিম জাহানের খলীফা, তাঁর প্রতি সীমাহীন সম্মান প্রদর্শন করতেন। সব সময় তাঁর খোঁজ-খবর রাখতেন। দিনের পর দিন পেরিয়ে বহু বছর গড়িয়ে গেল। 'আমিরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে চললো। অবশেষে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যা নিলেন। রোগের তীব্রতা বেড়ে গেল। তাঁর শুভানুধ্যায়ী ও গুণমুগ্ধরা বুঝতে পারলেন এ তাঁর অন্তিম রোগ। তাঁরা তাঁকে দেখার জন্য গেলেন। তাঁদেরকে দেখে তিনি কান্না শুরু করলেন। অশ্রু গড়িয়ে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। একজন বললেন : 'আমির! আপনি তো একজন নেক্‌কার, দুনিয়া বিরাগী, খোদাভীরু 'আবিদ মানুষ ছিলেন। আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন? 'আমির বললেন : আল্লাহর কসম! আমি দুনিয়ার প্রতি লোভের বশবর্তী হয়ে অথবা মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছিনে। আমি কাঁদছি দীর্ঘ ভ্রমণ ও স্বল্প পাথেয়-এর কথা চিন্তা করে। উর্ধ্বে আরোহণ ও নিম্নে পতনের মাঝ দিয়ে আমার জীবন কেটেছে। এরপর আছে জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আমি জানিনে কোথায় হবে আমার ঠিকানা।[৩৩] একথা বলতে বলতে তাঁর রূহটি তাঁর সর্বোচ্চ বান্ধবের নিকট পৌছে গেল। তখন হযরত মু'আবিয়ার (রা) শাসনকাল। বাইতুল মাকদিসে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩৪]

'আমির-এর সম্পর্কে এক ব্যক্তির একটি স্বপ্ন উল্লেখ করার মত। এ স্বপ্নের দ্বারা তাঁর আধ্যাত্মিকতা কোন স্তরের ছিল তা অনুমান করা যায়। সা'ঈদ নামের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। একবার এক ব্যক্তি স্বপ্নে নবীর (সা) অপরূপ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেন। সেই ব্যক্তি আবেদন জানায় : হুজুর! আমার গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করুন। তিনি বলেন : তোমাদের জন্য 'আমির দু'আ করছেন। সেই ব্যক্তি 'আমিরের নিকট এই স্বপ্ন বর্ণনা করলে তিনি প্রবল আবেগে এত বিগলিত হয়ে যান যে, তাঁর কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হয়।[৩৫]

হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ছিলেন 'আমিরের অতি শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক।

---

[৩৩] সিফাতুস সাফওয়া-৩/২১১

[৩৪] আল-ইসাবা-৩/৮৬; 'আসরুত তাবি'ঈন-২৩৩

[৩৫] তাবাকাত-৭/৮০

শিক্ষক তাঁর প্রিয় ছাত্রের সব গতিবিধি ও কাজকর্মের প্রতি সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। মাঝে মধ্যে প্রয়োজন হলে জরুরী নির্দেশনাও দিতেন। একবার তিনি একটি চিঠিতে 'আমিরকে লেখেন : অতঃপর এই যে, আমি একটি বিষয়ে তোমার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, এখন আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি তা পরিবর্তন করে ফেলেছো। যদি তুমি সেই অঙ্গীকারের উপর থেকে থাক তাহলে আল্লাহকে ভয় কর এবং তার উপর অটল থাক। আর তাই যদি সত্য হয় যা আমি শুনেছি, তাহলে আল্লাহকে ভয় কর এবং সেই অঙ্গীকারে ফিরে আস।[৩৬]

'উতবী বলেছেন, আমাদের শিক্ষকরা বলতেন : যুহ্দ ও 'ইবাদাত আটজন তাবি'ঈর মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেছে। সেই আটজনের একজন হলেন 'আমির।[৩৭]

একবার 'আমিরকে বলা হলো, আপনি একটু দুনিয়ার পরিচয় দিন। বললেন : দুনিয়া হলো মৃত্যুর মা, সুদৃঢ়ের ভঙ্গকারী, দান ও অনুগ্রহ ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশী এবং তার মধ্যে যা আছে সবই এক অজানার দিকে ধাবমান।[৩৮]

'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ বলতেন : 'কথা যখন অন্তর থেকে বের হয় তখন তা অন্তরে পড়ে। আর যখন জিহ্বা থেকে বের হয় তখন তা কানের ছিদ্র অতিক্রম করে না।'[৩৯]

'আমির ইবন 'আবদিল্লাহকে একবার বলা হলো : মানুষ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? বললেন : আমি তার সম্পর্কে কি বলবো যে ক্ষুধার্ত হলে বিনয়ী ও বাধ্য হয়, আর পেট ভরলে বিদ্রোহী হয়।[৪০]

---

[৩৬] আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/১৫১

[৩৭] প্রাগুক্ত-৩/১৭১

[৩৮] প্রাগুক্ত-৩/১৭২

[৩৯] কিতাবুল হায়ওয়ান-৪/২১০; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৮৩; ৪/২৯

[৪০] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/১৬৯

'আলকামা ইবন কায়স (রহ)

আবূ শিব্‌ল 'আলকামা ছিলেন বিখ্যাত তাবি'ঈ মুহাদ্দিছ ইবরাহীম আন-নাখা'ঈর মামা এবং আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদের চাচা। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন।[১] জ্ঞান, চারিত্রিক উৎকর্ষ, পার্থিব ভোগ-বিলাস বিমুখতা ও খোদাভীতির দিক দিয়ে বিশিষ্ট তাবি'ঈদের অন্তর্গত ছিলেন। ইমাম আয-যাহ্‌বী তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে : তিনি কূফার বড় ফকীহ্, 'আলিম, কারী, ইমাম, হাফেজ, মুজাবিবদ ও মুজতাহিদ।[২]

তিনি এমন এক যুগ লাভ করেন যেখানে বহু বড় সাহাবীর সান্নিধ্যে থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। হযরত 'উমার (রা), 'আলী মুরতাদা (রা), 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (রা), হুযায়ফা ইবন আল-ইয়ামান (রা), সালমান আল-ফারেসী (রা), আবূ মাসউদ আল-বাদরী (রা), আবুদ্ দারদা' (রা) প্রমুখ উঁচু স্তরের সাহাবায়ে কিরাম তখন বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং বর্ণনাও করেছেন। তবে হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদের (রা) জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে বিশেষভাবে উপকার লাভ করেন। তিনি 'আলকামাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দেন। আসওয়াদ বলেন : 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (রা) 'আলকামাকে যেভাবে কুরআন শিক্ষা দিতেন, ঠিক সেইভাবে তাশাহ্‌হুদও শিক্ষা দিতেন।[৩] তাঁর এমন বিশেষ মনোযোগ ও অনুগ্রহে 'আলকামা দ্বিতীয় ইবন মাস'উদে (রা) পরিণত হন। ইবন মাস'উদ (রা) নিজেই বলতেন, আমি যত কিছু পড়েছি ও জেনেছি, তা সবই 'আলকামা পড়েছে ও জেনেছে।[৪] তাঁর জ্ঞানগত যোগ্যতা ও উৎকর্ষের ব্যাপারে সকল 'আলিম ও মুহাদ্দিছ একমত। ইমাম যাহাবী লিখেছেন : তিনি একজন ফকীহ্ ও শ্রেষ্ঠ ইমাম। ইমাম নাওবী বলেছেন : 'আলকামা একজন উঁচু স্তরের, সুমহান মর্যাদার এবং সম্পূর্ণতার অধিকারী ফকীহ্ ছিলেন।[৫]

কুরআন, হাদীছ, ফিকাহ্ তথা সকল জ্ঞানে 'আলকামার সমান দক্ষতা ছিল। কুরআনের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন হযরত ইবন মাস'উদের (রা) নিকট। ইমাম যাহ্‌বী লিখেছেন:[৬]

وَجَوَّدَ الْقُرْآنَ عَلَى اِبْنِ مَسْعُوْدٍ، - বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করা শিখেছিলেন ইবন মাস'উদের নিকট।' ইবন মাস'উদ (রা) নিজে মাঝে মাঝে নিজের পাঠের শুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য 'আলকামাকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। 'আলকামা বর্ণনা করেছেন। একবার ইবন মাস'উদ আমাকে বললেন, তুমি সূরা আল বাকারায় আমার ভুল ধরবে। একথা বলে তিনি আমাকে সূরা আল বাকারা পাঠ করে শুনিয়ে জানতে চাইলেন : আমার

---

১. তাহযীবুত তাহযীব-৭/২৭৬
২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৫৩
৩. তাবাকাত-৬/৫৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৫৮
৪. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৪১
৫. তাহযীবুল আসমা'-১/৩৪২
৬. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৪৮

কিছু ছুটে যায়নি তো? আমি বললাম : একটি হরফ ছুটে গেছে। তিনি নিজেই বললেন : অমুক হরফ। আমি বললাম : হাঁ।[৭]

তিনি চমৎকার কণ্ঠ ও মিষ্টি আওয়াজের মানুষ ছিলেন। এ কারণে ইবন মাস'ঊদ (রা) 'তারতীল' (স্পষ্ট ও সুমধুর সুর) করে কুরআন পাঠ করার জন্য তাঁকে বলতেন। তিনি নিজেই বলতেন, আল্লাহ্ আমাকে মিষ্টি গলা দিয়েছিলেন। 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'ঊদ (রা) আমার দ্বারা কুরআন পাঠ করিয়ে শুনতেন, আর বলতেন, আমার মা-বাবা তোমার প্রতি কুরবান হোক! একটু মিষ্টি সুরে পাঠ কর। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) একথা বলতে শুনেছি যে, মিষ্টি ধ্বনি কুরআনের ভূষণ।[৮]

তিনি একজন শ্রেষ্ঠ হাফেজে হাদীছ ছিলেন। ইমাম যাহ্বী তাঁকে হাদীছের হাফেজ ও লেখকদের দ্বিতীয় স্তরে স্থান দিয়েছেন।[৯] স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। কোন জিনিস একবার মুখস্থ করে নিলে তা যেন বইয়ের মত সংরক্ষিত হয়ে যেত। তিনি নিজে বলতেন : যে জিনিস আমি আমার যৌবনে মুখস্থ করেছি তা এখন এমনভাবে পাঠ করি যেন কাগজে লেখা কোন জিনিস দেখে দেখে পাঠ করছি।[১০] এমন এক অসাধারণ স্মৃতি শক্তি নিয়ে তিনি হযরত 'উমার (রা), 'উছমান (রা), 'আলী (রা), সা'দ (রা), হুযায়ফা ইবন আল-ইয়ামান (রা), আবুদ দারদা' (রা), আবূ মাস'ঊদ (রা), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা), খাব্বাব ইবন আল-আরাত (রা), খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদ (রা), মা'কাল ইবন সিনান (রা), উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা), 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'ঊদ (রা) প্রমুখের মত শ্রেষ্ঠ 'আলিম সাহাবীদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন।[১১] এই মহান ব্যক্তিবর্গের বদান্যতায় তিনি হাদীছের একজন অতি বড় হাফেজে পরিণত হন। ইবন সা'দ তাঁকে বহু হাদীছের ধারক এবং ইমাম যাহ্বী শ্রেষ্ঠ ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।[১২] ইয়াহইয়া ইবন আল-ইয়ামান তাঁর ছেলেকে বলতেন, হাদীছের ইমাম চারজন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে : 'আবদুল্লাহ, 'আলকামা, ইবরাহীম এবং তুমি দাঊদ।[১৩]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদের (রা) হাদীছের বেশীর ভাগ অংশ, বরং বলা চলে প্রায় সবই 'আলকামা তাঁর বুকের মধ্যে ধারণ করেন।

এত বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মুহাদ্দিছ হিসেবে পরিচিত হওয়া এবং সেই সূত্রে মান-মর্যাদার উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া তাঁর পছন্দনীয় ছিল না। হযরত ইবন

---

৭. তাবাকাত-৬/৬০

৮. প্রাগুক্ত

৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৮

১০. তাবাকাত-৬/৫৮

১১. তাহ্যীবুত তাহযীব-৭/২৭৬

১২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৮

১৩. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/৪৭৭

মাস'ঊদের ইনতিকালের পর লোকেরা তাঁর নিকট আবেদন জানালো যে, এখন আপনি তাঁর স্থলে মানুষকে সুন্নাহ্‌র তা'লীম দিতে বসুন। তিনি জবাবে বললেন : তোমরা কি চাও মানুষ আমার পিছে পিছে চলুক?[১৪]

হাদীছে তাঁর শিষ্য-শাগরিদের পরিধি অনেক বিস্তৃত। 'আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ, ইবরাহীম ইবন সা'দ, ইমাম শা'বী, আবূ কাতাদা নাখা'ঈ, শাকীক ইবন সালামা ইবন কুহায়ল, কায়স ইবন রূমী, কাসিম ইবন মুখায়মারা, আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ, ইয়াহইয়া ইবন ওয়াছ্‌ছাব, আবুদ দুহা মুসলিম প্রমুখ খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ছিলেন তাঁর ছাত্র। ছাত্রদের মধ্যে তাঁর ভাগিনা ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ এবং ভাতিজা আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৫]

ফিকাহ্‌র জ্ঞানও তিনি অর্জন করেন ফকীহুল উম্মাত হযরত 'আবদুল্লাহ্‌ ইবন মাস'ঊদের (রা) নিকট। এ কারণে এ শাস্ত্রেও তিনি ইমামাত ও ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখতেন। আল্লামা যাহ্‌বী লিখেছেন : 'كَانَ فَقِيْهًا إِمَامًا بَارِعًا' তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ইমাম, ফকীহ।[১৬] ইমাম নাওবী তাঁকে পূর্ণতার অধিকারী ফকীহ বলেছেন।[১৭]

জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও প্রশস্ততার দিক দিয়ে 'আলকামা ছিলেন হযরত ইবন মাস'ঊদের (রা) বিশিষ্ট ছাত্রদের একজন। ইবন মাদায়িনী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদের (রা) জ্ঞানের সবচেয়ে বড় ধারক-বাহক ছিলেন 'আলকামা, আসওয়াদ, 'উবায়দা ও হারিছ।[১৮] তাঁদের মধ্যে 'আলকামা ছিলেন সবার চেয়ে অগ্রগামী। ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন, ইবন মাস'ঊদের ছয়জন ছাত্র মানুষকে সুন্নাতের তা'লীম দিতেন। তাঁদের মধ্যে 'আলকামা ও আসওয়াদ- এ দু'জনও ছিলেন। আবুল হুযায়ল জিজ্ঞেস করলেন, তা এ দু'জনের মধ্যে ভালো কে ছিলেন? তিনি 'আলকামার নামটি উচ্চারণ করলেন।[১৯] 'আবদুল্লাহ্‌ ইবন মাস'ঊদ (রা) নিজেই তো এ সনদ দান করেন যে, আমি যা কিছু পড়েছি, জেনেছি, তা সবকিছু 'আলকামা পড়ে ও জানে।[২০] এটাইতো 'আলকামার জ্ঞানের প্রশস্ততার সবচেয়ে বড় সনদ।

'আলকামার জ্ঞানগত পূর্ণতা এত স্বীকৃত ছিল যে, রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের অনেকে তাঁর থেকে জ্ঞান লাভ করতেন। আর এটা একজন তাবি'ঈর জন্য অতি বড় সম্মান ও গৌরবের বিষয়। আবূ জাবয়ান বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) একাধিক সাহাবীকে 'আলকামার নিকট বিভিন্ন মাস'আলা জিজ্ঞেস করতে দেখেছি। তাঁরা তাঁর নিকট ফাতওয়াও জিজ্ঞেস করতেন।[২১]

---

১৪. তাবাকাত-৬/৬০

১৫. তাহ্‌যীবুত তাহযীব-৭/২৭৭; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৪৮

১৬. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৪৮

১৭. তাহ্‌যীবুল আসমা'-১/৩৪২

১৮. তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব-৭/২৭৭

১৯. প্রাগুক্ত

২০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৪১

২১. তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব-৭/২৭৭; হিলয়াতুল আওলিয়া-২/৩৮

অভ্যাস, স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতায় তিনি ছিলেন হযরত রাসূলে পাকের সত্তার অনুরূপ। ইবরাহীম বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্রে নবী কারীমের (সা) মত ছিলেন। আর 'আলকামা ছিলেন ইবন মাস'উদের (রা) মত। এভাবে 'আলকামা যেন রাসূলুল্লাহর (সা) অনুরূপ ছিলেন। অভ্যাস ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে 'আলকামা ও ইবন মাস'উদের এত পরিমাণ মিল যে, যারা ইবন মাস'উদকে (রা) দেখেনি তারা 'আলকামার জীবন ও কর্মকে দেখে ইবন মাস'উদকে (রা) মনের আয়নায় কল্পনা করতে পারতো। এই মিল কেবল 'ইলম ও বাহ্যিক চাল-চলন ও স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে সীমিত ছিল না, বরং 'আমলেও তাঁর ইবন মাস'উদের (রা) সাথে পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল। এ কারণে তিনি "উলামা' রাব্বানিয়্যীন' বা আল্লাহ ওয়ালা 'আলিমদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইমাম যাহ্‌বী লিখেছেন, তিনি সৎকর্মশীল ও খোদাভীরু লোক ছিলেন।[২২]

আল-কুরআনের সাথে তাঁর এক অস্বাভাবিক সম্পর্ক ও হৃদ্যতা ছিল। সাধারণতঃ পাঁচ দিনে তিনি একবার সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ শেষ করতেন।[২৩] কখনো কখনো এক রাতেই সম্পূর্ণ কুরআন পড়ে ফেলতেন। ইবরাহীম বলেছেন, 'আলকামা একবার মক্কায় গেলেন। রাতে তিনি তাওয়াফ শুরু করলেন। প্রথম সাত চক্করে 'তিওয়াল' সূরা পাঠ শেষ করেন। দ্বিতীয় সাত চক্করে 'মি'ইন', তৃতীয় সাত চক্করে 'মাছানী' এবং চতুর্থ সাত চক্করে বাকী সূরা পাঠ শেষ করেন। এভাবে এক রাতে তাওয়াফ অবস্থায় সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত শেষ করেন।[২৪]

কুরআনের সাথে তাঁর এত গভীর সম্পর্কের কারণে সব সময় তাঁর মুখ থেকে কুরআনের আয়াত বহমান থাকতো। প্রতিটি কাজ শুরু করার সময় যেখানে যে আয়াতটি প্রযোজ্য সেটি পাঠ করতেন। যেমন খাওয়ার সময় হলে স্ত্রীর নিকট খাবার চাইতেন এ আয়াত পাঠ করে :

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا[২৫]

– "তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।"

ঘোড়ায় চড়ার সময় জিনে পা রাখার মুহূর্তে তাঁর জিহ্বা থেকে বের হতো এ আয়াত :[২৬]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.[২৭]

---

[২২] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৪৮

[২৩] তাবাকাত-৬/৬০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৫৭

[২৪] তাবাকাত-৬/৫৯

[২৫] সূরা আন-নিসা'-৪

[২৬] তাবাকাত-৬/৫৭, ৫৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৫৩

[২৭] সূরা আয-যুখরুফ-১৩

"সকল প্রশংসা আল্লাহর। 'পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব।"

জ্ঞান চর্চার সাথে সাথে জিহাদের প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনাও তাঁর মধ্যে ছিল। হিজরী ৩২ সনে আমীর মু'আবিয়ার (রা) সাথে তিনি কনস্টান্টিনোপল অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এই কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ব্যাপারে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এ বাহিনীর সবাই সে বিজয়ের অংশীদার ও সাক্ষী হওয়ার জন্য শাহাদাতের প্রবল প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিলেন। মু'দিদ নামক একজন মুজাহিদ একটি কিল্লার উপর আক্রমণ করার সময় মাথায় বাঁধার জন্য 'আলকামার একটি চাদর চেয়ে নেন। এ মুজাহিদ শহীদ হন এবং 'আলকামার চাদরটি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়।

'আলকামা এ চাদরটিকে অত্যন্ত মঙ্গলময় বলে মনে করতেন। সেটি কাঁধে ঝুলিয়ে জুম'আর নামাযে যেতেন এবং বলতেন, আমি এটি এজন্য কাঁধে ঝুলাই যে, এতে মু'দিদের খুনের স্পর্শ আছে।[২৮]

তিনি খ্যাতি ও প্রচারকে খুব ভয় করতেন। এর থেকে দূরে থাকার জন্য পঠন-পাঠন কার্যক্রমের বিশেষ স্থানে বসা মোটেই পছন্দ করতেন না। 'আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন যে, আমরা 'আলকামাকে অনুরোধ করলাম, আপনি মসজিদে নামায পড়ুন এবং নামাযের পর একটু বসুন। তাহলে আপনার কাছে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করতে পারতাম। বললেন, এটা আমি পছন্দ করি না যে, মানুষ ইশারা করে বলুক– ইনি 'আলকামা।[২৯] একদিন জুম'আর নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গেলেন। ইমাম তখন খুতবা দিচ্ছেন। লোকেরা তাঁকে মসজিদের ভিতরে প্রবেশের জন্য অনুরোধ করলো। কিন্তু তিনি সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে দরজায় বসে পড়লেন।[৩০]

আমীর-উমারা এবং রাষ্ট্রের উঁচু পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের প্রতি শুধু বেপরোয়া এবং তাঁদের থেকে দূরেই থাকতেন না, বরং তাঁদের সাথে মেলামেশা, উঠাবসা এবং তাঁদের নিকট যাতায়াত করাকেও নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন। একবার লোকেরা বললো, আপনি আমীর-উমারার দরবারে যাতায়াত করুন। তাহলে তাঁরা আপনার প্রকৃত অবস্থা অবগত হবে এবং মর্যাদা বুঝবে। বললেন, আমি তাঁদের থেকে যত কথা দূর করবো এবং যত জিনিসের স্বল্পতা ঘটাবো তাঁরা তার চেয়ে বেশী জিনিস আমার মধ্য থেকে কম করে দেবে।[৩১] অর্থাৎ আমি তাঁদের থেকে যে পরিমাণ দোষ-ত্রুটি দূর করবো, তার চেয়ে বেশী ভালো জিনিস আমার থেকে তাঁরা দূর করে দেবে। তিনি কেবল নিজে আমীর-উমারার সাথে মেলামেশা করতেন না, বরং অন্যদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতেন।

---

[২৮] ইবনুল আছীর : আল-কামিল ফিত তারীখ-৩/১০৩

[২৯] তাবাকাত-৬/৫৯

[৩০] সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৫৮

[৩১] তাবাকাত-৬/৫৯

আবূ ওয়ায়িল বর্ণনা করেছেন। যখন বসরা ও কূফা দু'টি অঞ্চলই ইবন যিয়াদের শাসনাধীনে দেওয়া হয় তখন একবার তিনি আমাকে বললেন, তুমিও আমার সাথে একটু চলো। আমি গেলাম এবং 'আলকামার কাছে আমীর-উমারা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ঐ লোকদের থেকে তোমার যা অর্জন হবে তার চেয়ে বেশী জিনিস তারা তোমার থেকে নিয়ে নিবে। কোন প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবেও তিনি আমীরদের দরবারে যাওয়া পছন্দ করতেন না। একবার হযরত আমীর মু'আবিয়ার (রা) দরবারে যাবে, এমন একটি প্রতিনিধিদলের তালিকায় তাঁর নামটিও লিখে দেওয়া হয়। তিনি তা জানার সাথে সাথে আবূ বুরদাকে লেখেন, আমার নামটি তালিকা থেকে বাদ দিন।[৩২]

'আলকামা হিজরী ৬২ সনে কূফায় ইনতিকাল করেন। অন্তিম রোগ শয্যায় অসীয়াত করেন যে, আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে কালেমা তায়্যিবার তালকীন করবে যাতে আমার জিহ্বার শেষ উচ্চারণ হয়- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ - এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, যাঁর কোন শরীক নেই। আমার মৃত্যুর খবর কাকেও পৌঁছাবে না। যাতে জাহিলী যুগের মত প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি না হয়। দ্রুত দাফন করবে। বিলাপকারিণী মহিলারা যেন লাশের অনুগামী না হয়।[৩৩]

---

[৩২] প্রাগুক্ত

[৩৩] প্রাগুক্ত-৬/৬০; হিলয়াতুল আওলিয়া'-২/১০১

মাসরূক ইবন আল-আজদা' (রহ)

হযরত মাসরূকের ডাক নাম আবূ 'আয়িশা। তাঁর পিতার নাম আল-আজদা'। এটা ছিল তাঁর জন্মের পর পিতা-মাতা প্রদত্ত নাম। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর পিতার নাম হয় 'আবদুর রহমান। তিনি ছিলেন ইয়ামনের বিখ্যাত খান্দান হামাদানের একজন নেতা এবং আরবের অন্যতম খ্যাতিমান পুরুষ 'আমর ইবন মা'দিকারিব-এর প্রীতিভাজন ব্যক্তি। ইমাম যুহরী মাসরূককে 'আমরের ভাগ্নে বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

মাসরূক জাহিলী ও ইসলামী দু'যুগই পেয়েছিলেন। মুহাম্মাদ (সা)-এর রিসালাতের সময়কালেও তিনি বর্তমান ছিলেন। তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যরা সে সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। এমনকি তাঁর অতি আপনজন 'আমর ইবন মা'দিকারিব (রা) মদীনায় এসে হযরত রাসূলের কারীমের (সা) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু মাসরূকের দুর্ভাগ্য যে, এ সময় ইসলাম গ্রহণ থেকে তিনি বঞ্চিত থেকে যান। তিনি কখন ইসলাম গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফাতকালে তিনি মুসলমান হন বলে কিছু কিছু বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়। ইবন সা'দের তাবাকাতে মাসরূকের নিজের এ রকম একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, 'আমি আবূ বকরের (রা) পিছনে নামায পড়েছি।'[২]

হযরত 'উমার ফারূকের (রা) খিলাফতকালে মাসরূককে দৃশ্যপটে দেখা যায়। সে সময় একবার ইয়ামনী প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনায় আসেন। হযরত 'উমার (রা) তাঁর পরিচয় জানতে চান। তিনি বলেন : আমি মাসরূক ইবন আল-আজদা'। 'উমার (রা) বলেন : আল-আজদা' তো শয়তানের নাম।[৩] এখন থেকে আপনি হবেন মাসরূক ইবন 'আবদির রহমান। আর এখান থেকেই তাঁর পিতার নাম পরিবর্তন হয়ে যায়। এ রকম একটি বর্ণনাও আছে যে, হযরত 'উমার (রা) তাঁকে নয়, বরং তাঁর পিতাকে নাম জিজ্ঞেস করে আজদা'-এর স্থলে 'আবদুর রহমান নামটি প্রস্তাব করেন।[৪] যাই হোক না কেন, এ দু'টি বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে পিতা-পুত্র দু'জনই মদীনায় এসেছিলেন। এ রকম একটি বর্ণনাও আছে যে, শিশু অবস্থায় তিনি চুরি হয়ে গিয়েছিলেন এবং পরে পাওয়া যায়। তাই তাঁর নাম হয় 'মাসরূক'। যার অর্থ চুরি হয়ে যাওয়া।[৫]

মাসরূক ছিলেন ইয়ামনের বিখ্যাত অশ্বারোহীদের অন্যতম ব্যক্তি। হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি তাঁর তিন ভাই- 'আবদুল্লাহ, আবূ বকর ও মুনতাশার-এর সাথে

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৯

২. তাবাকাত-৫/৩৮২

৩. আবূ দাউদ-৪৯৫৭; মুসনাদে আহমাদ-১/৩১; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/৩০১

৪. তাবাকাত-৬/৫০

৫. 'আসরুত তাবি'ঈন-২৬২

বিখ্যাত কাদেসিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তাঁর তিন ভাই শাহাদাত লাভ করেন। আর অস্ত্র চালাতে চালাতে মাসরূকের হাত অবশ হয়ে যায় এবং মাথায় মারাত্মক আঘাত পান। এ আঘাতের চিহ্ন সারা জীবন বিদ্যমান ছিল। যেহেতু এই চিহ্ন টি ছিল তাঁর সাহস, বীরত্ব ও জীবন বাজি রাখার একটি সনদ, তাই এটাকে তিনি ভীষণ পছন্দ করতেন এবং এটা মুছে যাওয়া মোটেই আশা করতেন না।[৬]

তবে তাঁর এ বীরত্ব ও বাহাদুরী ছিল ইসলামের সেবায় এবং ইসলাম বিরোধী শক্তির মুকাবিলায়। মুসলমানদের গৃহযুদ্ধে তাঁর তরবারি সবসময় কোষবদ্ধই ছিল। হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালের কোন বিদ্রোহ ও বিশৃংঙ্খলায় কোনভাবেই অংশগ্রহণ করেননি। ইসলামের একজন শুভানুধ্যায়ী হিসেবে তিনি নিজের শহর কূফার অধিবাসীদের মদীনাবাসীদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য সব সময় উৎসাহিত করতেন।[৭]

হযরত 'উছমানের (রা) শাহাদাতের পর যখন উটের যুদ্ধের তোড়াজোড় শুরু হয়ে যায় এবং সমর্থন ও সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে হযরত 'আলী (রা) যখন হযরত হাসান (রা) ও 'আম্মার ইবন ইয়াসিরকে (রা) কূফায় পাঠান তখন এই মাসরূক সর্বপ্রথম তাঁদের সাথে মিলিত হন। তিনি 'আম্মার ইবন ইয়াসিরকে (রা) জিজ্ঞেস করেন : 'আবুল ইয়াকজান! আপনারা 'উছমানকে (রা) কোন কারণে শহীদ করেন? তিনি বলেন : আমার ইজ্জত আবরু নিয়ে টানাটানি ও আমাকে পিটুনির কারণে।

মাসরূক বলেন : আল্লাহর কসম! আপনারা যতখানি ভোগান্তির শিকার হয়েছিলেন তার চেয়ে বেশী বদলা নিয়ে ফেলেছেন। যদি আপনারা ধৈর্য ধরতেন, তাহলে সেটাই আপনাদের জন্য ভালো ছিল।[৮]

উটের যুদ্ধের মাধ্যমে যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়, সিফ্ফীন যুদ্ধ পর্যন্ত তা চলমান ছিল। মাসরূক এর একটিতেও অংশগ্রহণ করেননি। হযরত 'আলীর (রা) সমর্থকদের বড় কেন্দ্র ছিল কূফা। এখানে অবস্থান করে নিজেকে নিরপেক্ষ রাখা ভীষণ কঠিন ব্যাপার ছিল। এ কারণে এ সময় তিনি কূফা ছেড়ে কাযবীন চলে যান।[৯]

শা'বী বর্ণনা করেছেন, কোন একটি যুদ্ধেও মাসরূক 'আলীর (রা) সাথে ছিলেন না। পরবর্তীকালে যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো যে, আপনি 'আলীর (রা) সাথে ছিলেন না কেন? তিনি বলতেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, ধরে নাও আমরা একে অপরের মুখোমুখি সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এবং উভয় পক্ষ অস্ত্র হাতে একে অপরকে হত্যা করে চলেছি, আর সেই সময় তোমাদের চোখের সামনে আসমানের কোন দরজা খুলে গেল এবং সেখান থেকে কোন ফেরেশতা বেরিয়ে এসে মুখোমুখি দু'টি সারির

---

৬. তাবাকাত-৬/৫২

৭. আল-কামিল ফিত তারীখ-৩/১২৭

৮. প্রাগুক্ত-৩/১৮৫

৯. প্রাগুক্ত-৩/২৩০

মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَـنْ تَـرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللهَ بِكُمْ رَحِيْمًا.[১০]

'ওহে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের অর্থ-সম্পদ খেয়ো না। তবে তোমাদের পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য হলে খেতে পার। আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াশীল।'

– তাহলে তার এ বলা উভয় পক্ষকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখবে কিনা? লোকেরা জবাব দিত : নিশ্চয় বিরত রাখবে। তখন তিনি বলতেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের জানা উচিত যে, আসমানের দরজা খোলা হয়েছে এবং সেখান থেকে একজন ফিরিশতা এসে তোমাদের নবীকে এ নির্দেশ শুনিয়ে গেছেন। আর তা মাসহাফে বিদ্যমান আছে এবং তা অন্য কিছু দ্বারা রহিত করা হয়নি।[১১]

'আমির থেকে অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। মাসরূক আমাকে বললেন, যখন মু'মিনদের দু'টি দল পরস্পরের সাথে লড়াই করার জন্য মুখোমুখি সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, আর তখন আসমান থেকে কোন ফিরিশতা আত্মপ্রকাশ করে চিৎকার করে বলে :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ الخ

তখন তোমার কি ধারণা? তারা যুদ্ধ করবে, না যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে? আমি বললাম: তারা যদি অনুভূতিহীন জড় পাথর না হয় তাহলে অবশ্যই রণেভঙ্গ দেবে। আমার এ জবাব শুনে তিনি বললেন, আল্লাহর এক আসমানী বন্ধু উপরোক্ত নির্দেশ নিয়ে ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহর আর এক বন্ধুর নিকট অবতরণ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ যুদ্ধ থেকে বিরত হয়নি। অথচ না দেখে ঈমান আনা দেখার পর ঈমান আনার চেয়ে ভালো। আরেকটি বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি শুধু নিজেই এ গৃহযুদ্ধ থেকে দূরে ছিলেন না, বরং মুসলিম জনগণকে বিরত রাখার জন্য সিফ্ফীনের যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্তও গিয়েছিলেন। তিনি বিবাদমান দু'টি দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উপরোক্ত উপদেশমূলক কথা শুনিয়ে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সঠিক কথা এটাই যে, তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এবং কোনভাবেই সিফ্ফীনের রণক্ষেত্রে যাননি।

উমাইয়্যা খিলাফতকালে তিনি কিছুদিনের জন্য কাযী ছিলেন।[১২] হিজরী ৬৩ সনে তিনি 'ওয়াসিত' নামক স্থানে অন্তিম রোগে আক্রান্ত হন। আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সারাটি জীবন তিনি এই নির্ভরতাকে

---

[১০] সূরা আন-নিসা'-২৯

[১১] তাবাকাত-৬/৫১-৫২

[১২] প্রাগুক্ত-৬/৫৫

আঁকড়ে থাকেন। পার্থিব ধন-সম্পদ তাঁর জীবনকে কখনো কলুষিত করতে পারেনি। বিচারকের দায়িত্ব পালনের সময়ও তিনি কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। এ জন্য কাফনের কাপড় পর্যন্ত কেনার পয়সা তাঁর ঘরে ছিল না। শা'বী বলেছেন, মাসরূক মৃত্যুর সময় কাফনের কাপড় কেনার মত অর্থও রেখে যাননি। তার জন্য তিনি ঋণ করার অসীয়াত করে যান। তবে একথাও বলে যান যে, কৃষি পেশার লোক এবং রাখালদের থেকে নিবে না। বরং যারা গৃহপালিত প্রাণী পালন করে, অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদের থেকে নিবে। একেবারে শেষ নিঃশ্বাসের আগে তিনি আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে এভাবে দু'আ করেন : 'হে আল্লাহ! আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এবং আবূ বকর (রা) ও 'উমারের (রা) সুন্নাতের পরিপন্থী কোন পথ ও পদ্ধতির উপর মরছি না। আল্লাহ, তোমার কসম! আমি আমার তরবারিটি ছাড়া কোন মানুষের নিকট কোন সোনা-রূপো রেখে যাচ্ছি না। এর দ্বারাই আমার কাফন-দাফন করবে।' এ কথা দ্বারা সম্ভবতঃ তিনি তরবারিটি বিক্রি করে কাফনের অর্থ সংগ্রহের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন।

এসব অসীয়াত তথা অন্তিম উপদেশবাণী দান করার পর তিনি ওয়াসিত-এ হিজরী ৬৩ সনে ইনতিকাল করেন। সেখানেই দাফন করা হয়।[১৩]

তাঁকে তাবি'ঈ 'আলিমদের মধ্যে গণ্য করা হয়। ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তাঁর মধ্যে জ্ঞান অর্জনের তীব্র বাসনা দেখা যায়। শা'বী বর্ণনা করেছেন, মাসরূকের চেয়ে জ্ঞান অন্বেষণকারী আর কেউ ছিল না।[১৪] সৌভাগ্যবশতঃ তিনি হযরত 'আয়িশার (রা) মত স্নেহময়ী বিদুষী মা লাভ করেছিলেন। তিনি মাসরূককে ছেলের মত দেখতেন এবং ছেলের মত স্নেহ করতেন। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি তাঁকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।[১৫] কিন্তু এসব বর্ণনা ঠিক নয়। তবে তিনি মাসরূককে অতি বেশী স্নেহ করতেন এবং তাঁকে 'আমার ছেলে' বলে ডাকতেন। মাসরূক যখন হযরত 'আয়িশার (রা) দরবারে উপস্থিত হতেন তখন তিনি তাঁকে মধুর শরবত পান করাতেন। একবার মাসরূক কয়েকজন লোক সংগে করে হযরত 'আয়িশার (রা) কাছে আসেন। তিনি বাড়ীর লোকদের নির্দেশ দেন, আমার ছেলেদের জন্য মধুর শরবত বানাও।[১৬] হযরত 'আয়িশা (রা) ছাড়াও মাসরূক হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি ইবন মাস'উদের (রা) যোগ্যতম ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন। ইবন মাদাইনী বলেছেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) ছাত্র-সঙ্গীদের মধ্যে মাসরূকের উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিই না।[১৭]

মাসরূকের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও সাধনা এবং উপরে উল্লেখিত মহান দু'ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ

---

[১৩] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৯

[১৪] তাহযীবুল আসমা'-১/৮৮

[১৫] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ/১৪৯; তারীখু ইবন 'আসাকির-৬/২১০

[১৬] তাবাকাত-৬/৫২

[১৭] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪২

সাহচর্য তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ 'আলিমে পরিণত করে। ইমাম যাহ্বী তাঁকে একজন ফকীহ্ ও শ্রেষ্ঠ 'আলিম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৮] ইমাম নাওবী লিখেছেন, তাঁর মহত্ব, বিশ্বস্ততা, মর্যাদা এবং ইমাম হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে সবাই একমত।[১৯] মুররা তো বলতেন, 'হামাদান গোত্রের কোন নারী মাসরূকের মত দ্বিতীয় কোন সন্তান জন্ম দিতে পারেনি।[২০]

হাদীছ ও সুন্নাহ্তে মাসরূকের জ্ঞান অনেক গভীর ও ব্যাপক ছিল। এ জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন সরাসরি বহু উঁচু স্তরের সাহাবীর নিকট থেকে। যেমন : হযরত 'আয়িশা (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা), আবূ বকর (রা), 'উমার (রা), 'উছমান (রা), 'আলী (রা), মু'আয ইবন জাবাল (রা), উবাই ইবন কা'ব (রা), যায়েদ ইবন ছাবিত (রা), খাব্বাব ইবন আরাত (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা), মুগীরা ইবন শু'বা (রা) ও আরো অনেকে। হাদীছের সাথে সাথে তিনি সুন্নাহ্রও শিক্ষা দিতেন।[২১]

ফিকাহ্ ছিল তাঁর বিশেষ অধীত বিষয়। এ শাস্ত্রে তিনি ইমাম ও ইজতিহাদের মর্যাদা ও যোগ্যতা লাভ করেন। তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদের (রা) সেইসব শিষ্য-শাগরিদদের মধ্যে ছিলেন যাঁদের কাজই ছিল দারস ও ইফতা (শিক্ষা ও ফাতওয়া দান)।[২২] বিচার কাজে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাযী শুরায়হ অনেক সময় তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। শা'বীর মতে ফাতওয়ার ক্ষেত্রে মাসরূক কাযী শুরায়হ-এরও উপরে ছিলেন। কাযী শুরায়হ তাঁর পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করতেন। কিন্তু মাসরূকের তাঁর পরামর্শের প্রয়োজন পড়তো না।[২৩]

ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর এই বিশেষ যোগ্যতার কারণে বিচার-ফায়সালায় ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক ও রুচি। এ কাজ তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি যে একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তার প্রমাণ হলো কাযী শুরায়হ তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন।[২৪] উমাইয়্যা খিলাফতকালে তিনি কিছুদিনের জন্য কাযীর দায়িত্ব পালনও করেন। বিচার-ফায়সালায় তাঁর এত বেশী আগ্রহ ছিল যে, তিনি বলতেন, আমার কাছে একটি বিবাদে সত্য-সঠিক ফায়সালা করা এক বছর 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' (আল্লাহর পথে জিহাদ) থেকে বেশী পছন্দ।[২৫]

'ইলমের সাথে সাথে মাসরূকের মধ্যে 'আমলও ছিল। তিনি উন্নত নৈতিক গুণাবলীর

---

১৮. প্রাগুক্ত
১৯. তাহযীবুল আসমা'-১/৮৮
২০. তাবাকাত-৬/৫২
২১. তাহ্যীবতু তাহ্যীব-১০/১১০
২২. প্রাগুক্ত-১০/১১১
২৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৩
২৪. প্রাগুক্ত-১/৪৯
২৫. তাবাকাত-৬/৫৫

অধিকারী ছিলেন। যাবতীয় নৈতিক গুণের উৎস হলো খোদাভীতি। তিনি খাওফে খোদা বা খোদাভীতিকে প্রকৃত জ্ঞান বলে বিশ্বাস করতেন। আর তার বিপরীতে 'আমল বা কর্মের অহঙ্কারকে মূর্খতা জ্ঞান করতেন। তিনি বলতেন : 'মানুষের জন্য এই জ্ঞান যথেষ্ট যে, সে আল্লাহকে ভয় করে। আর নিজের জ্ঞান নিয়ে গর্ব করাটাই মূর্খতা।'[২৬]

তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জ্ঞান আহরণের প্রতি তীব্র আগ্রহ ও আবেগ পোষণ করতেন। ইমাম শা'বী তাঁর এমন একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন যা দ্বারা তাঁর আগ্রহের তীব্রতা অনুমান করা যায়। তিনি বলেছেন : মাসরূক একবার বসরায় এক ব্যক্তির কাছে গেলেন একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। কিন্তু তাঁর কাছে তেমন কোন জ্ঞান লাভ করতে পারলেন না। সেখান থেকে তাঁকে বলা হলো, আমাদের এখানে শামের এক ব্যক্তি আসেন তাঁর কাছে এ সম্পর্কিত জ্ঞান আছে। সেখান থেকে মাসরূক সেই ব্যক্তির খোঁজে শামের পথ ধরেন।[২৭] প্রিয় পাঠক! বসরা থেকে শাম নিকটের কোন দূরত্ব ছিল না। এ ছিল বহু দিন ও বহু কষ্টের পথ। একটি মাত্র আয়াত সম্পর্কে জানার জন্য তিনি এ পথ পাড়ি দিয়েছেন। জ্ঞান অর্জনের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ ও শক্ত অঙ্গীকার ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়।

তিনি একজন বড় 'আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। ইবাদাতের কঠিন অনুশীলন করতেন। ক্রমাগতভাবে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা দু'টি ফুলে যেত।[২৮] বছরের বিশেষ বিশেষ সময় তাঁর ইবাদাত অত্যধিক বেড়ে যেত। কোথাও 'তা'উন'-এর মহামারী দেখা দিলে তিনি নির্জন স্থানে গিয়ে 'ইবাদাতে মশগুল হয়ে যেতেন। অনেকে সন্দেহ করতো তিনি হয়তো তা'উন-এর ভয়ে লোকালয় ছেড়ে নির্জন স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। আসলে তা নয়। তাঁর উদ্দেশ্য হতো একাগ্র চিত্তে 'ইবাদাতে নিমগ্ন থাকা। আনাস ইবন সীরীন বর্ণনা করেছেন, আমরা জানতে পেলাম যে, মাসরূক তা'উন থেকে পালাতেন। কিন্তু মুহাম্মাদ একথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি বললেন, বিষয়টি তাঁর স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞেস করা উচিত। আমরা একদিন তাঁর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! ব্যাপারটি তা নয়। তিনি কখনো 'তা'উন' থেকে পালাতেন না। তবে যখন তা'উন-এর মহামারি দেখা দিত, তিনি বলতেন, এই যিক্‌র ও আমলের দিনগুলোতে আমি চাই নিরিবিলিতে 'ইবাদাত করতে। তারপর তিনি শুধুমাত্র 'ইবাদাতের জন্য নির্জনতা অবলম্বন করতেন। মাঝে মাঝে তিনি নিজের উপর এত কঠিন কাজ চাপিয়ে দিতেন যে, অনেক সময় আমি তা দেখে তাঁর পিছনে বসে কাঁদতে শুরু করতাম।[২৯] হজ্জের সময় যতদিন মক্কায় থাকতেন, সিজদার মধ্যেই ঘুমের কাজ সেরে নিতেন।[৩০] মাসরূকের স্ত্রীর নাম ছিল ফায়রূয। একবার তিনি যখন দেখলেন মাসরূক

---

২৬. 'আসরুত তাবি'ঈন-২৬৪

২৭. হিলয়াতুল আওলিয়া-২/৯৫

২৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৬৩

২৯. তাবাকাত-৬/৫৪

৩০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৯

একাধারে রোযা রেখেই চলেছেন তখন তিরস্কারের সুরে বললেন : মাসরূক! আপনি ছাড়া আর কেউ কি আল্লাহর 'ইবাদাত করে না? জাহান্নাম কি কেবল আপনার জন্য তৈরী করা হয়েছে? জবাবে মাসরূক বললেন : ফায়রূয! জান্নাতের সন্ধানকারী ব্যক্তি ক্লান্ত হয় না, আর জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী ঘুমায় না।[৩১]

তিনি নিজের নফসের মুহাসাবা বা আত্ম সমালোচনা এবং পাপ স্মরণ করে তার জন্য ইসতিগফার করা অত্যন্ত জরুরী মনে করতেন। তিনি বলতেন, মানুষের জন্য এমনসব মজলিস থাকা উচিত যেখানে বসে তারা নিজেদের পাপকে স্মরণ করে আল্লাহর নিকট ইসতিগফার করতে পারে। তাঁর দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোন মূল্যই ছিল না। তিনি দুনিয়াকে ময়লা-আবর্জনার চেয়ে বেশী কিছু মনে করতেন না। একদিন তিনি তাঁর এক ভাতিজার হাত ধরে একটি ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানে নিয়ে যান। তাকে বলেন, আমি তোমাকে দুনিয়া কি তা দেখাচ্ছি। দেখ, এই হচ্ছে দুনিয়া। এসব কিছু খেয়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে, পরে পুরানো ও ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, এর পিঠে আরোহণ করে দুর্বল করে ফেলা হয়েছে। আর এর জন্য কত না রক্ত ঝরিয়েছে, আল্লাহর হারামকে হালাল করেছে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।[৩২]

আর এ কারণে দুনিয়ার প্রতি তাঁর অন্তর কখনো ঝোঁকেনি এবং পার্থিব কোন জিনিসের প্রতিও তাঁর কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি। হযরত সা'ঈদ ইবন জুবায়র ছিলেন তাঁর সম-চিন্তা ও সম-মতের মানুষ। তাঁদের মধ্যে অনেক রহস্যময় ও গূঢ় কথাবার্তা হতো। ইবন যুবায়র বলেছেন, মাসরূক একদিন আমাকে বললেন, সা'ঈদ! এখন এমন আর কোন জিনিস নেই যার প্রতি অন্তরের আকর্ষণ থাকতে পারে। শুধু এটাই আছে যে, নিজের চেহারাকে ধুলি মলিন করি।[৩৩]

দুনিয়ার প্রতি তাঁর এমন বীতস্পৃহ ভাবের কারণে দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব থেকে সব সময় নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন। বহু মানুষ তাঁর প্রয়োজন পূরণ করতে এবং তাঁর সেবায় নিয়োজিত হতে চাইতো, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না। একবার খালিদ ইবন উসায়দ তাঁর নিকট তিরিশ হাজার দিরহাম পাঠালেন। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফেরত দিলেন। তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁকে এ কথা বুঝানোর চেষ্টা করলেন যে, আপনি গ্রহণ করে তা সাদাকা করে দিন। আত্মীয়-বন্ধুদের দান করুন এবং অন্য সব ভালো কাজে লাগান। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে রাজী করাতে পারলেন না।[৩৪]

এই তীব্র আত্ম-নির্ভরতা ও অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষীহীনতা কখনো কখনো তাঁকে পরিবারসহ অভুক্ত অবস্থার মধ্যে ফেলে দিত। এমতাবস্থায়ও তাঁর প্রগাঢ় আল্লাহ-নির্ভরতায় কোন রকম ফাটল ধরতো না। একদিন ঘরে খাবার মত কিছুই ছিল না। স্ত্রী

---

[৩১] আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/১৬৮

[৩২] তাবাকাত-৬/৫৫

[৩৩] প্রাগুক্ত-৬/৫৩, ৫৪

[৩৪] প্রাগুক্ত-৬/৫৩

জানান দিলেন, 'আয়িশার বাপ, আজ আপনার ছেলে-মেয়েদের খাবার মত ঘরে কিছু নেই। একথা শুনে মাসরূক একটু হেসে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! তিনি অবশ্যই তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।[৩৫]

এত অল্পে তুষ্টি ও আল্লাহ নির্ভরতার ভিতর দিয়েও তিনি ছিলেন একজন দরাজদিল দানশীল ব্যক্তি। কোন সময় কোনভাবে হাতে কিছু পয়সা-কড়ি এলেই সাথে সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে বিলিয়ে দিতেন। সায়িব ইবন আকরা'র সাথে এক মেয়ের বিয়ে দেন। সায়িব শ্বশুরের হাতে দশ হাজার দিরহামের মত মোটা একটি অংক তুলে দেন। তিনি তার সবই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, গরিব-দু:খী মানুষ ও দাসমুক্তি প্রভৃতি খাতে ব্যয় করেন।

তিনি সব রকম কথা ও কাজে ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। নৌকা বা জাহাজে যদি উঠার প্রয়োজন হতো তাহলে উঠার সময় একটি ইট হাতে নিয়ে উঠতেন। নামাযের সময় তার উপর সিজদা করতেন। কারো কোন কাজ যদি তাঁর কথায় বা সুপারিশে হতো তিনি তার কাছ থেকে কোন উপহার-উপঢৌকনও গ্রহণ করতেন না। একবার একটি ব্যাপারে কোন এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেন। লোকটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ তাঁকে একটি দাসী দান করতে চান। তিনি ভীষণ ক্ষেপে যান। লোকটিকে তিনি বলেন, তোমার মন-মানসিকতা এমন তা যদি আগে আমি জানতাম তাহলে তোমার জন্য কখনো সুপারিশ করতাম না। যতটুকু সুপারিশ করেছি, তাতো করেই ফেলেছি। এখন যতটুকু প্রয়োজন বাকী আছে আমি তার জন্য আর কোন কিছুই বলবো না। আমি 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) মুখ থেকে শুনেছি। যে ব্যক্তি কারো হক আদায় করে দেওয়া, অথবা যুলুম-অত্যাচার বন্ধ করার জন্য কারো কাছে সুপারিশ করে, আর তার বিনিময়ে যদি তাকে উপহার-উপঢৌকন দেওয়া হয় এবং সুপারিশকারী তা গ্রহণ করে তাহলে সেই উপহার-উপঢৌকন তার জন্য হারাম হবে।[৩৬]

'উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ একবার কূফায় এসে জিজ্ঞেস করলেন : সবচেয়ে ভালো মানুষ কে? লোকেরা বললো : মাসরূক ইবন আল-আজদা'।[৩৭]

ইমাম আল-আসমা'ঈ ইবন 'আওনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবন 'আওনের শিক্ষকরা বলাবলি করতেন যে, তাবি'ঈদের আট ব্যক্তি পর্যন্ত এসে যুহ্দ তথা খোদাভীতি ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ভাব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেছে। তাঁরা হলেন : 'আমির ইবন 'আবদিল কায়স, আল-হাসান ইবন আবিল হাসান আল-বসরী, হারিম ইবন হায়্যান, আবু মুসলিম আল-খাওলানী, উওয়ায়িস আল-কারানী, আর-রাবী' ইবন খুছায়ম, মাসরূক ইবন আল-আজদা' ও আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ।[৩৮]

---

৩৫. প্রাগুক্ত-৬/৫৩

৩৬. প্রাগুক্ত-৬/৫৪

৩৭. 'আসরুত তাবি'ঈন-২৭০

৩৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৭১

মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (রহ)

বিখ্যাত তাবি'ঈ মুহাম্মাদ ইবন সীরীনের ডাকনাম আবূ বকর। পিতা সীরীন ছিলেন ইরাকের 'জারজারায়া'র অধিবাসী[১], তামা-পিতলের একজন দক্ষ কারিগর। হাড়ি-পাতিল তৈরীর পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। 'আইনুত্ তামার-এ তাঁর দোকান ছিল। 'আইনুত তামার-এর যুদ্ধে আরো অনেক অনারবের সাথে সীরীনও মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন এবং ভাগের সময় কোন এক মুজাহিদের অংশে পড়েন। পরে তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিকের (রা) দাসে পরিণত হন। অনেকে ধারণা করেছেন, তিনি ভাগের সময় আনাসের (রা) অংশে পড়ে থাকবেন, অথবা আনাস পরে অন্য কোন মুজাহিদের নিকট থেকে তাঁকে কিনে নেন। যাই হোক, সীরীন হযরত আনাসের একজন দাস ছিলেন। সেহেতু তিনি একজন দক্ষ ধাতব কারিগর ছিলেন, তাই প্রচুর অর্থ রোজগার করতেন। মনিব আনাসের (রা) সাথে মুকাতাবা বা মুক্তির চুক্তি করেন। আনাসকে (রা)। তিনি বিশ অথবা চল্লিশ হাজার দিরহাম দেন এবং বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন।[২]

সীরীন দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের পর তামা-পিতল শিল্পের কাজে আরো মনোযোগী হন। আয়-রোগজার আরো বেড়ে যায়। অল্প দিনের মধ্যে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে যান। এবার তিনি দীনের বাকী অংশ পূরণ করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) 'সাফিয়্যা' নাম্নী একদাসী ছিল। সাফিয়্যা ছিলেন সুন্দরী, বুদ্ধিমতি, চালাক- চতুর ও চমৎকার গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারিনী এক যুবতী। তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও মার্জিত ভদ্র আচরণ তাঁকে মদীনার সব শ্রেণীর মহিলার প্রিয়পাত্রী করে তোলে। মদীনার যে মহিলাই তাঁর সাথে পরিচিত হতো, তাঁকে ভালোবাসতো। তখন পর্যন্ত জীবিত উম্মাহাতুল মু'মিনীন তথা রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমগণ, বিশেষতঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) অতি আদরের পাত্রী ছিলেন। সীরীন তাঁর জীবন-সঙ্গীনী হিসাবে এই সাফিয়্যাকে নির্বাচন করেন।

সীরীনের পক্ষ থেকে হযরত আবূ বকরের (রা) পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব গেল। সাফিয়্যা এ পরিবারের দাসী হলেও তাঁকে তাঁরা মেয়ের মত করে মানুষ করেছেন। তাঁরা পাত্রের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা সীরীনের আগের মনিব আনাস ইবন মালিকের নিকট আসলেন। তাঁর কাছে সীরীনের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আনাস (রা) সাফিয়্যার মনিব পরিবারকে বললেন, আপনারা সাফিয়্যাকে সীরীনের হাতে তুলে দিতে ভয় করবেন না। আমি তাঁকে সঠিক দীনদার, অতি চরিত্রবান এবং যথেষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী দেখেছি। খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদ তাঁকে 'আইনুত তামার যুদ্ধে বন্দী করার পর সে চল্লিশ জন বন্দীর সাথে মদীনায় আসে। আর তখন থেকেই

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৭৯
২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান- ১/৪৫৩

সে আমার সাথে ছিল। সাফিয়্যার পরিবার রাজী হয়ে গেল। এমন একটি চমৎকার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয় যে, মদীনার খুব কম মেয়ের বিয়েতে তেমন হতে দেখা গেছে। বিরাট সংখ্যক সাহাবী (রা) এই বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বদরী সাহাবী ছিলেন আঠারো জন। তাঁদের শুভ ও কল্যাণ কামনা করে দু'আ করেন কাতিবে ওহী হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা)। কনেকে সাজ-গোজ করিয়ে স্বামী-গৃহে পাঠান তিন জন উম্মাহাতুল মু'মিনীন। এই শুভ ও মঙ্গলময় বিয়ের মাধ্যমে যে পরিবারটি গড়ে ওঠে সেখানে খলীফা হযরত উছমানের খিলাফতের শেষের দিকে হিজরী ৩৩ সনে মুহাম্মাদ ইবন সীরীন জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি হন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম তাবি'ঈ।[৩]

হযরত আনাস ইবন মালিকের (রা) ব্যক্তিত্বটি এমনই ছিল যে, যে কেউ তাঁর কাছে সামান্য কিছু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পেয়েছে সে 'ইলম ও 'আমলের একজন বড় উত্তরাধিকারী হয়ে গেছে। ইবন সীরীনের সৌভাগ্য যে, এই মহান সাহাবীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ দিন থাকার সুযোগ লাভ করেন।[৪] আনাস ইবন মালিক ছাড়াও তিনি হযরত আবূ হুরাইরার (রা) সুহবতের সুযোগও বেশীমাত্রায় গ্রহণ করেন। তাঁকে আবূ হুরাইরার (রা) শিষ্য-সাগরিদদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি তাবি'ঈ শিরোমণি হযরত হাসান বসরীর (রা) সাহচর্যেও দীর্ঘদিন কাটান।[৫] এই সব মহান ব্যক্তির সাহচর্যের কল্যাণে তিনি 'ইলম ও 'আমলের এক বাস্তব প্রতিকৃতিতে পরিণত হন। ইবন সা'দ লিখেছেন :[৬]

كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا .

- তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন, অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইমাম, ফকীহ্, বহু জ্ঞানের আধার ও খোদাভীরু মানুষ।

ইমাম যাহবী লিখেছেন :[৭]

كان فقيهًا إمامًا غزير العلم ثقةً ثبتًا علامة التفسير رأسا فى الورع .

- তিনি ছিলেন একজন ফকীহ্, ইমাম, বহু জ্ঞানের ভাণ্ডার, বিশ্বস্ত, সুদৃঢ়, তাফসীর শাস্ত্রের মহাজ্ঞানী ও খোদাভীরুতার প্রধান।

সে যুগের প্রায় সকল শাস্ত্রে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। ইমাম নাওবী লিখেছেন, তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফিকাহ্, স্বপ্নের তা'বীর ইত্যাদি শাস্ত্রসমূহের ইমাম ছিলেন।[৮]

ইবন সীরীন ছিলেন হযরত আনাসের (রা) নিকট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, হযরত আবূ হুরাইরার (রা)

---

[৩] তাবাকাত- ৭/১৪০; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন- ১২৬

[৪] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৭৯

[৫] তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/২১৫; ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/৪৫১

[৬] তাবাকাত- ৭/১৪০

[৭] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৭৮

[৮] তাহ্যীব আল- আসমা'- ১/৮২

বিশেষ শাগরিদ এবং হযরত হাসান আল বসরীর (রহ) মজলিসে বসা মানুষ। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন 'ইলমে হাদীছের এক একজন দিকপাল। তাছাড়া আরো বহু সাহাবীর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁদের কয়েকজন হলেন : যায়িদ ইবন ছাবিত (রা), হুযাইফা ইবন ইয়ামান (রা), ইবন 'উমার, ইবন 'আব্বাস, হাসান ইবন 'আলী (রা), জুনদুব ইবন 'আবদিল্লাহ (রা), রাফি' ইবন খাদীজ (রা), সুলাইমান ইবন 'আমির (রা), সামুরা ইবন জুনদুব (রা), 'উছমান ইবন আবিল 'আস (রা), 'ইমরান ইবন হুসাইন (রা), কা'ব ইবন 'আজরাহ্ (রা), মু'আবিয়া (রা), আবূ দারদা' (রা), আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা), আবূ কাতাদা আনসারী (রা), আবূ বাকর ছাকাফী (রা), উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা), ও আরো অনেকে।

তাবি'ঈদের বড় একটি দলের নিকট থেকেও তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁদের বিশিষ্ট কয়েকজন হলেন : 'আকরামা, শুরাইহ, হুমাইদ ইবন 'আবদির রহমান হিময়ারী, 'আবদুল্লাহ ইবন শাকীক, 'আবদুর রহমান ইবন আবী বাকরাহ্, কায়স ইবন 'আব্বাদ, মুসলিম ইবন ইয়াসার, ইউনুস ইবন জুবায়র, 'আমর ইবন ওয়াহাব, ইয়াহইয়া ইবন আবী ইসহাক হাদরামী, খালিদ আল-হাযরা' প্রমুখ। এ সব ব্যক্তির সূত্রে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৯] আর তাঁদের কল্যাণে তিনি হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞানের সাগরে পরিণত হন। ইবন সা'দ, ইমাম যাহ্বী, ইমাম নাওবী ও ইবন হাজার তাঁকে 'ইমামুল হাদীছ' বলে উল্লেখ করেছেন।

এত ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি হাদীছ শোনা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত রকমের সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি সাধারণ স্তরের মানুষের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন ও হাদীছ শোনা ও গ্রহণ করা এই সতর্কতা পরিপন্থী কাজ বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন, জ্ঞান হচ্ছে দীন। এ কারণে তা গ্রহণের পূর্বে ভালো রকম পরখ করে নাও যে, তা কার নিকট থেকে গ্রহণ করছো।[১০]

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে এত সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, তিনি যে শব্দ শায়খের নিকট থেকে শুনেছেন হুবহু সেই শব্দে বর্ণনা করতেন। শুধু ভাব ও অর্থ বর্ণনা যথেষ্ট মনে করতেন না। এত সাবধানতার সাথে হাদীছ বর্ণনা করতেন যে, মনে হতো কোন জিনিস তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করছেন। অথবা কোন কিছুর ভয় করছেন। আর এই সাবধানতার কারণে তিনি হাদীছ লেখাও পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, বই থেকে দূরে থাক। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা বই এর কারণেই পথ ভ্রষ্ট হয়েছে। আমি যদি কোন জিনিসকে বই বানাতাম, তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) পত্রাবলীকে বানাতাম।

তবে হাদীছ মুখস্থ করার জন্য, এই শর্তে লেখা বৈধ মনে করতেন যে, মুখস্থ করার পরে আবার নষ্ট করে ফেলা হবে। বর্ণনা ও হাদীছ লেখা প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান কথা তিনি বলতেন যে, কথা বলছে এমন কোন ব্যক্তি যদি জানে যে, জবাবদিহিতার জন্য তার সবকথা

---

[৯] তাহযীব আত-তাহযীব- ৯/২১৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৭৮

[১০] তাবাকাত- ৭/১৪১

লেখা হচ্ছে, তাহলে সে কথা বলা কম করে দেবে।[১১] তাঁর একথার অর্থ হলো, সাধারণ কথাবার্তার ক্ষেত্রে একজন কথা বলতে থাকা মানুষ যদি জবাবদিহিতার ভয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে, তাহলে হাদীছের লেখালেখির ক্ষেত্রে তো অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ, এর ভুল-ত্রুটিতে আরো বেশী ধর-পাকড় করা হবে। আর লেখালেখির ভুল-ত্রুটি চিরস্থায়ী রূপ লাভ করে।

হাদীছ বর্ণনায় তাঁর এই সাবধানতার কারণে হাদীছ বিশেষজ্ঞদের নিকট তিনি একজন অতি বড় সত্যবাদী এবং তাঁর বর্ণিত হাদীছ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত। হিশাম ইবন হাসসান বলতেন, আমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী ইবন সীরীনকে পেয়েছি।[১২] হাদীছের অনেক বড় বড় ইমাম এ শাস্ত্রের উৎসাহী ছাত্রদেরকে ইবন সীরীনের সাথে সংযুক্ত থাকতে উপদেশ দিতেন। শু'আয়ব ইবন হাবহাব বলতেন, শা'বী আমাদেরকে ইবন সীরীনের আঁচল ধরে থাকতে উপদেশ দিতেন।[১৩]

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর ছাত্র-শাগরিদের সংখ্যা বিপুল। ইমাম শা'বী, ছাবিত, খলিদ আল-খাদ্দাদ, দাউদ ইবন আবী হিন্দা, ইবন 'আওন, জারীর ইবন হাযিম, 'আসিম আল আহওয়াল, কাতাদা, সুলাইমান আত-তাইমী, মালিক ইবন দীনার, ইমাম আওযা'ঈ, কুররাহ্ ইবন খালিদ, হিশাম ইবন হাস্‌সান, আবূ হিলাল আর-রাসিবী প্রমুখ তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ।[১৪]

ফিকাহ্ শাস্ত্রেও তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। তিনি যে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্‌দের একজন ছিলেন এ ব্যাপারে সবাই একমত। ইবন সা'দ, হাফেজ যাহ্বী, ইমাম নাওবী, ইবন হাজার প্রমুখ পণ্ডিতগণ ফিকাহ্ শাস্ত্রে তিনি যে ইমাম ছিলেন তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইবন হিব্বান বলেন, ইবন সীরীন ছিলেন একজন ফকীহ্, মর্যাদাবান হাফেজ ও দক্ষ ব্যক্তিত্ব।[১৫]

ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর উৎকর্ষতার ভিত্তিতে বিচার-ফায়সালায়ও তিনি দক্ষ ছিলেন। 'উছমান আল-বাত্তি বলেন, এ অঞ্চলে ইবন সীরীনের চেয়ে বড় কোন বিচার-ফায়সালার 'আলিম ছিলেন না।[১৬] বিচার-ফায়সালায় তার দক্ষতার কারণে তাঁকে কাজীর পদটি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। এই পদে তাঁকে জোর করে নিয়োগ দেওয়া হবে ভেবে ভয়ে শামে পালিয়ে যান। অনেক দিন পালিয়ে থাকার পর আবার মদীনায় ফিরে আসেন।[১৭]

বিভিন্ন মাসআলার জবাব ও ফাতওয়া দান কালে তিনি অতিরিক্ত সাবধানতা অথবা ভয়ের কারণে হতবুদ্ধি হয়ে পড়তেন। তখন তাঁর অবস্থা একেবারে পাল্টে যেত। আশ'আছ বলেছেন, আমরা যখন ইবন সীরীনের কাছে বসতাম, তিনি কথাও বলতেন, হাসতেনও,

---

[১১] প্রাগুক্ত- ৭/১৪১,১৪৩; সিয়ারুল তাবি'ঈন- ৪৩৬

[১২] তাহ্যীব আত- তাহ্যীব- ৯/২১৪

[১৩] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৭৮

[১৪] তাহযীব আত-তাহ্যীব- ৯/২১৪

[১৫] প্রাগুক্ত- ৯/২১৬

[১৬] তাবাকাত- ৭/১৪৩

[১৭] শাযারাত আয-যাহাব- ১/১৩৯

কুশলও জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু যেই না তাঁর কাছে ফিকাহ্‌র কোন মাসআলা, অথবা হারাম-হালাল বিষয়ক কোন কথা জানতে চাওয়া হতো অমনি তাঁর রূপ পাল্টে যেত। আর এটা বুঝাই যেত না যে, একটু আগে এই ব্যক্তি হাসিমুখে কথা বলছিলেন। ইবন 'আওন বলেছেন, একবার আমি একটি মাসআলায় ইবন সীরীনের শরণাপন্ন হলাম। জবাবে তিনি বললেন : আমি একথা বলছি যে, এতে কোন অসুবিধে নেই; বরং আমি এতে কোন অসুবিধে বুঝতে পারছিনে।[১৮]

তাঁর যুগের অনেক বড় বড় 'আলিম ও বিশেষজ্ঞ তাঁকেই তাদের সময়ের শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী মনে করতেন। ইবন 'আওন বলতেন, গোটা পৃথিবীতে তিন ব্যক্তির জুড়ি মেলা কষ্টসাধ্য। ইরাকে ইবন সীরীনের, হিজাযে কাসিম ইবন মুহাম্মাদের এবং শামে রাজা' ইবন হায়ওয়ার। আর এই তিনজনের মধ্যে ইবন সীরীন ছিলেন বসরার সবচেয়ে বড় খোদাভীরু ফকীহ্, জ্ঞানী, দক্ষ হাফিজ এবং স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যাকার।[১৯] ইবন 'আওন আরো বলতেন : আমার দু'চোখ ইবন সীরীন, আল কাসিম ও রাজা' ইবন হায়ওয়ার সমকক্ষ কাউকে দেখেনি।[২০]

ইবন সীরীনের জাত বা সত্তাটি ছিল 'ইলম ও 'আমলের সন্ধিস্থল। তাঁর মধ্যে যে পরিমাণ 'ইলম ছিল, ঠিক সেই পরিমাণ 'আমলও ছিল। তিনি তাঁর যুগের একজন বড় 'আবিদ ও খোদাভীরু বুযর্গ ছিলেন। ইবন সা'দ লিখেছেন, তিনি বহু জ্ঞানের ভাণ্ডার ও খোদাভীরু ব্যক্তি ছিলেন।[২১] ইমাম আয-যাহ্‌বী লিখেছেন, তিনি খোদাভীরুদের নেতা ছিলেন। খতীব আল-বাগদাদী বলেছেন, তিনি ছিলেন খোদাভীরু ফকীহ্‌দের একজন।[২২] আল-'ইজলী বলেছেন, আমি কাউকে খোদাভীরুতায় তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ্ এবং ফিকায় তাঁর চেয়ে বড় খোদাভীরু দেখিনি।[২৩] ইবন সীরীন বলতেন, খোদাভীরুতা খুবই সহজ জিনিস। একব্যক্তি একবার প্রশ্ন করলো, সেটা কেমন করে? বললেন, যে জিনিসে সন্দেহ হবে তা পরিহার করবে।[২৪]

একদিন এক যুবক ইবন সীরীনের ঘরে বসে আছে। এক সময় সে ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে বলে : জনাব, এই যে একটি ইট আরেকটি ইটের চেয়ে উঁচু- এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? ইবন সীরীন বললেন : ভাতিজা! বেশী দেখা বেশী কথার জন্ম দেয়। ইবন সীরীনের তাকওয়া-খোদাভীতি সেকালে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। লোকেরা দৃষ্টান্ত হিসেবে তা উল্লেখ করতো। যেমন একজন কবি বলেছেন :[২৫]

---

১৮. তাবাকাত- ৭/১৪২
১৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব- ৯/২১৬
২০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ- ১/৭৮
২১. তাবাকাত- ৭/১৪০
২২. তাহ্‌যীব আল আসমা'- ১/৮৩
২৩. তাবাকাত- ৭/১৪২
২৪. শাযারাত আয-যাহাব- ১/১৩৯
২৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন- ১/১৯২; ৩/১৭৩

فأنت بالليل ذئب لاحريم له + وبالنهار على سَمْتِ ابن سِيْرِيْنَ .

- রাতের বেলা তুমি একজন নেকড়ে- যার কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। আর দিনের বেলা ইবন সীরীনের মত খোদাভীরু।

ইবন সীরীন বলতেন, আমি কখনো কোন কিছুর জন্য কারো প্রতি হিংসা করিনি।[২৬]

স্বভাবগতভাবে তিনি প্রফুল্লমুখ ও হাসি-খুশী মেজাজের ছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তর খোদাভীতিতে পূর্ণ ছিল। ইউনুস বর্ণনা করেছেন, ইবন সীরীন হাসিমুখ ও ঠাট্টা-কৌতুক প্রিয় মানুষ ছিলেন।[২৭] কিন্তু অন্তরের কোমলতা ও খোদাভীতির এমন অবস্থা ছিল যে, প্রকাশ্যে তাঁর ঠোঁট দু'টি তো হাসতো; কিন্তু নির্জন ও একাকীত্বের সময় তাঁর চোখ দু'টো অশ্রু-ভেজা থাকতো।

হিশাম ইবন হাস্‌সান বলেছেন, একবার আমরা কিছু লোক ইবন সীরীনের গৃহে অবস্থান করছিলাম। দিনের বেলায় তাঁকে হাসি-খুশী দেখতাম এবং রাতের অন্ধকারে তাঁর কান্নার আওয়ায শুনতে পেতাম।[২৮] মৃত্যুর আলোচনার সময় তাঁর উপর মৃত্যুর মত অবস্থার সৃষ্টি হতো। যুহাইর আল-আকতা 'বর্ণনা করেছেন। ইবন সীরীন যখন মৃত্যুর কথা আলোচনা করতেন তখন তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন মারা যেত।[২৯] সেকালে একথা বলা হতো যে, 'ফিকাহ্‌তে হাসান আল বসরী, তাকওয়া-খোদাভীতিতে ইবন সীরীন, বুদ্ধি-জ্ঞানে মুতার্‌রিফ ও মুখস্থ শক্তিতে কাতাদা।'[৩০]

'আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সরল-সোজা ও কলুষমুক্ত 'আকীদার অনুসারী। এ ক্ষেত্রে যুক্তির চুলচেরা বিশ্লেষণ ও নতুনত্ব মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর যুগের 'কদর' তথা নিয়তিবাদের চর্চা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি এটাকে খুবই অপছন্দ করতেন। তিনি এর কোন আলোচনা বা কথা শোনা সহ্য করতে পারতেন না। ইবন 'আওন বলেছেন, একবার এক ব্যক্তি ইবন সীরীনের নিকট এসে 'কদর' সম্পর্কিত কিছু কথা বলে। তিনি তার জবাবে এ আয়াতটি পাঠ করেন :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ .

- আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন- যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।[৩১]

---

২৬. প্রাগুক্ত- ৩/১২৫
২৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ- ১/৭৮
২৮. তাহযীব আল- আসমা'- ১/৮৪
২৯. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ- ১/৭৮
৩০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন- ১/২৪২
৩১. সূরা আন-নাহল- ৯০

এ আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে তিনি নিজের কানে আংগুল ঢুকিয়ে বন্ধ করে লোকটিকে বলেন, হয় তুমি আমার নিকট থেকে উঠে চলে যাও, নয়তো আমি চলে যাচ্ছি। তাঁর এমন চরম বিতৃষ্ণ ভাব দেখে লোকটি উঠে চলে যায়। তার যাওয়ার পরে ইবন সীরীন বলেন, আমার অন্তর আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। আমার ভয় হচ্ছিল, সে আমার অন্তরে এমন কোন ধারণা ঢুকিয়ে না দেয় যা দূর করার ক্ষমতা আমার হবে না। আর তাই আমার জন্য এটাই সঙ্গত ছিল যে, আমি তার কোন কথাই শুনবো না।[৩২]

আরেকবার তাঁর নিকট এক বেদুইন আসে এবং বিভিন্ন মত ও পথ বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করতে থাকে। তিনি তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন। কোন এক ব্যক্তি তাকে বললো, 'কদর' বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস কর না। সে বললো : আবু বকর! কদর বিষয়ে আপনার মত কি? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন : এ প্রশ্ন তোমাকে কে শিখিয়ে দিয়েছে? তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, কারো উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই। তবে যদি কোন ব্যক্তি নিজে তার আনুগত্য মেনে নেয় সে তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে।[৩৩]

ইবন সীরীনের সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল 'ইবাদাত। তিনি বড় কঠিন 'ইবাদাত করতেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন তিনি 'ইলম ও 'ইবাদাত উভয় ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ অর্জন করেছিলেন।[৩৪] প্রতি রাতে সাত পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যদি কোন রাতে কিছু পড়তে বাকী থেকে যেত তাহলে তা দিনে পড়ে নিতেন। একাকী থাকার সময় তাসবীহ্ পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। ঘুমানোর পূর্বে নিজের অন্তরকে আল্লাহর যিক্র-এর দিকে ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে সারাটি রাত যেন তাঁর 'ইবাদতে কাটতো। ইবন সীরীনের বাড়ীর সীমানার মধ্যে একটি মসজিদ ছিল। সেখানে শিশুদেরও যাওয়ার অনুমতি ছিল না। একদিন পর পর রোযা রাখতেন। আর এ ব্যাপারে এত কঠোরতা অবলম্বন করতেন যে, রোযার দিনটি ইয়াওমুশ শাক বা সন্দেহের দিন হলেও সন্দেহের কারণে রোযা ছাড়তেন না। ছোটখাট 'ইবাদাতের ক্ষেত্রেও তাঁর আচরণ ছিল একটু বাড়াবাড়ি মাত্রার। ওজু করার সময় পায়ের গোছা পর্যন্ত ধুতেন। যাকাত আদায়ের ব্যাপারে এত গুরুত্ব দিতেন যে, যাকাতের অর্থ বন্টন না করে 'ঈদের নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হতেন না। ইবন 'আওন বর্ণনা করেছেন, আমাদের এমন কখনো হয়নি যে, আমরা 'ঈদের দিন ইবন সীরীনের বাড়ী গিয়েছি, আর তিনি আমাদেরকে খুবাইস (এক প্রকার খাবার) অথবা ফালুদা খাওয়াননি। তিনি যাকাত আদায় ব্যতীত 'ঈদের নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হতেন না। প্রথমে যাকাতের অর্থ পৃথক করে মহল্লার জামে মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন। তারপর 'ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হতেন।[৩৫]

তিনি আল্লাহর নিদর্শন ও প্রতীকসমূহের খুব সম্মান করতেন। কুরআন তিলাওয়াতের

---

৩২. তাবাকাত- ৭/১৪৩

৩৩. প্রাগুক্ত- ৭/১৪৪

৩৪. শাযারাত আয-যাহাব- ১/১৩৯

৩৫. তাবাকাত- ৭/১৪৫,১৪৬,১৪৮

মাঝখানে কথা বলা মোটেই পছন্দ করতেন না। নিজের কাপড় দিয়ে মসজিদ সাফ করতেন।

আল্লাহর আদেশ তো তিনি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। আর নিষেধ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে ছিলেন আরো কঠোর। সন্দেহযুক্ত বিষয়ও এত পরিমাণ পরিহার করে চলতেন যে, তার জন্য বড় রকমের আর্থিক ক্ষতিও মেনে নিতেন। তাঁর ছেলে বাক্কার ইবন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা এক খণ্ড ভূমি খরিদ করেন এবং তার খাজনাও আদায় করেন। সেই ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর ছিল। কিছু লোক আঙ্গুরের রস বের করতে চাইলো। ইবন সীরীন তাদেরকে নিষেধ করলেন এবং তা এমনি বিক্রি করতে বললেন। লোকেরা বললো : এ আঙ্গুর এভাবে বিক্রি করা যায় না। তিনি বললেন, তাহলে শুকিয়ে মনাক্কা বানিয়ে বিক্রি কর। লোকেরা বললো : এ জাতীয় আঙ্গুরের মানাক্কা হয় না। তিনি বললেন : যখন কোনভাবে বিক্রি করা যায় না তখন রস বানানোর চেয়ে এগুলো নষ্ট করে ফেলাই ভালো। এরপর তিনি সব আঙ্গুর পানিতে ফেলে দেন।[৩৬]

ব্যবসা-বাণিজ্য এমন এক পেশা যাতে হারাম-হালালের ব্যাপারে বেশী সতর্কতা অবলম্বন অনেক সময় বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন করে তোলে। ইবন সীরীন জীবিকার জন্য পেশা হিসেবে ব্যবসাকে বেছে নেন। জীবনের প্রথম পর্বে জ্ঞান অর্জন শেষ করে দ্বিতীয় পর্ব যখন আরম্ভ করেন তখন প্রত্যেকটি দিনকে সমান দু'ভাগে ভাগ করেন। এক ভাগ জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান বিতরণ ও 'ইবাদাত, আর এক ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য তথা জীবিকা অর্জন। প্রত্যুষে তিনি বসরার জামে মসজিদে চলে যেতেন। ফজরের নামায আদায়ের পর দুপুরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সেখানে নিজে শিখতেন ও অন্যদেরকে শেখাতেন। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে বেচাকেনার জন্য বাজারে চলে যেতেন। আর রাতের আঁধারে বিশ্বচরাচর যখন ঢেকে যেত তিনি তখন নিজের ইবাদাতখানায় ঢুকে যেতেন। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কুরআনের নির্ধারিত অংশ পাঠে নিমগ্ন হতেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়ে সারা রাত অস্থিরভাবে কাঁদতেন। তাঁর এ কান্না শুনে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের তাঁর প্রতি দয়া হতো এবং তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে যেত। বেচাকেনার উদ্দেশ্যে তিনি যখন বাজারে ঘুরতেন তখন মানুষকে উপদেশ দিতে ভুলতেন না। অন্যদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। কিসে আল্লাহর সন্তুষ্টি তাও বলে দিতেন। ছোট-খাট ঝগড়া-বিবাদও ফায়সালা করতেন।[৩৭]

তিনি জীবিকার জন্য ব্যবসাকে বেছে নেন এবং হালাল-হারামের ব্যাপারে অতিরিক্ত সাবধানতার কারণে মাঝে মধ্যে বিরাট ক্ষতির মধ্যে পড়েন। কিন্তু তিনি হাসিমুখে তা মেনে নেন। তবুও সন্দেহযুক্ত জিনিস স্পর্শ করেননি। একবার তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে কিছু পণ্য খরিদ করেন। সেই পণ্য বিক্রি করে আশি হাজার দিরহাম লাভ হয়। কিন্তু কোন কারণে

---

৩৬. প্রাগুক্ত- ৭/১৪৪. ১৪৭
৩৭. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন- ১২৮

তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, এই বেচাকেনায় সুদের মিশ্রণ ঘটলো কিনা। মূলতঃ এই বেচাকেনায় কোনভাবেই সুদের মিশ্রণ ঘটেনি। তা সত্ত্বেও তিনি কেবল সন্দেহের কারণে লাভের একটি দিরহামও গ্রহণ করেননি।[৩৮]

কোন কোন সময় তো এই অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য কারাদণ্ডের শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছে। তবুও তিনি সন্দেহযুক্ত অর্থ গ্রহণ করেননি। একবার তিনি চল্লিশ হাজার দিরহামের পণ্য খরিদ করেন, পরে তিনি এই পণ্যের ব্যাপারে এমন কিছু কথা জানতে পারেন যা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। এ কারণে তিনি পণ্যের গোটা চালানটাই দান করে দেন। ফলে মহাজনকে মূল্য পরিশোধ করতে না পারায় তাঁকে কারাদন্ড ভোগ করতে হয়।[৩৯]

ঘটনাটি এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনি বাকীতে চল্লিশহাজার দিরহামের যয়তুন তেল খরিদ করেন। একটি পিপা খোলার পরে তাতে একটি পঁচা বিগলিত ইঁদুর দেখতে পান। তিনি আপন মনে বললেন : সব তেল তো একই গুদামে এক স্থানে ছিল। এই অপবিত্র বস্তুটির নাপাক করা তেল তো অন্য পিপাতেও ভরা হতে পারে। আর আমি যদি এ নাপাক তেল বিক্রেতাকে ফেরত দিই তাহলে সে হয়তো আবার বাজারে বিক্রি করবে। তাই তিনি নিজের দীনদারীকে প্রাধান্য দেন। সব পিপার তেল মাটিতে ঢেলে নষ্ট করে ফেলেন। এ কাজ তাঁর জন্য এক বিরাট আর্থিক ক্ষতি ছিল। মহাজন পণ্যের মূল্য অথবা পণ্য ফেরত চাইলো। কিন্তু তিনি পণ্যের মূল্য বাবদ এত অর্থ দিবেন কোথা থেকে। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত কাজীর আদালত পর্যন্ত গড়ালো। কাজী তাঁকে অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ দেন। দীর্ঘদিন যাবত কারাগারে বন্দী জীবনযাপন করেন।[৪০]

তিনি যে স্তরের 'আলিম ছিলেন তাতে সামান্য একটু চেষ্টা করলে কারাগারে না গিয়েও পারতেন। তিনি বিত্তশালী কোন ব্যক্তির অথবা শাসকের দ্বারস্থ হতে পারতেন এবং তাদের দ্বারা নিজের এই ঋণের বোঝা হালকা করাতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজেকে ছোট না করে নিজের আদর্শের উপর অটল থাকেন।

তিনি যখন কোন পণ্য বিক্রি করতেন তখন ক্রেতাকে তা ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাতেন। ক্রেতা রাজী হয়ে গেলে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর মানুষকে সাক্ষী বানাতেন। তাঁর বেচাকেনার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর সমকালীন এক ব্যক্তি মাইমূন ইবনে মাহ্‌রান। তিনি বলেছেন, আমি কিছু কাপড় কেনার জন্য কূফায় গেলাম। সেখানে ইবন সীরীনের দোকানে পৌঁছলাম। যখন আমি কোন কাপড় পছন্দ করতাম এবং দরদাম করে কেনার সিদ্ধান্ত নিতাম তখন তিনি আমাকে তিন বার জিজ্ঞেস করতেন : আপনি কি এটা কিনতে রাজি হয়েছেন? আমি বলতাম : হাঁ, রাজি। এতেও তিনি সন্তুষ্ট হতেন না। বরং দু'জন মানুষকে ডেকে সাক্ষী বানাতেন। এসব পর্যায় অতিক্রম করার পর বলতেন : এখন পণ্য নিয়ে যান। তিনি হিজাযী দিরহামে কেনা-বেচা করতেন না। আমি তাঁর এমন তাকওয়া ও সাবধানতা

---

৩৮. তাবাকাত- ৭/১৪৫
৩৯. প্রাগুক্ত- ৭/১৪৪
৪০. তাহযীব আল-আসমা' ১/৮৪; হিলয়াতুল আওলিয়া- ২/২৬৯-২৭১

দেখে আমার যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস সব সময় তাঁর দোকান থেকেই কিনতাম। এমন কি কাপড় বাঁধার সামান্য জিনিসও তাঁর কাছ থেকেই নিতাম।[৪১]

সে যুগে পরিমাপের পাত্র ও বাটখারার পরিমাণে কমবেশী থাকতো। তাই তিনি যখন কারো নিকট থেকে কোনকিছু ধার-কর্জ নিতেন তখন প্রচলিত পরিমাপ পাত্র ও বাটখারার পরিবর্তে অন্য কোন জিনিস দিয়ে মেপে নিতেন। তারপর যে জিনিস দিয়ে মাপতেন সেটি সীল-মোহর করে সংরক্ষণ করতেন। তারপর সেই জিনিস ফেরত দানের সময় সেই সীল করা নির্দিষ্ট জিনিস দিয়ে মেপে ফেরত দিতেন। আর বলতেন, ওজন কম-বেশী হয়ে থাকে।[৪২]

ব্যবসায়িক লেন-দেনের ধারাবাহিকতায় অধিকাংশ সময় তাঁর হাতে জাল মুদ্রা এসে যেত। জাল মুদ্রায় যে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই তিনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। জাল মুদ্রা তাঁর হাতে এলে তা অন্য কারো হাতে পৌঁছার সুযোগ দিতেন না। সবই নষ্ট করে ফেলতেন। ইবন 'আওন বলেছেন, যখন ইবন সীরীনের নিকট জাল মুদ্রা আসতো, তিনি তা দিয়ে কোন কিছু কিনতেন না। তাই তাঁর মৃত্যুর সময় দেখা গেল এ জাতীয় পাঁচশো অকেজো মুদ্রা তাঁর নিকট জমা হয়ে আছে।[৪৩]

তিনি মানুষকে হালাল উপার্জনের কথা বলতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য হালাল রুযি নির্ধারিত হয়ে আছে, তোমরা তাই তালাশ কর। তোমরা হারাম উপায়ে অর্জন করলেও যা তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে তার চেয়ে বেশী পাবে না।[৪৪] অন্যকে হারাম অর্থ থেকে বাঁচানোর জন্য এতখানি করতেন যে, যদি কেউ তাঁর নিকট থেকে অবৈধভাবে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করতো তিনি তাকে হারাম অর্থ থেকে বাঁচানোর জন্য কসম পর্যন্ত খেয়ে বসতেন।

দীনের হাকীকত ও গূঢ় রহস্যের সূক্ষ্ম বুঝ ও হারাম-হালালের ব্যাপারে তাঁর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি মাঝে মাঝে তাঁকে এমন সব অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করাতো, যা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। যেমন, একবার এক ব্যক্তি এসে দাবী করলো যে, সে তাঁর কাছে দু'টি দিরহাম পায়। দাবীটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল। এ কারণে তিনি লোকটির দাবী মানতে অস্বীকার করেন। লোকটি তখন বললো, তাহলে আপনি হলফ করে বলুন। সে ধারণা করেছিল যে, মাত্র দু'টি দিরহামের জন্য তাঁর মত মানুষ হলফ করবেন না। ইবন সীরীন বললেন : হাঁ, আমি হলফ করবো। এ কথা বলে তিনি হলফ করেন। তখন লোকেরা তাঁকে বললো : হে আবু বকর! আপনি মাত্র দু'টি দিরহামের জন্য হলফ করছেন? অথচ সামান্য সন্দেহের কারণে গতকাল আপনি চল্লিশ হাজারের দাবী ত্যাগ করলেন। আর সে ক্ষেত্রে কেবল আপনি ছাড়া আর কেউই সন্দেহ পোষণ করছিল না। তিনি বললেন : হাঁ, আমি হলফ করবো। কারণ, আমি তাকে হারাম খাওয়াতে চাই না। আর আমি জানি এটা তার সম্পূর্ণ হারাম

---

[৪১] তাবাকাত- ৭/১৪৬; ৭/২০২

[৪২] প্রাগুক্ত- ৭/১৪৭

[৪৩] 'আসরুত তাবি'ঈন- ১৫৫

[৪৪] তাবাকাত- ৭/১৪৬

উপার্জন হবে। আমি জেনে- বুঝে তাকে হারাম খাওয়াতে পারিনে।[৪৫]

হারাম থেকে সাবধানতার কারণে সম্ভবতঃ তিনি শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী আমীর-উমরাদের উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। একবার হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের (রা) মত মহান ব্যক্তি হাসান বসরী (রহ) ও তাঁর নিকট কিছু উপহার পাঠান। হাসান বসরী গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি গ্রহণ করেননি।[৪৬]

খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা থেকে এত পরিমাণ দূরে থাকতেন যে, যে সব বৈধ সুবিধার মধ্যে বিন্দুমাত্র খিয়ানতের ধারণা হতে পারে, শুধু সতর্কতা বশতঃ সে সব সুবিধা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতেন। যেমন, যখন তিনি দীর্ঘদিন জেলখানায় বন্দী ছিলেন তখন তাঁর দীনদারী, খোদাভীতি ও 'ইবাদত-বন্দেগীর অবস্থা দেখে জেলার তাঁর একজন ভক্তে পরিণত হন। একদিন তিনি ইবন সীরীনকে বললেন : শায়খ! রাতে গোপনে আপনি বাড়ী চলে যান, পরিবারের লোকদের সাথে রাত কাটান, তারপর সকাল হওয়ার সাথে সাথে আমার কাছে ফিরে আসুন। আপনার মুক্তি পর্যন্ত এভাবে করতে থাকুন। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! এ কাজ আমি করতে পারবো না। জেলার বললেন : আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত করুন! কেন পারবেন না? তিনি বললেন: শাসন কর্তৃত্বের অধিকারীর সাথে খিয়ানতে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না।[৪৭]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) মৃত্যু শয্যায় ওসীয়াত করে গিয়েছিলেন যে, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন যেন তাঁকে গোসল দেন, কাফন পরান এবং জানাযার নামায পড়ান। হযরত আনাস (রা) মারা গেলেন। ঘটনাক্রমে ইবন সীরীন তখন জেলখানায় বন্দী। লোকেরা শহরের শাসকের নিকট ছুটে গেল এবং তাঁকে হযরত আনাসের (রা) অন্তিম ইচ্ছার কথা জানিয়ে ইবন সীরীনের মুক্তির অনুরোধ জানালো। যাতে তিনি হযরত আনাসের অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন। শাসক অনুমতি দিলেন। কিন্তু ইবন সীরীন জেল থেকে বের হতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন : আমি একজন পাওনাদারের পাওনা অর্থ পরিশোধ করতে না পারার কারণে জেলে বন্দী আছি। তাঁর অনুমতি না আনা পর্যন্ত আমি জেল থেকে বের হবো না। লোকেরা পাওনাদারের কাছে ছুটে গেল এবং তার অনুমতি নিয়ে এলো। এবার তিনি জেল থেকে বের হলেন। হযরত আনাসকে (রা) গোসল দিলেন, কাফন পরালেন এবং তাঁর জানাযার নামায পড়ালেন। তারপর আবার জেলে ফিরে গেলেন। পরিবারের কারো সাথে দেখা করলেন না।[৪৮]

তিনি খ্যাতি ও প্রচার-বিমুখ মানুষ ছিলেন। আর এই খ্যাতির বিড়ম্বনা থেকে বাঁচার জন্য কোন সাধারণ মজলিস-মাহফিলেও যোগদান করতেন না। তিনি বলতেন : আমি শুধু খ্যাতির ভয়ে আপনাদের জলসাগুলোতে আসিনে। মানুষের দৃষ্টিকাড়ে এমন সব কর্ম ও

---

৪৫. তাহযীব আল- আসমা'- ১/৮৪

৪৬. তাবাকাত- ৭/১৪৭

৪৭. তাহযীব আল- আসমা'- ১/৮৪

৪৮. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান- ১/৪৫৩

বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি সযত্নে নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন। অধিকাংশ সময় নামাযের ইমামতির জন্য নিজের চেয়ে কম মর্যাদার লোককে সামনে এগিয়ে দিতেন। ইবন 'আওন বলেন, ইবন হুবাইরার বিদ্রোহের সময় আমিও ইবন সীরীনের সাথে বের হই। নামাযের সময় হলে তিনি আমাকে নামায পড়ানোর নির্দেশ দিলেন। আমি তাঁর আদেশ পালন করলাম। তবে নামায পড়ানোর পর আমি তাঁকে বললাম, আপনি তো বলে থাকেন যে, নামায সেই ব্যক্তির পড়ানো উচিত যার কুরআন বেশী মুখস্থ আছে। তিনি বললেন, আমার এটা ভালো মনে হয় না যে, আমি নামায পড়ানোর জন্য সামনে এগিয়ে যাই, আর মানুষ এটা বলুক যে, মুহাম্মদ মানুষের নামাযের ইমামতি করেন।[৪৯]

ইবন সীরীন তাঁর মায়ের বড় অনুগত ছিলেন। মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা করতেন। মা কিসে খুশী হন, সব সময় সে দিকে লক্ষ্য রাখতেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর উপর অক্ষরে অক্ষরে 'আমল করতেন।

وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ
أَحَدُهُمَا أَوْكِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا.

- তোমার পালনকর্তা আদেশ করছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলোনা এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বলো তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা।[৫০]

মাকে তিনি কী পরিমাণ ভালোবাসতেন এবং মায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কতটুকু যত্নবান ছিলেন তার একটা চিত্র পাওয়া যায় তাঁর বোন হাফসা বিন্ত সীরীনের একটি বর্ণনায়। তিনি বলেন, আমার মা ছিলেন হিজাযের মেয়ে। তিনি রঙ্গীন ও উৎকৃষ্টমানের মিহি কাপড় পছন্দ করতেন। ইবন সীরীন মায়ের এ পছন্দকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। যখনই তাঁর জন্য কাপড় কিনতেন তখন কেবল কাপড়ের মসৃণতার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, কতখানি টেকসই সে দিকে মোটেও খেয়াল করতেন না। 'ঈদের জন্য ইবন সীরীন নিজে মায়ের কাপড় রং করতেন। আমি কখনো তাকে মার সামনে জোর গলায় কথা বলতে শুনিনি। যখন কথা বলতেন, এত আস্তে বলতেন যেন কোন গোপন কথা বলছেন। ইবন 'আওন বলেছেন, ইবন সীরীন যখন তাঁর মার সামনে থাকতেন তখন তাঁর গলার আওয়ায এত ক্ষীণ হতো যে, কোন অপরিচিত লোক সে সময় তাকে দেখলে রোগাক্রান্ত বলে মনে করতো।[৫১]

তিনি নিজেকে খুবই তুচ্ছ মনে করতেন। নিজের ব্যক্তিসত্তার জন্য বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য পছন্দ করতেন না। সুতরাং কাউকে তাঁর সাথে সাথে চলার অনুমতি দিতেন না। যদি কেউ

---

[৪৯] তাবাকাত-৭/১৪৮
[৫০] সূরা বানী ইসরাইল- ২৩
[৫১] তারীখু ইবন 'আসাকির- ৫/২২৩

তাঁর সাথে চলতে চাইতো, তাকে তিনি বলতেন, যদি তুমি বিনা প্রয়োজনে চলতে থাক, তাহলে ফিরে যাও। তিনি বলতেন, পাপাচারে যদি দুর্গন্ধ থাকতো তাহলে আমার পাপের দুর্গন্ধের কারণে কোন মানুষ আমার কাছে ঘেঁষতে পারতো না।[৫২]

এত বিনয় ও নম্রতা সত্ত্বেও তিনি একজন দুঃসাহসী ব্যক্তি ছিলেন। অনেক বড় বড় বিপদ ও ভীতিকে কোন পাত্তাই দিতেন না। আবূ কিলাবা বলতেন, মুহাম্মাদের সমান শক্তি ও সাহস রাখে কে? তিনি নিযার ফলার উপরও উঠে পড়তেন। বড় সাফ দিলের মানুষ ছিলেন। কখনো কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, আমি ভালো-মন্দ কারো প্রতি হিংসা করিনে।[৫৩] মোটকথা, ধর্ম ও নীতি-নৈতিকতার তিনি এক পূর্ণ মডেল ছিলেন। আবূ 'আওয়ানা বলেছেন, ইবন সীরীনকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হতো।[৫৪]

ইবন সীরীনের এসব চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য বড় বড় সাহাবী ও তাবি'ঈদেরকে এত পরিমাণ মুগ্ধ করেছিল যে তাঁদের অনেকে তাঁর দ্বারা নিজেদের জানাযার নামায পড়ানোকে বড় বরকতের কাজ বলে মনে করেছিলেন। তাই তাঁদের মৃত্যুর আগে তাঁকে দিয়ে কাফন-দাফন ও জানাযার জন্য অসীয়ত করে গিয়েছিলেন। যেমন হযরত আনাস ইবন মালিকের (রা) কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন 'আওন বর্ণনা করেছেন, হযরত হাসান আল বসরীর আত্মগোপনকালে তাঁর এক মেয়ের ইনতিকাল হয়। আমি গোপনে তাকে সংবাদ পৌঁছালাম। আমার ধারণা ছিল তিনি আমাকে জানাযার নামায পড়ানোর নির্দেশ দিবেন। কিন্তু তিনি আমাকে করণীয় অনেক কাজের কথা বলার পর ইবন সীরীন দ্বারা জানাযার নামায পড়ানোর আদেশ দেন।[৫৫]

হিজরী ১১০ সনে তিনি অন্তিম রোগে আক্রান্ত হন। শেষ জীবনে চল্লিশ হাজার দিরহাম ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ জন্য বড় চিন্তিত ছিলেন। ছেলে 'আবদুল্লাহ তাঁর সব ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিয়ে তাকে চিন্তামুক্ত করেন। তিনি ছেলের কল্যাণ কামনা করে দু'আ করেন। মৃত্যুর পূর্বে উপদেশ দেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, পরস্পর মিলেমিশে থাকবে। যদি ঈমানদার হওয়ার দাবী কর তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি দীন নির্বাচন করেছেন, তার উপরেই মরবে। তোমরা দীনের ক্ষেত্রে আনসারদের ভাই ও তাদের মাওলা (আযাদকৃত দাস) হিসেবে থাকবে। সততা ও পবিত্রতা ব্যভিচার ও মিথ্যা থেকে ভালো। এ সব অসীয়াত করার পর জুম'আর দিন ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স আশি বছরের উপর ছিল। অনেকে সাতাত্তর বছরের কথা বলেছেন। ইমাম যাহবী বলেছেন, তিনি হাসান আল-বসরীর মৃত্যুর ১০০ দিন পর

---

[৫২] মুখতাসার সিফাতুস সাফওয়া- ১৫০

[৫৩] তাবাকাত- ৭/১৪৩,১৪৪

[৫৪] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৭৮

[৫৫] তাবাকাত- ৭/১৪৮

মৃত্যুবরণ করেন।[৫৬] তিনি তিরিশজন সন্তানের জনক ছিলেন। তবে মৃত্যুর সময় একমাত্র ছেলে আবদুল্লাহ ছাড়া আর কেউ জীবিত ছিলেন না। তিনি ভালো পোশাক পরতেন, চুলে মেহেদীর খেজাব লাগাতেন। গোঁফ হালকা করে ছাঁটতেন।

সে যুগের একজন বিখ্যাত মহিলা 'আবিদ হাফসা বিনত রাশিদ। তিনি বলেছেন, মারওয়ান আল-মাহমালী নামে আমাদের একজন প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি আল্লাহ-রাসূলের বড় অনুগত এবং একজন বড় 'আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মারা গেলেন। আমরা বড় শোকাভিভূত হয়ে পড়লাম। এ অবস্থায় আমি একদিন তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি প্রশ্ন করলাম আবূ আবদিল্লাহ! আপনার রব আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললেন : আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। বললাম, তারপর আর কি করেছেন? বললেন : আমাকে ডান পাশের লোকদের কাছে উঠানো হয়েছে। বললাম : তারপর? বললেন : আমাকে পূর্ববর্তী লোকদের কাছে নেওয়া হয়েছে। বললাম : সেখানে আর কাকে দেখেছেন? বললেন : হাসান আল-বসরী ও মুহাম্মাদ ইবন সীরীনকে দেখেছি।[৫৭]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবন সীরীন একজন বড় ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যাকার ছিলেন। ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে তাঁর ব্যাখ্যা সম্বলিত অনেক স্বপ্নের কথা জানা যায়। এখানে তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

একদিন এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম একটি কবুতর একটি মুক্তা গিলে ফেললো। তারপর মুক্তাটি আগের চেয়ে বড় হয়ে বেরিয়ে এলো। আরেকটি কবুতর একটি মুক্তা গিলে ফেললো। তারপর সেটি পূর্বের চেয়ে ছোট হয়ে বেরিয়ে এলো। তৃতীয় আরেকটি কবুতর একটি মুক্তা গিললো এবং সেটি পূর্বের মত একই আকারে বেরিয়ে এলো।

ইবন সীরীন বললেন : প্রথম কবুতরটি হলেন হাসান আল বসরী, তিনি হাদীছ শোনেন। তারপর সুন্দর করে বর্ণনা করেন এবং ওয়াজের মধ্যে ব্যাখ্যা করেন। আর যে কবুতরটির মধ্যে মুক্তা ছোট হয়ে যায়, সে আমি, আমি হাদীছ শুনি, কিন্তু কিছু বাদ দিই। আর তৃতীয়টি হলো কাতাদা, তিনি হাদীছ যাঁরা সবচেয়ে বেশী মুখস্থ রাখতে পারেন তাঁদের একজন।[৫৮]

একবার এক ব্যক্তি এসে বললো : আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার মাথার উপরে যেন একটি স্বর্ণের মুকুট শোভা পাচ্ছে।

ইবনে সীরীন বললেন : আপনি আল্লাহকে ভয় করুন! আপনার পিতা প্রবাসে আছেন। সেখানে তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। তিনি চাচ্ছেন আপনি তাঁকে নিয়ে আসুন। লোকটি তখন একটি চিঠি বের করে বলে, এই যে আমার পিতার চিঠি। এতে লিখেছেন, তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন, বিদেশ-বিভূঁইয়ে আছেন এবং তাঁকে নিয়ে আসার জন্য বলেছেন।

---

৫৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৭৮; 'আসরুত তাবি'ঈন- ১৬১; সুওয়ারুম মিন হায়াত আত- তাবি'ঈন- ১৩৩

৫৭. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত- তাবিঈন-১৩৪

৫৮. তারীখু ইবন 'আসাকির- ৫/২২৭

একদিন এক ব্যক্তি এসে বললো : আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি রক্ত প্রস্রাব করছি। ব্যাখ্যায় ইবন সীরীন বললেন : তুমি তোমার স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় উপগত হয়ে থাক। সে বললো : ঠিক বলেছেন। তিনি বললেন : আল্লাহকে ভয় কর। আরেকবার এক ব্যক্তি এসে বললো : আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন কোন ক্ষেত চাষ করছি; কিন্তু তাতে কোন চারা গজাচ্ছে না। বললেন : তুমি স্ত্রী উপগত অবস্থায় 'আযল করে থাক। লোকটি বললো : ঠিক। একদিন এক ব্যক্তি এসে বললো : আমি দেখলাম, জাওয়া নক্ষত্র ছুরাইয়্যা নক্ষত্রের আগে চলে গেছে। তিনি বললেন : এই হাসান আল বসরী আমার আগে মারা যাবেন। তারপর আমি তাঁর অনুসরণ করবো। তিনি আমার চেয়ে উঁচু মর্যাদার। ৫৯

একবার এক ব্যক্তি এসে বললো : আমি যেন দেখলাম, আমার হাতে পানি ভর্তি একটি কাঁচের পেয়ালা। পেয়ালাটি পড়ে ভেঙ্গে গেল; কিন্তু পানি থেকে গেল। তিনি লোকটিকে বললেন : আল্লাহকে ভয় কর। আসলে তুমি কিছুই দেখনি। লোকটি বললো, সুবহানাল্লাহ! আমি যা বলেছি তাই দেখেছি। তিনি বললেন : কেউ মিথ্যা বললে তার দায়িত্ব আমার নয়। তোমার স্ত্রী খুব শিগগীর সন্তান প্রসব করে মারা যাবে। কিন্তু তার সদ্য প্রসূত ছেলেটি বেঁচে থাকবে। লোকটি বেরিয়ে গিয়ে বললো : আল্লাহর কসম! আমি কিছুই দেখিনি। অল্প কিছু দিনের মধ্যে তার স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে মারা যায়।৬০

'আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম আল-মুরূযী ছিলেন ইবন সীরীনের সমকালীন বসরার একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি বলেন, আমি ইবন সীরীনের মজলিসে উঠা-বসা করতাম। এক সময় তা ছেড়ে দিয়ে গোপনে খারিজীদের 'ইবাদিয়্যা' সম্প্রদায়ের সাথে উঠা-বসা শুরু করি। একদিন আমি স্বপ্নে দেখি, আমি এমন সব লোকদের সাথে আছি যারা রাসূলুল্লাহর (সা) মরদেহ বহন করছে। আমি ইবন সীরীনের নিকট আসলাম এবং আমার স্বপ্নের কথা তাঁকে বললাম। তিনি বললেন : আপনার কি হয়েছে যে, আপনি এসব লোকদের সাথে বসেন যাঁরা নবী (সা) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা দাফন করতে চায়? ৬১

এভাবে বহু স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার কথা পাওয়া যায়। ইমাম যাহবী বলেছেন, ইবন সীরীন থেকে স্বপ্নের তা'বীরের ব্যাপারে অনেক আশ্চর্যজনক কথা বর্ণিত হয়েছে, যা অনেক দীর্ঘ। এ ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর সাহায্য লাভ করেছিলেন।৬২

এতবড় জ্ঞানী ও 'আবিদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি একজন রসিক মানুষ ছিলেন। তবে তাঁর সে রসিকতা সীমা লংঘন করতো না।

হিশাম ইবন হাস্সান বলেন, একবার এক ব্যক্তি ইবন সীরীনের নিকট এসে বললো : আমি যে স্বপ্নটি দেখেছি সে সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেন : স্বপ্নটি কি?

---

৫৯. হিলয়াতুল আওলিয়া- ২/২৭৭, ২৭৮

৬০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'- ৪/৬১৭

৬১. 'আসরুত তাবি'ঈন- ১৫৬

৬২. সিয়ারু আ'লাম আন- নুবালা'- ৪/৬১৮

লোকটি বললো, আমি দেখলাম, আমি একটি ছাগল পেয়েছি এবং তা বিক্রি করে আট দিরহাম পাচ্ছি। বিক্রির সময় আমি জেগে গেলাম। দু'চোখ খুলে কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি আবার চোখ বন্ধ করে আমার দু'হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং বললাম : চার দিরহামই দাও। কিন্তু কিছুই দিল না। তার কথা শুনে ইবন সীরীন বললেন : সম্ভবত: ক্রেতারা তোমার ছাগলের কোন দোষের কথা জেনে সরে পড়েছে। লোকটি বললো ঃ আপনি যা বললেন সম্ভবতঃ তাই হবে।[৬৩] আসলে লোকটি ছিল একটু নির্বোধ ধরনের, তাই ইবন সীরীনও তাকে সেই রকম জবাব দিয়েছিলেন।

একবার গালিব নামক এক ব্যক্তি ইবন সীরীনের নিকট হিশাম ইবনে হাস্সান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন : তিনি তো গতকাল মারা গেছেন। আপনি জানেন না? কথাটি শুনে গালিব দুঃখের সাথে "ইন্না লিল্লাহ" পাঠ করলেন। ইবন সীরীন তাঁর ব্যথিত চেহারা দেখে পাঠ করলেন :[৬৪]

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها .

- আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে।[৬৫]

ইবন সীরীনের মজলিসটি হতো সব সময় শুভ, কল্যাণ ও উপদেশের মজলিস। সেখানে তাঁর উপস্থিতিতে কেউ কারো সম্পর্কে কোন খারাপ কথা বললে তিনি খুব দ্রুত সেই ব্যক্তির কোন ভালো কিছু জানা থাকলে তা আলোচনা করে সবাইকে শুনিয়ে দিতেন। উমাইয়্যা যুগের অত্যন্ত প্রতাপশালী স্বৈরাচারী গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মৃত্যুর পর তিনি একদিন শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে গালি দিচ্ছে। তিনি লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন : ভাতিজা, চুপ কর। হাজ্জাজ তাঁর পরোয়ারদিগারের নিকট চলে গেছেন। তুমি যখন আল্লাহ রাব্বুল 'ইজ্জাতের সামনে উপস্থিত হবে তখন দেখবে, এ দুনিয়াতে যে সব ছোট ছোট পাপ করেছো তা হাজ্জাজের বড় বড় পাপের চেয়েও মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। তোমাদের দু'জনের অবস্থাই হবে সেদিন ভিন্ন- যা নিয়ে প্রত্যেকেই ব্যস্ত থাকবে। ভাতিজা! জেনে রাখ, মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হাজ্জাজ যাদের উপর জুলুম করেছেন তাদের পক্ষ থেকে হাজ্জাজের নিকট থেকে বদলা নিবেন। ঠিক তেমনিভাবে হাজ্জাজের প্রতি যারা জুলুম করেছে, আল্লাহ হাজ্জাজের জন্য তাদের থেকে বদলা নিবেন। সুতরাং আজকের পর থেকে কারো গালি দেওয়ার কাজে নিজেকে কখনো জড়িত করোনা। আরেকবার এক ব্যক্তি সফরে রওয়ানা হওয়ার আগে তাঁর সাথে দেখা করতে এলো। তিনি তাকে বললেন : ভাতিজা সব সময় আল্লাহকে ভয় করবে। যতদূর সম্ভব হালাল পথে রোজগার করবে। আর জানবে যে, হারাম পথে তুমি যতই চেষ্টা কর, তোমার জন্য নির্ধারিত অংশের বেশী তুমি লাভ করতে পারবে না।[৬৬]

---

৬৩. আল 'ইক্দ আল ফারীদ- ৬/১৬৪

৬৪. 'উয়ূন আল-আখবার- ১/৩৬৫

৬৫. সূরা আয-যুমার-৪২

৬৬. সূওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৩০; 'আসরুত তাবি'ঈন-১৫৯

বানূ উমাইয়্যার অনেক আঞ্চলিক গভর্নর ও শাসকদের সাথে ইবন সীরীনের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। মাঝে মাঝে তাঁদের দরবারে যেতেন এবং সুযোগমত তাঁদেরকে আল্লাহ-রাসূলের কথা শুনিয়ে উপদেশ দিতেন। একবার বানূ উমাইয়্যার একজন উঁচুস্তরের গভর্নর 'উমার ইবন হুবায়রা আল-ফায়ারী লোক মারফত ইবন সীরীনকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য ডেকে পাঠালেন। তিনি এক ভাতিজাকে সংগে নিয়ে ইবন হুবায়রার দরবারে গেলেন। ইবন হুবায়রা তাঁকে গভীর সম্মান ও আন্তরিকতার সাথে স্বাগতম জানিয়ে নিজের আসনের পাশে বসালেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ তাঁর সাথে দীন ও দুনিয়ার নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। এক পর্যায়ে ইবন হুবায়রা তাঁকে প্রশ্ন করলেন : ওহে আবূ বকর! আপনি আপনার শহরবাসীদেরকে কেমন রেখে এসেছেন? বললেন : আমি যখন তাদেরকে ছেড়ে এসেছি তখন জুলুম-অত্যাচার তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আর আপনি তাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। পাশে বসা তাঁর ভাতিজা তাঁর কাঁধে টোকা দিয়ে তাঁকে একটু সংযত করতে চাইলেন। এতে তিনি আরো বেপরোয়া হয়ে গেলেন। তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি তুমি নও, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি আমি। নিশ্চয় এ আমার একটি সাক্ষ্য।

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন :

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أثِمٌ قَلْبُهُ .

আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করোনা। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে।[৬৭]

মজলিস যথারীতি শেষ হলো। 'উমার ইবন হুবায়রা যেভাবে সম্মান ও আবেগের সাথে ইবন সীরীনকে স্বাগতম জানিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে বিদায় দিলেন। তারপর তিন হাজার দীনার ভর্তি একটি থলে লোক মারফত ইবন সীরীনের কাছে পাঠালেন। কিন্তু তিনি গ্রহণ করলেন না। তাঁর ভাতিজা প্রশ্ন করলেন : আমীরের উপহার আপনি গ্রহণ করলেন না কেন? বললেন : আমার প্রতি একটি ভাল ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি এ উপহার আমাকে দিয়েছেন। তাঁর ধারণা মত আমি যদি ভালো মানুষ হই তাহলে আমার তা গ্রহণ করা উচিত নয়। আর যদি আমি তাঁর ধারণার অনুরূপ মানুষ না হই, তাহলে তো তা গ্রহণ করা কোনভাবেই সঙ্গত নয়।[৬৮]

---

[৬৭] সূরা- আল বাকারা- ২৮৩

[৬৮] সুওয়ারুন মিন হায়াত তাবি'ঈন- ১৩১; 'আসরুত তাবি'ঈন- ১৫২-১৫৩

আল-আহনাফ ইবন কায়স (রহ)

আল-আহনাফের ভালো নাম সাখর, মতান্তরে দাহ্হাক। উপনাম আবূ বাহ্র। আরবের বিখ্যাত তামীম গোত্রের একটি শাখা-গোত্রের নাম বানূ সা'দ। হিজরাতের তিন বছর পূর্বে ৬১৯ খ্রীস্টাব্দে এই গোত্রে তাঁর জন্ম।[১] পিতার নাম কায়স ইবন মু'আবিয়া। আবূ বাহ্র সাখরের দু'টি পা জন্মগতভাবেই খোঁড়া ছিল। এ কারণে 'আল-আহনাফ' উপাধিটি কপালে জুটে যায়। যার অর্থ খঞ্জ, ল্যাংড়া, খোঁড়া ইত্যাদি। তাছাড়া তাঁর দেহে আরো অনেক অস্বাভাবিকতা ছিল।[২] এত কুশ্রী ও কদাকার ছিলেন যে, মানুষ প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁকে তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করতো। তবে নেতৃত্ব ও আভিজাত্যের যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ সমাবেশ তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। যেমন : প্রখর বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, মত প্রকাশের সৎসাহস, প্রবল বাগ্মিতা ও বাকপটুতা ইত্যাদি।[৩] তাঁর পিতা কায়স যেমন তাঁর গোত্রের প্রথম স্তরের কোন লোক ছিলেন না তেমনি একেবারে শেষ স্তরেরও ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন মধ্যম স্তরের মানুষ। বর্তমান সৌদি আরবের 'নাজদ' প্রদেশের 'আল-য়ামামা'-এর পশ্চিমাঞ্চলে ছিল তাঁর গোত্রের আদি বাসস্থান। আর সেখানেই আল-আহনাফের জন্ম হয়। মতান্তরে বসরায় তাঁর জন্ম এবং সেখানেই এতিম অবস্থায় তিনি বেড়ে ওঠেন। তিনি খুব অল্প বয়সে পিতৃহারা হন। বানূ মাযিন তাঁর পিতাকে হত্যা করে।[৪]

আহনাফ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকাল লাভ করেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলীর বর্ণনা মতে রিসালাতের যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁরই চেষ্টায় তাঁর গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে।[৫] তবে অন্য রিজাল শাস্ত্রবিদদের বর্ণনা এর বিপরীতে দেখা যায়। ইবন সা'দ তাঁর জীবনী 'তাবি'ঈন'-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইবন 'আবদিল বার সতর্কতামূলকভাবে সাহাবীদের মধ্যে তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছেন। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকাল পেয়েছিলেন। তবে রাসূলে পাকের দীদারের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকেন। তাই তাঁকে তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য করেন।[৬] হাফেজ ইবন হাজার লিখেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) যুগ লাভ করেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেননি।[৭]

যে বর্ণনার ভিত্তিতে বলা হয় যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেন

---

[১] ড: 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী-১/৩৪৪; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৪৫৭

[২] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৫৬

[৩] ড: শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-২/৪৩১

[৪] ড: 'উমার ফাররূখ-১/৩৪৪

[৫] শাযারাত আয-যাহাব-১/৭৮

[৬] আল-ইসতী'আব-১/৫৫

[৭] তাহযীব আত-তাহযীব-১/১৯১

তা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) জীবনের শেষ ভাগে ইসলামী দা'ওয়াত প্রসারের লক্ষ্যে আল-আহনাফের গোত্র বানূ সা'দে একজন সাহাবীকে পাঠান। তিনি বানূ সা'দের লোকদের সমবেত করে তাদের সামনে ইসলামের বাণী তুলে ধরেন এবং তাদেরকে ঈমান আনার আহ্বান জানান। লোকেরা চুপ থাকলো এবং একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে লাগলো। কিশোর আহনাফও সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর গোত্রের নেতা ও সাধারণ লোকদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভাব লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে যান এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন : হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আমি আপনাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভাব লক্ষ্য করছি কেন? আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে এক পা এগোচ্ছেন তো আরেক পা পিছাচ্ছেন কেন? আল্লাহর কসম! এই আগন্তুক আপনাদের জন্য শুভ ও কল্যাণের বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন। তিনি আপনাদেরকে উত্তম মূল্যবোধ ও নৈতিকতার দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং ক্ষতিকর উপাদান থেকে বিরত থাকতে বলছেন। আল্লাহর কসম! আমরা ভালো কথা ছাড়া তাঁর মুখ থেকে আর কিছু শুনিনি। সুতরাং আপনারা এই সত্যের আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিন। আপনারা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করে সফলকাম হবেন। তাঁর কথার পর তাঁর গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর তাঁর গোত্রের প্রবীণরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু বয়স কম হওয়ার কারণে আল-আহনাফকে নেওয়া হয়নি। ফলে তিনি সাহাবী হওয়ার মর্যাদা ও গৌরব থেকে বঞ্চিত থেকে যান।[৮]

আল-আহনাফ বলেন : আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতকালে একদিন কা'বা তাওয়াফ করছি। তখন আমার পূর্ব পরিচিত এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো। তিনি আমার একটি হাত মুট করে ধরে বললেন : আমি কি আপনাকে একটা সুসংবাদ দিব? বললাম : হাঁ, দিন। বললেন : আপনার কি সেই কথা স্মরণ আছে, যেদিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের গোত্রে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর জন্য গিয়েছিলাম এবং সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য তুলে ধরার পর আপনি কি বলেছিলেন? বললাম : হাঁ, স্মরণ আছে। তিনি বললেন : সেদিন আমি আপনাদের ওখান থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ফিরে তাঁকে আপনার ভূমিকা ও বক্তব্যের কথা বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন : 'হে আল্লাহ, তুমি আল-আহনাফের সকল পাপ ক্ষমা করে দাও।' এরপর আল-আহনাফ আজীবন বলতেন : 'কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) এই দু'আর চেয়ে বড় আশাব্যাঞ্জক কোন 'আমল আমার নেই।'[৯]

কিন্তু প্রথমতঃ এ বর্ণনাটি সত্য কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। আর সত্য বলে মেনে নিলেও এতে তাঁর ইসলাম গ্রহণ প্রমাণিত হয় না। শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি একজন সত্যের অনুসারী জ্ঞানী লোক ছিলেন এবং অন্তরে সত্য গ্রহণ করার শক্তি ও সাহস ছিল। আর রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আ তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ নয়। তাঁর এ দু'আ

---

[৮] ড: 'উমার ফাররূখ-১/৩৪৪

[৯] ইবন সা'দ, তাবাকাত-৭/৬৬; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৪৬০-৪৬১

ছিল আহনাফের সত্যকে চেনা ও জানার জন্য। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, তিনি সে সময় ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহকে দেখা, তাঁর সাহচর্য লাভ করা এ বর্ণনা দ্বারা মোটেই প্রমাণ হয় না। আর সাহাবী হওয়ার জন্য দেখা ও সাক্ষাৎ অপরিহার্য। তবে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই সত্যকে চেনা এবং তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আ করা এ মোটেই কম মর্যাদার ব্যাপার নয়। বিভিন্ন তথ্য দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রথম খলীফার খিলাফতকালের কোন এক সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। নিম্নের এ ঘটনা দ্বারা সে কথা প্রমাণিত হয়।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর জাযীরাতুল আরবে ভণ্ড নবী মুসায়লামা আল-কাজ্জাবের উৎপাত শুরু হয়। সে নিজেকে একজন নবী বলে দাবী করে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অনেকে তার সাথে যোগ দেয়। ফলে তার কর্মকাণ্ড ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য একটি মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি করে। একদিন আল-আহনাফ তাঁর চাচা আল-মুতাশাম্মাসকে সংগে করে মুসায়লামার সাথে সাক্ষাৎ ও তার কথা শোনার জন্য যান। আল-আহনাফ তখন একজন তরুণ। মুসায়লামার সাথে দেখা করে ফেরার পথে চাচা আল-মুতাশাম্মাস তাঁকে প্রশ্ন করলেন :

– আহনাফ, লোকটিকে কেমন দেখলে?

আল-আহনাফ : লোকটিকে অসত্যের অনুসারী বলে মনে হলো। সে আল্লাহ ও মানুষের প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে।

চাচা একটু কৌতুক করে তাঁকে বললেন : তুমি তাকে মিথ্যাবাদী বলছো, একথা আমি যদি তাকে বলে দিই, তুমি ভয় পাবে না?

বললেন : সে সময় আমি তার সামনেই একথার ব্যাপারে আপনার শপথ নিব যে, আপনিও কি আমার মত তাকে মিথ্যাবাদী বলেন না? অতঃপর চাচা-ভাতিজা দু'জনই হেসে দেন। দু'জন ইসলামের উপর অটল থাকেন।[১০]

এ সময় (হিঃ ১১/খ্রীঃ ৬৩৩) তাঁর গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, কিন্তু তিনি তাঁর গোত্রকে অনুসরণ করেননি। তাঁর গোত্রের সাথে মিলে মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধও করেননি।[১১] হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি প্রথম মদীনায় আসেন। তখন তাঁর বয়স বিশ বছর। বানূ তামীম সম্পর্কে হযরত 'উমারের (রা) একটা খারাপ ধারণা ছিল। এজন্য প্রায়ই তিনি নিন্দামন্দ করতেন। একবার আহনাফের উপস্থিতিতে বানূ তামীমের কোন প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলো। 'উমার (রা) তাঁর অভ্যাস মত তাদের নিন্দামন্দ করলেন। সাথে সাথে আহনাফ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কিছু বলার জন্য অনুমতি চাইলেন। খলীফা অনুমতি দিলেন। আহনাফ বললেন : আপনি কোন ব্যতিক্রম ছাড়া গোটা বানূ তামীমের নিন্দা করেছেন। অথচ তারাও সাধারণ মানুষের মত। তাদের

---

১০. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৪৬২

১১. ড: 'উমার ফাররুখ-১/৩৪৪

মধ্যেও ভালো-মন্দ সব ধরনের মানুষ আছে। হযরত 'উমার (রা) এমন সত্য উচ্চারণ শুনে বলেন : তুমি সত্য বলেছো। তারপর তিনি বানূ তামীমের কিছু গুণের কথা বলে পূর্বের উচ্চারিত তাদের নিন্দার ক্ষতিপূরণ করেন। আহনাফের পরে তাঁরই গোত্রের 'হাত্তাত' নামের আরেক ব্যক্তি কিছু বলতে চায়। কিন্তু 'উমার (রা) তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তোমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের নেতা তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

যদিও হযরত 'উমার (রা) আহনাফের নীতিগত কথার কারণে তাঁর বক্তব্য মেনে নেন, তবে তাঁর গোত্রের প্রতি 'উমারের (রা) খারাপ ধারণা বিদ্যমান ছিল। এ কারণে সতর্কতামূলকভাবে আহনাফের জীবন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে খলীফা এক বছরের জন্য মদীনায় নিজের সাথে রেখে দেন। পরীক্ষার পর তিনি আহনাফকে বলেন, আমি এক বছর যাবত তোমাকে পরীক্ষা করেছি। আমি তোমার মধ্যে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু দেখিনি। তোমার বাহ্যিক আচরণ ভালো। আমি আশা করি তোমার ভিতরটাও ভালো হবে। আমি তোমার সাথে এমন আচরণ এজন্য করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে একথা বলে সতর্ক করে গেছেন যে, এই উম্মাতের ধ্বংস বাকপটু মুনাফিকদের হাতেই হবে।[১২]

এই পরীক্ষার পর হযরত 'উমারের (রা) যখন আহনাফের উপর দৃঢ় আস্থা সৃষ্টি হলো তখন তাঁকে তাঁর জন্মভূমি বসরায় ফেরত পাঠালেন। আর সেই সাথে বসরার তৎকালীন ওয়ালী আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে (রা) তাঁকে সংগে রাখার, তাঁর সাথে পরামর্শ করার এবং তাঁর পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য বলে পাঠান। আহনাফ বসরার একজন নেতা ছিলেন। হযরত 'উমারের (রা) এই নির্দেশের পরে প্রতিদিন তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১৩]

সেই সময় পারস্য অভিযান চলছিল। বসরায় ফিরে যাওয়ার পর আহনাফ এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং হিজরী ১৭ সনে পারস্য অভিযানে তাঁকে দেখা যায়।[১৪]

আহনাফ ছিলেন একজন বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল মানুষ। এ কারণে গোত্রীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতিনিধিত্বের সময় তাঁর নামটি তালিকার প্রথমে দেখা যেত এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গোত্রীয় প্রতিনিধির দায়িত্ব তাঁরই উপর অর্পিত হতো। আর তাই এই সময় বসরার একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মদীনায় খলীফার দরবারে আসেন। খলীফা হযরত 'উমার (রা) বসরাবাসীদের বিভিন্ন অভিযোগ ও প্রয়োজনসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, আহনাফ তাদের প্রয়োজন ও অভিযোগসমূহ তুলে ধরে চমৎকার একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর এ বক্তৃতায় হযরত 'উমার খুবই মুগ্ধ হন এবং মন্তব্য করেন : আল্লাহর কসম! ইনি একজন নেতা। কথাটি দু'বার বলেন। সেখানে উপস্থিত যায়দ ইবন জাবালার সহ্য হলো না। তিনি বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! সে তেমন নয়। তার মা

---

[১২] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৫৪

[১৩] প্রাগুক্ত-১/২৩৭; তাবাকাত-৭/৬৬; উসুদুল গাবা-১/৫৫

[১৪] আল-কামিল ফিত-তারীখ-২/৪২

তো বাহিলী গোত্রের। 'উমার (রা) বললেন : সে যদি সত্য বলে থাকে তাহলে সে তোমার চেয়ে ভালো।[১৫] তারপর খলীফা তাঁকে পারস্যের কিসরা সাম্রাজ্যের কিছু বিজিত অঞ্চলের কর্তৃত্ব দান করেন। তিনি বসরার ওয়ালীকে লেখেন : শাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে আহনাফের সাথে পরামর্শ করবে এবং সেই মত কাজ করবে। আহ্ওয়ায বিজয়ের পর বিখ্যাত ইরানী জেনারেল হুরমুযান– যিনি খুযিস্তান যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁকে মদীনায় নিয়ে আসেন আহনাফ।[১৬]

সে সময় ইরাক বিজয় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। তবে ইরানের উপর ব্যাপক সামরিক অভিযান তখনো চালানো হয়নি। ইরানের বিজিত অঞ্চল বার বার বিদ্রোহ ঘোষণা করতো। সেই সময় ইরানে যুদ্ধরত সৈনিকদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় খলীফার দরবারে আসে। হযরত 'উমার (রা) তাদের কাছে জানতে চাইলেন, এই ইরানীরা বার বার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে কেন? মনে হয় মুসলমানরা তাদের উপর উৎপীড়ন চালায়। প্রতিনিধি দল খলীফার কথার প্রতিবাদ করলো। কিন্তু কেউ হযরত 'উমারের (রা) প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলো না। আহনাফের মেধা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তিনি এই প্রশ্নের গভীরে চলে যান এবং বলেন : 'আমীরুল মু'মিনীন, ইরানের মধ্যভাগে সামরিক অভিযান বন্ধ করে দিয়েছেন এবং ইরানী সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মুকুট ও সিংহাসনসহ বিদ্যমান আছেন। যতদিন তিনি এভাবে বিদ্যমান থাকবেন, ইরানীরা তাঁর সহযোগিতায় বার বার বিদ্রোহ করতে থাকবে। কারণ, একই দেশে দুইটি সরকার এক সাথে চলতে পারে না। ইরানের শাহানশাহ্ সবসময় ইরানীদেরকে বিদ্রোহের উস্কানি দেয়। এ কারণে যতদিন পর্যন্ত আমরা ইরানের অভ্যন্তর ভাগে সামরিক অভিযান চালিয়ে তাঁকে শেষ করে দিতে না পারবো ততদিন ইরানীদের এরূপ আচরণ অব্যাহত থাকবে। যখন তারা নিজেদের সরকারের ব্যাপারে একেবারে হতাশ হয়ে যাবে তখন শান্ত হবে।' হযরত 'উমার (রা) আহনাফের বক্তব্য শুনে মন্তব্য করেন : তুমি সত্য বলেছো। তারপর তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ইরানের বিরুদ্ধে ব্যাপক সামরিক অভিযান চালানোর জন্য তৎপরতা শুরু করেন এবং প্রতিটি প্রদেশের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী পাঠান।[১৭] শাহানশাহে ইরান ইয়াযদিগিরদ তখন খুরাসানে অবস্থান করছিলেন। যেহেতু আহনাফ খলীফাকে তাঁর মূলোৎপাটনের পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং মেধা ও বুদ্ধির দিক দিয়ে তিনি এ কাজের জন্য সবচেয়ে বেশী যোগ্য ছিলেন, তাই খুরাসান অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব খলীফা তাঁরই উপর ন্যস্ত করেন। হিজরী ২১ সনে তিনি খুরাসানের দিকে অগ্রসর হন এবং তাবসীন হয়ে হিরাতে পৌঁছেন। এর বিজয় সম্পন্ন করে মারবে শাহজাহান– যেখানে ইয়াযদিগিরদ অবস্থান করছিলেন– এর দিকে যাত্রা করেন। তাঁর অগ্রাভিযানের সংবাদ শুনে ইয়াযদিগিরদ মারব আর-রোয চলে যান এবং সেখানে পৌঁছে তিনি চীনের খাকান বংশীয়

---

১৫. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/৬২

১৬. সিয়ারুত তাবি'ঈন-১৫১

১৭. আল-কামিল ফিত-তারীখ-২/৪৩০-৪৪০

শাসক ও অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চলীয় শাসকদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানিয়ে পত্র লেখেন। ইয়াযদিগিরদের মারব আর-রোয যাবার পর আহনাফ মারবে শাহজাহানে হারিছা ইবন নু'মান আল-বাহিলীকে রেখে মারবের দিকে অগ্রসর হন। তাঁর অগ্রযাত্রার সংবাদ পেয়ে ইয়াযদিগিরদ সেখান থেকে পালিয়ে বলখে পৌছেন। এই আবর্তনমূলক দৌড়-ঝাঁপের মধ্যে কূফা থেকে সেনা-সাহায্য এসে পৌছে। আহনাফ তাদেরকে সাথে নিয়ে বলখের উপর আক্রমণ করেন। ইয়াযদিগিরদ পরাজিত হয়ে পালিয়ে নদী অতিক্রম করে সীমান্তবর্তী খাকান শাসনাধীন অঞ্চলে চলে যান। তারপর আহনাফ খুরাসানের সকল অঞ্চলে তাঁর সৈন্য ছড়িয়ে দেন। খুরাসানবাসীরা তাদেরকে কোনভাবেই বাধা দিতে পারেনি। এভাবে নিশাপুর থেকে তুখারিস্তান পর্যন্ত গোটা অঞ্চল বিনা যুদ্ধে বিজিত হয়। আহনাফ মারব আর-রোয ফিরে আসেন এবং খলীফা হযরত 'উমারকে (রা) বিজয়ের সুসংবাদ জানিয়ে পত্র পাঠান। খলীফা ইরানের বাইরে বিজিত অঞ্চলের পরিধি বাড়াতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাই তাঁকে সামনে অগ্রসর হতে বারণ করেন।

এদিকে ইয়াযদিগিরদের চীনের সীমান্ত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণের পর চীন সম্রাট খাকান তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে খুরাসান পৌছেন। তারপর সেখান থেকে সোজা বলখের দিকে যাত্রা করেন। বলখের ইসলামী বাহিনী আহনাফের সাথে মারব আর-রোয প্রত্যাবর্তন করেছিল। এ কারণে ইয়াযদিগিরদ ও খাকান উভয়ে বলখ হয়ে মারবের দিকে অগ্রসর হন। ইয়াযদিগিরদ মারবে শাহজাহান- যেখানে তাঁর কোষাগার ছিল, চলে যান। আহনাফের সাথে সেখানে তাঁর সংঘর্ষ হয়। আহনাফ পাহাড়ের পাদদেশে সৈন্য সমাবেশ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত সকাল-সন্ধ্যা খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। একদিন আহনাফ নিজেই ময়দানে আসেন। খাকানের বাহিনী থেকে একজন তুর্কি বীর সৈনিক হাতে তবলা ও ঢোল পিটাতে পিটাতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে আহনাফ আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করেন। তারপর দু'জন বীর সৈনিক একের পর এক আহনাফের সাথে লড়বার জন্যে এগিয়ে আসে। আহনাফের তরবারির আঘাতে তাদের দু'জনেরই বীরত্বের নেশা চিরদিনের জন্য মিটে যায়। এরপর গোটা তুর্কি বাহিনী মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। খাকান তাঁর বাহিনীর অগণিত লাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাঁর বোধোদয় হয়। তিনি সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেন। ইয়াযদিগিদরকে সাহায্য করার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত কোন লাভ ছিল না। তাছাড়া তিনি বুঝতে পারেন, মুসলমানদেরকে পরাভূত করাও কোন সহজ কাজ নয়। তাই তিনি ইয়াযদিগিরদকে বলেন, অনেক দিন হয় আমরা দেশ ছেড়ে এসেছি, এ যুদ্ধে আমাদের অনেক বীর সৈনিকও প্রাণ হারিয়েছে, আর এই সংঘাত-সংঘর্ষে আমাদের বিশেষ কোন লাভও নেই, তাই আমরা দেশে ফিরে যেতে চাই। এরপর তিনি তাঁর বাহিনীকে সবকিছু গুটিয়ে দেশের দিকে যাত্রার নির্দেশ দেন।

ইয়াযদিগিরদ মারবে শাহ্জাহানে ছিলেন। খাকানের ফিরে যাবার সংবাদ পেয়ে তিনি সাহস হারিয়ে ফেলেন এবং কোষাগারের যাবতীয় ধন-সম্পদ তুর্কিস্তান সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। ইরানীরা তা জানতে পেরে তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে। তারা ইয়াযদিগিরদকে বলে, তুর্কীদের কোন দীন-ধর্ম নেই। তাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার পালনের কোন জ্ঞান-অভিজ্ঞতাও আমাদের নেই। আর যাই হোক, মুসলমানদের একটি ধর্ম আছে। তারা অঙ্গীকার পালনকারীও বটে। তাই, যদি আপনাকে দেশই ছাড়তে হয় তাহলে মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তি করে নিন। কিন্তু ইয়াযদিগিরদ এই পরামর্শ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। ইরানীরা যখন দেখলো তাদের দেশের ধন-সম্পদ অন্য দেশে পাচার হতে যাচ্ছে তখন তারা মরণপণ যুদ্ধ করে তা ছিনিয়ে নেয়। ইয়াযদিগিরদ তাঁর নিজ প্রজাদের নিকট পরাজিত হয়ে তুর্কিস্তানে পালিয়ে যান। হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালের শেষ পর্যন্ত খাকানের অতিথি হিসেবে সেখানে বসবাস করেন।

ইয়াযদিগিরদের তুর্কিস্তানে চলে যাবার পর ইরানীদের শেষ অবলম্বন ভেঙ্গে পড়ে। তারা হতাশ হয়ে আহনাফের সাথে সন্ধি করে এবং ইয়াযদিগিরদের যাবতীয় ধন-ভাণ্ডার আহনাফের হাতে তুলে দেয়। আহনাফ তাদের সাথে এমন ভদ্রোচিত আচরণ করেন যে, এতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের শাসন থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে।

ইরানীদের সাথে এই সন্ধিচুক্তির পর আহনাফ খলীফা 'উমারকে (রা) বিজয়ের সংবাদ পাঠান এবং সেখানে উপস্থিত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে উদ্দীপনাময় এক ভাষণ দেন। আজও মুসলমানদের জন্য সেই ভাষণটি শিক্ষণীয় হতে পারে। ভাষণটি ছিল নিম্নরূপ :

'মুসলিম ভাইয়েরা! আজ মাজুসী (অগ্নিউপাসক)-দের সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাদের অধিকারে তাদের সাম্রাজ্যের এক খণ্ড ভূমিও আজ আর নেই। আজ তারা কোনভাবেই আর মুসলমানদের কোন রকম ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। আজ আল্লাহ তাদের ভূমি, তাদের সাম্রাজ্য এবং তাদের দেশবাসী জনগণের অধিকারী তোমাদেরকে করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষার জন্য। যদি তোমরা পাল্টে যাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এনে বসাবেন। আমার ভয় হয়, মুসলমানরা নিজেদের হাতেই নিজেরা ধ্বংস না হয়।[১৮]

হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফাতকালে ইরানে ফের যখন বিদ্রোহ হয় এবং খুরাসান মুসলিম শাসন কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে যায় তখন এই আহনাফই সামরিক অভিযান চালিয়ে আবার তা মুসলিম শাসনের অধীনে ফিরিয়ে আনেন।[১৯]

মোটকথা, তিনি খলীফা 'উমারের (রা) ইনতিকালের পূর্বে হিজরী ২১ সনে (খ্রী. ৬২৪) একটি বিজয়ী বাহিনীর সাথে পারস্যে যান। হিজরী ২১ সনে নিহাওয়ান্দ, অতঃপর কুম ও

---

[১৮]. প্রাগুক্ত-৩/২৬-২৯

[১৯]. প্রাগুক্ত-৩/৯৬-৯৯

কাশান বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমিরের অগ্রবর্তী বাহিনীর সদস্য হিসেবে খুরাসান তথা হিরাত, মারূব, মারব আর-রোয, বল্‌খ প্রভৃতি অঞ্চল বিজয়ে অবদান রাখেন। তারপর জায়হূন-সায়হূন নদী অতিক্রম করে মধ্য এশীয় অঞ্চলে ঢুকে পড়েন। খলীফা হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে সামারকান্‌দ বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। এই অভিযানে তিনি একটি চোখ হারান।[২০]

হযরত 'উছমান (রা)-এর শাহাদাতের পর আহনাফ হযরত 'আলীকে (রা) খলীফা মেনে নিয়ে তাঁর হাতে বাই'আত করেন। কিন্তু উটের যুদ্ধে কোন পক্ষে যোগদান করেননি। এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে তিনি নিজেই বলেছেন :

'সে সময় আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে সফরে ছিলাম। মদীনায় এসে তালহা ও যুবায়রের (রা) সাথে দেখা করে বললাম : এই ব্যক্তিকে ('উছমান) আমি তো নিহত ব্যক্তি রূপে দেখতে পাচ্ছি। এঁর পরে আপনাদের দু'জনের পছন্দনীয় এমন এক ব্যক্তির নাম বলুন যাঁর হাতে আমি বাই'আত করবো। তাঁরা বললেন : আমরা 'আলীর কথা বলবো। বললাম : যাঁর কথা আপনারা বলছেন তাঁর প্রতি কি আপনারা সন্তুষ্ট? তাঁরা বললেন : হাঁ। আহনাফ বলেন : এরপর আমি মক্কায় গেলাম। আমরা সেখানে থাকতেই 'উছমানের (রা) হত্যার সংবাদ পেলাম। সে সময় মক্কাতে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাও (রা) ছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম : আপনি এখন কার হাতে আমাকে বাই'আত করতে বলছেন? বললেন : 'আলী ইবন আবী তালিবের (রা) হাতে। বললাম : যাঁর হাতে আমাকে বাই'আত করতে আদেশ করছেন তাঁর প্রতি কি আপনি সন্তুষ্ট? বললেন : হাঁ। আহনাফ বলেন : তারপর আমি মদীনায় যাই এবং 'আলীর (রা) হাতে বাই'আত করি। অতঃপর আমি বসরায় ফিরে যাই। আমি দেখলাম, ব্যাপারটি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এরপর আমরা দেখলাম, 'আয়িশা, তালহা ও যুবায়র (রা) তাঁদের বাহিনী নিয়ে আসলেন এবং বসরার উপকণ্ঠ 'আল-খুরায়বা' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন।

আহনাফ বলেন : আমি মানুষের কাছে তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলাম। বললো : তাঁরা বলছেন, 'উছমান অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন। তাই তাঁর রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য তাঁরা আপনার সাহায্য চেয়েছেন। আমি এমন একটি মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হলাম যা আর কখনো হইনি। কারণ, এ তিন ব্যক্তি– যাঁদের মধ্যে একজন উম্মুল মু'মিনীন ও আরেকজন রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী– তাঁদেরকে অপমান করা খুবই কঠিন কাজ। অন্যদিকে তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) যে চাচাতো ভাইয়ের হাতে আমাকে বাই'আত করার আদেশ করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে তাঁদেরই সাথে যুদ্ধ করা আরো কঠিন কাজ। আমি তাঁদের কাছে গেলাম। তাঁরা বললেন : 'উছমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং আপনি তাঁর রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য উচ্চকণ্ঠ হোন। আমি তখন উম্মুল মু'মিনীনকে বললাম : আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি

---

[২০] দ্র: 'উমার ফারূখ-১/৩৪৫

আমাকে 'আলীর হাতে বাই'আত করতে বলেননি? বললেন : হাঁ, বলেছি। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তারপর আমি তালহা ও যুবায়রকেও একই কথা বললাম এবং তারা একই জবাব দিলেন। আমি তাঁদেরকে বললাম : আল্লাহর কসম! যতক্ষণ উম্মুল মু'মিনীন আপনাদের সাথে আছেন, আমি আপনাদের বিরুদ্ধে লড়বো না। ঠিক তেমনি রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই 'আলীর (রা) বিরুদ্ধেও লড়বো না। আমাকে আপনারা তিনটি পন্থার যে কোন একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিন। (১) আমাকে অনারব কোন দেশে যাওয়ার সুযোগ দিন। সেখানে আল্লাহ আমার জন্য যা ফয়সালা করেন তাই হবে। (২) আমাকে মক্কায় যেতে দিন। আমি সেখানে চুপচাপ অবস্থান করবো। (৩) অথবা মক্কার আশেপাশে কোথাও থাকার অনুমতি দিন। তাঁরা বললেন : আমরা ভেবে দেখে আপনাকে জানাবো। তাঁরা পরামর্শ করলেন। তাঁরা ভাবলেন, 'আমাকে অনারব ভূমিতে যেতে দিলে আরো অনেকে আমার সাথে মিলিত হবে। মক্কায় যেতে দিলে কুরায়শদের মধ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবো এবং তাঁদের সব খবর কুরায়শদেরকে জানিয়ে দিব। তার চেয়ে বরং বসরা থেকে দু' ফারসাখ দূরে 'আল-জালহা' নামক স্থানে নজরবন্দী অবস্থায় রেখে দেওয়া সমীচীন হবে। তাঁর সাথে বানূ তামীমের ছয় হাজার যোদ্ধাও সেখানে চলে যাবে।' এভাবে উটের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন।[২১]

হযরত 'আলী ও হযরত মু'আবিয়ার (রা) মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ আরম্ভ হলে আহনাফের সত্যের সন্ধান লাভকারী তরবারি কোষবদ্ধ থাকতে পারেনি। তিনি 'আলীর (রা) সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং বসরাবাসীদেরকে 'আলীর (রা) সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। সিফ্‌ফীনে তিনি 'আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করেন। এ কথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি এক পর্যায়ে 'আলীর (রা) দল ত্যাগকারী খারেজীদের দলেও ছিলেন।[২২] কিন্তু একথা সঠিক নয় বলে বিভিন্ন তথ্যে প্রমাণিত হয়।

সিফ্‌ফীন যুদ্ধের সমাপ্তির পর দ্বন্দ্ব নিসরনের জন্য যখন তাহকীম বা শালিসীর বিষয়টি সামনে এলো এবং 'আলীর (রা) পক্ষে আবূ মূসা আল-আশ'আরীর (রা) নামটি প্রস্তাব করা হলো তখন আহনাফ এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি 'আলীকে (রা) বলেন, আপনাকে 'আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনীতিকের ('আমর ইবন আল-'আস) সাথে বোঝাপড়া করতে হচ্ছে। আমি আবূ মূসাকে (রা) ভালো করেই জানি। তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য মোটেই উপযুক্ত ব্যক্তি নন। এ কাজের জন্য অত্যন্ত চালাক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রয়োজন। সম্ভব হলে আপনি আমাকে আপনার পক্ষের প্রতিনিধি নিয়োগ করুন। আর এ কাজের জন্য সাহাবী হওয়া একান্ত জরুরী হলে আপনি অন্য কোন সাহাবীকে নির্বাচন করুন এবং আমাকে তাঁর উপদেষ্টা নিয়োগ করুন।

কিন্তু ইরাকীদের সিদ্ধান্ত আবূ মূসার (রা) পক্ষে ছিল। এ কারণে হযরত 'আলী (রা)

---

[২১] আল'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৪/৩১৯-৩২০

[২২] ড: 'উমার ফাররুখ-১/৩৪৫

আহনাফের সৎ ও মূল্যবান পরামর্শ কাজে লাগাতে পারেননি। সিফ্‌ফীন যুদ্ধের পরে খারিজীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার সময়েও তিনি হযরত 'আলী (রা) সাথে ছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি কয়েক হাজার বসরাবাসী যোদ্ধাকে সংগে নিয়ে যান।[২৩]

হযরত 'আলীর (রা) শাহাদাতের পরে হযরত মু'আবিয়াকে (রা) খলীফা হিসেবে তিনি মেনে নেন। তবে তখনো স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও সত্য উচ্চারণের উপর অটল থাকেন। আমীর মু'আবিয়ার (রা) যৌক্তিক ও অযৌক্তিক সব ইচ্ছার সামনে মাথানত করেননি। বরং তাঁর কাছে মু'আবিয়ার (রা) যেসব কাজ যৌক্তিক বলে মনে হয়নি, সে ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাহসের সাথে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন।[২৪] মু'আবিয়া (রা) যখন তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দানের সিদ্ধান্ত নেন তখন পরামর্শের জন্য গোটা খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের রাজধানীতে তলব করেন। বসরার প্রতিনিধি দলের সাথে আহনাফও দিমাশকে যান। মু'আবিয়া (রা) ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করার ব্যাপারে আহনাফের মতামত জানতে চান। খলীফার দরবারে সমবেত বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে খলীফার দরবারে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এক পর্যায়ে মু'আবিয়া (রা) বলে ওঠেন : আহনাফ কোথায়? তিনি সাড়া দিলে মু'আবিয়া বলেন : আপনি কোন কথা বলছেন না যে? আহনাফ উঠলেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বললেন : আল্লাহ আমীরুল মু'মিনীনের মঙ্গল করুন! আমি যদি আপনাকে সত্য কথা বলি আপনি অসন্তুষ্ট হবেন, আর যদি মিথ্যা বলি তাহলে অসন্তুষ্ট হবেন আল্লাহ। আল্লাহর অসন্তুষ্টির চেয়ে আমীরুল মু'মিনীনের অসন্তুষ্টি আমাদের জন্য অতি সহজ ও সহনীয়। মু'আবিয়া বলেন : আপনি সত্য বলেছেন। তারপর আহনাফ বলেন :[২৫] জনগণ নিকট অতীতে একটি খারাপ সময় অতিবাহিত করে একটি ভালো সময় অতিক্রম করছে। আমীরুল মু'মিনীনের ছেলে ইয়াযীদ উত্তম উত্তরাধিকারী। আপনি তাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে চাচ্ছেন। কিন্তু আপনি এমন বার্দ্ধক্যে পৌঁছেননি যে এখনই মারা যাবেন, অথবা এমন রোগে আক্রান্ত হননি যে বাঁচার আশা নেই। আপনি উটরূপী কালের দুধ দোহন করেছেন, বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আপনিই ভেবে দেখুন, কার উপর আপনি খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে যেতে চান, কাকে খলীফা হিসেবে মনোনীত করতে চান। যারা আপনাকে নির্দেশ দেয়, কিন্তু পথ বাতলে দেয় না, পরামর্শ দেয়, কিন্তু আপনার দিকে লক্ষ্য করে না, আপনি এমন লোকদের কথায় কান দিবেন না। জনগণ কি চায়, আপনি সে বিষয়ে অধিক সচেতন এবং তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে আপনি অধিক জ্ঞানী। তবে হিজায ও ইরাকের অধিবাসীরা এটা মানবে না। তারা হাসান ইবন 'আলীর (রা) জীবদ্দশায় ইয়াযীদের হাতে বাই'আত করবে না।

---

[২৩] আল-কামিল ফিত-তারীখ-৩/২৮৪

[২৪] ড: 'উমার ফাররূখ-১/৩৪৫

[২৫] আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-১/৫৭; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২৪২

আহ্নাফের এ সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর দাহ্হাক ইবন কায়স উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে যান। আহ্নাফের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন এবং ইরাকবাসীদেরকে আমীরুল মু'মিনীনের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তারপর আহ্নাফ আবার উঠে দাঁড়ান এবং আল্লাহর হামদ ও ছানা পেশের পর বলেন : 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা আপনাকে কুরায়শদের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি। আপনাকে আমরা সবচেয়ে বেশী তীক্ষ্ণধী, শক্ত অঙ্গীকারকারী ও অঙ্গীকার পালনকারী পেয়েছি। আপনি জানেন, ইরাক আপনি জোরপূর্বক জয় করেননি এবং মারপিট করেও তার উপর প্রভুত্ব অর্জন করেননি। আপনার একথা জানা আছে, হাসান ইবন 'আলীকে (রা) আল্লাহর একটি অঙ্গীকার আপনি দান করেছেন। আর তা হলো, আপনার পরে তিনিই লাভ করবেন খিলাফতের দায়িত্বভার। সে অঙ্গীকার পূরণ করলে আপনি হবেন অঙ্গীকার পূরণকারী। আর যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন, জেনে রাখবেন, হাসানের পিছনে আছে, বহুসংখ্যক উন্নতমানের অশ্ব, সবল ও শক্ত বাহু ও তীক্ষ্ণ তরবারি। যদি আপনি প্রতারণার হাত এক বিঘত তাঁর দিকে বাড়িয়ে দেন তাহলে তাঁর পিছনে আপনি দেখতে পাবেন দু' বাহু পরিমাণ সাহায্য। আপনি নিশ্চয় জানেন, ইরাকবাসীরা আপনাকে ঘৃণা করার পর থেকে আর কখনো ভালোবাসেনি, তেমনিভাবে 'আলী ও হাসানকে (রা) ভালোবাসার পর থেকে আর কখনো ঘৃণা করেনি। আর এ ব্যাপারে আসমান থেকে বাণীও তাদের কাছে আসেনি। যে তরবারিগুলো সিফফীনের দিন তারা আপনার বিরুদ্ধে উত্তোলন করেছিল তা তাদের ঘাড়েই আছে, তেমনিভাবে যে অন্তরগুলো সেদিন আপনাকে ঘৃণা করেছিল তা তাদের পাঁজরের মধ্যেই আছে। আল্লাহর কসম! ইরাকীদের নিকট 'আলী (রা) অপেক্ষা হাসান (রা) অধিকতর প্রিয়।'[২৬]

আহ্নাফের বক্তব্য শেষ হলে যথাক্রমে 'আবদুর রহমান ইবন 'উছমান আছ-ছাকাফী, মু'আবিয়া ও ইয়াযীদ ইবন আল-মুকান্নি' উঠে দাঁড়ান ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। তারপর আহ্নাফ আবার উঠে দাঁড়ান এবং নিম্নের ভাষণটি দান করেন :[২৭]

يا أمير المؤمنين : أنت أعلمنا بيزيد في ليله ونهاره، وسره وعلانيته، ومدخله ومخرجه، فإن كنت تعلمه لله رضًا ولهذه الأمة، فلا تشاور الناس فيه، وإن كنت تعلم منه غير ذلك، فلا تزوِّدْه الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة، فإنه ليس لك من الآخرة إلا ماطاب، واعلم أنه لاحجة لك عند الله إن قدّمت يزيد على الحسن والحسين، وأنت تعلم من "هما" وإلى ماهما، وإنما علينا أن نقول : سَمِعْنَا وأطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإلَيْكَ المصير.

---

[২৬] জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২৪৩; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৪৫৮
[২৭] 'উয়ূন আল-আখবার-২/৬০৮; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৪/৩৭০; আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা-১/১২১

– হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ইয়াযীদের দিন-রাত্রির, গোপন-প্রকাশ্যের ও ভিতর-বাইরের খবর আমাদের চেয়ে বেশী রাখেন। যদি আপনি তাঁকে আল্লাহ্ ও এই উম্মাতের জন্য বেশী পছন্দনীয় মনে করেন তাহলে এ ব্যাপারে কোন মানুষের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন নেই। আর যদি আপনি এর বিপরীত কিছু জানেন তাহলে তার ঘাড়ে দুনিয়ার বোঝা চাপিয়ে আখিরাতের দিকে পাড়ি জমাবেন না। কারণ, আখিরাতে ভালো ছাড়া কোন কিছুই আপনার কাজে আসবে না। আর আপনি জেনে রাখুন, হাসান ও হুসায়নের (রা) উপর ইয়াযীদকে প্রাধান্য দিলে আল্লাহর কাছে আপনি কোন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবেননা। আপনি জানেন, তাঁরা দু'জন কে এবং তাঁদের পরিণতিই বা কী হতে যাচ্ছে। আমরা শুধু এতটুকুই বলতে পারি : 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। হে আমাদের পরোয়ারদিগার আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনিই আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।'

"আল-'ইকদ আল-ফারীদ" গ্রন্থকার ইবন 'আবদি রাব্বিহি বলেন : আহনাফের বক্তব্যের পর মানুষ সমাবেশ থেকে উঠে এদিক সেদিক চলে যায়। তারা তখন আহনাফের কথাই আলোচনা করছিল।। অতঃপর মানুষ ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার খলীফা হবার বিষয়ে বাই'আত গ্রহণ করে। সে সময় এক ব্যক্তিকে যখন বাই'আতের জন্য ডাকা হলো, সে বললো :

اللهمَّ أعوذ بك من شرِّ معاوية.

– 'হে আল্লাহ! আমি মু'আবিয়ার অনিষ্ট থেকে পানাহ্ চাই।'

সাথে সাথে মু'আবিয়া (রা) বলে ওঠেন :

تَعَوَّذْ من شَرِّ نَفْسِكَ، فإنه أشَرُّ عليكَ وَبايعْ.

– 'তুমি তোমার অন্তরের অনিষ্ট থেকে পানাহ্ চাও। কারণ, তা তোমার জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। আর তুমি বাই'আত কর।'

লোকটি তখন বললো : 'আমি বাই'আত করছি। তবে আমি এ বাই'আতকে পছন্দ করিনে।' মু'আবিয়া (রা) তখন এ আয়াতটি পাঠ করেন :[২৮]

فَعَسى أنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

– 'হতে পারে তোমরা কোন জিনিস অপছন্দ কর, আর আল্লাহ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রাখেন।'[২৯]

তবে ইবন কুতায়বা বলেন, একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আহনাফ ও অন্যদের এসব

---

[২৮] সূরা আন-নিসা'-১৯

[২৯] জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২৪৬

বক্তৃতা-ভাষণের পর মু'আবিয়া (রা) তাঁর পুত্র ইয়াযীদের বাই'আতের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে ইসতিখারা করেন। অতঃপর বিষয়টি কিছু দিনের জন্য সম্পূর্ণ স্থগিত রাখেন। তারপর হিজরী ৫০ সনে তিনি মক্কায় এলে মক্কাবাসীরা তাঁর সাথে দেখা করতে আসে। তিনি তাঁর বাসভবনে একটু সুস্থির হয়ে বসার পর 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর ইবন আবী তালিব, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রকে (রা) ডেকে পাঠান। তাঁরা উপস্থিত হলে মু'আবিয়া (রা) দারোয়ানকে নির্দেশ দেন, এই লোকগুলো ভিতর থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে না। অতঃপর রুদ্ধদ্বার গৃহে মু'আবিয়া (রা) তাঁদের সাথে মতবিনিময় করেন। তারপর তিনি মক্কা ত্যাগ করেন এবং হিজরী ৫১ সন পর্যন্ত ইয়াযীদের বাই'আতের বিষয়টি নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি। ইবন কুতায়বা বলেন, হিজরী ৫১ সনে হযরত হাসানের (রা) ওফাতের অল্প কিছুদিন পর মু'আবিয়া (রা) ইয়াযীদের জন্য শামবাসীদের বাই'আত গ্রহণ করেন এবং খিলাফতের সকল অঞ্চলে তাঁর বাই'আত গ্রহণের নির্দেশ দেন।[৩০]

আহনাফের সত্যপ্রীতি ও স্পষ্টভাষিতার কারণে হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করতেন। অনেক বড় বড় আঞ্চলিক শাসক ও কর্মকর্তাকে তাঁর ইঙ্গিতে বরখাস্ত করতেন। 'উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ ছিলেন হযরত মু'আবিয়ার (রা) একজন অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি। উমাইয়্যা শাসনকে যাঁরা একটি মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। কিন্তু তাঁর কর্মপদ্ধতি আহনাফের পছন্দ ছিল না। হিজরী ৫৯ সনে 'উবায়দুল্লাহ আহনাফসহ কূফার একদল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সংগে করে শামে হযরত মু'আবিয়ার (রা) দরবারে আসেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) যথারীতি গভীর আবেগ ও আন্তরিকতার সাথে আহনাফকে স্বাগতম জানান এবং তাঁকে নিজের সাথে শাহী আসনে নিয়ে বসেন। বসরার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা 'উবায়দুল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মু'আবিয়ার (রা) সামনে তাঁর খুবই প্রশংসা করে। আহনাফের মত ছিল তাঁদের সবার বিপরীত। এ কারণে তিনি সম্পূর্ণ চুপ করে বসে থাকলেন।

হযরত মু'আবিয়া (রা) প্রশ্ন করলেন : আবূ বাহর! আপনি কিছু বলছেন না কেন? তিনি জবাব দিলেন : আমি বললে এই প্রতিনিধি দলের সবার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। তাঁর একথা শুনে হযরত মু'আবিয়া (রা) তখনই 'উবায়দুল্লাহকে বরখাস্ত করেন। তিনি আগত বসরাবাসীদেরকে তাদের পছন্দমত একজন ওয়ালীর নাম প্রস্তাব করতে আহ্বান জানান। তারা প্রত্যেকেই হযরত মু'আবিয়াকে (রা) খুশী করার উদ্দেশ্যে উমাইয়্যা খান্দান ও শামীদের মধ্য থেকে কারো নাম প্রস্তাব করে। আহনাফ তখনও চুপ ছিলেন। কারো নাম প্রস্তাব করলেন না। হযরত মু'আবিয়া (রা) প্রস্তাবকারীদের নিকট জানতে চান, আপনারা কাকে নির্বাচন করলেন? যেহেতু তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী প্রস্তাব করেছিল, তাই কোন এক ব্যক্তির ব্যাপারে একমত হতে পারেনি। আহনাফ একেবারেই

---

[৩০] প্রাগুক্ত-২/২৪৬-২৪৯

চুপ ছিলেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) বললেন, আপনি কিছু বলুন। তিনি এই প্রস্তাবকারীদের রূপ-প্রকৃতি দেখছিলেন। তাই তিনি মু'আবিয়াকে (রা) বললেন, যদি আপনি আপনার খান্দানের মধ্য থেকে কাউকে ওয়ালী বানাতে চান তাহলে আমি বরখাস্তকৃত 'উবায়দুল্লাহকেই অগ্রাধিকার দিব। আর যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে বানাতে চান তাহলে সেটা আপনার ইচ্ছা ও মর্জি। তাঁর একথা শুনে মু'আবিয়া (রা) 'উবায়দুল্লাহকে তাঁর স্বপদে বহাল করেন। তারপর আহনাফকে উপেক্ষা করার জন্য তিনি 'উবায়দুল্লাহকে ভীষণ তিরস্কার করেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর সাথে ভালো আচরণ করার প্রতি তাকিদ দেন।[৩১]

আল-আহনাফ একবার খলীফা হযরত মু'আবিয়ার (রা) দরবারে গেলেন। খলীফা তাঁকে নিজের পাশে বিছানার উপর বসতে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু তিনি সেখানে না বসে মাটিতে বসলেন। খলীফা তখন প্রশ্ন করলেন : আহনাফ, আপনি বিছানায় বসলেন না কেন? আহনাফ বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! কায়স ইবন 'আসিম আল-মিনকারী তাঁর ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, আমি মূলতঃ তাই পালন করি। তিনি বলেছিলেন : 'রাজা-বাদশাদের নিকট এমন কিছু লুকোবে না যাতে পরে তোমাকে পস্তাতে হয়। তোমাকে ভুলে যায় এমন ভাবেও তাদেরকে ছেড়ে আসবে না। তাঁদের পাশে একই বিছানায় বা একই গদীর উপর বসবে না। এমন দূরত্বে বসবে যাতে তাঁদের ও তোমার মাঝে এক অথবা দু'জন মানুষ বসার জায়গা থাকে। কারণ, হতে পারে তোমাদের এ বৈঠক চলাকালে এমন কোন বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এসে গেল এবং তার জন্য তোমাকে স্থান ছেড়ে দিতে হলো। আর তেমন হলে আগন্তুক ব্যক্তিটির মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, আর তোমার হবে মর্যাদাহানি।' অতএব, হে আমীরুল মু'মিনীন, বসার জন্য এ স্থানই আমার উপযোগী। হতে পারে আমাদের এ বৈঠকে আপনার পাশে বসার বেশী উপযুক্ত লোক এসে যেতে পারেন। খলীফা তখন মন্তব্য করেন : 'বানূ তামীমকে জ্ঞান ও বিজ্ঞতা দান করা হয়েছে। আর সেই সাথে দান করা হয়েছে অলঙ্কারমণ্ডিত কথামালা।'[৩২]

একবার আহনাফ বসরার একটি প্রতিনিধি দলের সাথে মু'আবিয়ার (রা) দরবারে গেলেন। তাঁর সাথে নামির ইবন কুতবাও ছিলেন। নামিরের গায়ে ছিল কূফার কাতওয়ান নামক স্থানের 'আবা', আর আহনাফের গায়ে ছিল পশমের মোটা পোশাক। তাঁরা দু'জন মু'আবিয়ার (রা) সামনে দাঁড়ালে তিনি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকালেন। নামির তা বুঝতে পেরে বললেন : ওহে আমীরুল মু'মিনীন! 'আবা' আপনার সাথে কথা বলবে না। 'আবা'র মধ্যের মানুষটি আপনার সাথে কথা বলবেন। মু'আবিয়া (রা) ইশারায় তাঁকে বসতে বললেন। তারপর আহনাফের দিকে তাকিয়ে তাঁর বক্তব্য জানতে চাইলেন। আহনাফ বললেন :[৩৩]

---

৩১. আল-কামিল ফিত-তারীখ-৩/৪৩১

৩২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৫৪; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/৪২৯

৩৩. আহমাদ আল-হাশিমী, যাহরুল আদাব-১/৫৭; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/৩৬৩-৩৬৪

يا أمير المؤمنين، أهل البصرة عدد يسير وعظم كسير مع تتابع من المحول، واتصال من الذحول، فالمكثر فيها قد أطرق، والمقل قد أملق، وبلغ منه المخنق، فإن رأى أمير المؤمنين أن يُنْعِشَ الفقير، ويُجْبرُ الكسِيْرَ ويسهِّلُ العسير ويصفح عن الذحول ويراوى المحول ويأمر بالعطاء ليكشف البلاء ويزيل اللأواء، وإن السيِّد من يَعُمَّ ولايَخُصَّ ومن يدعو الجفلى ولايدعو النقرى، إن أُحسن إليهٗ شكر وإن أسئ إليه غفر، ثم يكون من وراء ذلك لرعيته عمادًا، يدفع عنهم الملمات ويكشف عنه المعضلات. فقال له معاوية : هاهنا يا أبا بحر، ثم تَلاَ : "وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْل."

– হে আমীরুল মু'মিনীন! বসরাবাসী সংখ্যায় অল্প এবং ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ ও ধারাবাহিক রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে ভগ্ন অস্থিবিশিষ্ট হয়ে গেছে। সেখানকার বিত্তশালীদের দৃষ্টি নত হয়ে গেছে এবং বিত্তহীনরা একেবারেই হত-দরিদ্র হয়ে পড়েছে। তারা কণ্ঠরোধ হবার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন চাইলে এই দরিদ্রদের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনতে, ভাঙ্গা হাঁড়ের জোড়া লাগাতে, কঠিনকে সহজ, অভাব-দারিদ্রকে দূরীভূত, রক্ত-বদলার চিকিৎসা ও দানের নির্দেশ দিতে পারেন। তাহলে এই দুর্যোগ ও এই কঠিন সময় দূর হবে। নিশ্চয় নেতা তিনিই হন যার দান-অনুগ্রহ হয় সবার জন্য, বিশেষ কারো জন্য নয়। যাঁর আহ্বান হয় সবার জন্য, বিশেষ কারো জন্য নয়। যদি তাঁর প্রতি কোন অনুগ্রহ করা হয়, তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, আর যদি কোন খারাপ কিছু করা হয়, তিনি ক্ষমা করে দেন। তাছাড়া তিনি তাঁর অধীনস্তদের জন্য হন স্তম্ভস্বরূপ। তাদের বিপদ-মুসীবত প্রতিহত করেন এবং যাবতীয় জটিলতা দূর করেন। অতঃপর মু'আবিয়া (রা) আহনাফকে বলেন : আবূ বাহর, এখানে। তারপর তিনি সূরা মুহাম্মাদ-এর ৩০নং আয়াতটি পাঠ করেন।

– 'আপনি অবশ্যই তাদেরকে কথার ভঙ্গিতে চিনতে পারবেন।' তিনি আরো বলেন : ওহে আবূ বাহর, যথেষ্ট হয়েছে। আপনি উপস্থিত ও অনুপস্থিত সবার জন্য একাই যথেষ্ট।[৩৪]

একদিন মু'আবিয়া (রা) বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে বসে আছেন। আহনাফও তাঁদের মধ্যে একজন। এমন সময় শামের এক ব্যক্তি সেখানে এলো এবং দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলো। তাঁর বক্তৃতার শেষ কথাটি ছিল "'আলীর (রা) প্রতি লা'নাত বা অভিশাপ"। উপস্থিত লোকেরা চোখ তুলে লোকটির প্রতি তাকালো। কিন্তু আহনাফ উঠে দাঁড়িয়ে

---

৩৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৮৮

বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! লোকটি এই মাত্র কী বললো? নিশ্চয় 'আলীকে (রা) অভিশাপ দানের প্রতি আপনার সম্মতি আছে তাই সে অভিশাপ দিয়েছে। আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। 'আলীকে ছেড়ে দিন। তিনি তো আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। তিনি তাঁর কর্ম নিয়ে একাকী কবরে চলে গেছেন। আল্লাহর কসম! যতটুকু আমরা জানি, তিনি তাঁর সঙ্গীদের অতিক্রম করে গেছেন। তিনি ছিলেন পুতঃপবিত্র চরিত্রের, স্বচ্ছ অন্তঃকরণের ও বিরাট মুসীবতগ্রস্ত মানুষ।'

এতটুকু বলার পর মু'আবিয়া (রা) বলে উঠলেন : হে আহনাফ! আপনি ধুলোবালি থেকে বাঁচার জন্য চোখ বন্ধ করে রেখেছেন। তাই আপনি যা দেখেননি তাই বলছেন। আল্লাহর কসম! আপনি অবশ্যই মিম্বরের উপর উঠবেন এবং ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, অবশ্যই তাঁকে অভিশাপ দিবেন। আহনাফ বললেন : যদি আপনি ক্ষমা করেন তাহলে তো ভালো, আর যদি অভিশাপ দেওয়ার জন্য আমাকে জোর-জবরদস্তি করেন, তাহলে আল্লাহর কসম! আমার ঠোঁট দিয়ে তা বের হবে না। মু'আবিয়া বললেন : উঠুন, মিম্বরের উপর যান। আহনাফ বললেন : আল্লাহর কসম! আমি কথা ও কাজে আপনার প্রতি ন্যায়বিচার করবো। মু'আবিয়া বললেন : আমার প্রতি ন্যায়বিচার করলে আপনি কথা বলতে পারবেন না। আহনাফ বললেন : আমি মিম্বরে উঠে আল্লাহর হামদ ও ছানা ও রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করবো। তারপর বলবো : ওহে জনগণ! মু'আবিয়া আমাকে 'আলীর প্রতি অভিশাপ দানের নির্দেশ দিয়েছেন। আপনারা জেনে রাখুন, 'আলী ও মু'আবিয়া দু'জন মতবিরোধ সৃষ্টি করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই দাবী করেছেন, প্রতিপক্ষ তাঁর ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আমি যখন দু'আ করি, আপনারা সবাই আমীন বলবেন। আল্লাহ আপনাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। তারপর আমি বলবো :

হে আল্লাহ! আপনি, আপনার ফেরেশতা মণ্ডলী, নবীগণ ও সমস্ত সৃষ্টি জগত এঁদের দু'জনের মধ্যে যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন তাঁর প্রতি ও তার দলের প্রতি অভিশাপ দিন। আপনারা সবাই আমীন বলুন। আল্লাহ আপনাদের প্রতি করুণা করুন। হে মু'আবিয়া, আমি এর একটি হরফও কম-বেশী করবো না। তাতে যদি আমার জীবনও চলে যায়। মু'আবিয়া বললেন : ওহে আবূ বাহর! তাহলে আমি আপনাকে ক্ষমা করছি।[৩৫]

আহনাফ সিফফীন যুদ্ধে 'আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করেন। 'আলীর (রা) পরে মু'আবিয়া (রা) যখন খলীফা হলেন তখন একদিন আহনাফ তাঁর কাছে গেলেন। মু'আবিয়া (রা) আহনাফকে লক্ষ্য করে বললেন : আহনাফ! আল্লাহর কসম, আমি সিফফীনের দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে চাইনে। তবে কিয়ামত পর্যন্ত সেই ব্যথা আমার অন্তরে বিদ্যমান থাকবে।

---

৩৫. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৪/২৮-২৯; নিহায়াতুল আরিব-৭/২৩৭

জবাবে আহনাফ বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সব বিষয় পিছনের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চান কেন? আল্লাহর কসম! যে অন্তঃকরণগুলো দ্বারা আমরা আপনাকে ঘৃণা করেছিলাম তা আমাদের পাঁজরের মধ্যে এবং যে তরবারিগুলো দ্বারা আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম, সেগুলো আমাদের কাঁধে বিদ্যমান আছে। আপনি ধোঁকা ও প্রতারণার এক বিঘত লম্বা করলে আমরা দু'বাহু পরিমাণ তার চেয়ে খারাপ জিনিস লম্বা করবো। আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের অন্তরের এই পঙ্কিলতা আপনার ধৈর্য ও বিচক্ষণতার স্বচ্ছতার দ্বারা পরিচ্ছন্ন করতে পারেন। মু'আবিয়া বললেন : আমি তাই করবো। তারপর আহনাফ উঠে বের হয়ে গেলেন। মু'আবিয়ার (রা) বোন উম্মুল হাকাম পর্দার পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! এই লোকটি কে, যে আপনাকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে গেল? বললেন : এ সেই ব্যক্তি যে রেগে গেলে বানূ তামীমের এক লাখ মানুষ রেগে যায়– অথচ তাঁরা জানে না কী জন্য তারা রেগে যাচ্ছে। এ হচ্ছে আল-আহনাফ ইবন কায়স– বানূ তামীমের নেতা এবং আরবের একজন বিজয়ী বীর।[৩৬]

একবার হযরত মু'আবিয়া (রা) লোক পাঠিয়ে আনহাফকে দরবারে ডেকে আনলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : ওহে আবূ বাহর, সন্তানের ব্যাপারে আপনি কি বলেন? বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! তারা আমাদের হৃদয়ের ভালোবাসা ও পিছনে ঠেস দেওয়ার স্তম্ভ। আমরা তাদের জন্য সমতল ভূমি ও ছায়াদানকারী আকাশ। তারা যদি চায়, দিয়ে দিন, আর যদি রেগে যায়, খুশী করুন। তাহলে তারা তাদের ভালোবাসা আপনাকে দিবে। তাদের প্রতি কঠোর হবেন না। যদি কঠোর হন, তাহলে তারা আপনার জীবনকে নিরানন্দ করে ছাড়বে এবং আপনার মৃত্যুকে ভালোবাসবে। মু'আবিয়া বললেন : আল্লাহর কসম, হে আহনাফ! আপনি আমার অন্তরের কথা বলছেন। ইয়াযীদের উপর রাগে আমার অন্তর ভরে আছে। আপনি তা দূর করে দিয়েছেন। অতঃপর আহনাফ চলে গেলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে দেওয়ার জন্য দু'লাখ দিরহাম ও দু'শো কাপড় ইয়াযীদের কাছে পাঠালেন। ইয়াযীদ সেখান থেকে অর্ধেক নিজের জন্য রেখে দিয়ে অবশিষ্ট অর্ধেক আহনাফের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।[৩৭]

হযরম মু'আবিয়ার (রা) ওফাতের পর আহনাফ ইয়াযীদের খিলাফত মেনে নেন। হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) যখন খিলাফতের দাবী নিয়ে ইয়াযীদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়ান তখন তিনি আহনাফের সাহায্য চেয়ে চিঠি লেখেন। তবে যতটুকু জানা যায় তাতে মনে হয় তিনি ইমামের আহ্বানে সাড়া দেননি। তিনি ইয়াযীদের বাই'আতের উপর অটল ছিলেন।

ইয়াযীদের মৃত্যুর পর যখন উমাইয়্যা খিলাফতের অভ্যন্তরে বিপ্লব ঘটে যায় এবং ইরাক থেকে উমাইয়্যা শাসন এক রকম উঠে যায়, তখন আহনাফ বসরাবাসীদের নেতৃত্ব দিতে

---

৩৬. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৩০; আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/১১৮

৩৭. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/৪৩৭

থাকেন। এরই প্রেক্ষিতে তাঁর গোত্র বানূ তামীম ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে কিছু ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং কিছুটা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের রূপ নেয়। আহনাফের চেষ্টায় তার নিষ্পত্তি হয়।[৩৮] তারপর ইরাক যখন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) অধীনে চলে যায় তখন আহনাফ তাঁর সহযোগী হয়ে যান। তাঁর সময়েও আহনাফের পূর্বের সম্মান ও মর্যাদা বহাল থাকে। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) ওয়ালীরা সবসময় তাঁর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ করতেন এবং সেই মত কাজ করতেন। ইরাকে যখন খারিজীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং তা বসরা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে তখন আহনাফেরই উৎসাহে বিখ্যাত সেনানায়ক মহাব ইবন আবী সুফরাকে খারিজীদেরকে দমনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) খিলাফতকালে মুখতার আছ-ছাকাফী যখন ইরাক দখলের চেষ্টা চালায় তখন আহনাফ ইবন যুবায়রকে (রা) সাহায্যের অংশ হিসেবে মুখতারের প্রতিনিধি মুছান্নাকে ইরাক থেকে বের করে দেন।[৩৯] তারপরও ধীরে ধীরে যখন ইরাকে মুখতারের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তিনি ইবন যুবায়রের (রা) ভাই মুস'আব ইবন যুবায়রের (রা) সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুখতারের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

এ সময় 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) মূল প্রতিদ্বন্দ্বী উমাইয়্যা খলীফা আবদুল মালিক আহনাফকে তাঁর পক্ষে ভেড়ানোর জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি উমাইয়্যাদের ঘোরতর বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাঁর জবাব দেন। তিনি বলেন, ইবন যারকা' আমাকে শামীদের সাথে বন্ধুত্বের আহ্বান জানাচ্ছে। আল্লাহর কসম! আমি চাই আমার ও তাঁর মধ্যে আগুনের পাথর প্রতিবন্ধক হয়ে যাক। যাতে তাদের মানুষ এদিকে না আসতে পারে, আর আমার লোক সেদিকে না যেতে পারে।[৪০]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) ভাই কূফার ওয়ালী মুস'আব ইবন যুবায়রের সাথে আহনাফের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি মুস'আবের সাথে সাক্ষাৎ করতে কূফায় যান এবং সেখানে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলীর বর্ণনা মতে হিজরী ৭২ সনে তাঁর মৃত্যু হয়।[৪১] অনেকে বলেছেন, হিজরী প্রথম শতকের সাত-এর দশকের শেষ দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।[৪২]

শিক্ষা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে আহনাফ তাঁর যুগে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। তবে বিশিষ্ট সাহাবীদের সাহচর্যের সুযোগ লাভে ধন্য হয়েছিলেন। এ কারণে জ্ঞানের

---

[৩৮] তারীখ আত-তাবারী-৮/৩১; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৬৮

[৩৯] আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/২০৩

[৪০] তাবাকাত-৭/৬৮

[৪১] প্রাগুক্ত-৭/৬৯; শাযারাত আয-যাহাব-১/৭৮

[৪২] ড: শাওকী দায়ফ-২/৪৩৩

জগতের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না এ কথা বলা যাবে না। 'উমার (রা), 'আলী (রা), 'উছমান (রা), সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা), আবূ যার (রা) প্রমুখ মহান সাহাবীর মুখ থেকে তিনি হাদীছ শোনেন এবং তাঁদের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাবি'ঈদের মধ্যে যাঁরা তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শুনে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে হাসান বসরী, আবুল 'আলা' ইবন শিখ্খীর, তালাক ইবন হাবীব প্রমুখ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। আরবী কবিতায়ও তাঁর ভীষণ দখল ছিল। মু'আবিয়া (রা) মাঝে মাঝে কবিতা নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করতেন।[৪৩]

জ্ঞান ও শিক্ষার জগতের তিনি তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি না হলেও তাঁর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্র ছিল কণ্টকাকীর্ণ রাজনীতির ময়দান। তিনি তাঁর সময়ের বড় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, চিন্তাশীল ও মহাজ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল, কোন মানব গোষ্ঠীতে আহনাফের চেয়ে ভদ্র মানুষ দেখা যায় না। তাঁর মৃত্যুর পর মুস'আব ইবন যুবায়র (রা) মন্তব্য করেন, আজ বিচক্ষণতা ও সঠিক সিদ্ধান্তের সমাপ্তি ঘটলো।[৪৪] বিভিন্ন উক্তি ও বাণীর মধ্যে তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এসব উক্তি ও বাণীর কিছু কিছু প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। তাঁর হিল্‌ম (প্রজ্ঞা) মু'আবিয়ার (রা) 'হিলম-এর সাথে তুলনা করা হতো এবং তা প্রবাদতুল্য ছিল। এ কারণেই 'আহলাম মিন আল-আহনাফ' উক্তিটির প্রচলন হয়।[৪৫]

সাধারণভাবে দেখা যায়, অসাধারণ বুদ্ধি, জ্ঞান ও চিন্তা-অনুধ্যানের সাথে যুহ্‌দ ও তাকওয়া এবং 'ইবাদত-বন্দেগীর সহ-অবস্থান খুব কম হয়। কিন্তু আহনাফ সে স্তরের চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন, ঠিক একই রকম যুহ্‌দ ও তাকওয়াও তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর 'ইবাদত-বন্দেগীর বিশেষ সময় ছিল রাতের অন্ধকার। পৃথিবীর সব মানুষ যখন ভোগ-বিলাস ও সুখ-স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেত তখন তিনি রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে বিনয়াবনত হয়ে দাসত্বের ঘোষণা দিতেন। রাতের অন্ধকারে মুহাসাবায়ে নফ্‌স বা আত্মসমালোচনা করতেন। নিজের কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করতেন।

আল-আহনাফ ছিলেন একজন বড় ধরনের 'আবিদ ব্যক্তি। খুব বেশী বেশী সালাত আদায়কারী ও সাওম পালনকারী। দুনিয়ায় মানুষের হাতে যা আছে তেমন সবকিছুর প্রতি তিনি ছিলেন নির্মোহ ও নিরাসক্ত। রাতের অন্ধকার নেমে এলে বাতি জ্বালিয়ে পাশেই রাখতেন। তারপর নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আল্লাহর গজব ও আজাবের ভয়ে রোগগ্রস্ত মানুষের মত প্রলাপ বকতেন এবং পুত্রহারা পিতার মত হাউমাউ করে কাঁদতেন। যখনই তিনি নিজের কোন পাপের কথা, অথবা নিজের কোন দোষের কথা বুঝতে পারতেন তখনই নিজের একটি আঙ্গুল বাতির আগুনের একেবারে কাছে নিয়ে বলতেন : হে

---

[৪৩] আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/৪৬২; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১/১৯১

[৪৪] তাবাকাত-৭/৬৭; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১/১৯১

[৪৫] আল-জাহিজ, কিতাব আল-হায়ওয়ান-২/৭২; আল-মায়দানী, মাজমা' আল-আমছাল-১/২২৯-২৩০; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৪/৭৯

আহনাফ! আগুনের পোড়ার এ কষ্ট অনুভব কর। অমুক দিন অমুক কাজটি করতে কে তোমাকে উৎসাহিত করেছিল? ওহে আহনাফ! তোমার ধ্বংস হোক! আজ এই বাতির শিখার গরম যদি তুমি সহ্য করতে না পার তাহলে আগামীকাল জাহান্নামের অগ্নিশিখার তাপ সহ্য করবে কিভাবে? আর কিভাবেই বা তখন ধৈর্য ধারণ করবে? হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কারণ, তুমি তার উপযুক্ত। আর যদি আমাকে শাস্তি দাও তাহলে আমি তারই উপযুক্ত।[৪৬]

বার্দ্ধক্যের দুর্বলতার সময় যখন সিয়াম পালনের শক্তি যেতে বসেছিল তখন একদিন যায়দ নামের এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে বলেন, আপনি খুবই শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন এবং রোযা আপনাকে আরো দুর্বল করে ফেলবে। জবাবে তিনি বলেন, আমি আমার এই দেহকে একটি দীর্ঘ সফরের জন্য প্রস্তুত করছি।

কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণ। কখনো একাকী হলেই কুরআন খুলে বসে যেতেন। এত সব 'ইবাদত-বন্দেগীর উপরও তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল না। তাই তিনি আল্লাহর কাছে আরজ করতেন এই বলে : হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও তাহলে সেটা হবে তোমার করুণা। আর যদি আমাকে শাস্তি দাও, তাহলে আমি তা লাভ করার যোগ্য।

তাহারাত বা পাক-পবিত্রতার ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, তীব্র থেকে তীব্রতর ঠাণ্ডার মওসুমেও তায়াম্মুম করতেন না। বরফ জমা ঠাণ্ডা পানিও ব্যবহার করতেন। খুরাসান অভিযানকালে এক রাতে গোসলের প্রয়োজন দেখা দেয়। ঠাণ্ডার মওসুম ছিল, খুরাসানের সেই রাতটি ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডার। আহনাফ কোন চাকর-বাকর বা সৈনিকের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালেন না। তিনি তখনই একাকী নির্জন রাতে পানির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তায় ছিল কাঁটা ওয়ালা ঝোপ-ঝাড়। তিনি সেগুলো পায়ে মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যান। কাঁটার খোঁচায় তার পা দু'টো রক্তে ভিজে যায়। শেষমেষ, একটি বরফপিণ্ডের গোঁড়ায় পৌঁছেন এবং সেখান থেকে বরফ ভেঙ্গে বরফ-মিশ্রিত পানি দিয়ে সেখানে গোসল করেন।

তিনি অত্যন্ত সত্যভাষী ও সত্যপ্রিয় মানুষ ছিলেন। শাসক ও আমীর-উমারার সামনেও তাঁর জিহ্বা সত্য প্রকাশে বিরত থাকতো না। ইয়াযীদের বাই'আতের বিষয়ে তাঁর স্পষ্টবাদিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকবার কোন এক বিতর্কিত বিষয়ে তাঁকে চুপ থাকতে দেখে হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বলেন : আবূ বাহর! আপনিও কিছু বলুন। তিনি মুখ খুললেন। বললেন : আমি আর কী বলবো। যদি মিথ্যা বলি তাহলে আল্লাহর ভয়। আর যদি সত্য উচ্চারণ করি তাহলে আপনাদের ভয়।[৪৭]

ধৈর্য ও সহনশীলতা ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'আল্লামা ইবন হাজার লিখেছেন, তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য অনেক। তাঁর বিচক্ষণতা ছিল প্রবাদতুল্য। কিন্তু তিনি সব সময় বিনয়ের

---

৪৬. তাবাকাত-৭/৬৭

৪৭. প্রাগুক্ত-৭/৬৭, ৬৮

সাথে বলতেন, প্রকৃতপক্ষে আমি কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি নই। বরং বিচক্ষণতার ভান করি।[৪৮]

আহনাফের এমন কিছু মূলনীতি ছিল যা প্রত্যেক মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য। তিনি বলতেন, আমি তিনটি কাজ করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে থাকি। সময় হয়ে গেলে নামায আদায়ে, মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনে এবং পাত্র পাওয়া গেলে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে।

আল-আহনাফ একজন দক্ষ ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, তাঁর দক্ষতা ও সাহসিকতার অনেক কাহিনী ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়। মুহাম্মাদ ইবন সীরীন বর্ণনা করেছেন। খলীফা 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) আল-আহনাফ ইবন কায়সকে একটি বাহিনী সহকারে খুরাসানে পাঠালেন। একদিন রাতে শত্রু বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ করে আল-আহনাফের বাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। তারপর শত্রু বাহিনী রণ দামামা বাজাতে বাজাতে তাঁর বাহিনীর উপর হামলা চালায়। মুসলিম বাহিনী ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়লো। এ অবস্থায় আল-আহনাফ কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে ঘোড়ার উপর চড়ে বসলেন এবং দামামার শব্দ যেদিক থেকে আসছিল, কবিতার একটি শ্লোক গুন গুন করে আওড়াতে আওড়াতে সেদিকে চললেন। তারপর যে সৈনিকটি দামামা বাজাচ্ছিল হঠাৎ তার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করেন। দামামার শব্দ থেমে যাওয়ায় শত্রু বাহিনী প্রমাদ গোনে এবং ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এদিক সেদিক পালাতে আরম্ভ করে। তারপর অন্য একটি অশ্বারোহী বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে ধরাশায়ী করে ফেলেন। এসবই কিন্তু আল-আহনাফ একা করেন। তারপর তাঁর সৈন্যরা এগিয়ে আসে এবং শত্রু বাহিনী পালাতে থাকে। তখন আল-আহনাফের বাহিনী তাদেরকে ধাওয়া করে হত্যা করতে থাকে। এ অভিযানে তিনি যে শহরটি জয় করেন তার নাম 'মারব আর-রোয'।[৪৯]

আল-আহনাফ ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল মানুষ। তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা তৎকালীন আরবে প্রবাদে পরিণত হয়। তাঁর ধৈর্যের অনেক গল্প-কাহিনী আরব ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। যেমন একবার 'আমর ইবন আল-আহ্তাম তাঁকে অশ্লীল ভাষায় অশালীন গালিগালাজ করার জন্য এক ব্যক্তিকে উৎসাহিত করলো। লোকটি তাঁকে তাঁর মান-সম্মানের উপর আঘাত করে নোংরা ভাষায় লাগি দিতে থাকলো। কিন্তু আহনাফ নীরবে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে গালি শুনতে লাগলেন। একটি কথারও জবাব দিলেন না। লোকটি যখন দেখলো, তিনি তার কথায় কোন রকম বাধা দিচ্ছেন না এবং কোন প্রত্যুত্তরও করছেন না তখন সে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়াতে কামড়াতে বলতে লাগলো : হায়রে দুঃখ! আল্লাহর কসম! আমি তাঁর কাছে এত তুচ্ছ ও হেয় যে, আমার এ অশালীন গালির কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছেন না।[৫০]

---

৪৮. তাবাকাত-৭/৬৭; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/২৭৭

৪৯. 'উয়ুন আল-আখবার-১/২০৯

৫০. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৪৬৫

আরেকবার তিনি বসরার একটি নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। এমন সময় একটি লোক কোথা থেকে এসে তাঁর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তাঁকে অশালীন ভাষায় গালাগালি করতে লাগলো। তিনি চুপ করে পথ চলতে লাগলেন। যখন তারা মানুষের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন তখন তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন : ভাতিজা, তোমার গালির যদি আরো কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি বলে ফেল। তা না হলে আমার গোত্রের লোকেরা শুনে ফেললে তোমার পরিণতি মোটেই ভালো হবে না।[৫১]

একবার জনৈক ব্যক্তি আহনাফকে প্রশ্ন করলো : আপনি এমন ধৈর্য ও সহনশীলতা কার কাছ থেকে শিখলেন? বললেন : কায়স ইবন 'আসিম আল-মিনকারীর কাছ থেকে। একদিন আমি তাঁকে দেখলাম, তাঁর বাড়ীর আঙ্গিনায় তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে গোত্রের লোকদের সাথে কথা বলছেন। এমন সময় হাত পিছন দিক থেকে বাঁধা এক ব্যক্তি ও একজন নিহত ব্যক্তির লাশ আনা হলো। তাঁকে বলা হলো : আপনার এই ভাতিজা আপনার এই ছেলেকে হত্যা করেছে। আল্লাহর কসম! তিনি তাঁর স্থান থেকে একটুও নড়লেন না এবং কথা বলাও বন্ধ করলেন না। এক সময় কথা শেষ করে ভাতিজার দিকে তাকিয়ে বললেন : ভাজিতা! পাপ করেছো এবং তোমার নিজের ধনুক দিয়ে নিজের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেছো। তোমার চাচাতো ভাইকে তুমি হত্যা করেছো। তারপর তিনি নিজের আরেক ছেলেকে বললেন : যাও, তোমার ভাইকে কবর দাও, তোমার চাচাতো ভাইয়ের বাঁধন খুলে দাও এবং নিহত ছেলের রক্তমূল্য হিসেবে তার মাকে এক শো উট দিয়ে দাও।[৫২]

একবার এক ব্যক্তি আহনাফকে প্রশ্ন করলো : আপনার গোত্রের নেতৃত্ব আপনি লাভ করলেন কিভাবে– আপনি তো তাদের সবচেয়ে মর্যাদাবান ঘরের লোক নন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুদর্শন নন এবং আচার-আচরণ ও নৈতিকতায় তাদের মধ্যে উত্তমও নন? উত্তরে আহনাফ বললেন : ভাতিজা! তোমার মধ্যে যা আছে তার বিপরীত জিনিস দ্বারা। লোকটি প্রশ্ন করলো : সেটা কি? বললেন : তোমার এমন সব বিষয় যা আমার কোন প্রয়োজন নেই তা পরিহার দ্বারা। যেমন আমার যে বিষয় তোমার কোন প্রয়োজন নেই তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছো।[৫৩]

ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন, তিনি নেতৃস্থানীয় তাবি'ঈদের মধ্যে ছিলেন। তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধির উপমা দেওয়া হতো। হাসান বসরী (রহ) বলতেন, আমি কোন সম্প্রদায়ের সবচেয়ে ভদ্র লোকটিকে আহনাফের চেয়ে বেশী ভালো পাইনি। তিনি একাধিক খলীফার শাসনকাল পেয়েছেন। তাঁদের কোন একজন খলীফা জনৈক ব্যক্তির কাছে আহনাফের গুণাবলী জানতে চান। জবাবে লোকটি বলে, যদি আপনি একটি গুণ শুনতে চান, আমি

---

৫১. 'উয়ূন আল-আখবার-১/৩৩১
৫২. প্রাগুক্ত-১/৩৩০
৫৩. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/২৮৬

তাই বলবো। আর দু'টি শুনতে চাইলে দু'টি এবং তিনটি চাইলে তিনটি গুণ বলবো। খলীফা বললেন, তুমি দু'টি বলো। তখন লোকটি বললো, তিনি ভালো করতেন, ভালোকে পছন্দ করতেন। মন্দ থেকে দূরে থাকতেন এবং মন্দকে ঘৃণা করতেন। খলীফা বললেন, আচ্ছা তুমি তাঁর তিনটি গুণ বলো। লোকটি বললো, তিনি কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। কারো উপর বাড়াবাড়ি ও যুলুম করতেন না এবং কাউকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতেন না। খলীফা বললেন, তাঁর একটি গুণের কথা বলো। সে বললো, তিনি তাঁর নিজের উপর সবচেয়ে বড় শাসক ছিলেন।[৫৪]

আহনাফ বলতেন : যখনই কোন বিষয়ে কেউ আমার সাথে পাল্লা দিয়েছে, আমি তিনটি পদ্ধতিতে তাকে হারিয়ে দিয়েছি। (১) সে যদি আমার চেয়ে উপরের স্তরের হয় তাহলে আমি তার মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। (২) আমার চেয়ে নীচের স্তরের হলে আমি আমার নিজকে সম্মান করেছি। (৩) আর আমার সমকক্ষ হলে নিজেকে তার উপর প্রাধান্য দিয়েছি।[৫৫]

খালিদ ইবন সাফওয়ান বলেছেন : আল-আহনাফ মর্যাদা থেকে পালাতেন, আর মর্যাদা তাঁর পিছু ধাওয়া করতো। আল-আসমা'ঈ বলেছেন, একবার আল-আহনাফ ও আল-মুনযির ইবন আল-জারূদ মু'আবিয়ার (রা) দরবারে যান। আল-মুনযির ভিতরে যাওয়া-আসা করতেন লাগলো; কিন্তু আহনাফ দরবারের শেষ প্রান্তে মোটা পশমের চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে থাকেন। যখনই আল-মুনযির এদিক ওদিক যাচ্ছিল, লোকেরা বলাবলি করছিল যে, ইনিই আল-আহনাফ। এক সময় আল-মুনযির বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলো : মনে হচ্ছে আমি যেন এই শায়খ (আল-আহনাফ)-এর অলঙ্কারে পরিণত হয়েছি।[৫৬]

তাঁর গোত্রের ফারগানা বিন্‌ত আওস ইবন হাজার নাম্মী এক মহিলা একবার আল-আহনাফের কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, কবরের কাছাকাছি তাঁর বাহনটি দাঁড় করিয়ে মৃত আহনাফকে লক্ষ্য করে যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন তাতে আল-আহনাফের সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন : 'নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। কাফনে জড়িয়ে কবরে রক্ষিত আবূ বাহরের প্রতি আল্লাহ দয়া ও করুণা করুন! সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনার বিচ্ছেদ দ্বারা আমাদেরকে পরীক্ষা করেছেন এবং আপনার মৃত্যুর দিনে আমাদেরকে তা জানিয়েছেন। আপনি জীবনকালে প্রশংসিত হয়েছেন এবং মৃত্যুর পরেও আপনি মানুষের স্মরণে আছেন। আপনি ছিলেন দারুণ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান, মহান শান্তিপ্রিয়, উঁচু স্তম্ভ, হিংসার আগুন নির্বাপনকারী ও নারীর সম্ভ্রম রক্ষাকারী ব্যক্তি। আপনি সভা-সমাবেশে অত্যন্ত ভদ্র, বিধবা ও অসহায় লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল, মানুষের অতি নিকটবর্তী,

---

[৫৪] প্রাগুক্ত-২/২৭৮; শাযারাত আয-যাহাব-১/৭৮

[৫৫] আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/২৮৩

[৫৬] 'উয়ূন আল-আখবার-১/২৬১-২৬২

তাদের মধ্যে অতি সাধারণ– যদিও আপনি তাঁদের নেতা। খলীফা ও আমীর-উমারাদের দরবারে আপনি প্রতিনিধি দলের নেতা। তাঁরা আপনার কথার শ্রোতা ও আপনার সিদ্ধান্তের অনুসরণকারী; এরপর তিনি চলে যান।[৫৭]

তিনি বলতেন : কারো মধ্যে চারটি গুণ থাকলে সে পূর্ণ মানুষে পরিণত হয়। আর যার মধ্যে চারটির একটি থাকে সে তার কাওম বা সম্প্রদায়ের অন্যতম কর্মশীল ব্যক্তিতে পরিণত হয়। (১) দীন– যা তাকে পরিচালিত করে। (২) বুদ্ধিমত্তা– যা তাকে ঠিক পথে চালায়। (৩) বংশ মর্যাদা– যা তাকে পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করে। (৪) লজ্জা-শরম– যা সে সব সময় অবলম্বন করে।

তিনি আরো বলতেন : একজন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি চারটি অবস্থার মধ্যে থাকে। (১) আরেকজন ঈমানদার তাকে হিংসা করে। (২) একজন মুনাফিক (কপট ধার্মিক) তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। (৩) কাফির তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। (৪) শয়তান তাকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করে।

তিনি বলতেন : মিথ্যাবাদীর কোন ব্যক্তিত্ব নেই। কৃপণের কোন নেতৃত্ব নেই এবং অসচ্চরিত্র ব্যক্তির কোন খোদাভীতি নেই।[৫৮]

তিনি আরো বলতেন : নিরানন্দ ব্যক্তির কোন বন্ধু নেই, মিথ্যাবাদীর কোন কথার ঠিক নেই, হিংসুকের কোন শান্তি নেই।[৫৯]

তিনি বলতেন : আমি ধৈর্যকে বহু মানুষের চেয়ে বেশী সাহায্যকারী পেয়েছি।[৬০]

খুরাসানে অবস্থানকালে একবার আল-আহনাফ বানূ তামীমকে উদ্দেশ্য করে একটি ভাষণ দেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ :

'ওহে বানূ তামীম, তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাস তাহলে তোমাদের নেতৃত্ব অটুট থাকবে, তোমাদের অর্থ-বিত্ত একে অপরের জন্য ব্যয় কর, তাহলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে, তোমরা তোমাদের পেট ও যৌনাঙ্গের বিরুদ্ধে জিহাদের দ্বারা জিহাদের সূচনা কর, তাহলে তোমাদের দীন ঠিক থাকবে, আর কোন কিছু অত্মসাৎ করবে না। তাহলে তোমাদের জিহাদ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকবে।[৬১]

একবার আহনাফকে প্রশ্ন করা হলো : সবচেয়ে ভালো পানীয় কী? বললেন : মদ। প্রশ্ন করা হলো : কিভাবে জানলেন? বললেন : আমি দেখেছি, যাদের জন্য এটা হালাল আছে তারা এটা ছেড়ে অন্যটার দিকে যায় না। আর যাদের জন্য এটা হারাম, তারা এর চারপাশে শুধু ঘুর ঘুর করে।[৬২]

---

[৫৭] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৩০২

[৫৮] প্রাগুক্ত-২/১৯৬, ১৯৭, ১৯৯

[৫৯] প্রাগুক্ত-২/৬৩; 'উয়ূন আল-আখবার-২/১০

[৬০] আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/২৮৩

[৬১] আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৯৩

[৬২] আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৬/৩৩৫

তিনি বলতেন : আরবরা ততদিন পর্যন্ত আরব থাকবে যতদিন তারা পাগড়ী পরবে, তরবারি কাঁধে ঝোলাবে, সহনশীলতাকে অপমান বলে গণ্য করবে না এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানকে হেয় কাজ বলে মনে করবে না।[৬৩]

আল-আহনাফ ছিলেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী কঠোর মানুষ।[৬৪] তিনি বলতেন, যার একটি কথা শুনে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে সে বহু কথা শোনে। একবার এক ব্যক্তি তাঁর সামনে 'হায়া' বা লজ্জার বেশ প্রশংসা করে। তার কথা শেষ হলে আল-আহনাফ বললেন : এটা শেষ পর্যন্ত দুর্বলতার রূপ নেয়। আর একটা ভালো কখনো একটা মন্দের কারণ হতে পারে না। আমরা বরং বলি : একটি নির্ধারিত পরিমাণের নাম 'হায়া'। আর পরিমাণের বেশী হয়ে গেলে তাকে তুমি যা ইচ্ছা নাম দিতে পার। এমনিভাবে দানশীলতা, বিচক্ষণতা, ভীরুতা, বীরত্ব, কৃপণতা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য।[৬৫]

হযরত 'উমার (রা) একবার আল-আহনাফকে লক্ষ্য করে বলেন : যার হাসি বেশী হয় তার গাম্ভীর্য কমে যায়। কেউ কোন কিছু বেশী করলে সে নামে সে পরিচিত হয়। যার মধ্যে কৌতুক ও হাস্য-রসিকতা বেশী হয়ে গেছে তার পতন ঘটেছে। যার বেশী পতন ঘটেছে তার তকাওয়া বা খোদাভীরুতা কমে গেছে। যার খোদাভীরুতা কমে গেছে তার লজ্জা-শরম চলে গেছে। আর যারা লজ্জা-শরম চলে গেছে তার 'কলব' বা অন্তঃকরণের মৃত্যু ঘটেছে।[৬৬]

---

৬৩. 'উমার ফাররুখ-১/৩৪৬

৬৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৯৮

৬৫. প্রাগুক্ত-১/২০২, ২/৭৬; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/২৭৯, ৪/৪১৫

৬৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/১৮৮

উওয়াইস ইবন 'আমির আল-কারানী (রহ)

হযরত উওয়াইস ইবন 'আমির আল-কারানীর জন্মস্থান ইয়ামন। তিনি তথাকার মুরাদ গোত্রের সন্তান ছিলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে না দেখেই 'খায়রুত তাবিঈন'[১] (তাবিঈদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো) বলে উল্লেখ করেন। তাঁর পিতার নাম 'আমির ইবন জাযআ।[২] রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় তিনি একজন পূর্ণ বয়স্ক ও ঈমানদার মানুষ হিসেবে বিদ্যমান থাকলেও নবী কারীমের (সা) সাথে মুখোমুখি সাক্ষাতের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত থেকে যান। চোখের দেখা না হলেও তিনি রাসূলে খোদার 'ইশ্‌ক ও মুহাব্বতে একেবারে বিভোর হয়ে পড়েন। তাঁর এ 'ইশ্‌ক ও মুহাব্বত প্রবাদতুল্য হয়ে যায় এবং তিনি জগতের সকল রাসূল-প্রেমীদের নেতায় পরিণত হন। আসলে জাহিরী জগত ও বাতিনী জগত দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। জাহিরী জগতের নিয়ম-কানুন বাতিনী জগতের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। 'ইশ্‌ক ও মুহাব্বত সম্পূর্ণ বাতিনী বিষয়। এর জন্য চাক্ষুস দেখা-সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন পড়ে না। দূরত্ব ও প্রতিবন্ধকতা এ ক্ষেত্রে কোন বিষয় নয়। বাতিনী বন্ধন হাজার মাইলের দূরত্বকেও নৈকট্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলার ক্ষমতা ও আকর্ষণের শক্তিই হলো মূল বিষয়। যেমন, সূর্য কোটি কোটি মাইল দূর থেকেও এ পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুকে আলোড়িত ও আলোকিত করে, শিশির বিন্দু উড়ে এসে সূর্যের তাপে নিজেকে বিলীন করে দেয় এবং বাগিচার ফুল বহু দূর থেকে বিভিন্ন পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকাকে সুরভিত করে তোলে। একই নিয়মে হযরত উওয়াইসও মাদানী সূর্যের কিরণে আলোকিত হয়ে ওঠেন এবং মদীনার বসন্ত ফুলের সৌরভে সুরভিত হয়ে পড়েন। এ কারণে তিনি ইয়ামনে অবস্থান করলেও তাঁর প্রেম-প্রবাহ মদীনা পর্যন্ত বহমান ছিল।

এ কোন কবিত্ব নয়; বরং বাস্তব সত্য। তাই হযরত রাসূলে কারীম (সা) এই না দেখা 'ইশ্‌ক ও মুহাব্বতের পতঙ্গের আলামত ও চিহ্ন একটি একটি করে হযরত 'উমারকে (রা) বলে যান। সাহীহ মুসলিমে এসেছে : 'সর্বোত্তম তাবিঈ মুরাদ গোত্রের এক ব্যক্তি। তাঁর নাম উওয়াইস। সে ইয়ামনে তোমাদের সাহায্যে আসবে। তার শরীরে শ্বেতীর দাগ আছে। এ দাগ সবটুকু মুছে গিয়ে এক দিরহাম পরিমাণ অবশিষ্ট আছে। তার মাও জীবিত আছে। সে তার সেবা করে। যখন সে আল্লাহর নামে কসম করে তখন তা পূর্ণ করে। যদি তুমি তার দু'আয়ে মাগফিরাত (ক্ষমার জন্য দু'আ) অর্জন করতে পার তাহলে তা করবে।[৩]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) এ বর্ণনার পর থেকে হযরত 'উমার (রা) সব সময় উওয়াইসের সন্ধানে ছিলেন। অতঃপর তাঁর খিলাফতকালে যখন ইয়ামন থেকে একটি

---

[১] হায়াতুস সাহাবা- ৩/৩৩৩-৩৩৪

[২] আল ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা- ১/১১৫

[৩] সাহীহ মুসলিম : কিতাবু ফাদাইল আস-সাহাবা- (২৫৪২); মুসনাদে আহমাদ- ১/৩৮; হায়াতুস সাহাবা- ৩/৩৩৩-৩৩৪

প্রতিনিধিদল এলো, তিনি তার অভ্যাস অনুযায়ী তাদেরকে প্রশ্ন করলেন : আপনাদের মধ্যে কি উওয়াইস ইবন 'আমির আছেন? তারা বললো : হ্যাঁ, আছেন। তারপর উমার (রা) খুঁজতে খুঁজতে ইয়ামনে উওয়াইসের কাছে পৌছেন। তাঁকে প্রশ্ন করেন : আচ্ছা, আপনি উওয়াইস ইবন 'আমির? তিনি বললেন : হাঁ।

'উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন : আপনার মা কি বেঁচে আছেন? বললেন : হাঁ। এই পরিচয়টুকু জানার পর হযরত 'উমার (রা) তাঁকে বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলে গেছেন, তোমার নিকট ইয়ামনীদের সাহায্যের সাথে মুরাদ ও কারন গোত্রদ্বয়ের এক ব্যক্তি উওয়াইস ইবন 'আমির আসবে, যার শরীরে শ্বেতীর দাগ থাকবে। তবে এক দিরহাম পরিমাণ ছাড়া সবটুকু মুছে যাবে। তার মা থাকবে এবং তার সাথে সে সদাচরণ করবে। যখন সে আল্লাহর নামে কসম খায় তখন সে তা পূর্ণ করে। যদি তুমি তার দু'আয়ে মাগফিরাত নিতে পার তবে তা নিবে। আপনি আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন।

উওয়াইস বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন! আমার মত মানুষ আপনার মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করবে? 'উমার আবার তাঁকে দু'আ করার অনুরোধ করেন। উওয়াইস বলেন : হে আল্লাহ, আপনি 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে ক্ষমা করে দিন। 'উমার বলেন : আজ থেকে আপনি আমার ভাই। আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না। তারপর 'উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : আপনি কোথায় যেতে চান? বললেন : কূফায়। 'উমার (রা) বললেন! আমি কূফার ওয়ালীকে আপনার ব্যাপারে লিখে জানিয়ে দিচ্ছি। উওয়াইস বললেন : তার কোন প্রয়োজন নেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকা আমার বেশী প্রিয়।

এ ঘটনার এক বছর পর কূফার একজন সম্মানিত ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসলেন। হযরত 'উমার (রা) তাঁর নিকট উওয়াইসের বিষয়ে জানতে চাইলেন। তিনি জানালেন, উওয়াইস নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় একটি ঝুপড়ি ঘরে বসবাস করেন। হযরত 'উমার (রা) তখন সেই ব্যক্তির নিকট উওয়াইস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী বর্ণনা করলেন। এই ব্যক্তি কূফায় ফিরে গেলেন এবং উওয়াইসের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর নিকট দু'আয়ে মাগফিরাত প্রার্থনা করেন। জবাবে তিনি বললেন, আপনি একটি পবিত্র সফর থেকে সবেমাত্র ফিরে এসেছেন, তাই আপনিই আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'উমারের (রা) সাথে কি আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে? লোকটি বললেন : হাঁ। এই সংলাপের পর উওয়াইস সেই লোকটির জন্য দু'আ করেন।[৪]

হযরত উওয়াইস (রহ) নিজেকে দুনিয়াবাসীর চোখ থেকে লুকোবার জন্য খুবই দীন-হীনভাবে থাকতেন। অধিকাংশ সময় সম্পূর্ণ শরীর ঢাকার জন্য সবটুকু কাপড় তাঁর গায়ে থাকতো না। নগ্নদেহ দেখে মানুষ তাঁর দেহ কাপড় দিয়ে ঢেকে দিত। স্থূল দৃষ্টির সাধারণ মানুষ তাঁর বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাঁকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতো এবং তাঁকে নানাভাবে

---

[৪] প্রাগুক্ত; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ৪/২২-২৩; 'আসরুত তাবি'ঈন- ৪৪৫; আল-'ইক্‌দ আল ফারীদ- ৩/৩৯৮

বিরক্ত করতো।[৫]

তবে সূক্ষ্মদৃষ্টির মানুষের দৃষ্টি থেকে তিনি লুকোতে পারেননি। তাঁর রূহানিয়্যাতের সুরভিতে মোহিত হয়ে মানুষ পাগলের মত তাঁর নিকট ছুটে এসেছে। হারাম ইবন হায়্যান (রহ) ছিলেন তাঁরই সমকালীন একজন সত্যিকার অন্তরবিশিষ্ট তাবি'ঈ। তাঁর ও উওয়াইসের মাঝে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা খোদ হারামই বর্ণনা করেছেন, যা সত্যিই শোনার উপযুক্ত।

তিনি বলেন, আমি উওয়াইস কারানীর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কূফা গেলাম। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে ফুরাতের তীরে পৌঁছলাম। সেখানে দেখলাম একটি লোক দুপুরের সময় একাকী বসে ওজু করছে এবং কাপড় ধুচ্ছে। আমি উওয়াইসের গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা শুনেছিলাম। এ কারণে খুব তাড়াতাড়ি তাকে চিনে ফেললাম। তিনি ছিলেন স্থূলদেহী ও গৌর বর্ণের। লোমশ শরীর, মাথা মুড়ানো, ঘন দাড়ি বিশিষ্ট মানুষ। পশমের একটি মোটা পায়জামা ও একটি চাদর শরীরে শোভা পেত। চেহারা ছিল একটু বড় ও ভীতিপ্রদ। নিকটে পৌঁছে আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমি মুসাফাহা (করমর্দন) করার জন্য হাত বাড়ালাম। তিনি মুসাফাহা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আল্লাহ্ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন—তিনি আবার একথাটি উচ্চারণ করলেন। আমি বললাম, উওয়াইস! আল্লাহ্ আপনার প্রতি করুণা করুন এবং আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনার এ কি অবস্থা হয়েছে। 'ইশ্‌ক ও মুহাব্বতের চূড়ান্ত পরিণতিতে তাঁর বাহ্যিক অবস্থা দেখে আমার চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে আসে। আমাকে কাঁদতে দেখে তিনিও কাঁদতে লাগলেন। তারপর আমাকে বললেন, হারাম ইবন হায়্যান! আল্লাহ আপনার প্রতি করুণা করুন! আমার ভাই, আপনি কেমন আছেন? আপনাকে আমার ঠিকানা কে বলেছেন? আমি বললাম : আল্লাহ্। আমার এ জবাব শুনে তিনি বললেন :

لا إله إلا الله سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لفعولا حين سمانى.

- এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ বা উপাস্য নেই। আমাদের প্রভু কতনা পবিত্র। আমাদের প্রভু যদি অঙ্গীকার করেন তা অবশ্যই পূর্ণ করেন।

হারাম ইবন হায়্যান বলেন যে, এর পূর্বে আর কখনো আমি তাঁকে দেখিনি এবং তিনিও আমাকে দেখেননি। এ কারণে আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম : আপনি আমার ও আমার পিতার নাম কিভাবে জানলেন? আল্লাহর কসম! আজকের পূর্বে আমি আর কোথাও কখনো আপনাকে দেখিনি। বললেন : মহাজ্ঞানী সত্তা আমাকে জানিয়েছেন। যখন আপনার অন্তর আমার অন্তরের সাথে কথা বলেছে তখনই আমার রূহ আপনার রূহকে চিনে ফেলেছে। চলাফেরাকারী জীবিতদের মত রূহদেরও জীবন থাকে। মু'মিনরা কখনো একসাথে মেলামেশা না করলেও, পরস্পর পরিচিত না হলেও এবং একজন আরেকজনের সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ না হলেও সবাই একজন আরেকজনকে চেনে-জানে। আল্লাহর এই

---

৫. তাবাকাত- ৬/১১২-১১৪

রূহের মাধ্যমে একে অপরের সাথে কথা বলে— তা সে একজন আরেকজনের থেকে যত দূরেই থাকুক না কেন।

আমি আরজ করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে কোন হাদীছ শুনেছেন? শুনে থাকলে একটু বর্ণনা করুন, আমি আপনার কাছ থেকে শুনে তা মুখস্থ করে নিই। বললেন- আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) পেয়েছি। তবে তাঁকে দেখা ও সাহচর্যের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি। হাঁ, যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, আমি তাদেরকে দেখেছি এবং আপনাদের মত আমার কাছেও তাঁর হাদীছ পৌঁছেছে। কিন্তু আমি মুহাদ্দিছ, কাজী অথবা মুফতী হবো— এ উদ্দেশ্যে নিজের জন্য এ দ্বার উন্মুক্ত করতে চাইনে। আমার নিজের নফসের অনেক কাজ আছে। তাঁর এ জবাব শুনে আমি আবার আরজ করলাম, তাহলে আমাকে কুরআনের কিছু আয়াত শুনিয়ে দিন। আপনার মুখ থেকে কুরআন শোনার বড় ইচ্ছা আমার। আমি আল্লাহর জন্যই আপনাকে ভালোবাসি। আমার জন্য দু'আ করুন এবং কিছু উপদেশ দিন, যা আমি চিরদিন মনে রাখবো। আমার এ আবেদন শুনে তিনি আমার হাত মুঠ করে ধরেন এবং - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم - পাঠ করে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। তারপর বলতে লাগলেন : আমার প্রভুর স্মরণ অতি উঁচু, তাঁর বাণী সবচেয়ে বেশী সত্য, সবচেয়ে বেশী সত্যকথা তাঁর কথা, সবচেয়ে বেশী ভালো কথা তাঁর কথা। এই কথাগুলো বলে তিনি- "وما خلقنا السماوات والأرض - থেকে - وهو العزيز الرحيم" -[6] পর্যন্ত তিলাওয়াত করে জোরে চিৎকার দিয়ে উঠে একেবারে চুপ হয়ে যান। আমি মনে করলাম তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমাকে বললেন, হারাম ইবন হায়্যান : তোমার পিতা মারা গেছেন, খুব শিগগীর তোমাকেও মরতে হবে। আবূ হায়্যান মারা গেছেন, তার জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম। ইবন হায়্যান! নূহ ও ইবরাহীম খলীলুর রহমান (আ) মারা গেছেন। ইবন হায়্যান! মূসা নাজিয়্যুর রহমান মারা গেছেন। ইবন হায়্যান! দাউদ খলীফাতুর রহমান মারা গেছেন। ইবন হায়্যান! মুহাম্মাদ রাসূলুর রহমান মারা গেছেন। ইবন হায়্যান! আবূ বকর খলীফাতুল মুসলিমীন মারা গেছেন! ইবন হায়্যান! আমার ভাই 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মারা গেছেন! একথা বলার পর তিনি 'হায় 'উমার! বলে চিৎকার দিয়ে ওঠেন এবং তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত কামনা করে দু'আ করেন। হযরত 'উমার ফারূক (রা) তখন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আর তখন ছিল তার খিলাফাতের শেষ দিক। এ কারণে আমি তাঁকে বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি করুণা করুন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব তো জীবিত আছেন। বললেন, হ্যাঁ! আমি যা কিছু বলেছি তা যদি ঠিক মত বুঝে থাক তাহলে তুমি জেনে যাবে যে আমরা মৃতদের মধ্যেই পরিগণিত। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করলেন এবং সংক্ষিপ্ত দু'আ করার পর বললেন : হারাম ইবনে হায়্যান, আল্লাহর কিতাব, উম্মাতের সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ এবং নবীর (সা) উপর দরূদ ও সালাম— এগুলোর ব্যাপারে আমার অসীয়াত থাকলো। আমি আমার মৃত্যু সংবাদ দিয়েছি, তোমারও মৃত্যু সংবাদ দিয়েছি। আগামীতে সব সময়

---

[6] সূরা আদ-দুখান- ৩৮-৪২

মৃত্যুকে স্মরণ রাখবে। একটি মুহূর্তও মৃত্যু থেকে উদাসীন হবে না। ফিরে গিয়ে তোমার গোত্রের লোকদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভয় দেখাবে। সব সময় নিজ দীনের লোকদেরকে উপদেশ দেবে এবং নিজের জন্য চেষ্টা করবে। সাবধান! জামা'আত বা দলছুট হবে না। এমন না হয় যে তোমার অজান্তে তোমার দীন ছুটে যায় এবং কিয়ামতে তোমাকে জাহান্নামের আগুনের মুখোমুখি হতে হয়। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! এ ব্যক্তির ধারণা যে, সে তোমার জন্যই আমাকে ভালোবাসে, তোমার জন্যই আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে। হে আল্লাহ! তাই তুমি জান্নাতে তার চেহারাটা আমাকে চিনিয়ে দিও এবং দারুস সালামে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিও, সে দুনিয়াতে যেখানেই থাকুক না কেন তোমার হিফাজতে রেখ, তার ঘর-বাড়ী, ক্ষেত-খামার তাঁর কর্তৃত্বে রেখ। দুনিয়ার এ সংক্ষিপ্ত জীবনে তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রেখ এবং দুনিয়ার যতটুকু তার জন্য নির্ধারিত আছে সেটুকু তার জন্য সহজলভ্য করে দাও। তোমার দান ও অনুগ্রহের ব্যাপারে তাকে কৃতজ্ঞ বানিয়ে দাও এবং তাকে ভালো প্রতিদান দাও। এই দু'আ করার পর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হারাম ইবন হায়্যান, এখন আমি তোমাকে আল্লাহর জিম্মায় সুপর্দ করছি। আস-সালামু আলায়কুম। আজকের পর আর যেন তোমাকে না দেখি। আমি প্রচার পছন্দ করিনে। নির্জনতা ও একাকীত্বই আমার বন্ধু। যতদিন আমি দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে জীবিত থাকবো চূড়ান্ত রকমের ব্যথা ও বেদনাগ্রস্ত অবস্থায় থাকবো। এ কারণে আগামীতে তুমি আর কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করবে না। এবং আমাকে খোঁজও করবে না। তোমার স্মৃতি আমার অন্তরে সব সময় থাকবে। কিন্তু এরপর না আমি তোমাকে দেখবো, আর না তুমি আমাকে দেখতে পাবে। আমাকে মনে রাখবে, আমার জন্য দু'আ করবে। আমিও ইনশা'আল্লাহ তোমাকে স্মরণে রাখবো এবং তোমার কল্যাণ কামনা করে দু'আ করবো। এরপর তিনি একদিকে চলতে শুরু করেন। আমিও তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। কিন্তু তিনি এতে রাজী হলেন না। এরপর আমরা দু'জনই কাঁদতে কাঁদতে একজন আরেকজন থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। আমি এক দৃষ্টিতে তার চলার পানে তাকিয়ে থাকলাম। এক সময় তিনি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। এরপর আমি তাঁকে অনেক খুঁজেছি, বহু মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু কোন ভাবেই তার সন্ধান পাইনি। আল্লাহ তাঁর প্রতি করুণা বর্ষণ করুন এবং তাঁকে ক্ষমা করুন। এই সাক্ষাতের পর থেকে এমন কোন সপ্তাহ যায় না যাতে এক দু'বার আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখিনি।[৭]

উওয়াইস আল কারানীকে দুনিয়া যতদিন চিনতে পারেনি ততদিন পর্যন্ত তাঁকে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে দেখা যেত। কিন্তু যখনই তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন থেকে তিনি মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে এমনভাবে চলে যান যে কেউ আর তাঁর সাক্ষাৎ পায়নি। এরপর সিফ্ফীন যুদ্ধে তাঁর শহীদ হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার বড় বাসনা তার ছিল। আর এর জন্য সব সময় আল্লাহর দরবারে দু'আ করতেন। সিফ্ফীন যুদ্ধে আল্লাহ পাক তাঁর সে বাসনা পূর্ণ করেন। এ যুদ্ধে তিনি হযরত আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করেন।

---

৭. হায়াতুস সাহাবা- ২/৮৭; 'আসরুত তাবি'ঈন- ২৪১-২৪৩

তিনি জীবনকালে সব সময় দু'আ করতেন :[৮]

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً تُوجِبُ لِى الْجَنَّةَ وَالرِّزْقَ .

হে আল্লাহ তুমি আমাকে এমন শাহাদাত দান কর যা আমার জন্য জান্নাত ও রিযিক ওয়াজিব করে দিবে।

হযরত উওয়াইস (রহ) যদিও একজন তাবি'ঈ ছিলেন এবং সব রকম মহত্ত্ব, মর্যাদা ও পূর্ণতার সমাবেশ তাঁর মধ্যে ঘটেছিল, তথাপি বাহ্যিক জ্ঞানে শীর্ষ জ্ঞানীদের তালিকায় কোথাও তাঁর নামটি পাওয়া যায় না। এমন কি একটি হাদীছের বর্ণনাও করেছেন বলে কোথাও দেখা যায় না। তাই বলে এমন সিদ্ধান্তে পৌছা ঠিক হবে না যে, জাহিরী 'ইলমের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। মূলতঃ তাঁর সত্তায় বাতিনী ও জাহিরী 'ইলমের সমাবেশ ঘটেছিল। জাহিরী 'ইলমের প্রচার ও প্রসারে তাঁর কোন অবদান না থাকার দু'টি কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ অন্তর পরিশুদ্ধ করণ ও আধ্যাত্মিক সাধনা ও অনুশীলনে নিজেকে নিয়োজিত রাখার পর 'ইলমে জাহিরীর চর্চায় সময় ব্যয় করা তাঁর পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তিনি ছিলেন ভীষণ প্রচার-বিমুখ মানুষ। নাম-কাম ও খ্যাতির প্রতি ছিলেন নিরাসক্ত। কাজী, মুফতী, মুহাদ্দিছ ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হওয়া তিনি দারুণ অপছন্দ করতেন। একবার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, আমার কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ ঠিক সেভাবে পৌছেছে যে ভাবে পৌছেছে আপনাদের নিকট। কিন্তু আমি নিজের উপর তার দ্বার উন্মুক্ত করে মুহাদ্দিছ, কাজী ও মুফতী হওয়া মোটেই পছন্দ করিনে। অন্তরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার বহু কাজ আমার আছে। তিনি বলতেন, আমি খ্যাতি ও প্রচার মোটেই পছন্দ করিনে। একাকীত্ব ও নির্জনতা আমার অতি প্রিয়। জাহিরী 'ইলমের পদ ও পদবী গ্রহণ করলে খ্যাতি থেকে তিনি বাঁচতে পারতেন না, তেমনিভাবে একাকীত্বও বজায় থাকতো না। আর এ কারণে তিনি নিজের জন্য 'ইলমের এ শাখার দ্বার একেবারেই রুদ্ধ করে দেন।

তাঁর কামালাতের উৎস ও ঝর্নাধারা কাগজের পাতার পরিবর্তে ছিল অন্তরের পাতা। তাঁর মহান সত্তাই ছিল 'ইলমে বাতিনের উৎস ধারা। তাবি'ঈদের মধ্যে হযরত হাসান বসরীর (রহ) পরে তিনিই হলেন তাসাউফের একক কেন্দ্র। পরবর্তীকালের সূফী-সাধকদের অনেকের সিলসিলা বা সূত্রের ধারাবাহিকতা তাঁর পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে।

তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতেন। নিয়ম ছিল, একরাত নামাযে দাঁড়িয়ে, দ্বিতীয় রাত রুকু অবস্থায় এবং তৃতীয় রাত সিজদা অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। বেশীর ভাগ সময় রাতের সাথে দিনও ইবাদাতে কেটে যেত। রাবী' ইবন খায়ছাম বর্ণনা করেছেন। তিনি একদিন ওয়াইসের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন, তিনি ফজরের নামাযে মশগুল আছেন। নামাযের পর তাসবীহ-তাহলীল থেকে ফারেগ হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকলেন। প্রতীক্ষার সময় বাড়তে বাড়তে জুহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। তারপর জুহর থেকে 'আসর এবং 'আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত একই অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন।

---

৮. আল ইসাবা- ১/১১৭

রাবী' ধারণা করলেন, মাগরিবের পরে হয়তো তিনি আহার করার জন্য বের হবেন। কিন্তু ঈশা পর্যন্ত তাসবীহ-তাহলীলে নিমগ্ন থাকলেন। তারপর আবার ঈশা থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত একই অবস্থা বিদ্যমান থাকলো। দ্বিতীয় দিন ফজরের নামাযের পর তার একটু ঘুমের ভাব হলো। কিন্তু তিনি সাথে সাথে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমি নিদ্রাকাতর চোখ এবং অতৃপ্ত পেট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাঁর এ অবস্থা দেখে রাবী বললেন, আমি, যতটুকু দেখেছি, তাই আমার জন্য যথেষ্ট।[৯]

সবসময় তিনি রোযা রাখতেন। অনেক সময় এমন হতো যে, ইফতার করার মত কিছুই থাকতো না। তখন খেজুরের বিচি খুঁটে সংগ্রহ করে বিক্রি করতেন এবং তাই দিয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য সামান্য কিছু কিনে আহার করতেন। যদি দু'একটি শুকনো খেজুর পেতেন, তাও ইফতারির জন্য রেখে দিতেন। খেজুর যদি কিছু বেশী পরিমাণে পেতেন তখন বিচি বিক্রি করার অর্থ গরীব-মিসকীনদেরকে দান করে দিতেন।[১০] প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁর নিকট যা কিছু খাদ্য-খাবার ও কাপড়-চোপড় থাকতো সবই দান করে দিতেন। তারপর এই বলে দু'আ করতেন– হে আল্লাহ! যারা অনাহারে মারা গেছে এবং যারা বস্ত্রহীন অবস্থায় মারা গেছে তাদের ব্যাপারে আমাকে পাকড়াও করবেন না।[১১] সতর ঢাকার মত কাপড় না থাকায় মাঝে মাঝে জুমআর নামাযেও যেতে পারতেন না।[১২]

কূফায় যিক্র আযকারের একটি 'হালকা' ছিল। সেই হালকায় বহু 'সালিক' তথা আধ্যাত্মিক পন্থীরা সমবেত হতেন। উওয়াইসও সেখানে অংশগ্রহণ করতেন। উসাইদ ইবন জাবির বর্ণনা করেছেন। আমরা কিছু লোক কূফায় যিক্র ও আমলের একটি হালকায় সমবেত হতাম। উওয়াইসও আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতেন। এই হালকায় উওয়াইসের যিকর সবার অন্তরের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলতো। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এই যিক্র ও 'আমল ছিল নামায ও কুরআন তিলাওয়াত।[১৩]

তাঁর দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ও নির্মোহ ভাব এমন পর্যায়ের ছিল যে, বাড়ী-ঘর, লেবাস-পোশাক, পানাহার, তথা পার্থিব যাবতীয় প্রয়োজন ও দাবী থেকে সব সময় মুক্ত ছিলেন। অতি সাধারণ একটি ভাঙ্গাচোরা ঘরে থাকতেন।[১৪] পানাহারের অবস্থা এমন ছিল যে, কখনো উট চরিয়ে, আবার কখনো খেজুরের বিচি খুঁটে বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে বেঁচে থাকার মত খাবার সংগ্রহ করতেন। হযরত উমারও এমন যুহ্দ অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু করেননি। পোশাকের মধ্যে থাকতো পশমের একটি মোটা চাদর ও লুঙ্গি।[১৫] অনেক সময় চাদরও থাকতো না। নগ্নদেহ দেখে মানুষ তাঁকে চাদর দিত। তিনি

---

[৯] তারীখু ইবন 'আসাকির- ৩/১৭৩
[১০] তাযকিরাতুল আওলিয়া'- ৪৩
[১১] হুলয়াতুল আওলিয়া'- ২/৮৭
[১২] সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ৪/৩০
[১৩] মুসতাদরিকে হাকিম- ৩/৪০৪,৪০৮
[১৪] তাবাকাত- ৬/১১৩
[১৫] মুসতাদরিক- ৩/৪০৬

এই বলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতেন : 'হে আল্লাহ! আমি আমার ক্ষুধার্ত পেট ও নগ্ন দেহের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার দেহে যে পোশাক আছে এবং আমার পেটে যে খাদ্য আছে তাছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই।১৬

তাঁর এমন মজযুব বা ঐশী প্রেমে বেহুঁশ অবস্থা দেখে লোকেরা তাঁকে ভুল বুঝতো এবং পথ চলার সময় তাঁকে নানাভাবে বিরক্ত করতো। একবার কাপড় সংগ্রহ করতে না পারার কারণে হালকায়ে যিকর থেকে অনুপস্থিত থাকলেন। তাঁর হালকার সাথী উসাইদ ইবন জাবির ভাবলেন, হয়তো তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বললেন, আপনি আমাদেরকে ছেড়ে দিলেন কেন? তিনি জবাব দিলেন : আমার গায়ে দেওয়ার মত চাদর ছিল না। তাই আমি যেতে পারিনি। উসাইদ বর্ণনা করেছেন, তাঁর একথা শোনার পর আমি আমার চাদরটি তাঁকে দিই। কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন : আমি যদি এই চাদর গায়ে জড়িয়ে বাইরে যাই তাহলে আমার গোত্রের লোকেরা বলবে, এই কপট ধার্মিক লোকটিকে তোমরা দেখ, সে একজন লোকের পিছু নিয়ে তাকে ধোঁকা দিয়ে তার চাদরটি হাতিয়ে নিয়েছে। তাঁর এত সব কথা ও আপত্তি সত্ত্বেও আমি প্রায় জোর করে আমার চাদরটি তাঁকে দিয়ে দিই। তাঁকে বলি এটি গায়ে দিয়ে আমার সাথে চলুন দেখি কে কি বলে। আমার এমন পীড়াপীড়িতে তিনি চাদরটি গায়ে জড়িয়ে আমার সাথে বের হলেন। যেই না আমরা একটি জন-সমাবেশ অতিক্রম করছি, অমনি তারা বলে উঠলো, তোমরা এই কপট ধার্মিককে দেখ, সে একটি লোকের পিছু নিয়ে তার চাদরটি বাগিয়ে নিয়েছে। আমি কথাটি শোনামাত্র তাদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, তোমাদের এমন কথা বলতে লজ্জা হয় না? আল্লাহর কসম! আমি যখন তাঁকে এ চাদর দিতে চেয়েছি, তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।১৭ মোটকথা, তিনি তাঁর বাহ্যিক অবস্থার কারণে মানুষের ঠাট্টা-বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতেন। আর হাসিমুখে তা সহ্য করতেন।

আধ্যাত্মিক সাধনার একটি স্তরের নাম 'ফানা'। 'ফানা' অর্থ পরম সত্তায় বিলীন হওয়া। তিনি এই 'ফানা'র এমন পর্যায়ে ছিলেন যেখানে বিন্দুমাত্র খ্যাতি, প্রচার ও দুনিয়াদার লোকদের সাথে মেলামেশার কোন সুযোগ নেই। এ কারণে খ্যাতি ও প্রচার থেকে পালিয়ে বেড়াতেন। খলীফা হযরত 'উমার (রা) একবার ইচ্ছা করলেন, কূফার ওয়ালীকে চিঠি লিখে তাঁর পরিচয় জানিয়ে দিয়ে তাঁর সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেন। কিন্তু উওয়াইস তাতে রাজী হননি। তিনি উমারকে (রা) বলেন- আমি অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকতেই পছন্দ করি। মানুষের সাথে মেলামেশাতে ভয় পেতেন। কিন্তু তার এ আত্মগোপন অবস্থা বেশি দিন বজায় থাকেনি। তাঁর রূহানিয়াতের খোশবু আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। দিন দিন মানুষের আগ্রহ তাঁর প্রতি বাড়তে থাকে। উসাইদ ইবন জাবির বর্ণনা করেছেন। আমার এক সাথী আমাকে উওয়াইসের নিকট নিয়ে যায়। তিনি দু'রাকআত নামায শেষ করে আমাদের প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি বলেন, আমার সাথে আপনাদের

---

১৬. প্রাগুক্ত- ৩/৪০৫

১৭. প্রাগুক্ত- ৩/৪০৪

আচরণও বেশ আজব ধরনের। আপনারা সবসময় আমার পিছনে লেগে থাকেন কেন? আমি একজন দুর্বল মানুষ। আমার অনেক প্রয়োজনীয় কাজ আছে, যা আমি আপনাদের কারণে সম্পন্ন করতে পারিনে। আপনারা এমন করবেন না। আল্লাহ আপনাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন। আপনাদের কারো কোন প্রয়োজন আমার কাছে যদি হয় তাহলে ঈশার নামাযের সময় সাক্ষাৎ করবেন। এই মজলিসে তিন ধরনের মানুষ এসে থাকে। বুদ্ধিমান ঈমানদার, নির্বোধ ঈমানদার ও কপট ধার্মিক (মুনাফিক)। এই তিন ধরনের মানুষের দৃষ্টান্ত হলো বৃক্ষ ও বৃষ্টির মত। যদি সবুজ-শ্যামল তরতাজা ও ফলবান বৃক্ষের উপর বৃষ্টি হয় তাহলে তার সজীবতা ও সৌন্দর্য আরো বেড়ে যায়। কিন্তু সজীব অথচ ফলহীন, এমন বৃক্ষের উপর বৃষ্টি হলে তার শাখা ও পাতায় সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় এবং তা ফল দিতে আরম্ভ করে। আর যদি শুকনো ঘাস ও দুর্বল শাখার উপর বৃষ্টি হয় তাহলে তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই উপমাটি দিয়ে তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :[১৮]

وننزل من القرآن ماهو شفاء للناس ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين إلا خسارا.

- আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। যালিমদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

খলীফা হযরত 'উমার (রা) উওয়াইস আল কারানীকে খুব বেশী বেশী স্মরণ করতেন। একবার তিনি মিনায় মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলেন : হে কারানবাসী, আপনাদের মধ্যে কি উওয়াইস আছেন? একজন বয়স্ক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি তো একজন পাগল। নির্জনস্থানে একাকী বাস করেন। তিনি কারো সাথে মিশতে চান না, আর কেউ তার সাথে মিশতে চায় না। 'উমার (রা) বললেন : আমি তাঁর কথাই বলছি। আপনারা ফিরে গিয়ে তাঁকে খুঁজে বের করবেন এবং তাঁকে আমার এবং রাসূলুল্লাহর সালাম পৌঁছে দিবেন।

আমীরুল মু'মিনীনের একথা উওয়াইসের কানে পৌছালে তিনি বলেন : আমীরুল মু'মিনীন আমাকে পরিচিত করে দিয়েছেন, আমার নামটি ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলিহি। আস্-সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ। তারপর তিনি মুখ নীচু করে দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন।[১৯]

তাঁর সীমাহীন একাকীত্ব ও নির্জনতা-প্রিয়তা তাঁকে আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ)-এর দায়িত্ব থেকে কখনো উদাসীন ও অমনোযোগী করতে পারেনি। এ দায়িত্ব পালনের কারণে তিনি অনেক সময় অনেকের শত্রুতে পরিণত হতেন। আবুল আহওয়াস নামক জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। তার এক বন্ধু তাকে বলেছেন, মুরাদ গোত্রের এক ব্যক্তি উওয়াইসের নিকট যায় এবং সালাম বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করে, উওয়াইস, কেমন আছেন? তিনি বলেন, আল-হামদু লিল্লাহ।

---

[১৮] আল ইসাবা- ১/১১৭

[১৯] সূরা আল-ইসরা'- ৮২

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করে, আপনার সাথে কালচক্রের আচরণ কেমন?

তিনি বলেন, এই প্রশ্ন এমন ব্যক্তিকে করছো যার সন্ধ্যার পর সকাল লাভ করার বিশ্বাস নেই এবং সকালের পর সন্ধ্যা পাওয়ার কোন আশা নেই। আমার মুরাদ গোত্রের ভাই! মৃত্যু কোন ব্যক্তির জন্য আনন্দের কোন স্থান অবশিষ্ট রাখেনি। আমার মুরাদ গোত্রের ভাই! আল্লাহর পরিচয় মু'মিনের জন্য সোনা-রূপোর কোন মূল্যই অবশিষ্ট রাখেনি। আমার মুরাদ গোত্রের ভাই! মু'মিন ব্যক্তির আল্লাহর ফরজ আদায়ের কারণে কোন বন্ধু থাকে না। আল্লাহর কসম! যেহেতু আমরা মানুষকে ভালো কাজের শিক্ষা দিই এবং খারাপ করতে বারণ করি, তাই তারা আমাদেরকে শত্রু ভেবে বসেছে। আর এতে তাদের পাপাচারী সহযোগী জুটে গেছে। যারা আমাদের প্রতি নানা রকম বানোয়াট দোষারোপ করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের এ আচরণ আমাকে সত্য বলা থেকে বিরত রাখতে পারবে না।[২০]

তিনি অখ্যাত ও অপরিচিত থাকার উদ্দেশ্যে খুব কমই জনসমক্ষে বের হতেন। তবে জিহাদের সম্মান ও মর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্যে কখনো কখনো নির্জনতা থেকে বেরিয়ে আসতেন। যদিও সহীহ মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণ নেই, তবে অনুমান তথা দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, হযরত 'উমারের (রা) সাথে ইয়ামনের সাহায্যের ব্যাপারে তাঁর যে সাক্ষাৎ হয়, তা নিশ্চিতভাবে এই যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় হয়ে থাকবে। তাছাড়া আল-ইসাবার একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি আযারবাইজানের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২১]

আবদুল্লাহ ইবনে সালামা ছিলেন আযারবাইজান যুদ্ধের সৈনিক। তিনি বলেছেন ঃ 'উমার ইবনুল খাত্তাবের সময়ে আমরা আযারবাইজান যুদ্ধ করি। আমাদের সাথে উওয়াইস আল কারানীও ছিলেন। যুদ্ধ শেষে ফেরার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক চিকিৎসা করার পরও তাকে আর বাঁচানো গেল না। তিনি মারা গেলেন। আমরা তাঁকে কবর দিলাম। কিন্তু পরে আর তার কবরের কোন চিহ্ন থাকলো না। কোন কোন বর্ণনায় জানা যায়, তিনি আলীর (রা) খিলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং সিফ্‌ফীন যুদ্ধে আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করে শহীদ হন।[২২]

পার্থিব আত্মীয়-সম্পর্কের মধ্যে উওয়াইসের শুধু এক মা ছিলেন। তাঁর সেবাকে তিনি সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য ও ইবাদাত মনে করতেন। তিনি একা হয়ে যাবেন, এই চিন্তায় হজ্জ আদায় করেননি। তাঁরই কারণে হযরত রাসূলে পাকের দীদার থেকে মাহরূম থেকে যান। মায়ের ইনতিকালের পর হজ্জ আদায় করার সুযোগ আসে কিন্তু তখন তিনি একজন কপর্দকশূন্য মানুষ। তাঁর কিছু শুভানুধ্যায়ী হজ্জের সফরের যাবতীয় ব্যবস্থা করায় তিনি হজ্জ আদায় করেন।[২৩]

তিনি বলতেন, আল্লাহর কাজে এমনভাবে থাকবে যেন তুমি সব মানুষকে হত্যা করে

---

[২০] আসরুত তাবি'ঈন- ২৪৬

[২১] প্রাগুক্ত- ২৪৩-২৪৪; মুসতাদরিক- ৩/৪০৬

[২২] আল-ইসাবা- ১/১১৭

[২৩] আল- বায়ান ওয়াত তাবয়ীন- ৩/১৯৩, টীকা-১০; 'আসরুত তাবি'ঈন- ২৪৭

ফেলেছো। অসাক্ষাতে কারো জন্য দু'আ করা তার সাথে সাক্ষাৎ করার চেয়ে ভালো। কারণ, সাক্ষাতের মধ্যে লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হতে পারে।[২৪]

তাবি'ঈদের মধ্যে উওয়াইস আল কারানীর এমন বিশেষ কিছু ফযীলত ও মর্যাদা আছে যা অন্য কারো নেই। তাঁর সবচেয়ে বড় সম্মান ও মর্যাদা হলো হযরত হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে 'খায়রুত তাবি'ঈন' (তাবি'ঈদের মধ্যে উত্তম) বলে অভিহিত করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন, আমার উম্মাতের এক ব্যক্তির সুপারিশে বানু তামীমের বিপুল সংখ্যক মানুষ জান্নাতে যাবে। হাসান মনে করেন, সেই ব্যক্তিটি হলেন উওয়াইস আল কারানী।[২৫] যদিও এই বর্ণনাটি তেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও এ দ্বারা হযরত উওয়াইসের মর্যাদা অনুমান করা যায়।

'খায়রুত তাবি'ঈন'-এর এত সব মহত্ত্ব, মর্যাদা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতার বর্ণনা সত্ত্বেও এমন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যা দ্বারা তাঁর অস্তিত্বটাই সন্দেহজনক হয়ে যায়। এই সব গুণাবলীতে ভূষিত উওয়াইস নামের কোন তাবি'ঈ আদৌ ছিলেন? যেমন: ইবন 'আদী বর্ণনা করেছেন, ইমাম মালিক তাঁর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতেন। সাম'আনী বর্ণনা করেছেন, ইবন হিব্বান বলতেন, আমাদের কোন কোন বন্ধু তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন। সাম'আনী এ রকম কথাও বর্ণনা করেছেন যে, ইবন হিব্বান বলতেন, আমাদের বুখারীর নিকট তাঁর সম্পর্কের বর্ণনাগুলোর সনদ সন্দেহযুক্ত।

কিন্তু অন্যসব মুহাদ্দিছ মনে করেন, হাদীছ ও তাবাকাত গ্রন্থাবলীর এত সব বর্ণনার বিপরীতে এই মুষ্টিমেয় কিছু দুর্বল বর্ণনার কোন স্থান ও মর্যাদাই থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় ভেবে দেখার মত আছে। প্রথমত: যে সব বর্ণনা দ্বারা উওয়াইস কারানীর অস্তিত্বই সন্দেহজনক হয়ে উঠে, সেগুলোর মান ও মূল্য কি? দ্বিতীয়তঃ সেগুলো যদি বিশুদ্ধও হয় তাহলে তদ্দ্বারা তাঁর বিদ্যমান না থাকার সিদ্ধান্তে পৌঁছা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? তৃতীয়তঃ এর বিপরীতের উলামা, মুহাদ্দিছ ও তাবাকাতের বর্ণনাসমূহের জবাব কি হবে?

বর্ণনার মূল্যমানের দিক দিয়ে এ জাতীয় সকল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। হাফেজ ইবন হাজার ও সাম'আনী যদিও এ বর্ণনাগুলো সংকলন করেছেন, তবে তার কোন সনদ তারা দেননি। তাই হাদীছ পর্যালোচনার রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। আর যদি বিশুদ্ধ ধরেও নেওয়া যায় তাহলেও সেগুলো দ্বারা উওয়াইস আল কারানীর অস্তিত্বহীনতার সিদ্ধান্তে পৌঁছা ঠিক নয়। কারণ, যাঁরা তাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন তা এই ভিত্তিতে করেছেন যে, তাঁরা সেই যুগে তাঁর নাম শোনেননি, অথবা তাঁর জীবনের কোন অবস্থার কথা জানতে পারেননি। কিন্তু তাঁরা জানেননি বা জানতে পারেননি, একথা দ্বারা তিনি ছিলেন না একথা প্রমাণিত হয় না।

নীতিগতভাবে সেইসব মানুষের অবস্থার কথা লোকে জানতে পারে যাঁরা বিশেষ কোন

---

[২৪] মুসতাদ্রিক- ৩/৪০৭

[২৫] সিফাতুস সাফওয়া- ১/২৩৭

অবস্থানে থাকেন। যাঁরা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে একেবারে নীরবে জীবন কাটিয়ে দেন তাদের কথা মানুষ জানতে পারে না। এমন কি সাহাবীদের সম্পর্কে এ দাবী করা যায় না যে, প্রত্যেকটি সাহাবী সম্পর্কে সেই যুগের লোকেরা জানতো, অথবা তাঁদের জীবনী সেই যুগে লেখা হয়েছিল। সাধারণত সেই সব সাহাবীর জীবন কথা জানা যায় যাঁরা শিক্ষা অথবা সরকারী কাজে কিছু অবদান রেখেছেন, অথবা হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে কোথাও তাঁর নামটি এসে গেছে। কোন কোন সাহাবীর তো শুধু নামই জানা যায়- জীবনের কোন কথাই জানা যায় না। তাই যদি হয় সাহাবীদের অবস্থা, তাহলে একজন অখ্যাত তাবি'ঈর অবস্থা কি হতে পারে?

এই নীতির ভিত্তিতে উওয়াইস আল কারানীর জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। তাঁর জীবনী থেকে যেমন জানা যায় যে, তিনি দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে নিজেকে সব সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখেন। কেউ তাঁকে মুফতী, মুহাদ্দিছ, কাজী বলবে এবং মানুষ তাঁর প্রতি মনোযোগী হবে, এই ভয়ে তিনি এমনভাবে নিজেকে গড়ে তোলেন যে, বিশেষ কিছু লোক ছাড়া তাঁর অঞ্চলের লোকেরাও তাঁকে জানতো না। আর যাঁরা তাঁকে চিনতো-জানতো তাঁরাও তাঁকে এক ভিন্ন স্বভাব-প্রকৃতির মানুষ বলে জানতো। শিক্ষা ও গুরুত্বপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাজের সাথে যেহেতু তিনি কোনভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন না, একারণে 'আলিম-উলামা তাঁর সম্পর্কে জানতেন না বা জানার কোন প্রয়োজন বোধ করেননি।

যাই হোক, তাঁর ব্যক্তিত্ব একেবারে গোপন থাকার মত ছিল না। এ কারণে অনেক বিশেষ ব্যক্তির নিকট তাঁর জীবনের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। পূর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি। আমরা যখন তাবাকাত ও হাদীছের গ্রন্থসমূহে দৃষ্টিপাত করি তখন 'সাহীহ মুসলিম'-এর মত গ্রন্থেও তাঁর ফযীলত ও মর্যাদার কথা পাই। তাবাকাত ও রিজাল (চরিত অভিধান) শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহের চেয়ে হাদীছের গ্রন্থাবলীতে তার কথা বেশী এসেছে। মুসনাদে আহমাদ, সাহীহ্ মুসলিম, দালাইলে বায়হাকী, হিলয়াতুল আওলিয়া (আবু নু'আয়ম), মুসতাদরিকে হাকিম ইত্যাদি হাদীছের গ্রন্থে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। হাফেজ ইবন হাজার-এর বেশীরভাগ সূত্রের উল্লেখ করেছেন তাঁর আল-ইসাবা গ্রন্থে।[২৬] সম্ভবত এর বাইরে আরো বহু গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা এসে থাকবে। তবে তাবাকাত ও রিজালের গ্রন্থাবলীতে তাঁর আলোচনা কম হওয়ার কারণ হলো, সাধারণতঃ এসব গ্রন্থে এমন সব ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত স্থান পায় যাঁরা শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাবাকাতে ইবন সা'দ, আল-ইসাবা, উসুদুল গাবা, হিলয়াতুল আওলিয়া, তারীখে ইবন 'আসাকির, তাহযীব, মীযানুল ই'তিদাল এবং এ জাতীয় আরো অনেক গ্রন্থে তাঁর জীবনকথা কম-বেশী এসেছে। আর যে সকল 'আলিম তাঁর অস্তিত্বের অস্বীকারমূলক বর্ণনা নকল করেছেন তাঁদের নিজেদেরই সেইসব বর্ণনার উপর

---

[২৬] আল-ইসাবা- ১/১১৭; আল-ইক্দ আল-ফারীদ-৩/৩৯৮

[২৭] আল ইসাবা- ১/১১৫-১১৭

আস্থা ও বিশ্বাস ছিল না। তারাও উওয়াইস আল কারানীর ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করতেন। যেমন ইবন হাজার ইমাম মালিকের অস্বীকৃতিমূলক বর্ণনা নকল করার পর লিখেছেন যে, তাঁর পরিচিতি এবং বিবরণ এত যে তাঁর অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।[28]

আল 'উতবী বলেছেন, আমি আমার শায়খদের বলতে শুনেছি : তাবি'ঈদের আটজনের কাছে 'যুহ্দ' (আল্লাহ ভীতি ও দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি) চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাঁরা হলেন : 'আমির ইবন 'আবদিল কুদ্দুস, আল- হাসান আল বসরী, হারাম ইবন হায়্যান, আবূ মুসলিম আল খাওলানী, উওয়াইস আল কারানী, রাবী' ইবন খুছায়ম, মাসরূক ইবন আল-আজদা' ও আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ।[২৯]

---

২৮. সিয়ারুত তাবি'ঈন- ৪৮

২৯. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ- ৩/১৭১

সালামা ইবন দীনার (রহ)

হযরত সালামার (রহ) ডাক নাম ছিল আবূ হাযিম। বংশগতভাবে তিনি ছিলেন অনারব। পিতা দীনার ছিলেন ইরানী এবং মাতা ছিলেন রোমান। আল-আসওয়াদ ইবন সুফইয়ান আল-মাখযূমীর দাস ছিলেন। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁকে মাখযূমী বলা হতো। ইতিহাসে তিনি আবূ হাযিম আল-আ'রাজ নামেও পরিচিত।[১]

পিতা-মাতা উভয়ের দিক থেকে যদিও তিনি অনারব বংশোদ্ভূত ছিলেন, তবুও ইসলামের সাম্য ও সমতার কল্যাণে মদীনার শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং একজন তাপস ও ভোগ-বিলাস বিমুখ 'আলিমে পরিগণিত হন। ইমাম আয-যাহাবী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন : "الواعظ الزاهد عالم المدينة وشيخها"[২] - তিনি একজন দুনিয়া-বিরাগী উপদেশদানকারী,ড় মদীনার 'আলিম ও শায়খ। ইমাম নাওবী বলেছেন : তাঁর বিশ্বস্ততা, মহত্ত্ব ও প্রশংসায় সকলে একমত।[৩]

তিনি হাদীছের একজন বড় হাফিজ ছিলেন। ইবন সা'দ লিখেছেন : "كان ثقة كثير الحديث" – তিনি ছিলেন বহু হাদীছ স্মৃতিতে ধারণকারী বিশ্বস্ত ব্যক্তি।[৪] সাহল ইবন সা'দ আস-সা'ইদী, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা) প্রমুখ সাহাবীর নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনেন। তবে বহু মুহাদ্দিছ মনে করেন শেষোক্ত দুই সাহাবীর নিকট থেকে তাঁর সরাসরি হাদীছ শোনা প্রমাণিত নয়। বিপুল সংখ্যক বিখ্যাত তাবি'ঈর নিকট থেকেও তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এখানে তাঁর কয়েকজন তাবি'ঈ শিক্ষকের নাম উল্লেখ করা হলো :

উমামা ইবন সাহ্ল ইবন হুনায়ফ, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন যুবায়র, 'আবদুল্লাহ ইবন আবী কাতাদা, নু'মান ইবন আবী 'আয়্যাশ, ইয়াযীদ ইবন রূমান, 'উবায়দুল্লাহ ইবন মুকাস্সিম, আবূ ইবরাহীম ইবন 'আবদির রহমান, না'জা ইবন 'আবদিল্লাহ, আবূ সালিহ আল-সাম্মান, আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান, ইবন মুনকাদির ও আরো অনেকে।

তাঁর ছাত্র ও শাগরিদদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো : যুহ্‌রী, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন ইসহাক, ইবন 'আজলান, ইবন আবী জি'ব, মালিক, হাম্মাদ, সুফইয়ান, সুলায়মান ইবন হিলাল, সা'ঈদ ইবন আবী হিলাল, 'আমর ইবন 'আলী, আবূ গাসসান আল-মাদানী, হিশাম ইবন সা'ঈদ, উহায়ব ইবন খালিদ, আবূ সাখর হুমায়দ ইবন যিয়াদ আল-খাররাত, উসামা ইবন যায়দ

---

১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৩৬৪

২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৯

৩. তাহ্যীবুল আসমা/-২/২০৮

৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৪/১৪৪

লায়ছী, মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার ইবন আবী কাছীর, আফলাহ্ ইবন সুলায়মান আন-নামিরী প্রমুখ।[৫]

ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর পূর্ণ দখল ছিল। তিনি ছিলেন মদীনার একজন বিখ্যাত ফকীহ্। ইমাম যাহাবী, ইমাম নাওবী ও অন্যরা তাঁকে ফকীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।[৬] ইমাম যাহাবী লিখেছেন, তিনি স্বভাবগত ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য অনেক। তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়পদ ফকীহ্ ও উঁচু মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি।[৭] ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞানের প্রমাণ এই যে, তিনি মদীনাতুর রাসূলের একজন কাজী ছিলেন।[৮]

মদীনায় তিনি মানুষকে ও'য়াজ-নসীহতের দায়িত্বও পালন করতেন। 'ইবাদাত-বন্দেগীর দিক দিয়ে তিনি মদীনার বড় বড় 'আবিদ ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি মদীনার 'আবিদ ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ব্যক্তিদের একজন ছিলেন।[৯] ইমাম যাহাবী, ইমাম নাওবী, ইবন হাজার ও আরো অনেকে তাঁর নামের সাথে 'যাহিদ' (দুনিয়া-বিরাগী) শব্দটি লিখেছেন। মোটকথা, সব দিক দিয়ে মহান তাবি'ঈ স্তরের মধ্যে তিনি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন।

আল-জাহিজ (মৃ. হি. ২৫৫) তাঁর 'আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন' গ্রন্থে বিখ্যাত তাপস ও দুনিয়া-বিরাগী মানুষ যাঁরা বয়ান ও বাগ্মিতায়ও পারদর্শী ছিলেন, তাঁদের নামের সাথে তাঁর নামটিও উল্লেখ করেছেন।[১০]

আমীর-উমারা ও শাসক শ্রেণী থেকে সবসময় দূরে থাকতেন। কখনো কোন প্রয়োজনে তাঁদের কাছে ঘেঁষতেন না। একবার খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক ইমাম যুহ্রীর মাধ্যমে তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠান। তিনি যুহ্রীকে বলেন, যদি সুলায়মানের আমার কাছে কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে তাঁকেই আমার কাছে আসা উচিত। আমার তো তাঁর কাছে কোন প্রয়োজন নেই।[১১]

ধর্মীয় ও নৈতিক গুণাবলীর পূর্ণতা ও উৎকর্ষতার সাথে সাথে যথেষ্ট জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। আবদুর রহ্মান ইবন যায়দ ইবন আসলাম বলেন, আমি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিনি যার কথা আবূ হাযিমের কথার চেয়ে বেশী বিজ্ঞতাপূর্ণ। ইবন খুযায়মা বলেন, উপদেশমূলক কথাবার্তায় তাঁর সময়ে আর কেউ তাঁর মত ছিলেন না।[১২]

তাঁর এমন অনেক জ্ঞানগর্ভ বাণী পাওয়া যায় যা দ্বারা তাঁর বিজ্ঞতার অনুমান করা যায়।

---

৫. প্রাগুক্ত-৪/১৪৩; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৩
৬. তাহযীব আল-আসমা'-২/২০৮
৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৩
৮. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৪/১৪৪
৯. প্রাগুক্ত
১০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৩৬৩
১১. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৪/১৪৪
১২. শাযারাত আয-যাহাব-১/২০৮; তাহ্যীব আল-আসমা'-২/২০৮

তিনি বলতেন, এমন সব কাজ যার কারণে মরণই শ্রেয় মনে হয় তা পরিহার কর। তারপর যখনই মৃত্যু আসুক তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যে বান্দা তার নিজের ও তার প্রভুর মাঝের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করে এবং সম্পর্কসমূহ ভালোমত বজায় রাখে আল্লাহ অন্য বান্দাদের সাথে তার সব সম্পর্ক ঠিক রাখেন। আর যে বান্দা তার ও আল্লাহর মাঝের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালনে অবহেলা করে আল্লাহ অন্য বান্দাদের সাথে তার পারস্পরিক দায়িত্বসমূহ পালনের ব্যাপারে অবহেলার ভাব সৃষ্টি করে দেন। এক সত্তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা একাধিক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার চেয়ে অনেক সহজ কাজ। অর্থাৎ এক আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারলে গোটা পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক ভালো হয়ে যাবে। একবার খলীফা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা থেকে কিভাবে মুক্তি পেতে পারি? বললেন : এটা খুবই সহজ কাজ। প্রত্যেকটি জিনিস বৈধ পন্থায় গ্রহণ করুন এবং বৈধ খাতসমূহে তা ব্যয় করুন। হিশাম বললেন, এ কাজ সেই ব্যক্তিই করতে পারেন যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে বাঁচার ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য লাভ করেছেন। তিনি বললেন : আর এ কারণে জিন ও মানুষে জাহান্নাম ভরে যাবে।[১৩] তিনি বলতেন :

যে আমলের কারণে তুমি মৃত্যুকে অপছন্দ কর সে আমল ছেড়ে দাও। তারপর তোমার মৃত্যু যখনই আসুক তোমার কোন ক্ষতি হবে না।[১৪]

তিনি বলতেন : আমরা সবাই তাওবা না করা পর্যন্ত মরতে চাই না। আর আমরা না মরা পর্যন্ত তাওবা করি না। খলীফা আবদুল মালিকের অন্তিম সময় যখন উপস্থিত, তখন দেখলেন একজন ধোপা হাত দিয়ে কাপড় কচলাচ্ছে। খলীফার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো : 'হায়! আমি যদি একজন ধোপা হতাম এবং প্রতিদিন যা উপার্জন করতাম তাই দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতাম।' একথা আবূ হাযিমকে শোনানো হলে তিনি বলে ওঠেন : সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁদেরকে মরণকালে সেই আশা-আরজু দান করেছেন যার মধ্যে আমরা সবসময় আছি। মরণকালে আমরা জীবনকালে তারা যে অবস্থায় আছে তা কামনা করবো না।[১৫]

তিনি বললেন : দুনিয়া বহু জাতি-গোষ্ঠীকে ধোঁকা দিয়েছে। তারা এ দুনিয়াতে অন্যায় ও অপকর্ম করেছে। যখন মৃত্যু এসে গেছে তখন তারা তাদের সবকিছু এমন লোকদের জন্যে ছেড়ে গেছে যারা তাদের কোন প্রশংসা করেনি এবং এমন সত্তার কাছে চলে গেছে যিনি তাদের কোন ওজর-কৈফিয়াত শুনবেন না। আমরা তাদের উত্তরাধিকারী হয়েছি। সুতরাং আমাদের উচিত হবে, তাদের যে জিনিসগুলো আমরা অপছন্দ করি তা থেকে দূরে থাকা এবং যা পছন্দ করি তা 'আমল করা।[১৬]

---

১৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/১৩৯; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৯

১৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৯

১৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৬৪, ১৯১

১৬. প্রাগুক্ত-৩/১২৮

একবার তিনি কোন এক প্রয়োজনে তৎকালীন শাসকের নিকট যান এবং এভাবে নিজের কথা তুলে ধরেন : একটি প্রয়োজনে আমি আপনার নিকট এসেছি এবং সেই প্রয়োজনের কথাটি পূর্বেই আল্লাহকে জানিয়েছি। এখন আল্লাহ যদি তা পূরণের জন্য আপনাকে অনুমতি দেন তাহলে আপনি পূরণ করুন। আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। আর তিনি যদি পূরণের অনুমতি না দেন, আপনি পূরণ করবেন না এবং সে ক্ষেত্রে আমরা আপনাকে মাজুর বা অপারগ মনে করবো।[১৭]

একবার তিনি ফলের বাজার দিয়ে যাচ্ছেন। ফল দেখে তিনি বললেন : তোমার সাথে আমার দেখা হবে জান্নাতে। আরেকবার তিনি গোশতের বাজার দিয়ে যাচ্ছেন। কসাইরা বললো : আবূ হাযিম, ভালো গোশত আছে, কিছু খরিদ করুন। বললেন : আমার কাছে কেনার মত পয়সা নেই। তারা বললো : পয়সা আপনি পরে দিবেন। তিনি বললেন : গোশত আমি পরেই খাব।[১৮]

হিজরী ৯৭ সনে উমাইয়্যা খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক মদীনার মসজিদে নববীতে নামায আদায় এবং রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি সালাম পেশের উদ্দেশ্যে দিমাশক থেকে মদীনার দিকে যাত্রা শুরু করেন। বহু কারী, মুহাদ্দিছ, ফকীহ, 'আলিম, আমীর-উমারা ও সেনাকর্মকর্তা তাঁর সফরসঙ্গী হন। মদীনায় পৌঁছে একটু স্থির হবার পর সেখানকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণ তাঁকে সালাম ও স্বাগতম জানানোর জন্যে উপস্থিত হলো। কিন্তু সালামা ইবন দীনার, যিনি হলেন মদীনার কাজী, সর্বজনমান্য 'আলিম, ও নির্ভরযোগ্য ইমাম, গেলেন না। সুলায়মান ইবন 'আবিদল মালিক তাঁর নিকট আগত লোকদের সাথে সাক্ষাৎ দান ও কুশল বিনিময় শেষ করলেন। তারপর তিনি তাঁর কিছু সঙ্গী-সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : খনিজ পদার্থে যেমন মরিচা পড়ে তেমনি মানুষের অন্তরেও মরিচা পড়ে- যদি না তাকে কেউ উপদেশ দিয়ে তার মরিচা সাফ করে। তারা বললো : আমীরুল মু'মিনীন ঠিক কথাই বলেছেন।

সুলায়মান বললেন : মদীনাতে কি এমন কোন লোক নেই, যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) বেশ কিছু সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, আমাদেরকে উপদেশ দান করতে পারেন? লোকেরা বললো : হাঁ, আমীরুল মু'মিনীন, আবূ হাযিম আল-আ'রাজ আছেন। তিনি জানতে চাইলেন আবূ হাযিম আল-আ'রাজ কে?

তারা বললো : সালামা ইবন দীনার- মদীনার 'আলিম ও ইমাম এবং যেসব তাবি'ঈ বিপুল সংখ্যক সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন তাঁদেরই একজন। সুলায়মান বললেন : তাহলে তাঁকেই আমার কাছে নিয়ে এসো। তবে খুব সম্মানের সাথে আনবে। লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে খলীফার নিকট যাওয়ার জন্য বললো। তিনি রাজী হলেন।

---

[১৭] আল-'ইকদ আল-ফারীদ-১/২৪৩

[১৮] প্রাগুক্ত-৩/১৮৬

সালামা খলীফার দরবারে উপস্থিত হলে খলীফা তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে নিজের কাছে বসালেন। তখন সেখানে ইবন শিহাব যুহ্‌রীও (রহ) বসা ছিলেন। তারপর খলীফা একটি অভিযোগের সুরে তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন :

– আবূ হাযিম! এ কেমন উপেক্ষা?

– আমীরুল মু'মিনীন! আমার মধ্যে আপনি কি ধরনের উপেক্ষা লক্ষ্য করলেন?

– বহু মানুষ আমার সাথে দেখা করতে এসেছে, অথচ আপনি আসলেন না!

– উপেক্ষা তো হয় পরিচয়ের পর। আপনি তো এর আগে আমাকে চিনতেন না, আর আমিও এর পূর্বে আপনাকে কখনো দেখিনি। তাহলে আমার দিক থেকে উপেক্ষা হলো কিভাবে?

খলীফা তখন তাঁর সঙ্গী-সাথীদের লক্ষ্য করে বললেন : শায়খ তাঁর কৈফিয়াত দানে ঠিক করেছেন, আর খলীফা তাঁর প্রতি অভিযোগ করে ভুল করেছে। তারপর তিনি আবূ হাযিমের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন :

– ওহে আবূ হাযিম, আমার অন্তর মাঝে কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জমা হয়ে আছে, আমি তা আপনার নিকট ব্যক্ত করতে চাই।

– আমীরুল মু'মিনীন, বলুন। আল্লাহ সাহায্যকারী।

– ওহে আবূ হাযিম, আমরা মৃত্যুকে অপছন্দ করি কেন?

– এ জন্য যে, আমরা দুনিয়াকে আবাসস্থল বানিয়েছি এবং আখিরাতকে বিধ্বস্ত করেছি। তাই আবাসস্থল ছেড়ে বিধ্বস্ত ভূমিতে যেতে অপছন্দ করি।

– আপনি সত্য বলেছেন। তারপর তিনি বললেন : আবূ হাযিম, আমি যদি জানতাম, আগামীকাল আল্লাহর কাছে আমার কি পাওনা আছে?

– আপনি আপনার কর্মকে আল্লাহর কিতাবের কাছে উপস্থাপন করুন, জানতে পারবেন।

– আল্লাহর কিতাব কোথায় পাব?

– আপনি তা পাবেন আল্লাহর এই বাণীর মধ্যে :

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ.[১৯]

– সৎকর্মশীলরা থাকবে জান্নাতে এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে।

খলীফা বললেন : তাহলে আল্লাহর যে রহমতের কথা বলা হয় তা কোথায়?

আবূ হাযিম বললেন :

إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ.[২০]

– নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

---

[১৯] সূরা আল-ইনফিতার-১৩-১৪

[২০] সূরা আল-আ'রাফ-৫৬

খলীফা- হায়, আমি যদি জানতে পারতাম, আগামীকাল আল্লাহর কাছে আমার আগমন কেমন হবে?

আবূ হাযিম- সৎকর্মশীলদের আগমন হবে একজন প্রবাসীর তার পরিবারে ফিরে আসার মত। আর একজন অসৎকর্মশীলের আগমন হবে একজন পালিয়ে যাওয়া দাসের মত যাকে ধরে টেনে-হেঁচড়ে আবার তার মনিবের কাছে আনা হয়।

এরপর খলীফা কেঁদে দিলেন। সে কান্নার আওয়াজ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠলো। তারপর একটু সুস্থির হয়ে বললেন : আবূ হাযিম, এর থেকে আমাদের পরিত্রাণের উপায় কি?

আবূ হাযিম- আপনারা আপনাদের ভিতরের গর্ব-অহঙ্কারের মলিনতা দূর করে আত্মমর্যাদাবোধের পরিচ্ছদ ধারণ করুন।

খলীফা- আর এই যে অর্থ-বিত্ত এ ক্ষেত্রে খোদাভীতির পথ কি?

আবূ হাযিম- যদি তা সঠিকভাবে অর্জন করেন, সঠিকভাবে রক্ষা করেন, সমভাবে বণ্টন করেন এবং এ ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে সেটাই হবে খোদাভীতি।

খলীফা- আবূ হাযিম, আমাকে বলুন তো, সবচেয়ে ভালো মানুষ কে?

আবূ হাযিম- আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী খোদাভীরু মানুষ।

খলীফা- আবূ হাযিম, বলুন তো সবচেয়ে ভালো কথা কোনটি?

আবূ হাযিম- যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ভয় করে অথবা কারো নিকট কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করে এবং তার মুখের উপর যদি সত্য কথাটি বলে দেয় তাহলে সেটাই হবে সবচেয়ে ভালো কথা।

খলীফা- আবূ হাযিম, কোন দু'আ সবচেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি কবুল হয়?

আবূ হাযিম- সৎকর্মশীলদের দু'আ সৎকর্মশীলদের জন্য।

খলীফা- সবচেয়ে ভালো সাদাকা (দান) কোনটি?

আবূ হাযিম- একজন স্বল্পবিত্তের মানুষ একজন হত-দরিদ্র মানুষের হাতে যা কিছু তুলে দেয়, সেটাই সবচেয়ে ভালো দান। যদি না তার পেছনে খোঁটা অথবা কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য হয়।

খলীফা- সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান কে?

আবূ হাযিম- যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের সুযোগ পেয়ে তা বাস্তবায়ন করে এবং মানুষকে তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, সেই সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান।

খলীফা- তাহলে সবচেয়ে বেশী নির্বোধ কে?

আবূ হাযিম- যে ব্যক্তি তার বন্ধুর ইচ্ছা অনুযায়ী চলে এবং সেই বন্ধুটিও একজন অত্যাচারী। তখন সে মূলতঃ তার আখিরাতকে অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়।

খলীফা– আবূ হাযিম, আপনি কি আমাদেরকে সঙ্গ দিতে পারেন? আপনি আমাদের থেকে কিছু গ্রহণ করবেন এবং আমরা আপনার থেকে কিছু গ্রহণ করবো।

আবূ হাযিম– আমীরুল মু'মিনীন, তা সম্ভব নয়।

খলীফা– কেন?

আবূ হাযিম– আমার ভয় হয়, আমি আপনাদের উপর একটু নির্ভরশীল হয়ে পড়ি কিনা। আর তাহলে আল্লাহ আমাকে বেশী করে দুনিয়ার কষ্ট ও আখিরাতের শাস্তি দিবেন।

খলীফা– আবূ হাযিম, আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা আমার কাছে একটু ব্যক্ত করুন।

এবার আবূ হাযিম কোন জবাব না দিয়ে চুপ থাকলেন। তারপর বললেন : আপনার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান সত্তার নিকট আমি তা পেশ করেছি। তিনি সেই প্রয়োজনের যতটুকু আমাকে দেন হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করি। আর যতটুকু না দেন, আমি খুশী থাকি। খলীফা আবার বললেন : আবূ হাযিম, আমার কাছে আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা একটু বলুন, যেভাবেই হোক আমি তা পূরণ করবো।

আবূ হাযিম– আমার প্রয়োজন এই যে, আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচান এবং জান্নাতে প্রবেশ করান।

খলীফা– আবূ হাযিম, সেটাতো আমার কাজ নয়।

আবূ হাযিম– আমীরুল মু'মিনীন, এছাড়া আমার তো আর কোন প্রয়োজন নেই।

খলীফা– আবূ হাযিম, আমার জন্য দু'আ করুন।

আবূ হাযিম– হে আল্লাহ, সুলায়মান যদি আপনার প্রিয় বান্দাদের একজন হয়ে থাকেন তাহলে আপনি তার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথকে সহজ করে দিন। আর যদি তিনি আপনার শত্রুদের একজন হন তাহলে তাঁকে সংশোধন করে দিন এবং আপনি যা ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন সেদিকে চলার পথ তাঁকে দেখিয়ে দিন।

এ দু'আ শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো : আপনি আমীরুল মু'মিনীনের দরবারে ঢোকার পর থেকে যা কিছু বলেছেন তার মধ্যে এ দু'আটি হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আপনি মুসলমানদের খলীফাকে আল্লাহর দুশমনদের মধ্যে গণ্য করে তাঁকে কষ্ট দিয়েছেন। জবাবে আবূ হাযিম বললেন : আপনার কথা ঠিক নয়। বরং আপনি যা বললেন সেটাই নিকৃষ্ট কথা। আল্লাহ তা'আলা 'আলিমদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তারা যেন সত্য কথা বলেন।

আল্লাহ বলেন : لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُوْنَهُ.

– অবশ্যই তোমরা তা মানুষের কাছে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না।

একথা বলার পর তিনি আমীরুল মু'মিনীনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন, আমাদের পূর্বে পৃথিবীর যে সব জাতি-গোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে তারা ততদিন শুভ ও কল্যাণের মধ্যে থেকেছে যতদিন তাদের শাসকগণ তাঁদের 'আলিমদের জ্ঞানের

প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের নিকট গিয়েছেন। তারপর এমন এক নির্বোধ শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হয় যারা জ্ঞান অর্জন করে। অতঃপর তার বিনিময়ে পার্থিব কিছু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তা নিয়ে শাসকদের দরবারে উপস্থিত হয়। ফলে শাসকরা 'আলিমদের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হারিয়ে ফেলে। সুতরাং তারা বিফল ও ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহর কাছেও হেয় ও অপমানিত হয়েছে। 'আলিমরা যদি শাসকদের নিকট যা আছে তার প্রতি অনাসক্তি ও বীতস্পৃহা দেখায় তাহলে শাসকরা তাদের জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হয়। কিন্তু 'আলিমরা যখনই শাসকদের নিকট যা কিছু আছে তার প্রতি আসক্ত হয়েছে, তখনই তাঁরা 'আলিমদের জ্ঞানের প্রতি নিরাসক্ত হয়েছে এবং তাঁদেরকে হেয় ও অপমান করেছে।

খলীফা- আপনি সত্য বলেছেন। আমাকে আরো একটু উপদেশ বাণী শোনান। আমি এমন কাউকে দেখিনি, আপনার চেয়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞতা যার মুখের অধিক নিকটবর্তী।

আবূ হাযিম বললেন, যদি আপনি বাস্তবায়নকারী লোক হন তাহলে এ পর্যন্ত আমি যা কিছু বলেছি তাই আপনার জন্য যথেষ্ট। আর যদি তা না হন তাহলে এমন ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করা আমার উচিত হবে না যাতে ছিলা নেই।

খলীফা বললেন : আবূ হাযিম, আমি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি, আপনি আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন।

আবূ হাযিম বললেন : হাঁ, আপনাকে খুব সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উপদেশমূলক কথা বলছি : - আপনার মহামহিম প্রভুকে অতি বড় করে দেখুন। আর যেখানে আপনাকে তিনি যেতে নিষেধ করেছেন সেখানে তিনি আপনাকে দেখতে পান এবং যেখানে যেতে আদেশ করেছেন সেখানে তিনি আপনাকে দেখতে না পান- এ ব্যাপারে তাঁকে আপনি পবিত্র ঘোষণা করুন। আর একথা জেনে রাখুন, এই শাসন কর্তৃত্ব আপনার পূর্ববর্তী একজনের মৃত্যুর পরেই কেবল আপনার হাতে এসেছে। সুতরাং আপনার হাত থেকে সেভাবেই চলে যাবে যেভাবে আপনি লাভ করেছেন।

একথা বলার পর তিনি সালাম দিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যত হন। খলীফা তখন বললেন :

- আল্লাহ্ আপনার মত উপদেশ দানকারী 'আলিমকে ভালো প্রতিদান দিন।

আবূ হাযিম খলীফার নিকট থেকে উঠে বাড়ীতে পৌছার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে দীনার ভর্তি একটি থলে নিয়ে খলীফার লোক হাজির হলো। সাথে একটি ছোট্ট চিঠিও নিয়ে এসেছে। তাতে লেখা আছে : 'এগুলো আপনি খরচ করুন। এ রকম আরো অনেক কিছুই আপনি আমার কাছ থেকে পাবেন।'

আবূ হাযিম দীনার ভর্তি থলেটি ফেরত পাঠালেন একথা বলে : হে আমীরুল মু'মিনীন, আমার কাছে আপনার প্রত্যাশা হাসি-তামাশা এবং আপনার কাছে আমার এই ফিরিয়ে দেওয়া অহেতুক ও অসার হওয়ার ব্যাপারে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই। হে আমীরুল মু'মিনীন, যে জিনিস আমি আপনার কাছে থাকা পছন্দ করিনে তা আমার কাছে থাকবে, সেটা আমি কিভাবে পছন্দ করতে পারি? হে আমীরুল মু'মিনীন, এই দীনার যদি আপনার

সাথে সাক্ষাতের সময় যেসব কথা আমি আপনাকে বলেছি তার বিনিময়ে হয় তাহলে আমার অসহায় অবস্থায় আমার জন্য মৃত জীব-জন্তু ও শূকরের গোশত এর চেয়ে বেশী হালাল হবে। আর এগুলো যদি বায়তুল মালে আমার অধিকারের অংশ হয় তাহলে এ অধিকারে কি আমার ও অন্যসব লোকদের মধ্যে সমতা বিধান করা হয়েছে?[২১]

আবূ হাযিম সালামার বাড়ীটি ছিল জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী, সৎকর্ম ও কল্যাণের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য একটি সুস্বাদু পানির ঝর্নাস্বরূপ। আত্মীয়, বন্ধু, ভক্ত ও শিক্ষার্থী সবাই সমানভাবে সেখানে ভীড় জমাতো। একবার 'আবদুর রহমান ইবন জারীর তাঁর ছেলেকে সংগে করে আবূ হাযিমের বাড়ীতে গেলেন এবং দু'জনই তাঁর পাশে বসলেন। তারপর তাঁরা তাঁকে সালাম দিয়ে তাঁর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে দু'আ করলেন। আবূ হাযিম তাঁদের সালামের জবাব দিয়ে তাঁদেরকে স্বাগত জানালেন। তারপর তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা আরম্ভ হলো। 'আবদুর রহমান ইবন জারীর বললেন : আবূ হাযিম, আমরা অন্তরের জাগরণ দ্বারা কিভাবে উপকৃত হই?

আবূ হাযিম : অন্তর পরিশুদ্ধির সময় সকল কবীরা গুনাহ মাফ করা হয়। বান্দা যখন পাপ কাজ ছেড়ে দেওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয় তখন সে বিজয়ী হয়। 'আবদুর রহমান, একথা ভুলে যেও না যে, দুনিয়ার অতি সামান্য জিনিস আমাদেরকে আখিরাতের অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত রাখে। আর যেসব অর্থ-সম্পদ আমাদেরকে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকটবর্তী করে না তা সবই আল্লাহর শাস্তি ও ক্রোধ বলে জানবে। ছেলে বললো : আমাদের শায়খ তথা মাননীয় ব্যক্তি অনেক। আমরা কার অনুসরণ করবো?

আবূ হাযিম : আমার প্রিয় ছেলে, তুমি সেই ব্যক্তির অনুসরণ করবে যে গোপন বিষয় প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, সকল প্রকার দোষ-ক্রটি ও পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে, জীবনের শুরুতেই নিজেকে সংশোধন করে এবং সংশোধনের কাজটি বার্দ্ধক্যে করবে বলে অপেক্ষা করে না। ছেলে, তুমি জেনে রাখ, সূর্য উদিত হয় এমন প্রত্যেকটি দিনে একজন তালিবে 'ইলম (জ্ঞান অন্বেষণকারী)-এর অন্তর মাঝে তার প্রবৃত্তি ও জ্ঞান মুখোমুখি হয় এবং দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির মত পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যদি তার জ্ঞান তার প্রবৃত্তিকে পরাজিত করতে পারে তাহলে সেদিনটি তার বড় লাভের দিন হয়ে থাকে। আর যদি তার প্রবৃত্তি তার জ্ঞানকে পরাজিত করে তাহলে সেটি তার বড় ক্ষতির দিন হয়ে থাকে।

'আবদুর রহমান ইবন জারীর বললেন : আবূ হাযিম, আপনি প্রায়ই আমাদেরকে শোকর (কৃতজ্ঞতা)-এর ব্যাপারে উৎহাসিত করে থাকেন। এই শোকর-এর প্রকৃতি ও গূঢ় রহস্য কি?

---

২১. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/১৬৩; 'উয়ূন আল-আখবার-২/৩৭০; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৪২; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবিয়ীন-১৮২-১৯২; 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৪৩-৩৪৭

আবূ হাযিম– আমাদের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর শোকর-এর একটি হক বা অধিকার আছে। আবদুর রহমান প্রশ্ন করলেন : দু' চোখের শোকর কি?

আবূ হাযিম– যদি আপনি তাদের দ্বারা ভালো কিছু দেখেন, প্রকাশ করবেন। আর খারাপ কিছু দেখলে গোপন করবেন।

আবদুর রহমান– দু'কানের শোকর কি?

আবূ হাযিম– তাদের দ্বারা ভালো কিছু শুনলে মনে রাখবেন। আর খারাপ কিছু শুনলে ভুলে যাবেন।

আবদুর রহমান– দু'হাতের শোকর কি?

আবূ হাযিম– আপনার যা নয়, তাদের দ্বারা তা ধরবেন না। আর তাদের দ্বারা আল্লাহর কোন হক বা অধিকারে বাধা দিবেন না। ওহে আবদুর রহমান, একথা স্মরণ রাখবেন যে, যে ব্যক্তি তার শোকর বা কৃতজ্ঞতা কেবল জিহ্বার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে এবং তার সাথে তার সকল অঙ্গ-প্রত্যক্ষ ও অন্তরের সবটুকু অংশীদার করে না, তার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মত যার একটি চাদর আছে, কিন্তু তার সবটুকু গায়ে না জড়িয়ে শুধু একটি পাশ গায়ে জড়ায়। ফলে সেটি তাকে গরম ও ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাতে পারে না।[২২]

একবার সালামা ইবন দীনার আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মুসলিম মুজাহিদদের সাথে বের হলেন। মুজাহিদদের এ বাহিনীটি রোমান বাহিনীর সাথে যুদ্ধের জন্য যাচ্ছিল। তারা তাদের গন্তব্য স্থলের কাছাকাছি পৌঁছে শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হওয়া ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে একটু বিশ্রাম করে নিতে চাইলো। এই বাহিনীতে বানূ উমাইয়্যার একজন আমীর বা শাসক ছিলেন। এই বিশ্রামকালীন সময়ে তিনি আবূ হাযিমের কাছে একজন লোক পাঠালেন। তিনি লোকটিকে বলে দিলেন, তুমি আবূ হাযিমের নিকট গিয়ে এই কথাটি বলবে : হাদীছ ও ফিকাহ্‌র মাসলা-মাসায়িল বলার জন্য আমীর আপনাকে একটু ডেকে পাঠিয়েছেন।

একথা শোনার সাথে সাথে আবূ হাযিম লিখলেন : 'হে আমীর, আমি এমন সব জ্ঞানী ব্যক্তির সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভ করেছি যাঁরা কখনো দীনকে দুনিয়াদার ব্যক্তির কাছে বয়ে নিয়ে যাননি। আমি মনে করি না যে, যারা এমন কাজ করবে তাদের প্রথম ব্যক্তি আপনি আমাকে বানাতে চান। আমার কাছে কোন প্রয়োজন থাকলে আপনি নিজেই আসুন। ওয়াস্ সালামু 'আলায়কা ওয়া 'আলা মান মা'আকা– আপনার প্রতি ও আপনার সাথে যারা আছে তাদের সবার প্রতি সালাম।'

আমীর চিঠিটি পড়ে তাঁর কাছে গেলেন, কুশল বিনিময় করলেন এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির দু'আ করে বললেন : আবূ হাযিম, আপনি যা লিখেছেন তার সাথে আমি একমত। এ চিঠির মাধ্যমে আপনি আমাদের মধ্যে আপনার সম্মান ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে

---

[২২] সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৯২-১৯৪; 'আসরুত তাবিয়ীন-৩৪৩

ফেলেছেন। এখন আপনি আমাদেরকে কিছু উপদেশ দান করুন। আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে ভালো প্রতিদান দিন।

আবূ হাযিম তাঁকে অনেক উপদেশ দিলেন। তিনি যেসব কথা বলেছিলেন তার কিছু এ রকম : শুনুন! যা আখিরাতে আপনার সাথে থাকুক বলে আপনি চান, দুনিয়াতে তা পেতে লোভ করুন। আর সেখানে যা আপনার সাথে থাকা আপনি অপছন্দ করেন, এখানেই তার প্রতি নিরাসক্ত হোন। ওহে আমীর, জেনে রাখুন, মিথ্যা ও অসত্য যদি আপনার প্রিয় হয় এবং আপনার দ্বারা প্রচলিত হয় তাহলে কপট লোকেরা ও বাতিলপন্থীরা আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং আপনার পাশে ভীড় করবে। আর যদি সত্য আপনার প্রিয় হয় এবং আপনি তা প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে সৎকর্মশীলরা আপনার পাশে সমবেত হবে এবং আপনাকে সত্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। সুতরাং আপনি এ দু'টির যেটি আপনার ভালো লাগে, বেছে নিন।[২৩]

হিজরী ১৪০ সনে অথবা তার পরে আবূ হাযিমের মৃত্যু হয়।[২৪] তাঁর জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে প্রশ্ন করলো : আবূ হাযিম, আপনি নিজেকে কেমন দেখতে পাচ্ছেন? বললেন : দুনিয়ার যা কিছু আমি লাভ করেছি তার মন্দ থেকে যদি আমি মুক্তি পাই তাহলে যা কিছু সরিয়ে ও গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে তা আমাকে ক্ষতি করবে না। তারপর তিনি নিম্নের এ আয়াতটি বার বার আবৃত্তি করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন :[২৫]

إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًّا •

– যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ ভালবাসা দেবেন।[২৬]

---

[২৩] সিফাতুস সাফওয়া-২/৮৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৪

[২৪] প্রাগুক্ত

[২৫] সূরা মারয়াম-৯৬

[২৬] সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৯৬

রাবী' ইবন খুছায়ম (রহ)

আবূ ইয়াযীদ রাবী' ইবন খুছায়ম বংশগত দিক দিয়ে আরবের ছা'লাবা গোত্রের একটি শাখা গোত্র ছাওর-এর সন্তান। পিতার নাম খুছায়ম ইবন 'আ'ইশ। যে সকল তাবি'ঈ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকাল পেয়েছিলেন, কিন্তু সাহাবীর মর্যাদা লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে যান, রাবী' তাঁদের একজন। তিনি সাহাবী হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে গেলেও সে যুগের বহুবিধ কল্যাণ লাভে ধন্য হন। জ্ঞান ও কর্ম এবং দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা ও খোদাভীতির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট তাবি'ঈ। ইমাম যাহ্বী বলেছেন, যে আটজন দুনিয়া বিরাগী তাপস রাসূলুল্লাহর (সা) যুগ লাভ করেন রাবী' তাঁদের একজন।[১]

তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান তাবি'ঈ। তবে তাঁর জ্ঞানের আলোকে নিষ্প্রভ করে দেয় তার দুনিয়া বিমুখতা ও খোদাভীতির জ্যোতি। এ কারণে তিনি 'ইলমের চেয়ে তাকওয়ার মাধ্যমে বেশী প্রসিদ্ধ। জ্ঞানগত উৎকর্ষ তিনি যতটুকু অর্জন করেছিলেন তাতে তাঁর সমকালীনদের মধ্যে বিশেষ স্থানের অধিকারীই ছিলেন। এমন একটা সময় তিনি লাভ করেন যখন 'আলিম সাহাবীদের বড় একটি দল বিদ্যমান ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে বিশেষভাবে 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'ঊদ (রা) ও আবূ আইঊব আল-আনসারীর নিকট জ্ঞান অর্জন করেন।[২] এ দু'জনের মধ্যে আবার 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'ঊদের (রা) নিকট থেকে বেশী ফায়দা লাভ করেন। তাঁর সাথে রাবী'র এত গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে, যতক্ষণ তিনি 'আবদুল্লাহর (রা) নিকট থাকতেন এবং দু'জনের একান্ত আলোচনা শেষ না হতো ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেত না। ইবন মাস'ঊদ (রা) তাঁর গুণাবলী ও আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষে এত মুগ্ধ ছিলেন যে, তিনি প্রায়ই বলতেন, আবূ ইয়াযীদ! রাসূলুল্লাহ (সা) যদি তোমাকে দেখতেন, দারুণ ভালোবাসতেন। আমি যখন তোমাকে দেখি তখন আমার বিনয়ী লোকদের কথা স্মরণ হয়।[৩] 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'ঊদের (রা) সাহচর্য এমন ছিল যে, অতি সাধারণ মানুষকেও একজন বড় 'আলিমে পরিণত করে দিয়েছে। রাবী' ছিলেন স্বভাবগতভাবে একজন সত্যনিষ্ঠ এবং অসম্ভব যোগ্য ব্যক্তি। এ কারণে তিনি ইবন মাস'ঊদের (রা) জ্ঞান ভাণ্ডার দ্বারা বেশী উপকার লাভ করেন।

কুরআন, হাদীছ, ফিকাহ্ তথা সব ধরনের জ্ঞানে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। বাস্তব দিক দিয়ে কুরআনের সাথে তাঁর সবচেয়ে বেশী সম্পর্ক ছিল। কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং কুরআনের আয়াত দ্বারা যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। সকল ওয়াজ-নসীহত ও বক্তৃতা-ভাষণে অত্যন্ত সার্থকভাবে কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করতেন।

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/২৫৮

২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/২৪২

৩. তাবাকাত-৬/১২৭

তিনি সবসময় কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি হয়তো মাসহাফ হাতে কুরআন তিলাওয়াত করছেন, তখন হঠাৎ কোন লোক এসে গেল। তিনি মাসহাফটি তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলতেন যাতে আগন্তুক লোকটি তা না দেখতে পারে।[৪]

সাধারণতঃ তাঁর ও'য়াজ-নসীহত হতো কুরআনের উদ্ধৃতি সহকারে নিম্নরূপ :

হে আল্লাহর বান্দারা! সবসময় ভালো কথা বলবে, ভালো কাজ করবে, ভালো স্বভাবের উপর থাকবে, নিজের জীবনকালকে বেশী বলে মনে করবে না, নিজের অন্তরকে কঠিন করে তুলবে না এবং সেইসব লোকের মত হবে না যারা বলে আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনে না।

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَيَسْمَعُوْنَ.[৫]

– তোমরা সেইসব লোকের মত হয়ো না যারা বলে আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনে না।

হে আল্লাহর বান্দারা! যদি তোমরা ভালো কাজ কর, তাহলে তা ক্রমাগতভাবে করতে থাকবে। কারণ সেদিন খুব শিগগির এসে যাবে যখন তোমরা এ অনুশোচনা করতে থাকবে যে, হায় আফসোস! এই ভালো কাজ যদি আরো বেশী করতাম! যদি তোমার দ্বারা খারাপ কিছু ঘটে যায় তাহলেও ভালো কাজ করবে। আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ـ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ.[৬]

– ভালো কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। আর এ হলো উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।

হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ তাঁর কিতাবের মাধ্যমে যে জ্ঞান তোমাদেরকে দান করেছেন, সে জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যে জ্ঞান তোমাদেরকে দেননি; বরং নিজের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন, সেই জ্ঞানে পারদর্শীদের জন্য তা ছেড়ে দাও। কোন কৃত্রিমতার আশ্রয় নিও না। আল্লাহ বলেছেন :

قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ، إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيْنٍ.[৭]

– হে নবী! আপনি বলে দিন, আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। আর আমি কোন কৃতিত্রমতাশ্রয়ীদের অন্তর্গত লোক নই। আর এই কুরআন বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ। আর এমন এক সময় আসবে যখন তার প্রকৃত অবস্থা অবশ্যই তোমরা জানবে।[৮]

---

৪. 'আসরুত তাবি'ঈন, ২১১; সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন, ৬২

৫. সূরা আল-আনফাল-৩

৬. সূরা হূদ-৯

৭. সূরা সাদ-৫

৮. তাবাকাত-৬/১২৮

হাদীছের ক্ষেত্রে ইমাম যাহ্বী তাঁকে ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।[৯] হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'ঊদ (রা), আবূ আইউব আল-আনসারী (রা), 'আমর ইবন মায়মূন (রা), 'আবদুর রহ্মান ইবন আবী লায়লা (রা) প্রমুখ সাহাবীর নিকট থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। আর ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ, ইমাম শা'বী, মুনযির ছাওরী, হিলাল ইবন ইয়াসাফ, বাকর ইবন মা'ইয প্রমুখের মত বিখ্যাত তাবি'ঈগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন।[১০] গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে তাঁর বর্ণনার কি স্থান ছিল তা এই শাস্ত্রের বিভিন্ন মনীষীর মন্তব্য দ্বারা অনুমান করা যায়। যেমন, ইমাম শা'বী বলতেন : রাবী' সত্যবাদিতার খনি।[১১] আর ইবন মু'ঈন বলতেন, রাবী'র মত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু ঘাঁটাঘাঁটির কোন প্রয়োজন নেই।[১২]

ফকীহ্ হিসেবে রাবী' যদিও তেমন খ্যাতি অর্জন করেননি, তবে তাঁর ফিকাহ্ বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য এ সনদ যথেষ্ট যে, তিনি ছিলেন সেই ফকীহুল উম্মাত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদের (রা) নিকট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র, যাঁর ফাতওয়ার উপর ইরাকী ফিকাহ্ ভিত্তিশীল। তবে পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, তাঁর সীমাহীন যুহ্দ ও তাকওয়া তথা দুনিয়াত্যাগী মনোভাব ও খোদাভীতি তাঁর সব যোগ্যতাকে ম্লান করে দিয়েছে।

সাধারণতঃ দেখা যায় প্রতিটি খান্দানের এমন কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকে যা কম-বেশী তার সদস্যদের মধ্যে পাওয়া যায়। কোন খান্দান জ্ঞান ও বিভিন্ন শাস্ত্রে এবং কোন খান্দান যুহ্দ ও তাকওয়া এবং অন্য কোন বিশেষ গুণের জন্য বিশিষ্ট হয়ে থাকে। রাবী'র খান্দান বানূ ছাওর ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শাবরামা বলেন, আমি কূফায় বানূ ছাওরের চেয়ে বেশী ফকীহ্ ও 'ইবাদাত-বন্দেগী করা বুযর্গ মানুষ আর কোন খান্দানে দেখিনি। আবূ বকর আয-যুবায়দী তাঁর পিতার কথা বর্ণনা করতেন যে, 'আমি ছাওরী ও 'আরানী গোত্রদ্বয়ের চেয়ে বেশী মসজিদে অবস্থানকারী মানুষ অন্য কোন খান্দানে দেখিনি।[১৩]

রাবী' ছিলেন এমন একটি 'ইবাদাত-বন্দেগী করা খান্দানের সদস্য, যে খান্দান দীনী ও রূহানী সম্পূর্ণতায় অন্য সবার চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি কেবল তাঁর খান্দানের মধ্যে নন, বরং গোটা তাবি'ঈ জামা'আতের সবচেয়ে বেশী 'ইবাদাতকারী ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। তিনি ছিলেন সেই মুষ্টিমেয় তাবি'ঈদের অন্যতম যাঁরা যুহ্দ ও তাকওয়ার দিক দিয়ে গোটা তাবি'ঈ সমাজের শীর্ষে ছিলেন।[১৪] তাঁর যুহ্দ ও তাকওয়া এবং 'ইবাদাত-বন্দেগীর ব্যাপারে সকল 'আলেম ও লেখক একমত। ইমাম শা'বী বলেন, রাবী' তাঁর দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খোদাভীরু ছিলেন।[১৫] আবূ 'উবায়দা বলেন, আমি রাবী'র

---

[৯] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৭
[১০] তাহযীবুত তাহযীব-৩/২৪২; 'আসরুত তাবি'ঈন, ২০৮
[১১] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৭
[১২] তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৩/২৪২
[১৩] তাবাকাত-৬/১৩৩
[১৪] তাহযীবুত তাহযীব-৩/২৪২
[১৫] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৮

চেয়ে বেশী ভালো 'ইবাদাতকারী আর কাউকে দেখিনি।[১৬] ইবন হাজার আল-'আসকালানী লিখেছেন, রাবী'র যুহ্দ এবং তাঁর 'ইবাদাত এত প্রসিদ্ধ যে, সে বিষয়ে কিছু লেখার কোন প্রয়োজন নেই।[১৭]

সকল ভালো কাজের মূল উৎস হলো আল্লাহর ভয়। রাবী'র মধ্যে আল্লাহর ভয় এত প্রবল ছিল যে, কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। দোযখের 'আযাবের অতি সাধারণ পার্থিব নমুনা দেখেও তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। আ'মাশ বর্ণনা করেছেন : একবার রাবী' কামারের ভাটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভাটিতে জ্বলন্ত লোহা দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।[১৮]

আরেকবারের একটি ঘটনা তাঁর বন্ধুদের একটি দল বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, একদিন আমরা 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদের (রা) সাথে বের হলাম। আমাদের সাথে রাবী' ইবন খুছায়মও ছিলেন। আমরা ফুরাত নদীর তীরে পৌঁছলাম। সেখানে চুন বানানোর একটি ভাটির পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। তখন চুন বানানোর জন্য সেই ভাটিতে পাথর ফেলা হচ্ছিল। তাতে দাউ দাউ করে প্রচণ্ড গর্জন সহকারে আগুন জ্বলছিল এবং তার লেলিহান শিখা বহু উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে রাবী' থমকে দাঁড়িয়ে যান এবং ভীষণ কাঁপতে শুরু করেন। এ অবস্থায় তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে থাকেন :[১৯]

إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَـهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيْرًا، وَإِذَا أُلْقُوْا مِنْـهَا مَكَانـًا
ضَيِّقًا مُقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هنالك ثُبُوْرًا.[٢٠]

– আগুন যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। যখন এক শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে মৃত্যুকে ডাকবে।

তারপর তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। আমরা তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং দীর্ঘক্ষণ সেবার পর তিনি হুঁশ ফিরে পান। আমরা তাঁকে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দিই।

'ইবাদাত-বন্দেগী ও তাকওয়া-পরহেযগারীর ভিতর দিয়েই রাবী' তাঁর জীবন শুরু করেন। শৈশব-কৈশোরেও সীমাহীন খোদাভীতি তাঁর মধ্যে বিরাজমান ছিল। এত অল্প-বয়সেও 'ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে রাত কাটিয়ে দিতেন। আল্লাহর আযাবের ভয়ে কেঁদে-কেটে অস্থির হয়ে পড়তেন। তাঁর সম্মানিতা মা ঘুমিয়ে পড়তেন। এক ঘুম পর গভীর রাতে জেগে দেখতেন তাঁর কিশোর ছেলেটি তখনো জায়নামাযে দাঁড়িয়ে অথবা

---

১৬. তাবাকাত-৬/১২৭

১৭. তাহযীবুত তাহযীব-৩/২৪২

১৮. তাবাকাত-৬/১৩১

১৯. সিফাতুস সাফওয়া-৩/৬২; হিলয়াতুল আওলিয়া-২/১১২

২০. সূরা আল-ফুরকান-১২-১৩

একাগ্রচিত্তে মুনাজাতে নিমগ্ন। মা ডেকে বলতেন : রাবী' তুমি এখনো ঘুমাওনি? তিনি বলতেন : মা, সেই ব্যক্তি কেমন করে রাতের অন্ধকারে ঘুমাতে পারে যে জবাবদিহিতার ভয় করে? ছেলের জবাব শুনে বৃদ্ধ মায়ের চোখের পানিতে দু'গাল ভিজে যেত। তিনি প্রাণ ভরে ছেলের কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর দরবারে দু'আ করতেন।

রাবী' যুবক হলেন। আর সাথে সাথে তাঁর তাকওয়া-পরহেযগারী এবং আল্লাহভীতিও যৌবন পেল। মানুষ যখন রাতের অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকতো, আল্লাহর ভয়ে রাবী'র কান্না-কাটিও তীব্রতা লাভ করতো। তাঁর এমন বিচলিত ও অস্থির অবস্থা দেখে মায়ের অন্তর ব্যথায় ভরে যেত। ছেলে সম্পর্কে নানা রকম দুশ্চিন্তা তাঁর মনে ভর করতো। এক সময় তিনি ছেলেকে ডেকে বলতেন :

– বেটা তোমার কি হয়েছে? মনে হচ্ছে তুমি কোন অপরাধ করে বসেছো? কোন মানুষকে খুন করেছো?

বলতেন : হাঁ, মা আমি মানুষ খুন করেছি। অস্থিরভাবে মা জানতে চাইতেন : বেটা, কাকে খুন করেছো? আমাকে বল। তাহলে আমরা নিহত ব্যক্তির পরিবারের লোকদেরকে খুশী করে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারবো। আল্লাহর কসম! নিহতের পরিবারের লোকেরা যদি তোমার এ কান্নাকাটি ও রাত জাগার কথা জানতে পারে তাহলে অবশ্যই তারা তোমার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ দেখাবে।

তিনি বলতেন : আপনি কাকেও কিছু বলবেন না। আমি আমার নিজকে হত্যা করেছি। আমার নিজকে আমি পাপের দ্বারা হত্যা করেছি।[২১]

পরবর্তীকালে রাবী'র ছেলে বড় হয়ে যখন দেখতো, বাবা সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেন তখন সে মাঝে মাঝে বাবার ঘরে ঢুকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলতো : আব্বা! যথেষ্ট হয়েছে। এখন কি একটু ঘুমোবেন? তিনি জবাব দিতেন : আমার ছেলে! সেই ব্যক্তি কেমন করে ঘুমোতে পারে যে তার প্রভুর শাস্তির ভয় করে।[২২]

রাবী'র 'ইবাদাত-বন্দেগীর বিশেষ সময় ছিল রাতের অন্ধকার। সারা রাত 'ইবাদাতে কাটিয়ে দিতেন। উপদেশমূলক আয়াত পাঠ করতেন। তা দ্বারা এত বেশী প্রভাবিত হয়ে পড়তেন যে একই আয়াত বার বার পাঠ করতে করতে সকাল হয়ে যেত। তাঁর দাস নুসায়র ইবান যা'লূক বর্ণনা করেছেন। রাবী' রাতের অন্ধকারে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সময় যখন নিম্নের এ আয়াতে পৌঁছতেন তখন তা বার বার তিলাওয়াত করতে করতে সকাল হয়ে যেত।[২৩]

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السَّيِّاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَايَحْكُمُوْنَ.[২৪]

---

[২১] সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন, ৬০-৬১

[২২] সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/২৬০

[২৩] তাবাকাত-৬/১৩০

[২৪] সূরা আল-জাছিয়া-২

– যারা খারাপ কাজ করেছে তারা কি এ ধারণা করে যে, আমরা তাদেরকে সেই লোকদের সমান করে দেব যারা ভালো কাজ করেছে? যাদের জীবন ও মরণ সমান। তারা কতই না খারাপ সিদ্ধান্ত নেয়।

'আবদুর রহমান ইবন 'আজলান বলেছেন। একদিন আমি রাবী'র ঘরে রাত্রি যাপন করি। তিনি যখন মনে করলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযের মধ্যে উপরের আয়াতটি তিনি বার বার তিলাওয়াত করেন। আর তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে।[২৫] জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক ছিলেন। কখনো জামা'আত ছাড়তেন না। শেষ জীবনে চলতে ফিরতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। তখনো জামা'আত তরক হতো না। অন্যের সাহায্যে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মসজিদে পৌঁছতেন। আবূ হায়্যান তাঁর পিতার কথা বর্ণনা করেছেন। রাবী' পঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে চলৎশক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলেন। তবে নামাযের জন্য হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে অথবা অন্যের সাহায্যে মসজিদে যেতেন। লোকেরা বলতো, আবূ ইয়াযীদ! আপনি তো এখন মা'জুর। এ অবস্থায় ঘরে নামায আদায়েরও অনুমতি আছে। জবাব দিতেন : حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة এবং حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ শোনার পর যতদূর সম্ভব সাড়া দেওয়া উচিত। তা সে হামাগুড়ি দিয়েই হোক না কেন।[২৬]

রাবী' একজন নির্জন-নিরিবিলির 'আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। আর এ কারণে খিলাফতে রাশেদার সময়ে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোথাও তাঁর উপস্থিতি দেখা যায় না। তবে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য নির্জন-নিরিবিলি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেন। তাঁর এই জিহাদ এমন নির্ভেজাল আল্লাহর জন্য হতো যে, মালে গনীমত মোটেই স্পর্শ করতেন না। ভাগে যা কিছু পেতেন তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে ফেলতেন। 'আবদি খায়র নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আমি একবার একটি যুদ্ধে রাবী'র সঙ্গী ছিলাম। এ যুদ্ধে গনীমতের অংশে তিনি বহু দাস এবং গৃহপালিত জন্তু লাভ করেন। কিছুদিন পর কোন কারণে আমাকে আবার তাঁর কাছে যেতে হয়। তখন তাঁর কাছে সেই গনীমতের মালের কোন কিছুই দেখতে না পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম : সেই দাস ও জীবজন্তুগুলোর কি হয়েছে? তিনি কোন জবাব দিলেন না। আমি যখন আবার জিজ্ঞেস করলাম তখন বললেন :

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ.

– তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা যা কিছু ভালোবাস তা থেকে খরচ কর।[২৭]

ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে খরচ করা ছিল তাঁর বিশেষ গুণ। মিষ্টি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এ কারণে কোন সায়িল এলে তিনি তার হাতে একটি চিনির দলা তুলে

---

[২৫] সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন, ৬২

[২৬] তাবাকাত-৬/১৩২

[২৭] প্রাগুক্ত-৬/১৩৩

দিতেন। লোকেরা যখন বলতো, এর চেয়ে তো তার রুটির প্রয়োজন বেশী। জবাবে তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন :[২৮]

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا.[২৯]

– তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে।

তিনি বলতেন : 'মানুষকে ভালো খাবার খাওয়াবে, নতুন কাপড় পরাবে এবং সুস্থ-সবল দাস মুক্ত করবে।'[৩০]

অভাবী-প্রতিবেশীদেরকে তিনি ভালো ভালো খাবার পাকিয়ে খাওয়াতেন। মুনযির ছাওরী বর্ণনা করেছেন। একবার রাবী' তাঁর বাড়ীর লোকদেরকে 'খুবায়স' নামক এক প্রকার খাবার তৈরী করতে বলেন। যেহেতু তিনি কখনো নিজের জন্য কোন কিছুর আবদার করতেন না। এ কারণে তাঁর বেগম সাহেবা অতি যত্ন সহকারে 'খুবায়স' তৈরী করেন। তাঁর প্রতিবেশীদের মধ্যে এক উন্মাদ ব্যক্তিও ছিল। তিনি সেই 'খুবায়স' নিয়ে গিয়ে নিজ হাতে তুলে তাকে খাওয়ান। উন্মাদ লোকটির মুখ থেকে সব সময় লালা ঝরতো। তিনি যখন তাকে খাইয়ে ঘরে ফিরে আসেন তখন বেগম সাহেবা বললেন, আমি এত কষ্ট করে এবং এত যত্ন সহকারে খাবারগুলো তৈরী করলাম, আর আপনি এমন এক লোককে খাইয়ে এলেন যে এটাও বুঝতে অক্ষম যে, সে কি খেয়েছে। তিনি জবাব দিলেন : আল্লাহ তো জানেন।[৩১] তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ، وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ.[৩২]

– তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা যা কিছু ভালোবাস তা থেকে খরচ কর। আর তোমরা যা কিছু খরচ করবে, আল্লাহ তা জানেন।

রাবী'র জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার' বা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। যদিও তিনি একজন নীরব ও নির্জনতা প্রিয় মানুষ ছিলেন, তবে আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার-এর জন্য নির্জনতা ছেড়ে বেরিয়ে এসে নীরবতা ঝেড়ে ফেলতেন। তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন তাদের তিনি বলতেন, তোমরা ভালো কথা বলবে এবং নিজেরা ভালো কথার উপর 'আমল করবে, সবসময় ভালোর উপর থাকবে। আর যতদূর সম্ভব বেশী বেশী নেক কাজ করবে এবং খারাপ কাজ কমিয়ে দেবে। নিজের অন্তরকে কঠোর করবে না। তোমার জীবনকাল এত দীর্ঘ নয়। সেইসব লোকের মত হবে না যারা মুখে তো বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শুনে না।

---

[২৮] প্রাগুক্ত-৬/১৩১

[২৯] সূরা আদ-দাহ্‌র-৮

[৩০] আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়ীন-৩/১৫৮

[৩১] তাবাকাত-৬/১৩১

[৩২] সূরা আলে 'ইমরান-৯২

কেউ যদি তাঁকে কিছু উপদেশ শোনাতে বলতো, তিনি তাঁকে কুরআনের কিছু হুকুম-আহকাম লিখে দিতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে কিছু উপদেশ দিতে বলে। তিনি কিছু কাগজ চেয়ে নিয়ে সূরা আল-আন'আমের এ আয়াতটি লিখে দেন :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ... عَلَيْكُمْ. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.[৩৩]

লোকটি বললো, আমি আপনার নিকট এজন্য এসেছিলাম যে, আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দেবেন। বললেন : হাঁ, এর উপর 'আমল কর।[৩৪]

তাকওয়া-পরহিযগারীর গর্ব ও ঔদ্ধত্য থেকে রাবী' সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করা সত্ত্বেও কখনো পাপীদের সম্পর্কে তাঁর জিহ্বা থেকে কোন খারাপ কথা বের হতো না। নাসর ইবন যা'লূক বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি রাবী'র নিকট জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোন মানুষকে খারাপ বলেন না কেন? বললেন : আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত নই। অন্যকে খারাপ বলবো কেমন করে? মানুষের এ বিস্ময়কর অবস্থা যে, সে অন্যের পাপের ব্যাপারে তো আল্লাহকে ভয় করে; কিন্তু নিজের পাপের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না।[৩৫]

রাবী' আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অনুসরণের ব্যাপারে ভীষণ গুরুত্ব দিতেন। ছোট ছোট ও অতি সাধারণ কথা ও কাজে তিনি এত সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, কোন মানুষের চিন্তা ও কল্পনাও সেদিকে যেত না। বাকর ইবন মা'ইয বর্ণনা করেছেন। একবার রাবী'র ছোট্ট একটি মেয়ে বললো, আব্বা! আমি খেলতে যাচ্ছি। তিনি বললেন : যাও, ভালো কথা বলো। ছোট্ট বাচ্চা। তাঁর এ কথার অর্থ কেমন করে বুঝবে? লোকেরা রাবী'কে বললো : আপনি এই শিশুকে খেলতে যেতে দেন না কে? বললেন : আমি এটা চাই না, আমার আজকের আমলনামায় এ কথা লেখা হোক যে, আমি খেলার নির্দেশ দিয়েছি।[৩৬]

তিনি সকল কাজ নিজ হাতে করতেন। রাড়ীর পায়খানাও নিজ হাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেন। একবার এক ব্যক্তি বললো, এ কাজের জন্য তো অন্য মানুষ আছে। বললেন, আমি বাড়ীর কাজ-কর্মেও অংশীদার হতে চাই। তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়ীভাব দেখে তাঁর শিক্ষক হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা) বলতেন, তোমাকে দেখে আমার বিনয়ী লোকদের কথা স্মরণ হয়।[৩৭] কখনো কোন অবস্থাতেই তাঁর মুখ থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী কোন কথা উচ্চারিত হতো না। কারো দ্বারা কষ্ট পেলেও তার জন্য দু'আ করতেন। একদিন মসজিদে মুসল্লীদের ভীষণ ভীড় ছিল। যখন জামা'আত আরম্ভ হতে যাচ্ছিল এবং ধীরে ধীরে লোকেরা সামনে এগুচ্ছিল, ঠিক সে সময় রাবী'র পিছনের

---

[৩৩] সূরা আল-আন'আম-১৫১

[৩৪] তাবাকাত-৬/১৩০

[৩৫] প্রাগুক্ত-৬/১২৯

[৩৬] প্রাগুক্ত-৬/১২৭

[৩৭] প্রাগুক্ত-৬/১৩০

লোকটি তাঁকে বলে, সামনে এগোন। কিন্তু অত্যধিক ভীড়ের কারণে তিনি সামনে এগুতে পারছিলেন না। লোকটি রেগে গিয়ে পিছন থেকে রাবী'র ঘাড়ে খোঁচা দেয়। তিনি ব্যথা পান এবং একথা বলতে থাকেন : আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন। লোকটি চোখ উঁচু করে রাবী'কে দেখতে পেয়ে এত লজ্জিত হয় যে, কাঁদতে শুরু করে।

তিনি সব সময় একাকী থাকা পছন্দ করতেন। কোথাও আসা-যাওয়া করতেন না। কোন অনুষ্ঠান ও সমাবেশে বসাও পছন্দ করতেন না। ইমাম শা'বী বলেন, রাবী' বিবেক-বুদ্ধি হওয়ার পর না কোন মজলিসে বসেছেন, আর না কোন প্রধান সড়কে গেছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলতেন, আমি এটা পছন্দ করতাম না যে, কোন স্থানে যাই, আর সেখানে এমন কিছু দেখি যাতে আমাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়, আর আমি সাক্ষ্য দিতে না পারি, কোন অভাবী মানুষকে দেখি, আর তার কোন সাহায্য করতে না পারি, অথবা কোন মজলুমকে দেখি ও তার কোন উপকারে আসতে না পারি।

বাড়ীতেও তিনি সব সময় চুপচাপ থাকতেন। খুব কম কথা বলতেন। কোন বাজে কথা তার মুখে কখনো উচ্চারিত হতো না। এক ব্যক্তি, যিনি রাবী'র সাহচর্যে বিশ বছর কাটান, বর্ণনা করেছেন যে, আমি তাঁর সাহচর্যে বিশ বছরের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি, এ সময়ে আমি তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত এমন কোন কথা শুনিনি যার সমালোচনা হতে পারে। একই ব্যক্তি আরো বলেছেন, আমি বিশ বছরে রাবী'র মুখ থেকে ভালো কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বের হতে শুনিনি। তামীম গোত্রের আরেক ব্যক্তি বলেছেন, আমি দু'বছর যাবত রাবী'র সাথে বসেছি। এর মধ্যে তিনি আমার কাছে মানুষের পার্থিব অবস্থা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেননি। একবার শুধু জিজ্ঞেস করেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন, তোমাদের মহল্লায় কয়টি মসজিদ আছে?[৩৮] অন্যদেরকেও তিনি বাজে কথা বলতে বারণ করতেন। তিনি বলতেন, তোমরা কম কথা বলবে। তবে এই নয়টি ক্ষেত্রে বেশী বলতে দোষ নেই :

১. তাহ্‌লীল : لا إله إلا الله

২. তাকবীর : الله اكبر

৩. তাস্‌বীহ : سبحان الله

৪. তাহ্‌মীদ : الحمد لله

৫. কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর কাছে দু'আ করা

৬. খারাপ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা

৭. আমর বিল মা'রূফ

৮. নাহি 'আনিল মুনকার

৯. কুরআন তিলাওয়াত।[৩৯]

---

[৩৮] প্রাগুক্ত-৬/১২৯; আল-বায়ান-৩/১৪৬

[৩৯] আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৩/১৫০

তিনি আরো বলতেন : মানুষকে ভালো কথা বলা শেখাবে, খারাপ কথা বলা থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে। কুরআন তিলাওয়াত করবে, আল্লাহর কাছে কল্যাণের জন্য দু'আ করবে এবং অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাহায্য চাইবে।[৪০]

রাবী' যদিও চুপচাপ ও একাকী থাকতেন, তবুও ফুলের সুবাস ও সূর্যের আলো যেমন আবদ্ধ করে রাখা যায় না, তেমনিভাবে তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকেনি। তাঁর চরিত্রের সুবাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর চরিত্র-মাধুর্য দ্বারা মানুষ দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। শাফীক বর্ণনা করেছেন, একবার আমি 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) কয়েকজন ছাত্রের সাথে রাবী'র সংগে সাক্ষাতের জন্য গেলাম। পথে এক ব্যক্তি আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? আমরা বললাম : রাবী'র সংগে দেখা করার জন্য। লোকটি বললো : আপনারা এমন এক ব্যক্তির কাছে যাচ্ছেন, যিনি কোন কথা বললে মিথ্যা বলেন না, অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করেন না এবং তাঁর কাছে কোন কিছু আমানত রাখলে খিয়ানত করেন না।

কোন মানুষের সমকালীনদের স্বীকৃতিই হলো তার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। রাবী'র সমকালীন লোকেরা তাঁর প্রতি এত মুগ্ধ ছিলেন যে, কেউ কোনভাবে তাঁর চেয়ে নিজেকে বড় ভাবা পছন্দ করতো না। একবার এক ব্যক্তি আবূ ওয়াইলকে প্রশ্ন করে : আপনি বড় না রাবী'? জবাবে তিনি বলেন : আমি বয়সে তাঁর চেয়ে বড়, তবে তিনি বুদ্ধি ও প্রজ্ঞায় আমার চেয়ে বড়।[৪১]

তিনি যেমন কম কথা বলতেন, তেমনি কোন বিতর্কেও জড়ানো পছন্দ করতেন না। একবার তাঁর এক আত্মীয় দেখা করতে এলো। কথার ফাঁকে এক সময় লোকটি বললো : আবূ ইয়াযীদ! হুসায়ন ইবন ফাতিমা (রা) নিহত হয়েছেন। তিনি বললেন : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন– নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই কাছে আমরা ফিরে যাব। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন :

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِىْ مَاكَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ.[৪২]

– বলুন, হে আল্লাহ, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী! আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতো।

রাবী'র এ কথায় লোকটি সন্তুষ্ট হতে পারলো না। সে প্রশ্ন করলো : তাঁর হত্যার ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

বললেন : আমি বলি তাঁদেরকে আল্লাহরই কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তাঁদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহই করবেন। আল-জাহিজ বলেন : 'ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কে রাবী' কোন

---

[৪০] তাবাকাত-৬/১২৯

[৪১] আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/৪২৫

[৪২] সূরা আয-যুমার-৪৬

কথা বলতেন না এবং কোন কথা শুনতেনও না।'[৪৩]

একবার এক ব্যক্তি বললেন : আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন, আল্লাহ আপনাকে ভালো প্রতিদান দেবেন। বললেন : তোমার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে যা কিছু আছে, সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আর যা কিছু জ্ঞান তোমার নেই, তা যিনি জানেন সেই সত্তার নিকট তা সোপর্দ কর। তোমাদের কেউ যেন না বলে : 'হে আল্লাহ, আমি তোমার দিকে ফিরে এসেছি।' তারপর যদি সে ফিরে না আসে তাহলে সেটা হবে মিথ্যা, তাই সে যেন বলে : 'হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রতি ফিরে আসুন!' তাহলে এটা হবে দু'আ।

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বললো : আমি দীর্ঘ দিন যাবত আপনার সাথে আছি, এর মধ্যে একদিনও আপনাকে কবিতার কোন উদ্ধৃতি দিতে শুনলাম না। অথচ আপনার সঙ্গী-সাথীদের অনেককে আমি কবিতার উদ্ধৃতি দিতে শুনেছি। বললেন : যা কিছু তোমরা এখানে বলবে তা সবই লেখা হবে এবং সেখানে তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হবে।

তারপর উপস্থিত সবার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন : তোমরা বেশী করে মৃত্যুকে স্মরণ কর। কারণ, সে তোমাদের থেকে অনুপস্থিত পর্যবেক্ষণকারী। আর অনুপস্থিত ব্যক্তির দূরে অবস্থানের মেয়াদ দীর্ঘ হয়ে গেলে তার ফেরার সময়ও নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। তারপর কিছুক্ষণ অঝোরে কাঁদলেন। কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে বললেন : সেই সময় তুমি কি করবে যখন এ অবস্থা হবে :

إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ.
يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى.[৪৪]

- যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন। সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে। সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে?[৪৫]

তিনি বলতেন, আমার যদি দু'টি মন থাকতো তাহলে একটা কোথাও আটকে গেলে অন্যটি তাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতো। কিন্তু আমার তো একটি মাত্র মন। সেটা যদি আমি অন্য কোথাও আটকে ফেলি তাহলে তাকে ছাড়াবে কে?[৪৬]

কেউ যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করতো : রাবী'! আজ আপনার সকালটি কি অবস্থায় হলো? বলতেন : দুর্বল পাপী অবস্থার মধ্যে আমার সকাল হয়েছে। এরপর নির্ধারিত রিযিক খাবো এবং মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকবো।[৪৭]

---

৪৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/১০৫

৪৪. সূরা আল-ফাজর-২১-২৩

৪৫. সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন, ৫৭-৫৯

৪৬. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/১৭৯

৪৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/১৭৪

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-ইমাম আয-যাহাবী :
    (ক) সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, (বৈরূত : আল-মুআস্-সাসাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯০)
    (খ) তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ, (বৈরূত : দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-ইসলামী)
    (গ) তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম, (কায়রো : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭ হি.)
    (ঘ) মীযান আল-ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল, (বৈরূত : দারুল মা'রিফা, সংস্করণ-১, ১৯৬৩)
২. ইবন হাজার আল-'আসকালানী :
    (ক) তাকরীব আত-তাহ্‌যীব, (বৈরূত : দারুল মা'রিফা, সংস্করণ-২, ১৯৭৫)
    (খ) তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব, (হায়দ্রাবাদ : দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৩২৫ হি.)
    (গ) আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা, (বৈরূত : দার আল-ফিক্‌র, ১৯৭৮)
    (ঘ) লিসান আল-মীযান, (হায়দ্রাবাদ, ১৩৩১ হি.)
৩. ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী, শাযারাত আয্-যাহাব, (বৈরূত : আল-মাকতাব আত-তিজারী)
৪. ইবন আল-জাওযী :
    (ক) সিফাতুস সাফওয়া, (হায়দ্রাবাদ : দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৩৫৭ হি.)
    (খ) আল-হাসান আল-বাসরী, (কায়রো : দারুল ফিক্‌র আল-'আরাবী)
৫. ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরূত : মাকতাবতুল মা'আরিফ)
৬. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, (বৈরূত : দারু সাদির)
৭. ইবন 'আসাকির, আত-তারীখ আল-কাবীর, (আশ-শাম : মাতবা'আতুশ শাম, ১৩২৯ হি.)
৮. ইবন খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'য়ান, (মিসর : মাকতাবাতু আন-নাহ্‌দা আল-মিসরিয়্যা, ১৯৪৮)
৯. ইবন হাযাম, জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব, (মক্কা : দারুল মা'আরিফ, ১৯৬২)
১০. ইবন আল-আছীর :
    (ক) উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, (বৈরূত : দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী)
    (খ) আল-কামিল ফিত তারীখ, (বৈরূত : দারুল বৈরূত)
১১. ইবন কুতায়বা :
    (ক) 'উয়ূন আল-আখবার, (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৭)
    (খ) আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা, (মিসর : মাতবা'আতুল বাবী আল-হালাবী, সংস্করণ-১, ১৯৩৭)

১২. আল-জাহিজ :
  (ক) আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, সম্পাদনা : 'আবদুস সালাম হারূন, (বৈরূত : দারুল ফিক্র, সংস্করণ-৪)
  (খ) কিতাবুল হায়ওয়ান, সম্পাদনা : 'আবদুস সালাম হারূন, (কায়রো : আল-মাতবা'আতুল হুমায়দিয়্যা; ১৯৪৮)
১৩. ইবন 'আবদি রাব্বিহি আল-আন্দালুসী, আল-'ইক্দ আল-ফারীদ, (কায়রো : মাতবা'আতু লুজনাতিত তা'লীফ ওয়াত তারজামা, সংস্করণ-৩, ১৯৬৯)
১৪. আহমাদ আল-হাশিমী, জাওয়াহিরুল আদাব, (মিসর : মাতবা'আতুস সা'আদা, ১৯৬৪)
১৫. আল-বাকিল্লানী, ই'জায আল-কুরআন, (বৈরূত : মুআস্সাতুল কুতুব আছ্-ছাকাফিয়্যা, সংস্করণ-১, ১৯৯১)
১৬. মুহিউদ্দীন ইবন শারফ আন-নাওবী, তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত, (মিসর : আত-তিবা'আ আল-মুগীরিয়্যা)
১৭. আয-যিরিক্লী, আল-আ'লাম, (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, সংস্করণ-৪, ১৯৭৯)
১৮. আহমাদ যাকী সাফওয়াত, জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব, (বৈরূত : আল-মাকতাবা আল-'ইলমিয়্যা)
১৯. 'আবদুল কাহির আল-বাগদাদী, আল-ফার্কু বায়নাল ফিরাক, (কায়রো, ১৯১০)
২০. ইহ্সান 'আব্বাস, আল-হাসান আল-বাসরী, সীরাতুহু, শাখসিয়্যাতুহু, তা'আলীমুহু ওয়া আরাউহু, (কায়রো : দারুল ফিক্র আল-'আরাবী, ১৯৫৭)
২১. ইবন আল-মুরতাদা, আল-মানিয়্যাতু ওয়াল আমাল, (হায়দ্রাবাদ)
২২. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, সংস্করণ-৭, ১৯৬৭)
২৩. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৮৫)
২৪. ইউসুফ আল-মুযী, তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর রিজাল, (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-২, ১৯৮৪)
২৫. ইবন তায়মিয়্যা, আর-রিসালা আত-তাদমুরিয়্যা, (কায়রো : ১৩৯৭)
২৬. মুহাম্মাদ আল-খাদারী বেক, তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা, (মিসর : আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়্যা আল-কুবরা, ১৯৬৯)
২৭. মাহমুদ শুকরী আল আলূসী, বুলূগ আল-আরিব ফী মা'রিফাতি আহওয়ালিল 'আরাব, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা)
২৮. ড. 'আবদুর রহমান আল-বাশা, সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন, (কায়রো : দারুল আদাব আল-ইসলামী, সংস্করণ-১৫, ১৯৯৭)
২৯. 'আবদুল মুন'ঈম আল-হাশিমী, 'আসরুত তাবি'ঈন (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, সংস্করণ-৩, ২০০০ইং)

৩০. আবুল হাসান 'আলী আন-নাদাবী, রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়া ফিল ইসলাম, (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, সংস্করণ-১, ১৯৯৯)

৩১. মু'ঈন উদ্দীন আহমাদ নাদবী, তাবি'ঈন, (ভারত : মাতবা' মা'আরিফ, ১৯৫৬)

৩২. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২)

৩৩. কোরআনুল কারীম, মূল : তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মহীউদ্দীন খান, (মদীনা : বাদশাহ্ ফাহ্দ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.)

৩৪. ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখ আল-ইসলাম, (বৈরূত : দারুল আন্দালুস, সংস্করণ-৭, ১৯৬৪)

৩৫. হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থ।